॥ সূচীপত্র ॥

প্রসঙ্গ ঃ সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা

(মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা)—৪৫০

অনুবাদক সূচীপত্র

স্বৈরিনী	ঊষা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
তার স্ত্রী	,,
বাথবাসিনীর কাহিনী	সুকান্ত সেনগুপ্ত
ফরহুম দি বেল টোলস্	তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
হিতোপদেশ	,,
যোগবাশিষ্ট রামায়ণম্	,,
লাউরা	,,
দি স্টোরি অফ মিংই	,,
ললিতা	,,
হরিবংশ	,,
বিদ্যাসুন্দর	,,
দি উইণ্ডো	,,
সিদ্ধার্থ	.
আণ্ডার দি উড	,,
মেমোয়ারস্	,,
ডেনজার	,,
লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক	,,
অনঙ্গ রঙ্গ	জীমূত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
রতি রঙ্গিনী	,,
পরকীয়া সংগম	,,
সোনালী গাধা থেকে	,,
ইউলিসিস থেকে	,,
আদিম খেলা	,,
স্বীকারোক্তি থেকে	,,
ধর্মযাজক ও পল্লীবধূ সমাচার	অবনী সাহা
নৈশাভিসার	,,
মঠের সন্ন্যাসিনী ও সেই বোবা চাকর...	,,
নাইটিঙ্গেল পাখীর গান	,,
প্রণয়াসক্ত রমনী জীবন	,,
এতটুকু বাসা	পৃথ্বীরাজ সেন

॥ প্রসঙ্গ ঃ অশ্লীলতা ও বিশ্বসাহিত্য ॥

বহু বিতর্কিত অশ্লীলতার নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা আছে কিনা জানিনে। দেশকাল, পাত্র-পাত্রী, আচার-সংস্কার ভেদে লজ্জার যেমন নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, ঠিক তেমনি অশ্লীলতার। বিভিন্ন জাতির মধ্যে লজ্জার আকার বিভিন্ন। লজ্জাকে মুখে আরোপ করাতে অবগুণ্ঠনে আবৃত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আবার বৈচিত্রময় বিশ্বে এমন সংবাদ চয়ন বোধহয় খুব একটা দুর্লভ নয় যে কোন জাতীয় রমণী নগ্ন থাকলেও স্তনদ্বয়কে অনাবৃত রাখা লজ্জাজনক কল্পনায় পয়োভারের সৌন্দর্য কাঁচুলির অচ্ছাদনে ঢেকে রাখল।

আপাততঃ অশ্লীলতা বিষয়ক এ যাবৎ বিদগ্ধ সমালোচক কর্তৃক যা আলোচিত হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ ও আলোচনা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক তো হবেই না বরং সপ্রাঙ্গিক ও সময়োপযোগী হবে! ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা সঞ্চয়ন' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সব্যসাচী বঙ্কিম অশ্লীলতার বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন ঃ—

'যা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য ভাবের অভি-ব্যক্তির জন্য লিখিত হয় তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল।'

তিনি আরও বলেছেন, 'অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ঘৃণিত। তবে যেমন লোকের রুচি ভিন্ন, তেমনি দেশ ভেদেও রুচি ভিন্ন প্রকার।...পক্ষান্তরে স্ত্রী পুরুষে মুখ চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য—মাতৃ পিতৃ সমক্ষেই উহা নির্বাহ হইয়া থাকে।... মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচি বিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা।'

অসুন্দর অর্থাৎ অশ্লীলতার স্থান জীবনে যে নেই এমন কথা নয় তবে শিল্পে জীবনের পূর্ণতা রূপায়িত হয় তাই পরশমণির স্পর্শে অশ্লীল হয়ে ওঠে শ্লীল, বস্তু পর্যবসিত হয় রসে। 'রচনার বিষয় রসে উত্তীর্ণ না হলে সাহিত্যে নানা রকম দোষ দেখা দেয়। অনেক সময় অশ্লীলতা এই কারণ ঘটিত।' (প্রমথনাথ বিশী) পাশ্চাত্য লেখক আঁ্যলা বলেন—'True fiction is chaste the description of physical is not a subject for the artist,—অর্থাৎ সত্যি-কারের গদ্য কাহিনীর মাঝে সতীত্বের সংযম থাকে—যৌনতার নগ্ন রূপায়ণ শিল্পীর বিষয় বস্তু হতে পারে না।

একালে-সেকালে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে ; ভবিষ্যতেও হবে। সাগর পারের দেশে চসারের 'ক্যানটারবেরি টেলস্' থেকে শুরু করে নভোকভের 'লোলিটা' পর্যন্ত বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থে অশ্লীলতা স্পন্দন অনুভব করা যায়।

স্বামী অন্ধ—চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত। তাই তার উপস্থিতিতেই উত্তেজিত অর্ধাঙ্গিনী অনুপ্রবেশকারী উপপতিকে দেহদানের মাধ্যমে অনাস্বাদিত পূর্ব রোমাঞ্চ ও তৃপ্তির স্বাদ পেয়েছে। পার্থিব বস্তুতে অনাসক্ত চিত্ত সর্বস্বত্যাগী দু'জন সন্ন্যাসী কৃষক গৃহস্থের স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে যৌন সংসর্গে নিবিড় আনন্দ উপলব্ধি করেছে এমন দৃশ্যও 'ক্যানটারবেরি টেলস্'-এ দুর্লভ নয়। অবশ্য ঘটনায় বোকাসিও সাহিত্যের ছায়া পড়েছে।

রুশ চিরায়ত সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক লিও টলস্টয়ের 'রেজারেকসনে'র বিষয় দক্ষিণারঞ্জন বসু লিখেছেন "টলস্টয় তখন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'রেজা-রেকসন' লিখেছেন। উপন্যাসের যে পরিচ্ছেদে ডিমিট্রির সঙ্গে তার অবৈধ সহ-বাসের ফলে সরল গ্রাম্যবালা কাটুসার সন্তান সম্ভবনা হবার বিবরণ রয়েছে তা পড়ে টলস্টয় গৃহিণী স্বামীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন। বলেছিলেন 'তোমার মতো বুড়োর পক্ষে এমনি নোংরা কথা লিখতে একটুও লজ্জা হলো না, আশ্চর্য।'"

যথারীতি টলস্টয় কোনো উত্তর দেননি স্ত্রীর কথায়। স্ত্রী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বন্ধু মেরিয়া আলেকজেন্দ্রোভনা সেমিৎসকে তিনি বললেন—"See how she attacks me, but when my brothers took me for the first time to a brothel and I accomplished this act I then stood by the woman's bed and wept."

'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার'-এ যৌন সঙ্গমের দীর্ঘ প্রসারিত বর্ণনা আছে। চ্যাটার্লি'র মতো জয়েসের 'ইউলিসিস', ক্লেল্যাণ্ডের 'ফ্যানীহিল', নবোকভের 'লোলিটা'তে অশ্লীলতার আতিশয্য নিঃসন্দেহেই কুশ্রীতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। 'ফ্যানীহিলে' একাধিকবার যৌন সঙ্গমের উল্লেখ আছে। 'দি ওয়েল অফ লোনলিনেস' উপন্যাসে সমকামী নারী জীবনের বিকৃতির সুদীর্ঘ বিবৃতি এক-কালে এটিকে নিষিদ্ধ উপন্যাস চিহ্নিত করেছিল। বর্তমানে এটি নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত। উইলিয়াম ব্যারেরে 'নেকেড লাঞ্চ' বহু বিতর্কিত আর একটি অশ্লীল উপন্যাস। গ্রন্থের নায়িকা মেরী তার প্রিয়তম জনির সঙ্গে কাম

প্রবৃত্তির চরম চরিতার্থতার মাঝেও শান্তি পেল না। তাই জনিকে হত্যা করে সে তার পুরুষাঙ্গ ভোজনে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে।

মপাঁসা এবং মম দুজনেই দেহ কামনায় ব্যাকুল। তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে যৌনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

সমকামিতা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহু প্রচারিত একটি বিষয়। 'পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসে অস্কার ওয়াইল্ড এর বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক ন্যুয়র্কের উন্মত্ত যৌন চর্চার নগ্ন চিত্র হ্যারল্ড রোবিন্সের 'এ স্টোন ফর ড্যানি ফিসারে' দর্পনায়িত হয়েছে। আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেবিস' উপন্যাসে স্তনে মদ ঢেলে লেহন করার রোমহর্ষক অশ্লীলতার স্পষ্ট চিত্র পাই। ম্যারিয়াকের মতে সাত্রেঁর 'যৌবন কামনার বাড়াবাড়িতে ঘৃণা হয়।' জৈব কামনা চিরন্তন একটি প্রবৃত্তি। কিন্তু লরেন্সের 'Rubbing the drity little secret', এবং জয়েসে 'What is love ? It is a crock and bottle' উক্তি দুইটি কি একমাত্র সত্য ? শরৎ-চন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলিনা।'

সেকস্‌পীয়র, কালিদাসেও যে অশ্লীলতা আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। আঠার শতকের অন্তিম লগ্নে আদর্শতার নিরিখে সেক্সপীয়রের নাটকেরও নব মূল্যায়ণ হলো—অশ্লীলতা আছে কিনা তা বিচার করা হলো। সেক্সপীয়রের Henry iv নাটকের উক্তি 'I will discharge upon her, Sir John, with two bullets" অশ্লীল সন্দেহ নেই কিন্তু সমগ্র সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য আর বিস্তৃতির মাঝে এর অস্তিত্ব কতটুকু ? তাছাড়া সেক্সপীয়র স্বয়ং তাঁর 'হ্যামলেট' নাটকে বলেছেন 'There is nothing good or bad, but thinking makes it so.'

মহাকবি কালিদাসের রচনায় অশ্লীলতার উল্লেখে সমালোচক মহল অতি সচেতন ও সক্রিয়। কিন্তু নিখুঁত সৌন্দর্যবোধের প্রতিই আলোচ্য কবির একান্ত আকর্ষণ। তাঁর রচনা পাঠে 'Sublime' একটা আনন্দে পাঠকের মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথেও অশ্লীলতার সন্ধানে এককালে হৈ হৈ রব উঠেছিল। এ যুগের সমালোচক প্র. না. বি লিখেছেন—"চিত্রাঙ্গদা নাটকে এমন বিষয় আছে সাদা গদ্যে লিখিত হলে, যতই অলঙ্কারে আবৃত হোক সে গদ্য স্থূল ও অশ্লীল হয়ে দেখা

দিত। 'বিজয়িনী, কবিতার নগ্ন নারী মূর্তি "a privacy of glorious light'এ আবৃত ; কিন্তু কবি তাকে বসন দেননি 'তবে ছন্দেও মনোরম অলঙ্কারে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করেছেন যে শুধু কন্দর্পকে নয় পাঠককেও তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়।' চিত্রাঙ্গদায় ভোগলীলা বিশ্বলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ তখন প্রকাশ পায় ফল। একথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে রবীন্দ্র সাহিত্য মার্জিত রুচিতে উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম শুচিতায় দীপ্যমান, মাধুর্য রসে সিক্ত।

তারপর বাঙলা উপন্যাস ও অশ্লীলতার বিষয়ে বলতে গেলে আলোচনায় প্যারিচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নববাবু বিলাস" প্রসঙ্গে বলা যায় যে এর কোনটিই সার্থক উপন্যাস নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাঙলা উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। কৃষ্ণকান্তের উইলে জলে ডোবা রোহিনী প্রসঙ্গে অশ্লীলতার স্পর্শ আছে। তিনি মালিকে বলিলেন, "তুই ইহার মুখে ফু‍ঁ-দে দেখি।......

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্বন করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙগা অধরে—সেই কটকি মুখের ফুঁ। মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, 'মুলে পারিবি না অধবড়। [কৃষ্ণকান্তের উইল, ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'শাহাজাদীরা বিবাহ করে না' জেবউন্নিসার এ উক্তি এবং তদনুযায়ী জীবনযাত্রা একই অভিযোগ উত্থাপিত করার পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্কিমের শেষ জীবনের দার্শনিক চিন্তাধারা সমন্বিত 'সীতারাম' উপন্যা স নগ্ন স্ত্রীকে বেত্রাঘাত জেলার বহু নারী ধর্ষণের কাহিনীকে স্মরণ করায়।

রবিবাবুর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে অনুগ্রহ নিগ্রহ মিশ্রিত পঙ্কিল লালসাময় মধুসূদন শ্যামার প্রসঙ্গ রসিক পাঠকের রস চিন্তার মাঝে ব্যাঘাত ঘটায় প্রশ্ন জাগায়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তীব্র মন্তব্য স্মর্তব্য—ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়।...

...তাঁহার 'তুমি যেও না এমনই, কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, ইত্যাদি লম্পট বা অভিসারিকার গান। "এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা পড়ে স্যার গুরুদাস বলেছিলেন এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্বে তিনি নাকি দেখেননি।'

[অশ্লীলতার অভিযোগ বাংলার নিষিদ্ধ বই। আদিত্য ওহদেদার। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫]

"অপরিণত বয়স্ক যুবক-যুবতীর জীবন 'ঘরে-বাইরে', 'চোখের বালি'র ন্যায় জঘন্য রুচিকর উৎকট উপন্যাসগুলি একেবারেই বিগড়াইয়া দিতে কম সহায়তা করিতেছে না। [নব্যভারত ১৩২৩]

সে যুগের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবুর 'রত্নদীপ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কিঞ্চিত তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন. 'বটতলার যোগ্য বই।'

এরপর শরৎচন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে তিনি 'একজন সম্ভোগ বিরোধী নীতিবিদ্, ইংরেজীতে যাহাকে বলে puritan'। তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'আলিঙ্গন তো দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের কোথাও দিতে পারিলাম না' এবং 'আমাদের সমাজে এ বস্তুটি (যৌন মিলন) লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration-এ লজ্জা করে।' কিন্তু এ কথাও মিথ্যে নয় যে কিরণময়ী ও সুরেশ ভোগকেই জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। 'আরাকান যাত্রার সময় জাহাজে কিরণময়ী দিবাকরের ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ অচলাকে শুধু চুম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এক দুর্যোগের রাত্রির দুরতি ক্রম্য অভিশাপে তাহা চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে।' (শরৎচন্দ্র, সুবোধ সেনগুপ্ত) উনিশ শতকের সাহিত্যে নীতির প্রাধান্য হেতু চরিত্রহীন,' 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ'কে 'immoral' বলে মনে করা হতো। বিদগ্ধ সমালোচক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'সাহিত্যে যাকে শ্লীল অশ্লীল বলা হয়ে থাকে আসলে তা সাহিত্যের উপর সমাজনীতির আরোপ। সমাজের পক্ষে যা শুভ তারই নাম শ্লীল, যা অশুভ তারই নাম অশ্লীল। তার সঙ্গে কিছুটা রুচি প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে।' (সৃষ্টির স্বাধীনতা, অন্নদাশঙ্কর রায়)।

সুরেশচন্দ্রের 'চিত্রবহা,' নরেশচন্দ্রের 'শুভা', 'শাস্তি,' 'পাপের ছাপ' উপন্যাস ত্রয়ী এবং চারুচন্দ্রের 'পঙ্কতিলক' উপন্যাস অশ্লীল ও নিষিদ্ধ পুস্তক হিসাবে গণ্য করা হত।

প্রবোধ সান্যালের 'আঁকাবাঁকা'য় রূপ বর্ণনার রীতি ইন্দ্রিয় পরতান্ত্রিক তথা অশ্লীল এমন কথা সে যুগের অনেক সমালোচক অকপটেই বলে ফেলেছিলেন।

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' রচনা করেছেন যিনি সেই সাধক উপন্যাসিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং 'বিবাহের চেয়ে বড়' উপন্যাসদ্বয়কে বাজেয়াপ্তের নামাবলী জড়িয়ে একদিন অন্ধকার গলির নিরালা ঘরে নির্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু একথাও বোধহয় মিথ্যে নয় যে বেল খেতে গেলে বেলের কয়েকটি বীচিও পেটে চলে যায়।

সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' (১৩৭৫) পত্রিকাতে ভারী সুন্দর একটা সংবাদ সরবরাহ করেছেন আদিত্য ওহ্ দেদার—"'অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যাঁর লেখনী তিনি নিজে অশ্লীলতার দায়ে ধরা পড়েন এমন বিড়ম্বনার আরেকটি দৃষ্টান্ত সজনীকান্ত দাস।"

লেখক নকুর ঠাকুরের আশ্রম গ্রন্থে অশ্লীলতার বিপক্ষে অর্থাৎ 'তুমি রাধা আমি শ্যাম' কাল্টের বিরুদ্ধে লিখে অশ্লীলতার দায়ে পড়লেন। তার মামলা শেষে জজ্ সাহেব আক্ষেপে বললেন যেখানে পুরস্কৃত করা উচিত সেখানে তিরস্কৃত করতে হল।

অনেক বিদগ্ধ সমালোচকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি,'বর্তমানে অশ্লীলতা শব্দের

তার থেকে মাত্র দু-তিন হাত দূরত্বে ঘুরছে। সিদ্ধার্থের সমস্ত শরীরটা ঝাঝাঁ করতে থাকে, কেমন অদ্ভুত লাগে তার নিজের মধ্যেটায়, চোখ ফেরাতে চেয়েও ফেরাতে পারে না। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা লতিকার, একটু মোটার দিকে, নগ্ন পেটে দুটো ভাঁজ পড়েছে, পাতলা সায়ার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়...আদিনাথ কোন কথা শোনে না ; উন্মত্তের মতো ছুট্‌ছুট্‌ করে, লতিকার বুকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে উম্‌-ম্‌-ম্‌-ম্‌ শব্দ ক'রে ওঠে—তারপর তাকে সিদ্ধার্থের দিকে ঠেলে বলে, নাও আমার বন্ধুকে একটু আদর করো।"

[প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

'উত্তরা তার পায়ের গোছ সংবৃত করল। উত্তরার পরণে লাল শাড়ি। যেন একটা মোচার খোল একটা সাদা থোড়কে ঢেকে দিল।.........মেয়েদের হাড় থাকে ভাবতে ভালো লাগে না।......

দিব্যেন্দু আবার উত্তরাকে চুমু খেল। এবার বুকের সৈকতে, এবার গলায়। প্রতিদান উত্তরা দিল সঙ্গে সঙ্গে......

আর তোমাদের, মেয়েদের বুঝি তলপেট কিছু না? সেখানে কোনও মোরগ-ফুল ফোটে না?

[এই রাত্রি আমার ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ]

আমার অনেক শখ ছিল একদিন, কোনোদিন, তোমার স্তন পান করব। স্তন্য-পায়ী, গোবেচারা; চিকন নরম কাজল কালো উজ্জ্বল চোখের কোঁনো সাদা বাছুরের মতো।......

হিমালয়ে হাইবিসকাস ফুল থাকবেই। অনেকদিন আগে ডম্‌ মোরেসের একটি কবিতাতে কোনো নেপালী মেয়ের কথা পড়েছিলাম, উরুসন্ধির বর্ণনা, 'show me the hibiscus flower between your thighs'

[মহুয়ার চিঠি ঃ বুদ্ধদেব গুহ]

সাহিত্যের জগৎ পূর্ণতার ; তাই আর্ট ফর আর্টস সেকের ন্যায় অশ্লীলতার জন্য অশ্লীলতা সৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই ব্যথা দেয়। প্রমথনাথ বিশী এ' প্রসঙ্গে মমের উল্লেখ করেছেন—'অনেক সময়েই অশ্লীলতা ইচ্ছাকৃত। সমরসেট মমের অনেক রচনা তার সাক্ষ্য।' বাংলা সাহিত্যেও তা দেখা যায়।

পরিশেষে বলি আমাদের প্রাচীন ও বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ত বটেই, কিন্তু এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত তথা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপের কালজয়ী দিক্‌পাল সাহিত্যিক প্রবর হোমার, দান্তে, চসার, বোকাসিও, বালজাক, সারভেন্টিস থেকে চেকভ, মঁপাসা, লরেন্স, নভোকভ প্রমুখের লেখাতে সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যের বিরাট ভাণ্ডারে কঠোর নীতিবাদীর দৃষ্টিতে শ্লীল ও অশ্লীলের প্রশ্ন নিঃসন্দেহে অঙ্গাঙ্গিক ভাবেই বর্তমান। এ প্রসঙ্গে Keats এর কবিতার একটি পংক্তি মনে পড়ে "Beauty is truth. truth, is beauty" সত্যম্‌ শিবম্‌ ও সুন্দরম্‌।

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মযাজক ও পল্লীবধূ সমাচার

গিয়োভানি বোকাসিও

ভারালাঙ্গো—নামটা সবাই জানেন। এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে একজন মাননীয় যাজক থাকেন। যেমন শক্ত সামর্থ তেমনি মেয়েদের বিষয়ে উৎসাহী পুরুষ। পড়াশোনায় খুব যে দড় তা নয়, কিন্তু মুখে বেশ কিছু উঁচু দরের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী মজুদ থাকতো। আর তা দিয়েই প্রতি রোববার তাঁর যাজন এলাকার ভক্ত নরনারীদের আপ্যায়ন করতেন। যখন তাঁর পুরুষ যজমানেরা বাড়ী থাকতো না, যাজক মশাই মহা উৎসাহের সঙ্গে তাদের বউদের খবরাখবর নিতে বেরুতেন। কাউকে দিতেন পবিত্র বারি, কাউকে একটা কি দুটো মোমবাতির পোড়া টুকরো, তাছাড়া তাঁর আশীর্বাদ।

শিষ্যাদের মধ্যে একজন সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা ছিলো সব চাইতে বেশী। তার নাম মোনো বেলকোলোর। সে ছিলো বেনটিভেনা ডেল ম্যাজো নামে একজন কৃষি শ্রমিকের বউ। নিঃসন্দেহে সে যেমন যৌবনবতী তেমনি মনোমুগ্ধকর এক পল্লীবালা। গোলগাল চেহারা দেখতে অনেকটা তামাটে রঙের টসটসে চেরী ফলের মতো। সারা গাঁয়ে এমন পটের ছবির মত মেয়ে আর ছিলোনা। তার উপর যখন সে খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতো, 'তুমি যা

চাইছো বঁধু, একদিন আশা পূর্ণ হবে।' আর যখন একটা রুমাল উঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতো, তখন তো পাড়ার অনেক ছোকরারাই মনে দাগ কেটে যেতো।

আমাদের যাজক মশাই মেয়েটির এই সব গুণপণায় এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে চিত্তবিক্ষেপের জ্বার তাড়িত হয়ে তিনি সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতেন যদি একবার তার দেখা মিলে। রোববারের সকালে গির্জায় তার দেখা পেলে, তিনি কানে কানে আবৃত্তির ভঙ্গীতে মনের কিছু কথা বলতে চেষ্টা করতেন। গাধার মতো কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বলতেন। কিন্তু বধূটির দেখা না পেলে কদাচিৎ মুখ খুলতেন। মোটামুটি তিনি তাঁর এই মনোভাব গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। বধূটির স্বামী বেনাটিভেনা ডেল্ ম্যাজো বা প্রতিবেশীরা তাঁর ব্যবহারে কোন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করতো না।

মোনা বেলকোলোরের, আরও ঘনিষ্ঠ হবার জন্য সুযোগ পেলেই যখন তখন তিনি কিছু না কিছু উপহার দিতেন। কখনও তাঁর নিজের বাগানের একগুচ্ছ তাজা রসুন, কখনও এক ঝুড়ি বরবটি, বা এক গোছা পেঁয়াজ জাতীয় গাছ। রাস্তায় দেখা হলে, অতি দীন ভাবে তার দিকে তাকাতেন। বোকার মত আসক্ত ও অনুরাগী ব্যক্তির মতো ফিস ফিস করে ন্যাকার জনক কথা তার কানে কানে বলতেন কিন্তু মেয়েটি এসব ভ্রূক্ষেপ করতো না। বরং এমন নাক উঁচিয়ে পথ চলতো যেন আশে পাশে যাজকটি নেই।

যাহোক একদিন, ধর্মযাজক মশাই উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াছিলেন। বেলা তখন দুপুর গড়িয়েছে। এমন সময় তাঁর দেখা হয়ে গেলো বেনাটিভেনা ডেল ম্যাজোর সঙ্গে। সে প্রচুর মালপত্র চাপিয়ে আগে আগে একটা গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাজক মশায় তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছো হে?

বেনাটিভেনা উত্তর দিলো, সত্যি বলছি যাজক মশাই, কিছু কাজ কারবারের জন্য শহরে যাচ্ছি। এগুলো নিয়ে যাচ্ছি উকিলবাবুর কাছে।

যাজক মশাই খুশীতে ডগমগ হয়ে বললেন, বেশ বেশ, যাও বৎস। আমার আশীর্বাদ রইলো। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আর হ্যাঁ, যদি ল্যাপুচ্চিও বা নালডিনোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তাহলে আমার শস্য আছড়াবার কাঠের জন্য চামড়ার ফিতে গুলো নিয়ে আসতে বলো তাদের। ভুলে যেওনা যেন।

বেনাটিভেনা শপথ করে বললো, সে এ সম্পর্কে দেখবে।

তারপর ফেনারেন্সের দিকে পা বাড়ালো সে। আর যাজক মশাই ঠিক করলেন, হ্যাঁ, বেলকোলোর কাছে যাবার সময় এসেছে। ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক। এই ভেবে ঘোড়ার মতো ছুটে চললেন তিনি। তাঁর প্রেমাস্পদার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পেঁাছুবার আগে আর থামলেন না।

ঈশ্বর এখানকার সকলের মঙ্গল করুন। কেউ কি বাড়ী আছো? ডাকলেন তিনি।

বেলকোলোর উপর তলায় ছিলো। তাঁর গলার আওয়াজ শুনে সে নিচে নেমে এলো।

ও, যাজকমশাই, আপনি। আসুন আসুন। এই দুপুরের গরমে গ্রামে টো টো করে ঘুরছেন কেন?

যাজকমশাই উত্তর দিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছেয়, আমি তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গ দিতে এসেছি। তোমার স্বামী শহরে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা হলো।

বেলকোলোর একটা আসনে বসে একগাদা বাঁধাকপির দানা ছাড়াতে লাগলো। এগুলো ওর স্বামী সকালে এনেছিলো।

যাজকমশাই বললের, কাছে এসো বেলকোলোর। আর কতদিন আমাকে নিরাশ করবে?

বেলকোলোর হাসতে হাসতে বললো, আমি আপনার কী করেছি!

কিছুই না, কিন্তু মুস্কিলটা কি জানো, ঈশ্বরের আদেশে আমি তোমার সঙ্গে কিছু একটা করতে চাই কিন্তু তুমি আমাকে তা করতে দাও না। আশীবাদ করুন। বললো বেলকেলোর। কিন্তু যাজক মহোদয়গণ ঐ ধরণের কাজ করেন না।

যাজকমশাই উত্তর দিলেন, আমরা অবশ্যই করি। কেন, আমরা কি পৃথিবীর মানুষ নই। অধিক বলতে কি, আমরা বরং ঐ কাজ অন্য মানুষের চেয়ে অধিক দক্ষতার সঙ্গে করে থাকি। জানো কি জন্যে? কারণ যখন আটা ভাঙানো কলের জলভান্ড পূর্ণ থাকে তখনই আমরা পেষাই করি। কাজেই যদি তুমি রোদে তোমার খড় শুকোতে চাও, তবে তোমার জিহ্বা চালনা বন্ধ কর। ওটা নিয়ে আমাকে কিছু করতে দাও।

আপনি কোন ধরণের খড়ের কথা বলছেন। আপনারা যাজকেরা সবাই সমান আপনিও তো চেহারা পত্রে একটি হাড় কেপ্পণ। বেলকোলোর বললো।

তুমি শুধু বল, তুমি কি চাও? তুমি তাই পাবে। উত্তর দিলেন যাজক মশাই। এক জোড়া ছোট্ট সুন্দর জুতো বা মাথায় রেশমী স্কারফ্ কিংবা উলের কোমর বন্ধনী অথবা অন্য কিছু! বেলকোলোর বললো, আমাকে বলতেই হবে, সবই খুব খাসা পছন্দ। কিন্তু আমার ওগুলো সবই আছে। তবে সত্যিই যদি আমাকে মনে ধরে থাকে, তবে আমার একটু উপকার করুন, তারপর আপনি যা বলবেন তাই করবো।

বল কী উপকার করতে হবে। আমি সানন্দে তা করবো। বললেন যাজক মশাই।

সুতরাং বেলকোলোর বললো আমাকে আগামী শনিবার ফ্লোরেন্স যেতে হবে। আমি যে উল বুনেছি তাই দিয়ে আসতে। আমার চরকাটাও মেরামত করতে হবে। যদি আমাকে পাঁচ পাউন্ড ধার দেন, যা আপনার মতো মানুষ সহজেই পারে, আমি বন্ধকদারের সঙ্গে দেখা করে আমার কালো স্কার্টটা আনবো, আর কোমর বন্ধনীটা, যা আমি রোববার পোরবো। আমি ওটা বিয়ের দিন পরেছিলাম, বুঝলেন! আর যতদিন ওটা বন্ধক থাকবে, আমি গির্জা বা অন্য কোথাও যেতে পারবো না। আমার এই উপকারটুকু করুন আমি সব সময় একান্ত আপনার হয়ে থাকবো।

যাজকমশাই বললেন ঈশ্বর আমার সহায় হোন! আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে যেতে আসিনি। নইলে আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে দিতাম। তবে আমার উপর ভরসা রাখতে পারো, শনিবারের মধ্যে তুমি টাকা পাবে।

বেলকোলোর বললো, ও বুঝেছি, আপনারা সবাই এই রকম অনেক শপথ করেন, কিন্তু পরে তা রাখতে পারেন না। আপনি কি ভাবেন, আপনি আমাকে বিলিউজা পেয়েছেন, যে নাকি শূন্য হাতে চলে গিয়েছিলো, যাকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত! আপনি তার কী করেছিলেন শুনি? ঈশ্বরের নামে বলছি, আপনি অত সহজে আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে যদি টাকা না থাকে তাহলে চলে যান, নিয়ে অসুন গে।

যাজক মশাই বলছেন, কাছে এসো। টাকার জন্য এখন আমাকে আবার সারা পথ ভেঙে যেতে এবং ফিরে আসতে বলোনা গো। যখন তুমি নিজেই দেখছো, তোমাকে পাবার জন্য আমি কত উদগ্রীব। আমার আসার ফাঁকে অন্য কেউ এসে আমাদের প্ল্যানটা ভেস্তে দিতে পারে। ঈশ্বর জানেন আর কবে আমি এমন সুযোগ পাবো।

বেলকোলোর বললো, ওটা অবশ্য আপনার নিজের কথা। যদি আপনি যেতে চান তো যান। নইলে অন্য জায়গায় আপনার সুযোগ খুঁজে নিন গে।

যাজকমশাই যখন দেখলেন, মেয়েটি তাঁর আদেশ মানতে রাজী নয়, তখন তিনি নরম হয়ে বললেন, বেশ আমি বলছি, আমি কী করবো। তুমি যখন বিশ্বাস করছো না যে আমি তোমাকে টাকা দেবো, তখন আমি আমার এই সুন্দর নীল আলখাল্লাটা জামিন হিসেবে তোমার কাছে রাখবো।

বেলকোলোর তার দিকে তাকিয়ে বললো, এক্ষুণি দেবেন! তা এর দাম কত হবে?

কত দাম? যাজক বললেন, আমি বলছি এটা খাঁটি উলের তৈরী। অন্য কিছুর নয়। মাত্র দিন পনেরো আগে আমি পুরানো কাপড়ের ব্যবসায়ী লোটোর কাছ থেকে কিনেছি। ঠিক সাত পাউন্ড দিয়ে।

সত্যি! বেলকোলোর বললো। ঈশ্বর আমার সহায় হোন. আমি একথা কোন দিন বিশ্বাস করবো না। যাহোক, একবার দেখি এটা।

যাজকমশাই, প্রলুব্ধ হয়ে আলখাল্লাটা খুলে তাকে দিলেন। আর সে ওটাকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে বললো, চলুন যাজকমশাই, আমরা গোলা বাড়ীতে যাই। কেউ ওর ধারে কাছে যায় না।

সুতরাং তারা গোলা বাড়ীতে গেলো। সেখানে তিনি মিষ্টি চুমোয় চুমোয় তাকে অভিভূত করে ফেললেন। তারপর তার সঙ্গে অনেকক্ষণ রতিক্রিয়ায় মগ্ন রইলেন। শেষে এক সময় গির্জায় ফিরলেন। সেখানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কথা ছিলো তাঁর।

গির্জায় ফিরে তিনি সব ক'টি মোমবাতির শেষাংশ জড়ো করে দেখলেন সারা বছরের অর্ঘ স্বরূপ পাওয়া মোমবাতি বেচে পাঁচ পাউণ্ডের অর্ধেকও হবে না। নিজেকে তাঁর, একটা গাধা বলে গাল দিতে ইচ্ছে হলো। নইলে কিনা একটা মেয়ে মানুষের কাছে তাঁর নিজের আলখাল্লাটা খুলে রেখে আসেন। সুতরাং তিনি ভাবতে লাগলেন কী করে পয়সা না দিয়ে আলখাল্লা উদ্ধার করা যায়।

যাজকমশাই সুচতুর ব্যক্তি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা উপায় বের করলেন কী করে ওটা ফেরৎ পাওয়া যায়।

পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ দিলেন তিনি।

পরদিন ছিলো একটা খানাপিনার দিন। তিনি এক প্রতিবেশীর শিশু-

পুত্রকে মোনা বেলকোলোর বাড়ীতে পাঠালেন। মোনা যদি দয়া করে তার হামামদিস্তাটা ধার দেন। কারণ বিঙ্গুসিও দাল পোগিও আর নুটো বুগলিও পরদিন সকালবেলা যাজকের সঙ্গে প্রাতরাশ করবেন, আর সেজন্য তিনি একটা সস্ তৈরী করবেন।

বেলকোলোর হামামদিস্তাটি পাঠিয়ে দিলো। প্রাতরাশের সময় হয়ে এলো এবং যাজকমশাই জানতেন বেনটিভেনা ডেল ম্যাজো আর বেলকোলোর এ সময় খাবার টেবিলে বসবেন। তিনি গির্জায় একজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন, মোনা বেলকোলোরকে হামামদিস্তাটা ফেরৎ দিয়ে এসো, আর বলবে ফাদার এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আর যে ছেলেটি এটা নেবার সময় আলখাল্লা জামিন রেখে গেছে সেটা ফেরত দিন।

সুতরাং কর্মচারীটি হামামদিস্তাটা নিয়ে বেলকোলোরের বাড়ী গেলো। দেখলো সে বেনটিভেনার সঙ্গে টেবিলে বসে প্রাতরাশ করছে।

হামামদিস্তাটা টেবিলের উপর রেখে, সে যাজকমশায়ের বারতা জানালো।

আলখাল্লার কথা শুনে বেলকোলোর কিছু বলতে যেতেই, বেনটিভেনা তাকে থামিয়ে রাগত স্বরে বললো, যাজমশায়ের কাছ থেকে জামিন নিয়েছো, এসব কী ব্যাপার! যীশুর নামে বলছি, তোমার সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা ছিলো। এক্ষুণি ভিতরে যেয়ে আলখাল্লাটা নিয়ে এসে ফেরৎ দাও। শীগগির যাও। এখন থেকে মনে রেখো, যাজকমশায় যদি কোন কিছু চান, তাঁকে তা দেবে। এমনকি যদি আমাদের গাধাটাকে চান তাও।

বেলকোলোর গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। নিজে নিজেই কী সব বিড়বিড় করে বললো, তারপর বিছানার পায়ের কাছে রাখা সিন্দুকের লুকোনো জায়গা থেকে আলখাল্লাটা বের করে আনলো। গির্জার কর্মচারীকে সেটা দিয়ে বললো, যাজকমশাইকে এই কথাটা জানিও। বেলকোলোর ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছে, এমন ঘৃণ্য ব্যবহারের পর আপনি আর সস্ তৈরীর জন্য কোনদিন তার হামামদিস্তায় পেষাই করতে পারবেন না।

কর্মচারীটী আলখাল্লাটা ফেরত দিয়ে যাজকমশায়কে দিল। তারপর বেল-কোলেরের কথাগুলো জানালো।

শুনে যাজকমশাই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে বললেন, এরপর তার সঙ্গে দেখা হলে বলো, সে যদি আমাকে তার হামামদিস্তা না দেয়, তবে আমিও তাকে আমার হামামদিস্তার ডাঁটি দেবোনা। একটা ছাড়া আর একটার

চলে না।'

বেনটিভেনা মনে করলো তার বকুনি খাওয়াতেই তার স্ত্রী এমন কথা বলেছে, তাই সে এ নিয়ে আর কিছু ভাবলো না। কিন্তু বেলকোলোর তাকে এমন বোকা বানানোর জন্য যাজকের উপর ভীষণ চটে গেলো। এমন কি বাকী গ্রীষ্ম-কাল অর্থাৎ আঙ্গুর তোলার সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বললো না। ইতোমধ্যে সেই যাজকটি নরকের ভয় দেখিয়ে দিন দিন তার জীবনকে এমন ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো, যে সে একমাত্র মদ ও কিছু বাদামভাজা খাইয়ে শান্তি স্থাপন করলো।

তখন থেকে তারা দুজনে বহুবার একত্রে গোগ্রাসে পানাহার করেছে এবং পাঁচ পাউন্ড দেবার পরিবর্তে যাজকমশায় তার খঞ্জনীতে নতুন একটা ঢাকনি করে দিয়েছেন, এবং তাতে অপূর্ব কৌশলে একটা ছোট্ট ঘণ্টা জুড়ে দিয়েছেন। বেলকোলোর এবার খুব খুসী।

পরিচিত

GIOVANNI BOCCACCIO—

(1313 A. D.—75)

গিয়োভানি বোকাসিও তৎকালীন ফ্লোরেন্স রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সফল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী। ১৩২৫ খৃঃ বোকাসিওকে তিনি ব্যাঙ্কিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য নেপল্‌স্ নগরীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি ব্যাঙ্কিং বিষয়ে পুত্রের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করলেন তখন নিজে নেপলিটন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করলেন ও পুত্রকে আইন অধ্যয়নেও নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আইনের চুলচেরা বিচার ও কচ্‌কচানি তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি।

তিনি শীঘ্রই পূর্ণ সময়ের জন্য সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অ্যানজেভিন রাজপরিবারের রবার্ট অ্যাঞ্জুর সহায়তায় নেপলস ইউরোপের শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পিঠস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তার প্রখ্যাত গ্রন্থ ডেকমেরান এর পটভূমিকায় "Black Death" কালো বিভীষিকার মহামারির দিন গুলির অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। ১৩৫০ খৃঃ তিনি তৎকালীন পন্ডিত প্রবর পের্ত্রাকের সান্নিধ্যে আসেন। সেই

সেদিনের রোমক ও গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যে তার অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠিত হয় Decameron, Elegiadi madonna fiammetta ইত্যাদি গ্রন্থ লেখার পরই। দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উত্তর সূরী বলা হয়।

যে কয়েকজন সাহিত্যিক ও মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টায় মধ্যযুগীয় ইউরোপে ব্যাভিচার, অনাচার ও কুসংস্কারের পর্বত প্রমাণ বাধা অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে জনমানসে ন্যায় ও সত্যের জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটে ইটালির বোকাসিও ও ইংলণ্ডের চসার প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের অন্যতম। চসার পোত্রাক, বোকাচিও প্রমুখ লেখকদের লেখায় যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তা খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংস্কারী আন্দোলনে নবজীবন দান করে। পাশ্চাত্যে নব চেতনার অগ্রদূত মার্টিন লুথার প্রমুখ মনীষীগণ এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

বাথবাসিনীর কাহিনী

জেওফ্রি চসার

বাথবাসিনীর কাহিনী ঃ   রাজা আর্থার ছিলেন একজন উপকথার রাজা। তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কাহিনী সারা বৃটেনে লোকমুখে প্রচারিত ছিল। তার সময়ে পরীরা দলেদলে নেচে বেড়াত। সেইসব দিনের সুখের স্মৃতি আজ অবলুপ্ত।

মধ্যযুগীয় উপকথার রাজা আর্থারের রাজসভায় একটি কামুক ও লম্পট পার্শ্বচর ছিল। একদিন নদীর ধার দিয়ে সে যাচ্ছিল। যেতে যেতে নিঃসঙ্গ পথে সে একটি মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটিও একই পথে একাকি হেঁটে চলেছে। রাজার পার্শ্বচরটি মেয়েটির সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। মেয়েটি কিন্তু ছেলেটিকে প্রশ্রয় না দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগল। ছেলেটির মৎলব স্বাভাবিক ভাবে মেয়েটিকে আতঙ্কিত করল। কিছুক্ষণ চলতে চলতে ছেলেটি মেয়েটিকে আবার ধরবার চেষ্টা করল। এবার মেয়েটির বাধা দান সত্ত্বেও ছেলেটি মেয়েটিকে ধরে আদর করতে লাগল। মেয়েটি নানাভাবে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটির দৈহিক বলের নিকট মেয়েটি পরাজিত হল। ফলে ছেলেটি পথে ঘাসের উপর মেয়েটিকে ফেলে জোর করেই তাকে উপভোগ করল। মেয়েটি এই ঘটনার কথা সকলকে জানিয়ে দিল। ফলে সকলেই রাজার এই উৎশৃঙ্খল পার্শ্বচরটির বিরুদ্ধে রাজার নিকট নালিশ জানাল। রাজার আদেশে ছেলেটির প্রাণদণ্ড হল। কারণ একটি নিষ্পাপ বালিকাকে এইভাবে ধর্ষণ করায় সকলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। যুবকটির প্রাণদণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে দেখে রাজার যুবতী স্ত্রীর মনে এঁর প্রতি সহানুভূতি জাগল। ফলে রাণী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ রাজার নিকট আবেদন করলেন

যে লোকটির শাস্তি দানের দায়িত্ব রাজা যেন রাণীর হাতে ন্যাস্ত করেন। রাজা রাণীর অনুরোধ মঞ্জুর করলেন। ফলে রাজাকে রাণী ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এরপর সুযোগমত এক সময় এই লোকটিকে ডেকে রাণী বললেন যে সে যদি রাণীকে বলতে পারে যে মেয়েরা সব থেকে বেশী কি কামনা করে, তবে সে মুক্তি পাবে। কেউ তার গায়ে হাত দেবে না। এ এক কঠিন প্রশ্ন। লোকটিকে রাণী বললেন যে এ প্রশ্নের উত্তর সে এক বছর ধরে ভাবনা চিন্তা ও আলোচনা করে দিতে পারে। রাণী বললেন তুমি দেশ ভ্রমণ করে নানা মানুষের সাথে আলোচনা করে বৎসর ঘুরলে অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।

লোকটি তখনকার মত মুক্তি পেল। এক বছর পরে ফিরে এসে মেয়েরা সবচেয়ে বেশী কি কামনা করে তা রাণীকে জানাবে। নইলে তার প্রাণদণ্ড হবে।

প্রায় একবছর এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য লোকটি বহু মহিলার স্মরনাপন্ন হয়। কেউ বললে মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ ও স্ফূর্তি ভালবাসে। কেউ বলল মেয়েরা টাকা পয়সা খুব ভালবাসে। কেউবা বলল মেয়েরা ভালবাসার জন্য সব ত্যাগ করতে পারে। কেউ আবার বলল যে মেয়েরা সব থেকে বেশী পছন্দ করে তোসামোদ। তোসামোদ পেলে যে কোন মেয়ে যে কোন লোককে দেহ দান করতে পারে। কেউ বা বলল মেয়েরা শৃঙ্গার রসাত্মক গল্প শুনতে ভালবাসে। আর ভালবাসে পুরুষ দেহকে দেহে ধারণ করতে। কেউ বলল মেয়েরা স্বাধীনতা পছন্দ করে। কেউ বা বলল মেয়েরা বুদ্ধিমতী একথা প্রমাণ করতে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে। কেউ বলল মেয়েরা কথা গোপন করতে ও গোপন রাখতে পারে খুবই। কিন্তু অনেকেই একথা মানতে রাজি নয়। কারণ মেয়েদের পেটে কথা থাকে না বলেই প্রসিদ্ধ আছে।

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলা যায় যে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। এ সম্বন্ধেও ডেভিড লিখেছেন যে মিডাসের লম্বা চুলের নীচে তার মাথায় দুটো গাধার কান গজিয়েছিল ; সে খুব বিচক্ষণতার সাথে ত্রুটির ব্যাপারটা কাউকেই জানতে দেয়নি। কারণ এটা তার পক্ষে খুবই অসম্মানের। তবে সে তার বিশ্বস্ত স্ত্রীকে এটা বলে ফেলেছিল। তার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী ও স্বামী পরায়ণ। তাই সে এটা প্রকাশ করেনি। কারণ প্রকাশ করলে তারও অপমান স্বামীরও অসম্মান। কিন্তু এই না প্রকাশ করার জ্বালায় তাকে প্রতিনিয়ত এমনই জ্বলতে হল যে শেষ পর্যন্ত সে সেখান থেকে চলে গিয়ে

এক হ্রদের তীরে বসে ঠিক করল যে, যখন কাউকে না বলার জন্য তার মনে এত জ্বালা হচ্ছে, তখন কাউকে বলতেই হবে। অথচ যাকেই বলবে সাত কান হয়ে তাতে তাদের নিজেদেরই অসম্মান। ফলে দুইকূল রাখতে সে ঠিক করল হ্রদের এই জলে মুখ ডুবিয়ে জলরাশিকেই সব কথা বলবে। এতে তার পেটের কথা পেট থেকে বের হল। কিন্তু জলকে সে অনুরোধ করল যে জলরাশি যেন একথা ঘোষণা না করে। ফলে এইভাবে জলে মুখ ডুবিয়ে সে জলের তলায় কথাটি প্রকাশ করল। স্ত্রীলোকের পেটে কথা যে থাকে না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘটনা। এইভাবে নাইট মশাই নানা দ্বন্দ্বে ভুগছেন, কিছুতেই স্ত্রী-লোকেরা কি ভালবাসে, কি কামনা করে সব থেকে বেশী, তার সত্যিকারের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। অথচ আর সময় নাই। তাকে এবার রাণীর কাছে গিয়ে জানাতেই হবে। রাণীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেই হবে। নচেৎ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। অতএব বিভ্রান্ত এই নাইট মরিয়া হয়ে ফিরে চলেছেন রাজবাড়ীর দিকে। ভাবছেন সঠিক উত্তর কি। এমন সময় চলার পথে জঙ্গলের ধারে দেখছেন অনেক সুন্দরী নারী। প্রায় দুইডজন রূপসী মেয়ে নাচছে। মরিয়া হয়ে লোকটি তাদের কাছেই গেল। কিন্তু যাওয়া মাত্র দেখল। সেখানে কেউ নাই। সকলেই উধাও। কেবল এক কুৎসিৎ বৃদ্ধা বসে আছে। সে বলল, তুমি কি চাও। নাইট তার সমস্যার কথা বলতেই মেয়েটি হেসে বলল এই প্রশ্নের উত্তর ত খুবই সহজ। সে উত্তর জানে। তবে একটা শর্তে। উত্তর সে যা বলবে তা যদি রাণী গ্রাহ্য করে—মেনে নেয় তবে তাকে সে যা চাইবে তাই দিতে হবে। যুবকটি তাতেই রাজি হল। কারণ তার প্রাণে বাঁচার জন্য এই বৃদ্ধার সাহায্য একান্ত দরকার। বৃদ্ধার বিজ্ঞ উত্তর হয়ত তার জীবন রক্ষা করবে। বৃদ্ধা খুব জোরের সাথেই বললেন যে, সে যে উত্তর বলবে রাণী নিশ্চয়ই তার সাথে একমত হবেন।

এবার বৃদ্ধা তার কানে কানে উত্তরটি বললেন।

এবার নাইট যুবকটি তার সাথে রাজদরবারে চলে এলেন। রাণী তার পার্শ্বচরী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কুমারী ও বিধবা মহিলাদের সমভিব্যাবহারে সিংহাসনে বসলেন ও নাইটকে বললেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে।

সারা সভাগৃহ নিস্তব্ধ। রাণী সিংহাসনে বসে আছেন। এবার নাইট সেই বৃদ্ধার বলা কথাটি সজোরে ঘোষণা করলেন। যুবকটি বললেন, মেয়েরা চান তাদের ভালোবাসার ব্যাপারে প্রেমের ব্যাপারে ও স্বামীর সম্বন্ধে পূর্ণ কর্তৃত্ব আর লোকজনের উপর প্রভুত্ব করতে। সেটাই আপনার ও সকল নারীর

শ্রেষ্ঠ কামনা। যদিও একথা বলার জন্য হয়ত আপনি আমাকে দোষী ঘোষণা করবেন অসন্তুষ্ট হয়ে, তবুও এটাই ঠিক। এটাই অন্তরে অন্তরে আপনার শ্রেষ্ট কামনা। সকল নারীর শ্রেষ্ঠ কামনা এই কর্ত্তৃত্ব পরায়ণতা। বিশেষ করে স্বামী ও প্রেমের উপর।"

রাণী একথা শুনে চুপ করে গেলেন। সকলেই বুঝলেন উত্তর ঠিকই হয়েছে। রাণী ঘোষণা করলেন যে প্রাণদন্ড মকুব হল। তবে এই কথা শুনে বৃদ্ধা ছুটে রাণীর নিকট গেলেন এবং বললেন যে এই উত্তরটা সে-ই লোকটিকে শিখিয়েছে। এবং তাও একটি শর্ত্তে যে উত্তর দানের পর প্রাণ ফিরে পেলে নাইট মহোদয় তাকে সে যা চাইবে তাই দেবে। এখন সে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হলেও এই সুপুরুষ যুবকটিকে সে বিবাহ করতে চায়। এছাড়া আর কোন সর্ত্তে সে রাজি নয়। সে কোন কিছুর বিনিময়ে নাইট মহোদয়কে ছাড়তে রাজি নয়। নাইট এই কথা শুনে আঁৎকে ওঠে। তাঁর সব কিছু টাকা পয়সা ধন দৌলতেব বিনিময়ে সে বৃদ্ধাটির হাত থেকে মুক্তি চায়। সে এক কথায় বলে হায় আমার মত উচ্চ বংশের মানুষের একি অসম্মান। একজন বৃদ্ধা ও দরিদ্র মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। কুৎসিত প্রেমহীন এক বৃদ্ধার সাথে সারা জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে নাইটকে সেই কুৎসিত মহিলাকেই বিবাহ করতে হল।

ফলে অনেকে হয়ত বলবেন যে এত বড় নাইটের বিয়ে হল অথচ তার আনন্দ অনুষ্ঠান ও ভোজসভার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলছি না। নাইট মশাই বিয়ে করলেন। তবে তার মনে আনন্দের বদলে দুঃখ ও বেদনা তাকে পীড়িত করতে লাগল। সেদিন সেখানে রাত্রে বা দিনে না ছিল আনন্দ না ছিল স্ফূর্তি।

বিছানায় শুয়ে নাইট কোন উত্তাপই বোধ করল। না নববধূর সাথে সহবাসের। ফলে মেয়েটি রাত্রে শুয়ে নাইটের ব্যবহারে ও ঔদাসীন্যে খুবই মর্ম্মাহত হল। মেয়েটি বলল, "হে নাইট তুমি যদি কোন কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে সে কথা বল। আমি সে ত্রুটি সংশোধন কবব।" নাইট বলল, "তুমি যে নীচ বংশের কুরূপা মেয়ে তোমার সাথে আমার কোন দিনই মিল হবে না। তুমি কোন দিনই আমার প্রেমাস্পাদা হতে পারবে না।

মেয়েটি বলল, "দেখ তুমি যা বলছ তা সম্পূর্ণ ভুল। ধনীরাই একমাত্র ভদ্রলোক ও গুণবাণ একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ধনের সাথে গুণের কোন সম্পর্ক

নেই। যিনি গুণী ও গুণবান তার কথাই আমাদের পালন করা উচিৎ। যীশুর ইচ্ছা তাঁর কাছ থেকেই যেন আমরা শিক্ষা লাভ করি। উচ্চ বংশ-জাত ব্যক্তিরা যে উচ্চচিন্তা করেন এমন কথা বলা যায় না। সাধারণ মানুষের ঘরেতেই ত যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বংশপরম্পরায় ধন সম্পত্তি ভোগ করা যায় কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা উচ্চ বংশোদ্ভূতদের একচেটিয়া কারবার নয়।"

ফ্লোরেন্সের পন্ডিতপ্রবর দান্তে বলেছেন ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে মহত্ব শিক্ষা করি। চারিত্রিক মহত্ব কোন বিশেষ বংশের উত্তরাধিকার হলে সে বংশের সকলেই সৎ ও মহৎ হতো। কিন্তু তা সর্ব্বদা বাস্তবে দৃষ্ট হয় না। বড় বংশের ও মহৎ বংশেও বহু কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করে। আবার গোবরেও পদ্মফুল ফোটে। সাধারণ চাষাভুষার ঘরেও বহু মহৎপ্রাণ সুশিক্ষিত সন্তান দেখা যায়। দারিদ্র মানুষকে পরিশ্রমী করে। অধ্যাবসায়ী করে। ধৈর্যের সঙ্গে চললে দারিদ্র মানুষকে জ্ঞানী করে, ঈশ্বর অনুরাগী করে। আমার ত মনে হয় দারিদ্র এক মহান চক্ষু। যার চশমার ভিতর দিয়ে আমরা প্রকৃত বন্ধু ও শত্রু চিনতে পারি।

তারপব কুৎসিত দরিদ্র মেয়েটি বলল যে, "বয়সের জন্য তুমি আমাকে অবজ্ঞা করছ। কিন্তু কি জান না যে সব বিষয়ে বয়স্কের অধিকার ও সম্মান আগে। বয়োবৃদ্ধ হওয়া গৌরবের। যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীরা বহু বিপদে পড়ে। বহু লোক তার স্ত্রীর রূপে ও যৌবনে মুগ্ধ হয়ে তার বাড়ীতে আসা যাওয়া করে। তাকে হিংসা করে। তার ক্ষতি সাধনে ব্রতী হয়। যুবতী ও রূপবতী স্ত্রী মানেই ত অসতী হওয়ার সম্ভাবনা। যৌবনের উম্মাদনায় যুবতী পর-পুরুষকে প্রশয় দেয়। পরকীয়া প্রেম সুন্দরী যুবতীদের অভ্যাস ওখেলা।

আমার মত দরিদ্র ও বৃদ্ধার স্বামী হলে তোমাকে এরকম কোন বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। বার্দ্ধক্যই সতীত্বের রক্ষাকবচ। যৌবনই সতীত্বের সংহারক। ফলে যুবতী স্ত্রী অপেক্ষা বয়স্কা স্ত্রী নিরাপদ।

ফলে তুমি কোনটা চাও। রূপবতী যৌবনবতী পিনপয়োধরা স্ত্রী চাইলে তোমার বাড়ীতে সদাসর্বদা বহু লোক গোপনে তার সঙ্গ লাভের জন্য আসা যাওয়া করবে। আর আমি যেহেতু কুরূপা আমি সারাজীবন সাধবী ও বিনীতা স্ত্রী হয়ে তোমার সেবা যত্ন করব।

নাইট কিছুটা চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ আমি তোমাকেই, তোমার মতো বিজ্ঞ নারীকেই স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

এবার মেয়েটি বলল "এবার থেকে আর কোন কথা নয় শুধু প্রেম আর প্রেম।"

"এবার তুমি আমাকে চুমো দিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দাও। আমি তোমার মনোরমা সতী সাধ্বী স্ত্রী হিসাবে জীবন কাটাব। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যত স্ত্রী পৃথিবীতে এসেছে আমি তাদের থেকেও শ্রেয় ও প্রিয় হয়ে থাকব তোমার কাছ। তোমার মনরঞ্জনের জন্য সদা সর্বদা সচেষ্টা হব।

এবার স্ত্রী বলল যে শুধু তাই নয় আমি এখন থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে কোন সুন্দরী নারী এমনকি রাণীদের থেকেও অনেক মনোলোভাও সুন্দরী হব। এবার আমার ঘোমটা খোল। দেখবে ঠিক তাই কিনা।" নাইট তার স্ত্রীর ঘোমটা খুলে অবাক হয়ে দেখে তার স্ত্রী যেন প্রকৃতই এক সুন্দরী ও মনোলোভা পীনোদ্ধতা যুবতী নারী। খুশিতে ভরপুর হয়ে সে ডগমগ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। চুমুতে চুমুতে তার সারা শরীর ভরিয়ে দিল। সম্ভোগ করল। শৃঙ্গার চলতে লাগল নানা যৌন অঙ্গে। একে অপরকে জড়িয়ে বলতে লাগল এবার সকল অঙ্গভরে চলুক যৌনরঙ্গ।

মেয়েটি প্রার্থনা করল যে যীশু যেন পৃথিবীতে কেবল বিনীত, যৌবনোচ্ছল ও কামার্ত স্বামীদের পাঠান :

* * *

পরিচিতি

GEOFRAY CHAUCER—Wife of Bath

জিওফ্রে চসার : (১৩৪০-১৪০০) ১৩৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম হয়। পারিবারিক মদ্যব্যবসায়ে পিতৃ পিতামহের বিপুল অর্থাগম হয়েছিল। ফলে সচ্ছল ধনী গৃহের সন্তান চসারের বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনা ও সাহিত্য অনুরাগ দেখা যায়।

চসার পড়াশুনা শেষ করে রাজদরবারে কাজে যোগদান করেন। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের অধীনে চাকরি করা কালে তিনি নানা স্থানে যাতায়াত করেন। ইউরোপের বহু স্থানে বিশেষ করে ১৩৭২ খৃঃ চসার ইটালিতে বৈদেশিক দূত রূপে গমন করেন। ফলে ইতালিও সাহিত্যের সাথে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। বোকাসিও, পের্টাক প্রমুখের লেখা তাকে নিঃসন্দেহে প্রেরণা যোগায়। তৎকালীন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও চার্চের ব্যভিচার ও বিভৎসতার বিরুদ্ধে চসার তাঁর স্যাটায়ার ধর্মী লেখা চালিয়ে যান। ফলে চসারের লেখায় যে খুরের ধার ও শ্লেস তা মধ্যযুগীয় পাঠককে নবজীবনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

অনঙ্গ রঙ্গ

অনরেদ্য বালজাক

ধোপানী না তাসারেত্তো বয়স্ক তাসারুকে বিয়ে করল। তাসারুর পেশা ভিন্ন। সে রঞ্জক (dyer)। তবে তাসারত্তো কাপড়কাচার কাজটা একেবারে ছেড়ে দেয়নি। স্বামীর ভিন্ন পেশা সত্ত্বেও। জামাকাপড় রং করা বা কাচার ব্যাপারে ওদের ভীষণ খ্যাতি। কি লর্ড, কি কাউন্ট, ধনী নির্ধন সব ওদের খদ্দের।

তাসারুর সঙ্গে বিয়ে হবার ছ-সাত বছর আগেই যৌবনে পদার্পন করেছে তাসারেত্তো। তাকে দেখতে ভোরের দীঘির জলে ঠিক একটি ফুটন্ত শালুক ফুলের মত। এখন কথা হচ্ছে, এই রকম একটি সদ্য ফোটা ফুল যৌবন পেরোনো এক ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হল কেন? কুমারী ফুলের লজ্জা ঘুচিয়ে তার থেকে মধু পান করবার শক্তি ঐ ভ্রমরের আর কতটুকু আছে? যৌবনবতী নারীকে আনন্দ দেবার ও তার থেকে আনন্দ আহরণের পুরুষালি ক্ষমতা?

তা হলে বলতে হয়, নিয়তির নির্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে?

ঠিক যে বয়সে তাসারুকে বিয়ে করল তাসারেত্তো সেটাই হল মেয়েদের ভালবাসা দেবার বা নেবার আসল বয়স।

তাসারেত্তো যৌবনমদে মত্তা। কিন্তু তাসারুর পৌরুষ অস্তগামী। কিন্তু তাসারেত্তোর মনে তা নিয়ে বিশেষ কোন খেদ বা আপশোষ আছে বলে তো মনে হয় না।

হয়তো তাসারুর সঙ্গে ওর মনের মিল হয়েছে। কিন্তু ওর দেহ যা চায় তা ষোল আনা বোধ হয় পায় না ও বয়স্ক স্বামীর কাছ থেকে। তবু এই তাসারুকে নিয়েই তাসারেত্তো দৈনন্দিন ঘর করণার কাজ করে। ব্যবসা দেখে। কাপড় কাচে। রঙ করে। সবদিক সামলায়।

বাইরে থেকে তাসারেত্তাকে সুখী বলেই মনে হয়।

তাসারেত্তা ফুর্তিবাজ মেয়ে। ওকে দেখলেই বোঝা যায় ও সুচতুর ধূর্ত। সত্যি কথা বলতে কি, আমার যতদূর মনে হয় তাসারেত্তা একটু ভালবাসার কাঙাল। কেউ যদি, মানে কোন পুরুষ যদি একটুকু ভালবাসা দেখায় তাহলে ও তাকে একটু প্রশ্রয় দেয়।

কেউ কেউ সতৃষ্ণ নয়নে ওর দেহের উপরে পড়া রূপ যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকে চাতক পাখীর মত। কখন মেঘের জল ঝড়ে পড়বে এই আশায়। আবার কেউ কেউ ওর পিছু নেয়। যারা ওর পিছু নেয় তাদের ও নিরাশ করে না। কিছু বলে না। পিছু নিতে দেয়। এই সব কাঙালে পনা লোকদের নাকি দড়ি দিয়ে ভাল্লুক নাচ নাচাতে খেলাতে দারুন মজা লাগে ওর। ও খুব আনন্দ পায় ওদের রকম সকম দেখে।

তবে মাঝে মাঝে এমন এক একটা বেয়াড়া নাছোড়বান্দা পিছু নেয় যে তাদের এড়ানো দায়। অনিচ্ছা থাকলেও ফাঁদে পড়তে হয়। তখন দেহের বাইরের রূপ-যৌবন সুধা বেশ কিছুটা ঘুষ দিয়ে তবে মুক্তি। আগুন নিয়ে অনবরত খেলা করতে একটু আধটু কি আর ছ্যাঁকা লাগবে না কখনো সখনো।

সুচতুর তাসারেত্তাকে তখন কে যেন নির্বোধ ভ্যাবাচ্যাকা করে তোলে।

তাসারেত্তা মনে মনে ভাবে যাকগে। এতে আর কি হয়েছে, গায়ে গায়ে শোধ তো: কথাই আছে 'ন দোষায় চর্মঘর্ষনাৎ'। ঠিক মত নয় তালে কি আর সব সময় গান করা যায়। মাঝে মাঝে তো তাল কাটবেই। গলা একটু বেসুরো হবেই। মনের পাতায় যেটুকু কালো দাগ লাগে সেট্কু আবার মুছে ফেলে তাসারেত্তা। অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাবলীলতায়।

হায় দেহ তুমি ছাড়া নাই কেহ। এই দেহই দেখছি সর্বস্ব। নারী হল প্রাণরূপা প্রকৃতি। এই নারী দেহ সাক্ষাৎ অমৃত কুম্ভ। এই অমৃত কুম্ভের সন্ধানে পুরুষ, সৃষ্টির আদি থেকে তৎপর। এই অমৃত কুম্ভের বারি তথা—কালিদাসের ভাষায় হেমকুম্ভস্তন দুগ্ধের রসখাদকের আশায় পুরুষ যুগযুগের পিয়াসী। পরিপূর্ণ একটি হেমকুম্ভস্তন যুগ নারী দেহছাপ অমৃতকুম্ভ চোখের সামনে পড়লে কোন পুরুষ বা নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে?

বহু পরিবারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ম'মিয় দ্যুফাউ এর অবস্থা হোল ঠিক তাই। তাসারেত্তাকে দেখে।

শীতের দুপুর।

তাসারেত্‌তা একটা খেয়া নৌকোয় নদী পার হতে রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে চলেছে। তাকে কতকগুলো কাচা জামা কাপড় পেঁছে দিতে হবে খদ্দেরদের বাড়ি, এমন সময় মঁসিয় দ্যুফাউ এর শিকারী নজর পড়ল ওর ওপর। দ্যুফাউ তখন ঐ একই রাস্তা ধরে আসছিল ফেরি ধরবার জন্য।

তাসারেত্‌তার দেহের উদ্বেলিত তরঙ্গায়িত ধারাল যৌবন তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করল। বিমুগ্ধও।

নদীর পারের কাছাকাছি এক জায়গায় বসে কাজ করছিল এক বৃদ্ধ।

দ্যুফাউ ওকে জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটা কে, বলতে পারো হে?

—ঐ মেয়েটা। ওর! ওর নাম তাসারেত্‌তা। ধোপানী খুব ভাল কাপড় কাচে আর রঙ ও করে মঁসিয়।

—তাই নাকি! বেড়ে দেখতে তো?

—হ্যাঁ স্যার। চমৎকার।

—ওর বিয়ে হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। ওর স্বামী বুড়ো তাসারু।

—বুড়ো?

—হ্যাঁ মঁসিয়, বুড়ো। তবে একেবারে বাহাত্তুরে বুড়ো নয় স্যার। আবার ঠিক ছোকরাও নয়।

—সেকি! তাতে মেয়েটা খুশি?

হ্যাঁ মঁসিয়, তাই তো আমরা জানি।

—ওর নামে কেউ কিছু বলে না।

—না স্যার। আমি কোনদিন শুনিনি। তবে ভারি ফুর্তিবাজ মেয়ে। সব সময় নিজের আনন্দে নিজে মেতে আছে। ভারি ভালো মেয়ে স্যার। তা ছাড়া কাজও খুব ভালো করে।

—হুঁ। তাহলে তো একে দিয়েই জামাকাপড় কাচাতে হয়, কি বল?

—কাচান না স্যার। খুব ভাল হবে। ডেকে দেবো?

—ডাকো না!

—তাসা, তাসা। বলে ডেকে উঠল বৃদ্ধ লোকটা তাসারেত্‌তার দিকে তাকিয়ে।

ডাক শুনেই তাসারেত্‌তা ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের গাঁট কোমরে নিয়ে।

বৃদ্ধ তাসারেত্‌তার দিকে হাত ইসারা করে চেঁচিয়ে বলে উঠল। এদিকে

এস তো তাসা। ম'সিয় ডাকছেন।

তাসারেত্তা হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

বৃদ্ধ বলল, ম'সিয় ডেকেছেন।

তাসারেত্তা তাকালো দ্যুফাউ এর দিকে। দু'জনের দৃষ্টির সংঘাত হল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল দ্যুফাউয়ের বুকের মধ্যে।

তাসারেত্তার দৃষ্টি পানে দ্যুফাউয়ের দু চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল।

একটা রজকী একটা সামান্য ধোপানীর দেহে যে এত যৌবন সম্পদ, চোখের নজরে যে এত জাদু থাকতে পারে, তা ম'সিয় দ্যুভউয়ের কল্পনায় এলো না।

হতবাক হয়ে রইল ম'সিয় দ্যুফাউ।

কথা বলতে চাইছে। কিন্তু কথা বেরুচ্ছে না মুখ থেকে তারপর অকস্মাৎ বলে উঠল।

—আমার অনেক দামি দামি জামা-কাপড় আছে। তুমি কাচতে পারবে। আমি রাজবাড়ির লোক।

রাজবাড়ির লোক শুনে তাসারেত্তার আনন্দের আর সীমা রইল না। অদ্ভুত গ্রীবা ভঙ্গিমা করে দুই অধরের মাঝে চিকন হাসির রেখা টেনে বলল।

—আপনি রাজবাড়ির লোক। খুব ভাগ্য আমার। নিশ্চয়ই কাচবো ম'সিয়। আপনার ঠিকানা। কবে যাবো।

—তোমায় যেতে হবে না। আমিই পাঠিয়ে দেবো। তোমার ঠিকানাটা বলো। হ্যাঁ তবে কাচা কাপড় গুলো তুমিই পেঁছে দিয়ে এসো। কেন না আমায় পরখ করে যাচাই করে দেখে নিতে হবে তো সে গুলো।

—তা তো নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, আমিই পেঁছে দিয়ে আসবো কাচা কাপড়। আমার ঠিকানা হলো পোঠিলো। সবাই আমায় চেনে। আমার নাম যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

—ওঃ পোঠিলোতে থাক তুমি। ঠিক আছে। আজ আর হবে না। কাল আমার লোক তোমার বাড়ি যাবে জামা-কাপড় নিয়ে। এই নাও আমার ঠিকানা।

বলেই দ্যুফাউ পকেট থেকে একটি কার্ড বার করে তাসারেত্তার হাতে দিল। দিয়েই পর মুহূর্তে আবার বলে উঠল।

—আচ্ছা অ্যাদিউ (মোঁসিয় বিদায় আমার প্রিয়) বলেই দ্যুফাউ নিজের ডান হাত দিয়ে তাসারেত্তার নরম চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে সেই হাত আবার নিজের ঠোটে ঠেকিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল।

নদীর ঘাটে তখন পারাপারের খেয়া এসে ভিড়েছে।

দ্যুফাউ উঠল গিয়ে সেই খেয়াতে। খেয়া থেকে আর একবার তাসারেত্তাকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করবার চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে দেখতে পেল বটে। কিন্তু ওর মুখ দেখতে পেল না। দেখতে পেল ওর সুস্পষ্ট বর্তুলাকার নিতম্বের কতকাংশ। যেন এক অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায়। যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে তাকে।

আনমনে পথ হাঁটছে তাসারেত্তা। হাঁটছে আর মনে মনে দ্যুফাউ-এর সঙ্গে সদ্য পরিচয় পথের স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে। সব কথা ভেবে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই হেসে উঠছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে তাসারেত্তা আবার নিজের ব্যবসার কাজেই মন দিল। মনে খুব আনন্দ। কেন না রাজবাড়ির লোক দ্যুফাউ ওর কাছে কাপড় কাচাবে। তাছাড়া দ্যুফাউ ওকে আদর করেছে। বাড়ী ফিরে পাড়াপড়শি সবার কাছে শুধু দ্যুফাউ এর গল্প। তার প্রশংসা।

সেদিন ঠান্ডাটা একটু বেশি।

রাত বেশি নয়। কাজ করে চলেছে তাসারেত্তা।

একজন পড়শি আর একজন পড়শিকে বলল।

—হ্যাঁ, এই ঠান্ডার মধ্যে তাসারেত্তা এখনো কাজ করচে, কি ব্যাপার বল তো।

—ব্যাপার আর কি মনে সুখ আছে। বলল, অপর পড়শি মেয়ে-ছেলেটা।

—সুখ। কিসের সুখ রে ভাই। কাপড় কেচে তো খেতে হয়। এতে আমার সুখ কিসের।

—তুই জানিস নে!

—না, কি করে জানব ?

—সেকি রে, পাড়াময় যে রটে গেছে—

—পাড়াময়, কি ব্যাপার বল তো।

—আরে ভাই, সেই বিকেল থেকে কেবল দ্যুফাউ আর দ্যুফাউ।

—সেটা আবার কে।

—ও মা, দ্যুফাউ এর নাম শুনিস নি।

—না তো ভাই।

—তবে তুই আর শহরে থাকিস নে।

—কি আছে। বল না বাবা, কে তোদের এই দ্যুফাউ।

—রাজবাড়ির হর্তাকর্তা।

—তাতে তাসারেত্তার কি হলো ?

—দ্যুফাউ এখন থেকে ওর কাছেই জামা-কাপড় কাচাবে তাই ওর মনে এত আনন্দ। এত ঠাণ্ডায় ও কাজ করে চলেছে।

বেশ তো। পয়সা দিয়ে জামা-কাপড় কাচাবে দ্যুফাউ। এতে তাসারেত্তার এত ফুর্তির কি হলো ?

—আরে ভাই তোকে বোঝানো দায় দেখছি। বুঝতে পারছিস না, দ্যুফাউকে ও চায়। দ্যুফাউ ওকে আদর করেছে। ও দ্যুফাউয়ের পীরিতে পড়েছে। এবার বুঝেছো, হাঁদা মেয়ে।

—ও এই কথা, তা ভাল। তাহলে তো তাসারেত্তার এবার বরাৎ ফিরে যাবে।

—তা যেতে পারে। তাসারেত্তা ছুঁড়ির গতরের চেকনাই তো কম নয় ? দেখলে মুনির মন গলে, মাথা ঘোরে।

যদি একবার নজরে পড়ে যায়, পড়ে যায় কেন, হয়ত পড়েই গেছে। যদি তাই হয় তবে আর ওকে দেখে কে ?

—তা ভাল।

—ভাল বলে ভাল। ভগবান যখন যার দিকে তাকান এমনি করেই তাকান। তোর আমার তো আর যৌবনের বালাই নেই। কাজে কাজেই ভগবান মুখে তুলে চান না।

—ঠিকই বলেছিস ভাই।

—আমি ঠিকই বলি। বেঠিক বলি না। তবে একটা কথা ভাই—

—কি !

—বলি, তোর আমারও তো একদিন যৌবন ছিল। না ছিল না।

—তা ছিল বই কি।

কিন্তু ভগবান কি তাকিয়েছেন আমাদের মুখের দিকে ?

—না ভাই।

—তবে ? একেই বলে ভাগ্য। ভাগ্য আমাদের নেই।

—আর ভাগ্য ! ভাগ্য থাকলে আর এরকম হবে কেন। যাক গে। তবু তাসারেত্‌তার বরাতটাই না হয় ফিরুক। হাজার হলেও তো তাসা আমাদেরই পড়শি। আর কিছু না হোক। অন্ততঃ একদিন ওর কাছ থেকে ভালমন্দ খাওয়া আদায় করা যাবে!

—তা যা বলেছিস ! আমাদের ঐটুকুই লাভ। বলেই দুজনে হো হো করে হেসে উঠল।

পরের দিন যথা সময়ে দ্যুফাউয়ের লোক এসে জামা কাপড় দিয়ে গেল তাসারেত্‌তাকে।

তাসারেত্‌তাও দ্যুফাউয়ের জামা-কাপড় খুবই যত্নের সঙ্গেই কেচে রঙ আর ইস্ত্রি করে যথা সময়ে সেগুলো নিয়ে পৌঁছে দিতে গেল নিজে দ্যুফাউয়ের হোটেলে।

দ্যুফাউ তখন ঘরেই ছিল। খুব জমকালো ঘর। একটা সোফায় বসে চুরুট টানতে টানতে অনর্গল ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

তাসারেত্‌তার কাছে দ্যুফাউয়ের কার্ড ছিল। রুম নাম্বার দেখে সোজা হাজির হল গিয়ে দ্যুফাউ এর ঘরে।

তাসারেত্‌তাকে দেখা মাত্রই দ্যুফাউ সোফা ছেড়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাসারেত্‌তার হাত থেকে নিজেই জামা-কাপড় নিয়ে একটা দেরাজের মধ্যে রেখে দিয়ে আবার সোফায় বসল।

তারপর লালসালোল দৃষ্টিতে তাসারেত্‌তার দিকে তাকিয়ে ওর একটা হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে ওর রূপ যৌবনের ভূয়সী প্রশংসা করতে আরম্ভ করল।

বলল—সত্যি তোমাকে খাসা দেখতে তাসারেত্‌তা। আমার খুব ভাল লেগেছে তোমাকে। বলেই তাসারেত্‌তার একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে চটকাতে আরম্ভ করল যৌন উত্তেজনা বোধ করে। তার দেহের চাঞ্চল্য সেই সময় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত গায়ে পড়া অশোভন আদর সোহাগে তাসারেত্‌তা প্রথমটা বেশ বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের ভাব পালটে গেল। নিজের মনে মনেই বলে উঠল, যাক, তাহলে দ্যুফাউয়ের ভাল লেগেছে আমাকে। তা লাগবে নাই বা কেন ? আমি কি কিছু কমতি যাই ? আমার যৌবনের ঠ্যালা সামলানো অনেক বাবুর দায়। যদিও আমি সবার ঠ্যালা সামলাতে জানি। অনেকেরই দৌড় দেখেছি।

বলে না মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। ব্যাটাছেলের মুরোদ কত তা ভালই জানা আছে। আদালতে মামলা উঠবার আগেই মোকদ্দমা ডিসমিস অনেক তাবড় তাবড় মহাপ্রভুরই! এক মিনিটের মুরদ।

যাক বাবা। কিছু তো বলা যাবে না। রাজ বাড়ির লোক। কিসে কি হয়ে যাবে। চুপ করে থাকাই ভাল। তবে যদি একবার দয়া হয় তাহলে আমার বরাত ফিরে যাবে। একথা ঠিক।

চুপ করে বসে রইল তাসারেত্‌তা। কিছু আনন্দে কিছু আতঙ্কে। কিন্তু মনের মধ্যে আশা আকাঙ্খার নানা আকাশ কুসুম স্বপ্ন গড়ে তুলতে লাগল নিমিষের মধ্যে।

দ্যুফাউ এবার নিজের ঠোঁট দুটো তাসারেত্‌তার ঘাড়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলল, তাসা,! তুমি এত সুন্দর। যা ভাল লেগেছে তোমাকে আমার। জামা কাপড় কাচার জন্যে তোমার ন্যায্য মজুরী তা তো তুমি পাবেই, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু পাবে। অনেক। এমন জিনিস্‌ তোমায় দেব যা তুমি ভাবতেই পার না।

এইখানেই কথা শেষ করল দ্যুফাউ। কিন্তু তাসা ওর ঘাড়ের ওপর বিছের কামড়ের মত একটা জ্বালা অনুভব, করল। তাসারেত্‌তার ডান হাতটা টেনে নিয়ে দ্যুফাউ রাখল তার বুকের মাঝখানে। চমকে উঠল তাসারেত্‌তা। ফনা তোলা ক্রুদ্ধ বিষধর সাপের যেন হাত পড়ল ওর।

নরম হাতে আবার সেই বিছের কামড়। কিন্তু এবার তা জ্বালা বলে মনে হল না তাসারেত্‌তার কাছে। মনে হল নন্দন কাননের কোন এক অমৃত কীট এসে ওকে দংশন করে গেল। শিরায় শিরায় এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতি। তাসারেত্‌ত বসে রইল মন্ত্রমুগ্ধের মত। ও টের পাচ্ছিল উত্তেজনায় ওরও থর থর অবস্থা। তাই আবেগে কম্পমান। বিস্ফারিত। বেপথু দ্যুফাউ বলল, কি তাসা, কথা বল ?

—আমি আর কি বলব মঁসিয়। সবই আপনার ইচ্ছে।

—তা হলে আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে তো ?

—তা ছাড়া আর কি মঁসিয়। আপনি খুশি হলেই আমার আনন্দ। তাহলে এখন যা দেবার দিন।

—নিশ্চয় দেব। এক্ষুনি দেব। এতো দেবো যে তুমি খুশি না হয়েই পারবে না তাসা।

—ঠিক আছে। খুশি করুন আমাকে। তার কথা শেষ হবার আগেই

জোরে জাপটে ধরল তাকে দ্যুফাউ। এই কথোপকথনের একটু পরেই দ্যুভাউয়ের খোদ চাপরাশি কিছু জরুরি কাগজপত্তর নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে—দেখে দরজা বন্ধ।

ঘরের মধ্যে একটা ডিম লাইট জ্বলছে বটে। কিন্তু এ সময়ে দরজা বন্ধ দেখে চাপরাশি একটু অবাক হয়ে গেল। দরজায় কান পেতে কিছু বুঝবার না কিছু শুনবার চেষ্টা করল চাপরাশি।

মনে হল বন্ধ ঘরের ভেতরে বিছানার ওপর চলেছে প্রবল ধস্তাধস্তি। দাপা-দাপি। ওলট পালট। নারী পুরুষের সেই আদিম শয্যাসংঘর্ষ নয়তো? শব্দের ধরণ যে অনেকটা তারই মত।

চাবিগর্তে চোখ রেখে ভেতরের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করল চাপরাশি। কিন্তু বৃথা। শুধু শব্দটা শুনতে পেল। সেই সঙ্গে চাপা কান্না গোঙানির মত আওয়াজ কি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বিরক্ত হয়ে চলে গেল নীচে। চাপরাশির কানের পাশ দুটো গরম হয়ে হয়ে উঠল।

প্রায় আধঘন্টা পর তাসারেত্‌তা বেরিয়ে এল দ্যুফাউয়ের ঘর থেকে।

দ্যুফাউ তখন তাসারেত্‌তার ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা পান করে মাতাল হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। তার পাজামার দড়ি ঢিলে। কসি আলগো চটচটে ভিজে এখানে ওখানে।

তাসারেত্‌তা হোটেলের সিড়ি দিয়ে নেমে চলছে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ভাবে। চোখে ওর জল। মাথার চুল এলোমেলো। উস্কো খুস্কো। পরণের পোষাক বিস্রস্ত। বেসামাল। খুজলে ভেজা দাগ মিলে যাবে এখানে ওখানে। কিসের তা না বললেও চলে।

ওর চেহারাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে বলে বোঝানো যায় না।

খেতে বসে পাতের কাছে এক চিলতে পাতি লেবুকে টিপে খেলে সেটাকে যেমন দেখতে লাগে তাসারেত্‌তার চেহারাটা দেখতে এখন সেই রকমই লাগছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কিছু রাগে, কিছু অভিমানে সিড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল তাসারেত্‌তা। সবাই অবাক হন ওর এই হাল দেখে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি তা তো আর কেউ দেখেনি বা জানে না।

তবু কি আশ্চর্য; খবরটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সারা হোটেল

নয়। যে তাসারেত্তা দ্যুফাউয়ের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। লোকটা নির্জন ঘরের দরজা বন্ধ করে দস্যুর মত নির্মমভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লুণ্ঠন করেছে তাসারেত্তার যৌবন। মিথ্যা উপহারের আশ্বাসে তাকে প্রলুব্ধ করে। যা এক্ষেত্রে এক নিদারুণ অশ্লীল বিদ্রূপ বা কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়।

লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে তাসারেত্তা হাজির হল গিয়ে সোজা এক জজ সাহেবের বাড়ী।

সেদিন ছুটির দিন। জজ সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলো। জজ সাহেবের চাপরাশির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাসারেত্তা বলল রাজবাড়ির দ্যুফাউ টাকা পয়সা উপহারের লোভ দেখিয়ে তার লাজ লজ্জা মানবসম্ভ্রম সব নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ তার জন্য একটি পয়সাও ঠেকায়নি তাকে। বলল

—এ ধরণের ব্যাপার আর একবার হয়েছিল আমার। সেটা এক পাদরির সঙ্গে। সে আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিল। আজ এই আবাগীর বেটা অনামুখো হাড় হাভাতে চোখখেকো মিনসে আমায় ঠকালো। আমার সর্বস্ব জবরদস্তি লুটে নিল একটি পাই পয়সাও না ঠেকিয়ে। কি বলব ভাই মুখে আটকাচ্ছে, মিনশে আমায়...আমাকে দিয়েও ওর......আর সব কিছু করতে বাধ্য করেছে...আমার বুক ফেটে কান্না আসছে ভাই। কি বল এরকম দুশমন এরকম হাড়ে হারামজাদা বজ্জাত বেতমিজ বেতমিজ লোকও থাকে। হ্যাঁ তবে আমি যদি কোন লোককে ভালবেসে তার সঙ্গে কিছু করি তাতে কোন দোষ নেই। কেননা সেটা আমার আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু দ্যুফাউকে তো আমি ভালবাসিনি। ও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে আকাজ কুকাজ করেছে। আমাকে বলাৎকার করেছে। এরজন্য অন্তত হাজার ক্রাউন ওর দেওয়া উচিত আমাকে খেসারত স্বরূপে।

এই পর্যন্ত বলেই তাসারেত্তা থেমে গেল! ওর চোখে এখন আর জল নেই...তবে মনের ব্যথার দরুণ ওর ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আর বুকটা ওঠানামা করছে।

ইতিমধ্যে জজ সাহেব ঘরে ঢুকলো। চাপরাশিকে সঙ্কেত করতেই চাপ-রাশি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাসারেত্তাকে দেখেই জজসাহেবের পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয়—এই আকর্ষনীয় তরুণী নারীর আসঙ্গ-লিপসায় উত্তেজিত হয়ে উঠল!

আস্তে আস্তে তাসারেত্তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর গায়ে গা ঘেসে দাঁড়াল।

তারপর নিজের নিজের ঠোঁট দুটো যতদূর সম্ভব তাসারেত্তার নরম ঠোঁট দুটোর কাছে নিয়ে গিয়ে ধরল। আশা, যদি তাসার অধর পাত্র থেকে কিছু শীতল দ্রাক্ষারস গড়িয়ে পড়ে নিজের অধরপত্রে।

কিন্তু তা হলো না। নেড়া বেলতলায় বারবার যায় না। তাসারেত্তা নিজেকে সামলে নিল।

জজ সাহেবও সোজা হয়ে দাড়িয়ে পড়ল।

তাসারেত্তা বলল, 'আমি আপনার কাছে নালিশ জানাতে এসেছি ধর্মাবতার।

—'নালিশ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কে তোমার কি করেছে বল, আমি তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো। তোমার জন্যে সব করতে পারি আমি। তবে আমাকে একটু দেখো।

—তা দেখব জজ সাহেব। আগে আমার নালিশটাই শুনুন।

—বল বল।

—মঁসিয় দ্যুফাউকে আপনি চেনেন?

—চিনি না। তবে নাম শুনেছি। কি করেছে তোমার?

আমার সর্বনাশ করেছে।

—সর্বনাশ! সেকি! চুরি?

—হ্যাঁ, চুরি তো বটেই। আমি ওকে আমার জিনিস নিতে দেবো না। কিন্তু ও চুরি করে নেয়া দূরের কথা, দস্যুবৃত্তি করেছে।

—জোর করে?

—হ্যাঁ, জোর করে।

—সে কি করে হল? গৃহস্থ যদি সজাগ থাকে তাহলে কি কেউ চুরি কিংবা দস্যুবৃত্তি করতে পারে?

—কেন, পিস্তল বা বন্দুক দেখিয়ে হয় না?

—তা হয় বটে।

—এটাও ঠিক সেই ধরণের ধর্মাতার।

—আচ্ছা, দ্যুফাউ তো রাজবাড়ির লোক শুনি। ওর তো কোন অভাব নেই। পয়সা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু তোমার ঘরে চুরি বা দস্যুবৃত্তি করতে গেল কেন, জবরদস্তি মেয়ে মানুষের শরীর সম্ভোগ।

ওটা হলো এক এক ধরণের ব্যাটাছেলের স্বভাব। অবলাদের উপর বল-প্রয়োগ। গাজোরি জুলুম। মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তাদের সঙ্গে সহবাস। একেই আপনারা বলেন ধর্ষকামিতা না কি। দ্যুফাউয়ের মেয়ের অভাব না থাকলে হবে কি। আরো চাই। নিত্য নতুন। কাঁচ কাঁচ নারী দেহ। আমার মত।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

বুঝতে পারছেন না জজ সাহেব।

—না। ঠিক ঢুকছে না মাথায়। একটু বুঝিয়ে বল।

—আমাকে দেখছেন তো?

—তা তো দেখছি।

—কি রকম দেখতে আমি?

—ভারি সুন্দর।

—আমার এই শরীরটাও তো একটা ঘর জজ সাহেব। বলুন ঠিক কি না?

—নিশ্চয়ই। ঘর বইকি! এরকম ঘর আর হয় না।

—এই ঘরে দরজা ঠেলে জোর করে ঢুকে দ্যুফাউ দস্যুপনা করেছে। শুধু তাই নয়, পাকা তস্করের মত বিদায়ের আগে কাজ হাসিলের নিশানা চিহ্ন রেখে গেছে গেরস্থ ঘরের আঙিনায়। মলমূত্র ত্যাগের মত পুরুষ শরীরের ক্লেদগ্লানি নিষ্কাষণ করে আমার দেহের অন্দরে।

এইবার হো হো করে হেসে উঠল জজ সাহেব। ও এই ব্যাপার। এখন কি করতে হবে আমাকে?

দ্যুফাউয়ের ফাঁসি হোক, তা আমি চাইনে।

—তবে আমার ক্ষতিপূরণ চাই।

—কি ভাবে?

—একটি হাজার ক্রাউন। এর কম নয়। এই এক হাজারেই আমার হবে। আমি ধোপানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য ব্যবসা করব।

—আচ্ছা দ্যুফাউয়ের তো বেশ পয়সা আছে শুনেছি। তায় আবার রাজ-বাড়ির হর্তাকর্তা।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখ নিচু করে একটু চিন্তা করল জজ সাহেব। তারপর ভাসারেত্ তার দিকে মুখ তুলে বলল ঠিক আছে। তুমি যখন বিচারই চাও তখন বিচারই হবে। তবে ঘটনাটা কিভাবে ঘটল সেটা আমার জানা

দরকার। তা না হলে কেস সাজাবো কি করে?

—তাহলে শুনুন।

—বলে দাও।

—দ্যুফাউ ওর জামা কাপড় কাচতে পাঠিয়ে ছিল আমার কাছে। রাস্তায় ওর সঙ্গে আলাপ। আমি কাচা কাপড় পেঁাছে দিতে যাই ওর হোটেলে। ঘরে ঢোকা মাত্রই দ্যুফাউ আমাকে ওর পাশে বসিয়ে খুব আদর করতে আরম্ভ করল। এই ফাঁক তালে গাল টেপা, কোমর জড়িয়ে ধরা...স্তন উরু নিতম্বে হাত রাখা... আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া এই সব আর কি। আমার রূপ যৌবনেরও খুব প্রশংসা করল।

—ঠিক করেছে। তারপর।

—তারপর বলল আমার যা ন্যায্য মজুরি তার চেয়েও অনেক কিছু বেশি দেবে আমাকে!

—তুমি রাজি হলে?

—কি করব হুজুর। গরিব মানুষ। রাজী না হয়ে কি পারি বলুন!

—তা ঠিক। তারপর দ্যুফাউ কি করল?

আমার হাত ধরে, আমার মাথার চুল ধরে খুব আদর করতে লাগল। আমার মুঠো করা নরম হাতের তেলোতে খাড়াভাবে ওর আঙ্গুল বসিয়ে খোঁচা মেরে ইঙ্গিতটা তো বুঝতে পারছেন, বলে লজ্জায় মাথা নিচু করল তেসারেত্তা।

—তুমি কোন আপত্তি করলে না?

—না হুজুর।

—ঠিক আছে তারপর?

—তারপর হঠাৎ মনে হলো আমার ঘাড়ে যেন একটা বোলতা এসে কামড়ে দিয়ে গেল।

—হো হো করে হেসে উঠল, জজসাহেব। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, ঘাড়টা জ্বলে গেল নিশ্চয়ই।

—তা একটু জ্বলেছে বৈকি।

—তবু তুমি কিছু বললে না?

—না।

—কেন?

—তখনো আমি আমার ন্যায্য মজুরি পাই নি।

—কেন ? মজুরি দেবে না বলেছিল ?

—না তা বলে নি।

—তবে ?

বলেছিল আমাকে খুশি করবে।

—তুমি কি বলেছিলে ?

—আমি বললাম মঁসিয় আপনার ইচ্ছে।

—দ্যুফাউ কি বলল ?

—বলল তাহলে আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে তো।

—তুমি কি বললে ?

—আমি বললাম, হ্যাঁ মঁসিও, তা ছাড়া আর কি।

হো হো করে হেসে উঠল জজ সাহেব। বলল তোমার কোন কেসই হতে পারে না। আমি তোমার কেস টেক-আপ করতে পারি না। কারণ তুমি এমনই একটা জবাব দিয়েছো যাতে দ্যুফাউ মনে করেছে ও যা চায় তাতে তুমি রাজি আছো। কাজেই কি করে কেস হতে পারে। আমি কি জবানবন্দি নেবো তোমার কাছ থেকে কোর্টে। তুমি এখন যা বললে আমার কাছে। তাতে তো তুমি হেরে যাবে। বলেই আবার হো হো করে হাসতে আরম্ভ করল জজ সাহেব।

তরল মতি তাসারেত্তা বলল।

—আপনি হাসবেন না জজ সাহেব। আমার দিকটা একবার ভেবে দেখুন। আমি অনেক চেষ্টা করেছি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। কেঁদেছি দ্যুফাউয়ের হাতে পায়ে ধরেছি আমাকে রেহাই দেবার জন্যে। গায়ের জোরে আমাতে উপগত না হবার জন্য। কিন্তু তবু ছাড়া পাই নি।

জজ সাহেব একটা চুরুট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।

—ওসব কান্নাকাটি হাতে পায়ে ধরা আসলে তোমাদের ছেনালিপনা। ও রকম না করলে ব্যাটাছেলের রোখ চাপবে কেন ? যাতে দ্যুফাউ রেগে যায়, ওর গা গরম হয়ে ওঠে, সে জন্যে তুমি ঐসব ছেনালিপনা করেছো। আসলে তোমার মনের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল।

জজ সাহেবের কথায় তাসারেত্তা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল—না না জজ সাহেব। আপনি বিশ্বাস করুন। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওভাবে দেহ দেবার। একদম না। আমি আমার মজুরির জন্যই এসেছিলাম। দ্যুফাউ জবর-দস্তি ধর্ষণই করেছে আমায়। আমার কোমর

জড়িয়ে ধরে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। আমি ওকে শোওয়া অবস্থায়ই লাথি মেরেছি। হাত কামড়ে ধরেছি। কিন্তু তবুও পারি নি। ওর ইচ্ছা পূরণ করেছে। বিশ্বাস করুন জজ সাহেব আমি একটুও মিথ্যে কথা বলছি না।

—ঠিক আছে আমি তোমার কথা না হয় বিশ্বাসই করলাম। কিন্তু এর মধ্যেও একটা কথা আছে।

—বলুন কি কথা।

—দুফাউ জবরদস্তি করেছে মানলাম। কিন্তু তুমি তো খুশি হয়েছো।

—মোটেই না জজ সাহেব। আমি মোটেই খুশি হই নি। আমার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু আমি এর বিচার চাই। এর প্রতিশোধ চাই। আর তা না হয় তো পুরো একটি হাজার ক্রাউন। তবে যদি আমার দুঃখ ঘোচে।

—সবই মানলাম তাসারেত্তা। কিন্তু তবু আমি তোমার কেস টেকআপ করতে পারি না। তার কারণ আমার বিশ্বাস একটা মেয়েছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুরুষ মানুষই তাকে কোন সম্ভোগ করতে পারে না।

—এ আপনার ভুল ধারণা, জজ সাহেব। আপনি জানেন না সবল পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েরা কত অসহায়। বিপদে পড়লেও তাই। আপনার সে সম্বন্ধে কোন ধারনাই নেই দেখছি। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলতে পারি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা ঘটবার ঘটেছে। অর্থাৎ দুফাউয়ের সাথে যৌন সংযোগ। বলেই তাসারেত্তা জজ সাহেবের দুটো পায়ে হাত দিতে গেল।

জজ সাহেব বলল থাক থাক। পায়ে হাত দিতে হবে না। আমি তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম। তবু একটা কথা।

—বলুন।

—আমি তো জজ।

নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা ধর, আমার এই ঘরটাই না হয় আদালত। আমি এই ঘরে বসেই তোমাকে নানা রকম ভাবে জেরাই বল, আর পরীক্ষাই বল, সব করতে পারি।

—নিশ্চয়ই পারেন। তবে আমার ঐ এক হাজার ক্রাউনই চাই। এর কমে আমি কিছুতেই রাজি হব না।

—তা তুমি পাবে। আমি আদায় করে দেবো। আগে পরীক্ষায় তো পাশ কর।

—ঠিক আছে। আমি তৈরি।

—জ্যাক। হাঁক ছাড়ল সাহেব চাপরাশির উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

জজ সাহেব জ্যাকের দিকে, তাকিয়ে বলল.—আমি যে বড় ছুঁচটা দিয়ে কোটের সব নথিপত্র সেলাই করে গেঁথে রাখি, সেই ছুঁচটা আর একগাছা টোন সুতো নিয়ে এসো তো জ্যাক।

ঘর থেকে আবার সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক।

দুতিন মিনিটের মধ্যে ছুঁচ আর সুতো নিয়ে আবার এসে উপস্থিত হলো।

জজ সাহেব জ্যাকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও আমাকে।

জ্যাক ছুঁচ আর সুতো দুইই তুলে দিল জজ সাহেবের হাতে।

জজ সাহেব বলল, তুমি চলে যাও।

জ্যাক চলে গেল সেলাম ঠুকে।

—জজ সাহেব ছুঁচটা নিজের হাতে রেখে আর সুতোটা তাসারেত্‌তার হাতে দিয়ে বলল, আচ্ছা তাসা। এই ছুঁচটা তো বেশ বড় তাই না?

—হ্যাঁ।

—গর্তটাও এর বড়?

—হ্যাঁ।

—তোমার হাতে সুতো আছে?

আছে জজ সাহেব।

এবার তাহলে আমি ছুঁচটাকে সোজা করে ধরছি। তুমি তোমার হাতের ঐ সুতোটাকে আমার হাতের এই ছুঁচের গর্তের মধ্যে গলিয়ে দাও তো দেখি। যদি পার তাহলে আমি তোমার কেস টেক আপ করব। আর তা না হলে নয়। —বলেই জজ সাহেব ছুঁচটাকে একেবারে সোজা করে শক্ত করে ধরে বসে রইল।

জজ সাহেব ভারি রসিক ও বহু প্রিয় ব্যক্তি। মনে মনে চিন্তা করল দেখি এই বিদ্যাধরী সুন্দরী কি করে।

তাসারেত্‌তা সুতোটাকে বেশ ভালো করে পাকিয়ে নিয়ে সোজা করে যেই ছুঁচের গর্তের মধ্যে ঢোকাতে যাবে অমনি জজসাহেব হাত নাড়িয়ে দিল।

তাসারেত্‌্যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সুতোটা ছুঁচের গর্তের মধ্যে না ঢুকে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এই ভাবে যতবার তাসারেত্‌তা ছুঁচের গর্তে সুতো পরাতে যায় ততবার জজসাহেব চালাকি করে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়—সুতো ধরা হাতটা শেষ মুহূর্তে নাড়িয়ে দিয়ে আর যাতে ছুঁচটা ঘুরিয়ে দিয়ে। ফলে তাসারেত্‌তা হাতের সুতোর মুখ আর কিছুতেই ছুঁচের গর্তে ঢুকতে পায় না।

তাসারেত্‌তা হয়রান হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,—ঐরকম করলে আমি আর পারবো না জজ সাহেব। —তাহলে এবার ভেবে দেখ তাসারেত্‌তা। তুমি যদি আমার হাতের এই ছুঁচটার মত কায়দা করতে তাহলে মঁসিয় দ্যুফাউ কিছুতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত না তোমায় দিয়ে। তার হাতের সুতো হাতেই ধরা থেকে যেত। তোমার ছুঁচের গর্তে আর তার প্রবেশলাভ ঘটত না। বলল জজ সাহেব। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

তাসারেত্‌তা বলল—আপনার ভুল ধারণা জজ সাহেব। আপনার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তাই একথা বলছেন।

—বলছি তাসা। তবে অভিজ্ঞতা নেই তাও ঠিক তাই বলে আমার কথা তুমি একেবারে ফেলে দিতে পারো না।

—তা পারি না বটে। তবে দ্যুফাউ যে কত বড় শয়তান তা, আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওকে রুখে ছিলাম ঠিক আপনার প্রদর্শিত কৌশলে। ও আমার সঙ্গে না পেরে শেষে অন্য কায়দা ধরে।

—সেটা আবার কি?

—আপনি ছুঁচটা ধরে থাকুন, আমি বলছি।

জজ সাহেব ছুঁচ ধরে রইল।

ঘরে মোমের বাতি জ্বলছিল। তাসারেত্‌তা সেই বাতির তলা থেকে একটু গলা মোম তুলে নিয়ে সুতোর সঙ্গে পাকিয়ে সুতোটিকে খুব সোজা ও শক্ত করে তুলল। তারপর সেটা ছুঁচের সামনে নিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করল,—আহা, কি সুন্দর ছুঁচ। এই ছুঁচ দিয়ে কি না করা যায়। কত নকশার কাজও হয়। তবে ছুঁচে যদি সুতো নাই পরানো যায়। তবে সেলাই বলুন আর নকসার কাজই বলুন, কি করে সম্ভব। ছুঁচটা তো ভারি পাজি। খালি ঘুরছে। না; এরকম করলে কি করে হবে। এই

ভাবে প্রকৃত পক্ষে দ্যুফাউ যে ভাবে তাসারেত্তাকে খোসামোদ করে রেখেছিল তাকে সঙ্গমে রাজী করাতে, সেই সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বলতে জজ সাহেবকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখল তাসারেত্তা।

জজ সাহেব ছুঁচ ঘুরিয়েই চলেছিল। এইভাবে ধরে থাকেনি কিন্তু এবার হাত ধরে যাওয়ায় হাতটা একটু স্থির করে ধরল। টেবিলের ওপর। তাও মুহূর্তের জন্য।

মুহূর্ত হলে হবে কি? এই মুহূর্তের মধ্যেই তাসারেত্তা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ছুঁচের গর্তের সুতোয় মুখ প্রবেশ করিয়ে সুতো পাকিয়ে দিল।

জজ সাহেব একটু বোকা বনে গিয়ে বলল —হাতটা আমার ধরে গেছে তাই।

—আমার ব্যাপারটাও ঠিক আপনার এই হাতের মতই হয়েছিল জজ সাহেব। বলল তাসারেত্তা। তার বুকে ফোলা নরম মাংস আরও ফোলাতে ফোলাতে।

জজ সাহেব অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল ঠিক একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। কিন্তু সে সামলে নিল।

সৃষ্টির মূলে কাম। সেই কাম দুর্জয় দুর্বার। এই দুর্বার কামকেই তখন-কার মত দমন করল জজ সাহেব।

এবার জজ সাহেবের বিশ্বাস হলো যে মঁসিয় দ্যুফাউ সত্যি সত্যি উপদ্রব করেছে, তাসারেত্তার উপর।

জজ সাহেব বলল—ঠিক আছে এখন তুমি যাও। কাল কোর্টে হাজির হবে। আমি মঁসিউকে ডেকে পাঠাবো। এক হাজার ক্রাউন হলেই তো তোমার হবে।

—হ্যাঁ জজ সাহেব এর বেশী আমি চাইনা।

—ঠিক আছে। এক হাজার ক্রাউন তোমায় আদায় করে দেবো। কিন্তু আমার মুখের দিকে একটু তাকাবে তো?

—নিশ্চয়ই তাকাবো জজ সাহেব। আগে আমাকে ঐ হাজার ক্রাউন পাইয়ে দিন।

—পাবে। নিশ্চয়ই পাইয়ে দেব। এখন তাহলে তুমি যাও।

কিছু গ্লানি। কিছু আকাঙ্খা মনে নিয়ে জজ সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিল তাসারেত্তা।

পরের দিন যথাসময় দুজনেই কোর্টে হাজির হল। মঁসিয়ে দ্যুফাউ এবং তাসারেত্তা।

মামলার জবানিতে দ্যুফাউয়ের হার হল। ক্ষতি পূরণ বাবদ এক হাজার ক্রাউন দিতে হল তাসারেত্তাকে কোর্টে বসে।

এরপর লোক পরম্পরায় শোনা গেল জজ সাহেব নিজেও নাকি তাসারেত্তার ব্যবহারে খুশি হয়ে ওকে এক হাজার ক্রাউন দিয়েছে।

পরিচিতি

* লেখকজীবনীর লেখকের পরবর্তী গল্পে পড়ুন।

রক্তের টান

মিগুয়েল ডে সারভেণ্টি

'গ্রীষ্মের রাত। ঘড়িতে সময় এখন এগারটা। এক মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক তাঁর ছোট ছেলে, 'ষোল বয়সের যুবতী কন্যা, স্ত্রী আর একজন চাকরানী নিয়ে নদীর তীর থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত

চারিদিক। ও'রা চলছিলেন অলস পদক্ষেপে। কারণ ক্লান্তি অপনোদনের

জন্যই তাঁদের এই সান্ধ্য ভ্রমন জোরে হেঁটে শ্রান্তিটা আর বাড়াতে চাইছিলেন না ওঁরা। সহরের শাসন ব্যবস্থা বেশ কড়া, অধিবাসীরাও ভদ্র তাই মনে ভয় ছিল না ওঁদের।

ঐ সহরে বাস কোরতো একজন ধনী যুবক। বয়স মাত্র বাইশ বছর। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান তাই মনোভাবনা ছিল একটু বেপরোয়া রকম। কয়েকজন বন্ধু ছিল তার, যাদের সুনাম ছিল না একটুও। ওদের সাহচর্যে যুবকটিও হয়ে পড়েছিল উদ্দাম। ধরা যাক্ যুবকটির নাম রডলফো। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি যখন তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ওপরে উঠছিলেন তখন যুবকটি তার চার বন্ধুকে নিয়ে নামছিল নীচে, ওদের মন ছিল স্ফূর্তিতে ভরা, প্রকৃতিটাও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্ধত। ভেড়া আর নেকড়ের যেমন সাক্ষাৎ হয় তেমনি পরস্পরের মুখোমুখি হোল ওরা। রডলফো আর তার বন্ধুরা মুখ ঢেকে রেখেছিল, যাতে কেউ চিনতে না পারে ওদের।

ভদ্রলোক ওদের উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিবাদ কোরলেন, ভয় দেখালেন, উত্তর পেলেন হাসি আর কুৎসিৎ মন্তব্যে। যাই হোক তখনকার মতো ওরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোকের কন্যা লিওকাডিয়ার অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো রডলফো। রাস্তায় চলতে সে ভাবল, ফল যাই হোক না কেন, এই মেয়েটিকে পেতেই হবে। বন্ধুদের কাছে মনের কথাটা বোলল সে। বন্ধুরা এক পায়ে খাড়া। তখনই ওরা ফিরে চোলল মেয়েটিকে জোর করে ধরে এনে রডলফোর হাতে তুলে দেবার জন্যে। ধনী বন্ধুকে তো সন্তুষ্ট রাখতেই হবে।

রুমাল দিয়ে নিজেদের মুখগুলো ভালো কোরে ঢেকে নিল ওরা, খাপ থেকে বার কোরল তলোয়ার, আর কয়েক পা পেছিয়ে গিয়েই দেখতে পেল ওদের।

রডলফো নিজেই দোড়ে গিয়ে লিওকাডিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চোলল। ভয়ে লিওকাডিয়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কে কোথায়, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা সে বুঝতেও পারেনি।

ওর বাবা চিৎকার কোরলেন, মা কাঁদলেন, ভাইটা ফুঁপিয়ে কাঁদলো, চাকরানীটা চুল ছিঁড়তে লাগল, কিন্তু তাতে কর্ণপাত কোরলো না কেউ, কারো মনে

একটুও অনুশোচনা বা দয়ার উদ্রেক হোল না, বদমায়েস গুণ্ডাগুলো আনন্দে অধীর হয়েই ওঁদের দুঃখ সাগরে নিমগ্ন কোরে স্থানত্যাগ কোরল।

রডলফো বিনা বাধায় বাড়ী পেঁছিল। লিওকাডিয়ার মা বাবা বাড়ী ফিরলেন, ভগ্ন হৃদয়ে চোখের মনিকে হারিয়ে ওঁরা তখন অন্ধ দিশেহারা। একবার ভাবলেন ওঁরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা জানাবেন কর্তৃপক্ষকে, তার পর আবার চিন্তা কোরলেন, এতে শুধু অসম্মানের বোঝাই বাড়বে, কার বিরুদ্ধে নালিশ কোরবেন তাঁরা? নিজেদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে?

ধূর্ত্ত রডলফো ইতিমধ্যে লিওকাডিয়াকে নিজের ঘরে নিয়ে তুলেছে। পাঁজাকোলা কোরে নিয়ে আসার সময় যদিও সে বুঝতে পেরেছিলো মেয়েটির জ্ঞান নেই, তবুও রুমাল দিয়ে তার চোখ বেঁধে দিতে ভোলেনি সে, পাছে কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বুঝতে পারে। ওদের দেখতে পায়নি কেউ, কারণ ওর বাবার বাড়ীটিতে তার নিজস্ব একটা ঘর ছিল। ঘরটার চাবি থাকতো ওর নিজের কাছেই, অন্য কারো অধিকার ছিল না সে ঘরে প্রবেশ করার। লিওকাডিয়ার জ্ঞান ফিরে আসার আগেই রডলফো একবার তার পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোরে নিয়েছে ওর ওপর। কামার্ত্তের চেতন অচেতন জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না। তার মনে হোল এবার ওর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হবে। সে ভাবলো জ্ঞান ফেরার আগেই ওকে রাস্তায় ফেলে আসতে হবে। চিন্তাটা কাজে পরিণত কোরতে যাবে এই সময় সে দেখলো মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসছে।

"আমি কোথায়? কি হয়েছে আমার? এত অন্ধকার কেন? আমার চারিদিকে ভিড় কোরে ছায়ার মতো এরা কারা? আমি কি এখনও নিষ্কলঙ্ক কুমারীরই আছি না সর্বনাশ হয়েছে আমার? আমার গায়ে এটা কার হাত? আমি কি বিছানায় শুয়ে রয়েছি? আমার কি যন্ত্রনা হচ্ছে? মা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বাবা, তুমি কোথায়? হে ভগবান আমি বুঝতে পারছি আমার মা বাবা আমার কথা শুনছেন না, আমি পড়েছি শত্রুর হাতে। চিরটাকালই কি এই রকম অন্ধকার থাকবে? আর কি কোন দিনই আলো দেখতে পাব না? এই জায়গাটাই আমার অসম্মানের কবর হ'য়ে থাকবে?

এখন মনে পড়ছে আমার, কিছুক্ষণ আগেই আমি বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছিলাম। আমার মনে পড়ছে কারা যেন আমাদের আক্রমণ কোরল। আমি বুঝতে পারছি লোকের কাছে আমার এ মুখ না দেখানোই ভালো।' কথাগুলো বোলতে বোলতে সে কাছে দাঁড়ানো রডলফোর হাতটা চেপে ধরল। "তুমি যেই হওনা কেন, শোন, আমার মিনতি। তুমি আমার সম্মান কেড়ে নিয়েছ, এখন আমার প্রাণটাও নাও। কারণ কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার সতীত্ব অপহরণ করার মতো নিষ্ঠুরতা যখন তোমার আছে তখন অবশ্যই আমাকে হত্যা করার মতো নির্দয়ও তুমি হতে পারবে। তোমার নিষ্ঠুরতাকেই আমি দয়া বোলে মনে কোরব।"

লিওকাডিয়ার বিলাপ শুনে রডলফো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার যৌবনে এরকম অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়নি তার। লিওকাডিয়াকে কি বোলবে ভেবে পেল না সে। উত্তর না পেয়ে লিওকাডিয়া হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কোরল যাকে উদ্দেশ্য কোরে কথাগুলো বোলল সে সেটা অশরীরি কি না। তার মনে পোড়ল কি রকম সবল হাত তাকে তার মা বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। তার নিজের দুর্ভাগ্যের পরিমাণটা যে উপলব্ধি কোরল ভালোভাবেই। কান্না আর দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে যাওয়া বিলাপটা আবার নতুন কোরে সুরু কোরল সে।

"তোমার দুষ্কর্মের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাহসী আর তোমার বয়সও বেশী নয়। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো আমার ওপর যে বলাৎকার তুমি করেছো তা তুমি কোনদিন প্রকাশ কোরবে না তাহলে আমি তোমার এই পাপ ক্ষমা কোরতে পারি। প্রতিজ্ঞা করো তোমার অন্ধকারের পাপ চিরটাকাল অন্ধকারেই রাখবে কখনও প্রকাশ কোরবে না। এত বড় একটা অপরাধের জন্যে এই সামান্য কথাটুকু তুমি রাখবে না? মনে রেখো আমি কখনও তোমার মুখ দেখিনি, দেখতে চাইও না। আমার দুর্ভাগ্যের কথা আমি শুধু ভগবানকে জানাবো আর কাউকে নয়। আমি আশা ছাড়বো না। কারণ আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা কোরলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। মনে কোরো না যে

আমাকে আটকে রাখলে ধীরে ধীরে আমার রাগ পড়ে যাবে। তাছাড়া আমাকে ভোগ করার বাসনাও নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গিয়েছে তোমার, কারণ অল্পায়াসেই তুমি পেয়েছো। তা আমি এখানে থাকলে তোমার কামাগ্নি একেবারেই অন্তর্হিত হবে। তাই মনে করো যে তুমি যা কোরেছো তা হঠাৎ ঘটা একটা দুর্ঘটনা। আমাকে এখনই রাস্তায় রেখে এস, অন্ততঃ গীর্জার কাছে রেখে এস, কারণ সেখান থেকে আমি আমার বাড়ীর রাস্তা চিনে নিতে পারবো। তুমিও প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে অনুসরণ কোরে আমার বাড়ী চিনতে যাবে না, অথবা আমার মা বাবার নাম জিজ্ঞেস কোরবে না। যদি তোমার ভয় হয় যে তোমার গলার স্বর থেকে আমি ভবিষ্যতে তোমায় চিনতে পারবো, তাহলে জেনে রাখো আমি জীবনে কখনও বাবা আর গীর্জার যাজক ছাড়া অপর কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই গলার স্বর শুনে পুরুষকে চেনা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

লিওকাডিয়ার মিনতি, কাতর প্রার্থনা, যুক্তি, সব অগ্রাহ্য কোরে রডলফো জানাতে চাইল যে ওর ইজ্জত নষ্ট কোরে নিজের আনন্দ পাওয়াটাই তার ইচ্ছা। আর একবার বলপ্রয়োগ কোরে ওকে উপভোগ করার চেষ্টা কোরতে গেল সে। লিওকাডিয়ার শরীরে তখন যেন অসাধারণ বল সঞ্চার হ'য়েছে, সে হাত পা, দাঁত জিভ সবকিছু দিয়েই প্রতিহত কোরতে চেষ্টা কোরল রডলফোর আক্রমণ।

"সাবধান, হৃদয়হীন, বিশ্বাসঘাতক, পিশাচ, তুমি যেই হওনা কেন, তুমি একবার আমার অচেতন অবস্থায় সুযোগ নিয়েছ, কিন্তু এখনও আমার দেহে প্রাণ আছে। প্রাণ থাকতে সুযোগ পাবে না তুমি।

লিওকাডিয়ার সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে রডলফোর কামেচ্ছা স্তিমিত হয়ে এল, পরিবর্তে অনুতাপ না হলেও ওকে সাহায্য করার ইচ্ছা জাগল ওর মনে। অপরাধীদের মন বোঝা দায়।

ক্লান্ত রডলফো আর কোন কথা না বোলে লিওকাডিয়াকে তার বিছানায় সেই অবস্থায় রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় অবশ্য ঘরের দরজায় চাবি দিতে ভুলল না। সে গেল তার বন্ধুদের সঙ্গে এখন কি করা উচিত

সে সম্পর্কে পরামর্শ কোরতে। লিওকাডিয়া যখন দেখল, সে একা, আর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ, সে উঠল বিছানা থেকে, তারপর দরজাটা পরীক্ষা কোরে ঘরের একটা জানালা খুলে দিল। জ্যোস্না রাতের চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরে। চারিদিক তাকিয়ে দেখল লিওকাডিয়া। ঘরটা মূল্যবান আর কারুকার্য্য করা আসবাবপত্রে ভর্ত্তি। ঘরের চেয়ার টেবিলগুলো গুনলো সে। জানালাটা বেশ বড়ো, কিন্তু লোহার জাল দেওয়া। জানলার নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান, তারপর উঁচু পাঁচিল। বাইরে যাওয়া একরকম অসম্ভব। ঘরের জিনিস-পত্র দেখে সে বুঝল কোন ধনী ব্যক্তির ঘর এটা। জানালার পাশে একটা টেবিলের ওপর রাখা একটা ক্রুশ দেখতে পেলো সে। সেটাকে সে তুলে নিয়ে জামার হাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। তারপর জানালাটা আবার বন্ধ কোরে দিয়ে বিছানায় গিয়ে অপেক্ষা কোরতে লাগলো, তার ভাগ্যে আর কি আছে তার অপেক্ষায়।

আধঘন্টাও কাটেনি তখনও। দরজাটা খোলার শব্দ পেলো সে। একজন কেউ এগিয়ে এল ওর দিকে, মুখে কোন কথা নেই তার। সে ওর চোখ দুটো একটা রুমাল দিয়ে শক্ত কোরে বাঁধল, তারপর ওর হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল ওকে। দরজাটায় আবার তালা পোড়ল। লোকটি আর কেউ নয়, রডলফো নিজে। বন্ধুদের কাছে সব কথা খুলে বোলতে লজ্জা হয়েছে তার। তাই সে ঠিক কোরেছে ওদের বোলবে সে মেয়েটার কান্নায় বিচলিত হয়ে সে কিছু না কোরেই তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সে তাই ওকে গীর্জার কাছে রাত থাকতে থাকতে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্যে বেরিয়ে পোড়লো। অবশ্য তার ইচ্ছে হচ্ছিল আর একটা দিন ওকে ঘরে রাখার। কিন্তু সে ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে সে ওকে আউণ্টামিয়েণ্টার মাঠে নিয়ে গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পর্ত্তুগীজ ও স্প্যানিশ ভাষা মিশিয়ে বিকৃত স্বরে সে বোলল যে এবার সে নির্ভয়ে বাড়ী ফিরতে পারে ; কেউ তাকে অনুগমন কোরবে না। চোখে বাঁধা রুমালটা খোলার আগেই সে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লিওকাডিয়া চোখের বাঁধন খুলে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো।' জায়গাটা চিনতে পারলো সে, কিন্তু আশে পাশে কাউকেই দেখা গেল না। তার মনে সন্দেহ জাগলো হয়তো দূরে থেকে কেউ তাকে অনুসরণ কোরতে পারে। সেই-জন্যে বাড়ীর দিকে চলার সময় প্রতিটি পদক্ষেপে সে থামছিল আর দেখছিল পেছনে তাকিয়ে। অন্যের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সে সামনে একটা বাড়ীর দরজা খোলা পেয়ে সেখানে ঢুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরল, তারপর সে যখন দেখলো কোথাও কেউ নেই তখন নিজে বাড়ীর দিকে রওনা হোল সে। ওর মা বাবা ওকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁরা পোষাক বদলান নি, বোসে বোসে বিলাপ কোরছিলেন অপহৃত মেয়ের জন্যে। ওকে দেখে দুহাত বাড়িয়ে জলভরা চোখে দৌড়ে এলেন তাঁরা।

লিওকাডিয়া তখনও ভয়ে কাঁপছিল থরথর কোরে। মা বাবাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার ভয়ংকর, বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা বোলল। লোকটিকে যে সে চিনতে পারেনি সে কথাও বোলল সে। দুর্ঘটনার স্থানটার বিশদ বর্ণনা দিয়ে সে, জানালা, বাগান, শয্যা, দেওয়ালের ছবি আর সবশেষে ক্রসটার কথা বোলে সে সেটা দেখালো ওঁদের। ওঁরাও প্রতিজ্ঞা কোরলেন এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন যেন তাঁর শাস্তি নেমে আসে শয়তানটার ওপর। লিওকাডিয়া আরও বোলল যে যদিও লোকটাকে সে চেনে না তবুও ঐ ক্রসটার সাহায্যে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না, কারণ শহরের যাজককে দিয়ে যদি ঘোষণা করিয়ে দেওয়া যয় যে পবিত্র ক্রশ যিনি হারিয়েছেন তিনি এখন সেটা যাজকের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে ক্রশের মালিক কে তা জানা যাবে।

ওর কথা শুনে বাবা বোললেন, "তোমার প্রস্তাবটা ভালোই মা, কিন্তু শয়তান কখনও নির্বোধ হয়না, সে হয়তো অন্য কোন লোককে পাঠাবে জিনিসটা পাবার জন্যে, আর তাতে আমরা প্রকৃত অপরাধীকে চিনতে পারব না। এখন গিয়ে তোমার উচিত পবিত্র জিনিসটা তোমার নিজের কাছে রেখে দেওয়া, আর নিত্য প্রার্থনা করা যাতে অপরাধী শাস্তি ভোগ করে। তুমি ঈশ্বরের চোখে

নির্দোষ নিষ্পাপ, আমিও তোমাকে বরাবর সেই ভাবেই দেখাবো। কখন কথায়, ইচ্ছায় বা কাজে তুমি তো সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হন এমন কোন কাজ করোনি।

বাবা এই ভাবে সান্ত্বনা দিলেন ওকে, মা ওর গলা জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তাতে ওর হৃদয়ের জ্বলা আরও বেড়ে গেল। এখন একমাত্র মুখ লুকিয়ে বাবা মার কাছে থাকা ছাড়া আর কোন কিছুই করার নেই।

ইতিমধ্যে রডলফো বাড়ী ফিরে দেখেন পবিত্র ক্রশটা যথাস্থানে নেই। তার বুঝতে একটুও অসুবিধা হোল না কে নিয়েছে সেটা। যেহেতু যথেষ্ট অর্থ আছে তার, তাই সেটা হারিয়ে একটুও দুঃখ হোল না তার। ওটার সম্পর্কে কোণ উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজনই বোধ কোরল না সে। এমনকি যখন সে তার ঘরের জিনিসপত্র মায়ের সহচরীর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে ইটালীতে চলে গেল তখন তার বাবা মাও সেটা নেই দেখে কোন প্রশ্ন কোরলেন না।

রডলফার ইটালী যাবার ইচ্ছা বহুদিনের। ওর বাবাও অনেক দিন ছিলেন সেখানে, তিনি বোলতেন, যে বাইরের দেশ কখনও দেখেনি সে ভদ্রলোক হতেই পারে না। বার্সিলোনা, জেনোয়া, রোম এবং নেপলসে থাকার জন্য তিনি অনেক টাকাই দিলেন ছেলেকে। ছেলে তার দু'জন বন্ধুকে নিয়ে যাত্রা কোরল টালীর উদ্দেশে। যাবার সময় লিওকাডিয়ার কথা তার মনেই ছিল না।

লিওকাডিয়া সকলের অলক্ষ্যে পিতৃগৃহেই বাস কোরছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সে বুঝতে পারল তার গর্ভে সন্তান এসেছে। প্রায়ই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো সে। মায়ের সান্ত্বনা বাক্যেও তেমন কোন কাজ হোত না।

যথাসময় সন্তান প্রসবের কাল এসে গেল গোপনেই ভূমিষ্ঠ হোল তার সন্তান। কোন ধাত্রীকেও ডাকা হোল না, পাছে কথাটা প্রচার হয়ে পড়ে। খুব গোপনীয়তার সঙ্গে ছেলেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল একটা গ্রামে। চার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই রইল সে, তারপর তার মাতামহ তাকে ভ্রাতুষ্পুত্র

বলে পরিবারে নিয়ে এলেন বাড়িতে। ভালোভাবেই মানুষ হতে লাগল।

ছেলেটির নামকরণ হোল লুইসা, দেখতে খুব সুন্দর, শান্ত স্বভাবের বুদ্ধিমান। ছেলেটিকে দেখলেই মনে হোত কোন উচ্চবংশোদ্ভূত পিতার ঔরসে তার জন্ম। ছেলেটির স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ। তার মাতামহ মাতামহী ভাবলেন, দুর্ভাগ্যের ছলে ঈশ্বরের আর্শীবাদই পেয়েছেন তাঁরা। সকলেরই প্রীতি ভালোবাসা অর্জন কোরে বড় হতে লাগল ছেলেটি।

কালক্রমে তার বয়স হোল সাত। সে ল্যাটিন একং স্প্যানিশ দুটো ভাষাই শিখেছিল সেই বয়সে। হাতের লেখাও ছিল সুন্দর। মাতামহের ইচ্ছা ছেলেটিকে যথার্থ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক কোরে গড়ে তোলা, কারণ ধনী হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তার। তাছাড়াও জ্ঞান ধর্ম্মবুদ্ধি কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারে না।

একদিন ওর মাতামহী ওকে পাঠালেন তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়ে। যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটি, সেখানে তখন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা চোলেছিল। ঘোড়দৌড় দেখার জন্যে ছেলেটি থামল সেখানেই আর একটু ভালো কোরে দেখার জন্যে রাস্তাটা পার হতে গিয়ে ধাবমান একটা ঘোড়ার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সে। ঘোড় সওয়ার চেষ্টা কোরেছিল রাসটেনে ধরতে, কিন্তু সাহস হয়নি। মাথায় আঘাত পেয়ে রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়ে রইল সে। একজন বৃদ্ধ সওয়ার ঘটনাটা ঘটতে দেখে বিদ্যুৎ গতিতে সেখানে এসে লাফিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে এবং ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। কালক্ষেপ না কোরে তিনি তাঁর অনুচরদের একজন চিকিৎসককে ডাকতে বোলে ওকে কোলে কোরে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। অনেকেই অনুসরণ কোরে চোলল তাঁকে, কারণ ইতি মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল যে আহত বালকটি লুইসিকো ছাড়া আর কেউ নয়। ছেলেটির মাতামহ ও মাতামহী লিওকাডিয়ার কানেই পেঁছিল কথাটা।

যেহেতু সে ভদ্রলোক আহত ছেলেটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন তিনি একজন বিশিষ্ট ধনী ও স্বনামধন্য ব্যাক্তি সেই জন্য লিওকাডিয়া ও তার মা বাবার পক্ষে সে বাড়ী খুঁজে পেতে অসুবিধা হোল না। ওদের

সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকও প্রবেশ কোরলেন সেই বাড়ীতে।

যে ঘরে শিশুটিকে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে প্রবেশ কোরল ওরা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং ত'র স্ত্রী ডোনা এসতেফেনিয়া রত ছিলেন ওর পরিচর্য্যায়।

লিওকাডিয়া ঘরটায় প্রবেশ করেই চমকে উঠল। অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হলেও ঘরের সাজসরঞ্জাম প্রায় একরকমই আছে। এই ঘরেই সর্ব্বনাশ হয়েছিল তার, আর এখানেই যে বীজ রোপিত হয়েছিল তার গর্ভে, তারই ফল লুইসিকো। মাকে একান্তে ডেকে সব কথা খুলে বোলল লিওকাডিয়া। মা বোললেন বাবাকে। বাবা ভাবতে লাগলেন এ অবস্থায় কি করা যায়।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু শিশুটিকে পরীক্ষা করে ক্ষতস্থান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে এবং অন্যান্য পরিচর্য্যার কাজ সমাপন কোরে হাসিমুখে বোললেন, না ভয় নেই, অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে ও আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়।

ডোনা এসতেফেনিয়া দেখেছেন, লিওকাডিয়াকে খুব ভালো লেগেছে তার মেয়েটিকে। কথায় কথায় তিনি জানালেন সুন্দর শিশুটিকে দেখতে ঠিক তাঁর একমাত্র ছেলে রডলেফোর মতো। সে এখন ইটালীতে আছে। ও'র কথা শুনে লিওকাডিয়া সাহস পেল। সে ধীরে ধীরে বোলল যে ভগবানের আশ্চর্য্য লীলায় যেমন তার ছেলে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে তেমনি সে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে যেখানে সে আরোগ্য লাভ করবে। আর লিওকাডিয়া খুঁজে পেয়েছে সেই জায়গাটি যার কথা তার যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে সে ভুলতে পারবে না।

ডোনা এসতেফেনিয়া একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন কোরে সব কথা জেনে নিলেন তিনি লিওকাডিয়ার কাছ থেকে। মেয়েটিকে তাঁর খুব ভালোলেগেছিল। তিনি বিশ্বাস কোরলেন সব কথা। আরও বিশ্বাস কোরলেন লিওকাডিয়া এখন পর্য্যন্ত তার নিজস্ব সম্মান রেখেছে। মনে মনে ঠিক কোরলেন তিনি স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ কোরবেন।

লিওকাডিয়ার বাবা মা'র সঙ্গেও কথা হোল তাঁর। ওদের আশ্বস্ত কোরলেন এই বোলে যে তাঁরা উপযুক্ত প্রতিশোধই নিতে পারবেন। দোষীকে তিনি শাস্তি দেবেন নিজেই। লিওকাডিয়ার কাছে তাঁদের বংশের পবিত্র ক্রুশটা দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, অতএব এবার যা কিছু করার তিনিই কোরবেন।

ডোনা এসতেফেনিয়া স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ কোরতে গেলেন। যে শিশুটিকে তুমি আজ আহত অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে এসেছে সে তোমারই পৌত্র। আর ওর মা তোমার পুত্রবধূ। যদিও এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ওদের বিবাহ সম্পন্ন হয়নি তবুও শিশুটি আমাদের ছেলে রডলফোরই সন্তান। সমস্ত প্রমাণ আমি পেয়েছি, এখন ওদের মিলন ঘটিয়ে আমাদের কর্ত্তব্য পালন কোরতে হবে।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, গিন্নী। তোমার এ অনুরোধের কারণ ?"

এই সময় লিওকাডিয়া হাতে পবিত্র ক্রুশটি নিয়ে ঘরে প্রবেশ কোরল। ডোনা এসতেফেনিয়া তখন স্বামীকে সাত বছর আগের সেই দুর্ঘটনাটার কথা শুনিয়ে বোললে। "ঈশ্বরের চোখে এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে কি আমরা আমাদের পরি-বারে নিয়ে আসব না ?"

লিওকাডিয়াকে দেখে মুগ্ধ হলেন ভদ্রলোক। ওকে আলিঙ্গন কোরে অনেক সান্ত্বনার কথা বোললেন। তিনি নাতিকে আদর কোরলেন অজস্র চুম্বন বর্ষণ কোরে। আর সেই দিনই নেপলস্ এ জরুরী চিঠি পাঠালেন ছেলের কাছে তিনি একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক কোরেছেন। সে যেন পত্র পাঠ ফিরে আসে।

রডলফো চিঠি পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। দুদিন পরেই সে যাত্রা কোরল দেশের উদ্দেশ্যে। তার বন্ধু দুজনও অনুসরণ কোরল তাকে। বারোদিন পরে ওরা পেঁাছল বার্সিলোনায়। তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে আরও

সাতদিন পরে টলেডোয় উপস্থিত হোল। ওকে দেখতে এখন আরও সুন্দর হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে অনেক।

লিওকাডিয়া ডোনা এসতেফেনিয়ার পরামর্শ মতো লুকিয়ে রেখেছিলো নিজেকে। আড়াল থেকে রডলফোকে দেখে ও আনন্দ উত্তেজনা আর আবেগে ফেটে পড়ল।

ডোনা এসতেফেনিয়া তাঁর ছেলের বন্ধুদের আগলে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাত বছর আগের সেই ঘটনার কথা শুনতে চাইলেন। তারাও স্বীকার কোরল ওদের বন্ধুকে সাহায্য করা অপরাধ। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, তবুও রডলফোকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি খাবার টেবিলে একটা সাধারণ মেয়ের ছবি দেখিয়ে বোললেন যে সেই মেয়েটিকেই তিনি নির্বাচিত কোরছেন পুত্রবধূ করার জন্যে।

রডলফো খুঁটিয়ে দেখলো ছবিটা।

মুখটা বিরস হয়ে উঠল ওর। সে বোলল "চিত্রকররা সাধারণতঃ কুৎসিৎ মুখকেই সুন্দর করে আঁকেন, আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বোলতে হবে মেয়েটা যার পর নাই কুৎসিৎ। যদিও মা বাবার অবাধ্য আমি হতে চাই না, তবুও একথাও বোলতে আমি বাধ্য যে বিবাহের বন্ধন একটা স্বর্গীয় বন্ধন। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এ বিবাহে মত দেওয়া অসম্ভব।"

ডোনা এসতেফেনিয়া তখন ডেকে পাঠালেন লিওকাডিয়াকে। খাবার টেবিলের সামনে এসে দাড়ালো সে।

মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল রডলফো।

"দেখতো, এবার পছন্দ হয় কি না?"

"আমি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক বোলে মনে কোরব মা, যদি তুমি আমার জন্যেই এঁকে নির্বাচিত কোরে থাকো। ইনি কি মানবী না স্বর্গের দেবী তাইতো বুঝতে পারছি না আমি।"

লিওকাডিয়ার অঙ্গে ছিল কালো ভেলভেটের গাউন, বোতামগুলো সোনা

দিয়ে বাঁধানো মুক্তোর। কোমর বন্ধ আর গলার হারটা ছিল হীরে বসানো, আর লম্বা লাল কোঁকড়ানো চুলগুলো ছিল কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওর উপস্থিতি ঘরটাকে আলো কোরে তুলেছিল।

লিওকাডিয়া দাঁড়িয়েছিল চুপ কোরে। রডলফো যার ওপর বলাৎকার কোরেছিলো। শিশুটির জন্মাবার পর থেকেই তার মনে ওর ওপর ধীরে ধীরেএকটা মমত্ববোধ, ভালোবাসা জন্মাতে সুরু কোরেছিল। ওকে সশরীরে সামনে দেখে তার মনে পোড়ল সেই দুর্ঘটনার কথা। চোখের সামনে আলোগুলো যেন নাচতে লাগল তার, তারপর এক সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে। ডোনা এসতেফোনিয়া পাশেই ছিলেন। তিনি ওকে ধরে ফেলে শুইয়ে দিলেন। রডলফোও উঠে এল। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে পোষাকের বাঁধন আলগা কোরলেও জ্ঞান ফিরল না তার। ঝি চাকররা কাঁদতে সুরু কোরল, ওরা ভেবেছিল লিওকাডিয়া মারা গিয়েছেন।

লিওকাডিয়ার মা, বাবা পাশের ঘরেই লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরাও ছুটে এলেন। ছুটে এলেন পুরোহিত, যদি মৃত্যু সময়ে কিছু স্বীকারোক্তি করার থাকে মেয়েটির। রডলফো লিওকাডিয়াব বুকে মুখ রেখে কাঁদতে সুরু কোরল। জোনা এসতেফোনিয়া ওকে উঠিয়ে দিলেন। বোললেন, "কাঁদতে হবে না বরং লজ্জিত হও। কারণ এতক্ষণ আমি যা গোপন কোরে রেখেছিলাম সেই কথা বলার সময় এসেছে। শোন, আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে যে মেয়ে সেই তোমার সত্যিকারের স্ত্রী।

রডলফো আরও নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা কোরল লিওকাডিয়াকে।

লিওকাডিয়ার জ্ঞান ফিরে আসছে। রডলফোর বাহুবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ দেখে লজ্জা পেলো সে। চেষ্টা কোরল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

"না, এখন নয়। আমার হৃদয়েই তোমার স্থান। একটু চুপ কোরে বিশ্রাম নাও এখন।"

সেই রাত্রেই পুরোহিত বিবাহ দিয়ে দিলেন ওদের। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবাই। সমারোহের বহর দেখে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, রডলফোর বন্ধুরাও আনন্দিত হোল।

ডোনা এসতেফেনিয়া সেদিন সর্বসমক্ষেই জানিয়েছিলেন কিভাবে রডলফো সাত বছর আগে এই মেয়েটির কৌমার্য হরণ করেছিল, আর লিওকাডিয়ার কাছে পাওয়া ক্রুশটাও তিনি দেখালেন সকলকে।

রডলফোর বুকে মুখ রেখে লিওকাডিয়া বোলল, "সেদিন যখন তোমার বাহুবন্ধনের মধ্যে আমার জ্ঞান ফিরেছিল সেদিন কেঁদেছিলাম, কারণ আমার সম্মান বিনষ্ট হয়েছিল সেদিন, আর আজ আমি কাঁদছি এই ভেবে যে সেই বাহুবন্ধনের মধ্যেই জ্ঞান ফিরতে আমি দেখলাম আমার সম্মান আমি ফিরিয়ে নিতে পেরেছি।"

রডলফো আরও নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরল ওকে।

আয়নায় নিজের ছেলের প্রতিবিম্ব দেখে রডলফোর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সকলেরই চোখে তখন আনন্দাশ্রু!

পরিচিতি

মিগুয়েল ডে সারভেণ্টি (১৫৪৭-১৬১৬) স্প্যানিশ সাহিত্য জগতের রাজা। জন্মস্থান স্পেনের আলকালা ডে হেনারেস সহরে। বিশ্ব সাহিত্যে তিনি স্থান কোরে নিয়েছেন ডনকুইসোট লিখে। উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখছেন অনেক ছোট গল্প। তাঁর সব সৃষ্টিই অনবদ্য। বর্ত্তমান গল্পটি তাঁর ছোট গল্পের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ফর হুম দি বেল টোল্‌স্‌

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

শয্যা-থলির কবোষ্ণ আবেষ্টনে নিশ্চিন্ত মনে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল রবার্ট জর্ডান। পিস্তলটা মণিবন্ধে বেঁধে রেখেছিল সে। সহসা মারিয়ার কোমল করস্পর্শে শিরশির করে উঠল তার সারা শরীর। মারিয়া শীতে

কাঁপছিল। জর্ডান তাকে বুকে টেনে নিল। প্রথমটা সে থলির ভেতর ঢুকতে চায়নি। বারবার বলেছিল, 'লক্ষ্মীটি, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভয় করছে।' লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সে। অবশেষে থলিতে ঢুকেছিল সে। জর্ডান তার ঘাড়ের নরম জায়গাটায় চুমু খেল। মারিয়া আবার বললে, 'না'

না। আমি কিছুতেই পারব না—আমায় ছেড়ে দাও।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। জর্ডান বলে, 'দুষ্টুমি কারো না মারিয়া।'

—'আমায় ছাড়।'

—'সোনামণি, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

—'আমিও কি তোমায় ভালোবাসিনা,' মৃদু কণ্ঠে মারিয়া বলে।

জর্ডান তার সর্বাঙ্গে আদর করতে লাগল। মারিয়া বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। মুখ তুলতেই তার ভিজে ঠোঁটে জর্ডানের ঠোঁটের মিষ্টি ছোঁওয়া লাগল। মারিয়ার চোখ জলে ভরে উঠল। জর্ডানের বলিষ্ঠ বাহুর মাঝে এখন সে বন্দী। মারিয়ার যৌবনের ফসল, অনতিউচ্চ তপ্ত স্তনে আদর করে সে; অনুভব করল তার যৌবনবতী শরীরের প্রতিটি উষ্ণ খাঁজ, সৌরভ আর রোমাঞ্চ। মারিয়ার জলে ভেজা চোখে চুমু খেল সে—স্বাদ পেল লবণাক্ত অশ্রুর।

মারিয়া বললে, 'তোমায় চুমু দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি জানিনা কিভাবে চুমু দিতে হয়।'

'—থাক, তোমায় আর চুমু দিতে হবে না।'

—'তোমায় আমি চুমু দেবই। কোন কিছুই বাদ দিতে চাই না। আজ সমস্ত কিছুই করব।'

—'এত জামা কাপড় থাকলে ভালো লাগে না।'

—'অসভ্য।'

জর্ডান মারিয়াকে নগ্ন করে। তার নিরাবরণ শরীর নিয়ে খেলা করে। প্রশ্ন করে, 'কেমন লাগছে?'

—'খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আমায় তুমি ফেলে যাবে না তো? তোমার সঙ্গে যাব আমি। সব সময়ে তোমাকে পেতে চাই। কোন আশ্রমে যাব না আমি।'

—'কিন্তু আশ্রমেই যেতে হবে তোমাকে।'

—'না জর্ডান, না। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। আমি তোমার হব।'

শুয়ে আছে তারা, অনুভব করছে মিলনের শিহরণ। কী নিবিড় আনন্দ, গভীর পরিতৃপ্তি? একে অপরের মাঝে হারিয়ে গেছে তারা। কিন্তু এক হয়ে যাওয়ার আনন্দের মাঝে কেমন যেন একটা বিষাদের সুর ধ্বণিত হচ্ছে। জর্ডান জিজ্ঞেস করে, 'মারিয়া, আর কারুকে ভালোবেসেছ তুমি?'

—'না।' তবে......'

—'তবে......কি ?'

—'অনেকের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল আমাকে।' চুপ করে থাকে জর্ডান। তার আবেগে একটু ভাটা পড়েছে মারিয়া তা বুঝতে পারে। অদম্য অভিমানে মারিয়ার গলা ধরে আসে। সে বলে, 'জানি, আমায় আর তোমার ভালোবাসা সম্ভব নয়। বেশ, আশ্রমেই যাব আমি। শুধু তোমার হয়ে থাকব সে ভাগ্য আমার নয়।'

—'ছিঃ মারিয়া! ওসব কথা বলোনা। বিশ্বাস করো তোমায় আমি ভালোবাসি।'

—'না গো, আমি জানি, আর আমায় ভালোবাসতে পারবে না তুমি, কিন্তু চুমু দেওয়ার ব্যাপারে সত্যিই আমি অনভিজ্ঞা। পশুগুলি যখন একে একে আমায় ধর্ষন করছিল প্রতিবারেই মরণপণ সংগ্রাম করেছিলাম আমি। বাধা দিয়েছিলাম, কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করেছি তাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলাম আমি।'

—'থাক না ওসব কথা। আমি তোমায় ভালোবাসি। আমায় একটা চুমু দেবে মারিয়া ?'

জর্ডানের গালে চুমু দিল মারিয়া। একটু হেসে বলে, 'ঠিক হলো তো ? বল না গো নাকটা কোথায় ঠেকবে ?'

জর্ডান মারিয়ার সারা গায়ে চুমু খেল। মিলনের এ আনন্দ কোনদিন পায়নি জর্ডান। সে মারিয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি জানতে, আমার কাছেই তুমি আজ শোবে ?'

—'হ্যাঁ। তাই তো জুতো খুলে এসেছিলাম।'

—'ভয় করেনি, তোমার ?'

—'প্রথমটা ভয় করেছিল খুব।'

—'মারিয়া, বলতে পার ক'টা বাজে এখন ?

—'কেন তোমার হাতে ঘড়ি নেই ?'

—'ঘড়িটাকে চেপে শুয়ে আছ তুমি। দেখব কি করে ?'

—'কেন, আমার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখা যায় না বুঝি ?'

জর্ডান ঘড়ি দেখে। রাত একটা। মারিয়া বলে, 'কাঁধে তোমার দাড়ির খোঁচা লাগছে।'

—'কি করব বল। দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেই।'

—'তোমার দাড়ি বাদামী, না ?'

—'হ্যাঁ।'

—'জান জর্ডান, তোমার আমার মিলনের মধ্যে দিয়েই আমি সেদিনের পাশবিক অত্যাচারের ভয়াবহ স্মৃতিটুকু মুছে ফেলতে চাই। ধর্ষণের পর আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে সেদিন যদি আত্মহত্যা করতাম তাহলে আজকের এ চরম পাওয়ার পরিতৃপ্তিটুকু থেকে বঞ্চিত হতে হতো। পিলার বলেছিল, যদি কোনদিন সত্যিকারের ভালোবাসা পাও তাহলে এ অপমান আর দুঃখের বোঝা আর বইতে হবে না। আজ বুঝছি, ঠিকই বলেছিল সে।'

—'মারিয়া, কোনদিন ভাবিনি কেউ আমার হবে। কিন্তু আজ তোমাকে পেয়েছি, নিজেকেও সঁপে দিয়েছি তোমার কাছে।'

এবার আর ভুল হলো না, মারিয়া ঠিক ঠিক চুমু খেল জর্ডানের ঠোঁটে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করল জর্ডানকে। তার মনে হলো মারিয়ার মন থেকে মুছে দিতে হবে ধর্ষণের ক্লেদাক্ত সেই স্মৃতিটুকু।

রাতের নির্জনতায়, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় মিলনোত্তর প্রশান্তিতে তারা ঘুমাচ্ছিল। তারার মালা পরে ঝিকমিক করছিল সারা আকাশ। মুহূর্তের জন্য জর্ডানের ঘুম ভাঙল। মারিয়াকে চুমু খেল সে। তার মতো মারিয়াও আজ তৃপ্ত—ঘুম ভাঙল না তার।

সকালে ঘুম ভাঙল জর্ডানের। মারিয়া নিঃশব্দে কখন চলে গেছে। সে যেখানে শুয়েছিল, সে জায়গাটা তখনও গরম ছিল।

লতাপাতা গুল্মে ঢাকা পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটছিল তারা। মাথার ওপর ঝকঝক করছিল পরিচ্ছন্ন সূর্য। তুষার ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছিল তাদের পিঠে। মারিয়ার হাত ধরে হাঁটছিল জর্ডান। পারস্পারিক স্পর্শটুকু মধুর লাগছিল উভয়ের। সূর্যরশ্মি ঝরে পড়ছে মারিয়ার রেশমি চুলে, ঝলমলে মুখে। জর্ডানের আলিঙ্গনে ধরা দিল মারিয়া। মারিয়ার জামার আবরণ ভেদ করে তার সুন্দর স্তন দু'টি জর্ডানের বুকে এসে লাগছিল। জর্ডান মারিয়ার জামার বোতাম খুলে তার বুকের সৈকতে, স্তনে চুমু খেল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল মারিয়া। অরণ্যের বুনো গন্ধ ভাসছিল। মারিয়ার তৃপ্তি-নিমীলিত চোখে রোদ পড়েছে। একবার চোখ মেলে তাকাল সে জর্ডানের দিকে—সুন্দর হাসিতে

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পাহাড়ীর নদীর পাশ কাটিয়ে আবার তারা হাঁটতে লাগল। জর্ডান বললে, 'সত্যিই সুশ্রী সুন্দরী তুমি।'

মারিয়া বলে, 'সুন্দরী না ছাই। আচ্ছা জর্ডান, মিলনের এমন অনুভূতি এর আগে আর কোন দিন তোমার হয়েছে? মনে হচ্ছিল আনন্দে যেন শূন্যে ভাসছিলাম আমি।'

—'কয়েকটি মেয়েকে ভালো লেগেছিল, সে তো নিছক ভালো লাগা। কিন্তু আর কোনদিন এমন তৃপ্তি পাইনি।'

—'সত্যি বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখবে এরপর আরও সুন্দর হব আমি। আরও অনেক আনন্দ দেব তোমাকে।'

—'আমায় যা দিয়েছ, তুলনা হয় না তার।'

মারিয়া বলে, 'লক্ষ্মীটি, আমার পা দু'টি ধরো না—ভীষণ ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

—'পা দুটো এগিয়ে দাও, আমি গরম করে দিই।'

—'দুষ্টুমি কারো না, এখুনি আমার পা গরম হয়ে যাবে। আচ্ছা জর্ডান তুমি সত্যি সত্যি আমায় ভালোবাস তো?'

—'কতবার বলব বলতো? বিশ্বাস কর, তোমায় আমি ভালোবাসি।'

—আমিও ভালবাসি তোমায়—খুব ভালবাসি। আমি তোমার মেয়েমানুষ তোমার বৌ।'

জর্ডান বললে, 'যদি তোমার শীত না লাগে, জামাটা একটু খুলবে।'

—'শীত করবে কেন! তোমার আদুরে ছোঁয়ায় গায়ে আমার পুলক লাগে আগুন জ্বলে।'

—'তোমাকে দেখলে আমার শরীরেও কামনার আগুন লাগে।

—'কিন্তু একটু পরেই তো তোমার শীত করবে।'

—'না গো না। আমি তো তোমার মাঝে হারিয়ে যাব।'

—'মারিয়া।'

—'কি বল।'

—'মারিয়া।'

—'দুষ্টুমি করো না। এ সময় কথা বলতে ভালো লাগে না। চুপ।'

—'শীত করছে?'

—'না। লক্ষ্মীটি চুপ কর। আমায় অনুভব করতে দাও। উঃ কি অসহ্য আরাম।'

—'মারিয়া। মারিয়া। মারিয়া।'

মিলনের মধুর উষ্ণতা অনুভব করার পর নগ্ন দেহে শুয়ে আছে তারা। মারিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাগল তোমার?'

জর্ডান বললে, 'তোমার কেমন লাগল?'

ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে জর্ডান আর মারিয়া। মিলনের মধুর উষ্ণতা অনুভব করার পর মুহূর্তের ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

নিশীথের নির্জনতায় আবার মিলিত হল জর্ডান আর মারিয়া। মারিয়ার যুগল উরুর তপ্ত স্পর্শসুখ অনুভব করছে জর্ডান। তার সুন্দর স্তন দুটি পর্বত শৃঙ্গের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার কণ্ঠদেশ যেন মনোরম এক উপত্যকা।

মারিয়া জর্ডানকে চুমু দিল। বললে, 'ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, আজ তোমায় মিলনের চরম সুখটুকু দিতে পারব না। ধর্ষিত হবার পর থেকে মাঝে মাঝেই আমার ঐ জায়গাটায় ব্যাথা হয়—আজ যেমন হয়েছে।

জর্ডান বলে, 'দুশ্চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন। আর তুমি ব্যথা পাও কিছু থেছে অবশ্যই আমি বিরত থাকব।'

—'কিন্তু আমার যে ইচ্ছে করছে। এদিকে ভীষণ ব্যথা।

—'আমি তো তোমায় জড়িয়ে শুয়ে রয়েছি মারিয়া। এটা কি মিলন নয়।'

—'সান্নিধ্যের এ মাধুর্যটুকুকে তো আমি অস্বীকার করছিনে, কিন্তু গর্দো থেকে ফেরার পথে সেই পাহাড়ে সঙ্গমে যে সুখ পেয়েছিলাম—সেই সুখ, সেই

আনন্দ পেতে চাই।'

—'আজ থাক। পাশাপাশি শুয়ে আজ শুধু ঘুমাব। সম্ভোগের অনেক রঙীন মুহূর্ত আমাদের প্রতীক্ষায়।'

FOR WHOM THE BELL TOLLS : Ernest Hemingway.

॥ পরিচিতি ॥

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, মূলত উপন্যাস ও ছোট গল্পের রচয়িতা আর্নেস্ট, হেমিংওয়ের জন্ম ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি শিকারের নেশা। মুষ্টি যোদ্ধা হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। পড়াশুনায় তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিলনা। কোন রকমে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। 'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার। এই সময় ইতালী থেকে আহত হয়ে স্বদেশে ফিরলেন তিনি। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন সাংবাদিক। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর উপন্যাস গুলি ভাস্বর। তাই সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি তিনি চুরি করেন নি, করেননি নকল সে শৌখিন মজদুরি। তাঁর 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' (১৯২৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পট ভূমিকায় রচিত এবং এই উপন্যাসটি লিখে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধকে উপজীব্য করে তিনি 'ফর হুম দি বেল্ টোলস্' (১৯৪০) রচনা করেন। অতিরঞ্জনের আশংকা না করেই বলা চলে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। তাঁর গীতিধর্মী উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান্ এণ্ড দি সী (১৯৫২) বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অতুলনীয় সংযোজন। 'মেন উইদাউট উইমেন' তাঁর একটি অসামান্য গল্পগ্রন্থ। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে চিরায়ত এই সাহিত্যিক আত্মঘাতী হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেন।

'ফর হুম দি বেল্ টোলস্' উপন্যাসে স্বাধীনতাকামী আদর্শবাদী এক শিক্ষক, নাম রবার্ট জর্ডান আমেরিকা থেকে স্পেনে ছুটে এসেছিল ইস্পাতে তৈরি পুলটাকে উড়িয়ে দিয়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরোধিতা করার জন্যে, লয়ালিস্ট গেরিলাদের সহায়তা করতে। গেরিলা বাহিনীর প্রধান হলো কমরেড পাবলো। কমরেড মদ খায় পর্যাপ্ত পরিমাণে, সে মাতাল, লোভী, বিশ্বাসঘাতক। জর্ডানের ব্যাটারি, ডেটনেটার চুরি করেছে সে, ঘোড়ার লোভে সহকর্মী গেরিলাদের অকাতরে

সে খুন করেছে। তার স্ত্রী প্রৌঢ়া পিলার একটি বলিষ্ঠ চরিত্র। এছাড়া গেরিলা দলে রয়েছে বৃদ্ধ দেশ প্রেমিক আনসেলমো আর রূপসী স্পেনীয় তরুণী মারিয়া।

যুদ্ধ, পুল উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাযুক্ত বিরুদ্ধ এই পরিবেশের মাঝেও প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে—অনুরাগের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল জর্ডান আর মারিয়ার চিত্ত। ভিন দেশী যুবক জর্ডানকে ভালোবাসল মারিয়া—উজাড় করে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে। জর্ডানও ভালোবেসেছিল মারিয়াকে। পুল ধ্বংস হলো কিন্তু নিজের ঘোড়ার নীচে চাপা পড়ল জর্ডান। কেঁদে ভাসাল মারিয়া, তার কাছে থাকতে চাইল। জর্ডানের নির্দেশে পিলার তাকে ঘোড়ায় তুলল, নিয়ে গেল সঙ্গে করে। জর্ডান বলে, 'প্রেম অবিনশ্বর। তোমার মাঝে বেঁচে থাকব আমি।' আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসল সে। এগিয়ে আসছে ফ্যাসিস্ট সেনাপতি। এবার জর্ডানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

অনুবাদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে জর্ডান-মারিয়ার মিলন-মদির শৃঙ্গার রসাত্মক অধ্যায়টি। এক হিসাবে অনুবাদ করা যায় না কেননা অনূদিত রচনা প্রায়ই ভাবানুষঙ্গহীন হয়ে পড়ে—মূলের রসাবেদন সঞ্চারিত হয় না। আধুনিক রুশ কবি রবের্ত রজদেস্তভেনস্কির মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'অনুবাদ হচ্ছে কার্পেটের উল্টোদিক, যেমন কিনা সুন্দরী রমণী। সুন্দরী কিন্তু সব সময়ে বিশ্বস্ত নাও হতে পারে।' তবে যথা সম্ভব মূলানুগ অনুবাদের চেষ্টা করেছি, রসসৃষ্টির জন্য একটু আধটু পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছে। সব সময়েই মনে রেখেছি 'ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম' যাতে না হয় '

হিতোপদেশ | নারায়ণ

॥ এক ॥

গৌড় দেশের অন্তর্গত কোশাম্বী নগরীতে চন্দন দাস নামে বিগত যৌবন, অর্থবান এক বণিক বাস করতেন। ঐশ্বর্যের অহমিকায় এবং কামপ্রবৃত্তির পরবশ হয়ে অধিক বয়সেও তিনি দারপরিগ্রহ করেছিলেন। স্ত্রীর নাম লীলাবতী।

ক্রমে ক্রমে লীলাবতীর দেহে এল নবযৌবনের জোয়ার। বৃদ্ধ চন্দন দাস স্ত্রীর তীব্র যৌনতৃষ্ণা দূর করতে অসমর্থ। শীতে কাঁপছে যে, জ্যোৎস্না কি

তাকে তৃপ্তি দিতে পারে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে যে, সে যেমন রোদের ছোঁয়ায় সন্তুষ্ট হয়না তেমনি কামের তাপ প্রশমণে যে স্বামী অপারগ তাকে পেয়ে নারীও সুখী হয় না। এ ক্ষেত্রে নারী পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

চন্দন দাস কিন্তু লীলাবতীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কথায় বলে না, বৃদ্ধের কাছে তরুণী ভার্যা প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয় হয়। ফোকলা কুকুর যেমন জিভ দিয়ে মাংস চাটে—ভোগও করতে পারেনা আবার ফেলতেও পারেনা, বৃদ্ধদেরও সেই একই অবস্থা।

যৌবনের প্রখর তাপে তাপিত কামাতুরা লীলাবতী এক বণিক পুত্রের প্রেমে পড়ল। বিয়ের পর বাপের বাড়িতে কাটানো, উৎসবে রকমারি লোকজনের আনাগোনায় নানা জনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, কুলটা-চরিত্রহীনা রমণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন, পতির বার্ধক্য আর মদ্যপান এবং স্বামী বিরহ যাতনায় নারী কুপথে যায়। নারী যে চিরচঞ্চলা দেবতাদেরও তা অবিদিত নয়। তাই সুরক্ষিত রমণীদের স্বামীরাই এ জগতে সবচেয়ে সুখী।

গরু যেমন নিত্যনতুন তৃণভূমিতে ঘাস খেয়ে বেড়ায় রমণীরাও তেমনি এক পুরুষে আসক্ত থাকতে পারে না—নতুন নতুন পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। পুরুষ হলো আগুন আর স্ত্রী ঘিয়ে-ভরা পাত্র। কথায় বলে, নারীর ভূষণ লজ্জা—লজ্জা আর ভয় নারীকে রক্ষা করে। একথা কিন্তু ঠিক নয়। কামপ্রবৃত্তির অনুপস্থিতিই কেবল নারীর সতীত্ব রক্ষা করতে পারে। কুমারীকে রক্ষা করেন পিতা, যুবতী স্ত্রীকে রক্ষা করেন স্বামী আর বার্ধক্যে রমণী পুত্রের অধীন—কেননা স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্য লাভের আদৌ উপযুক্ত নয়।

লীলাবতী একদিন সুখশয্যায় বণিক পুত্রের সঙ্গে যৌনলীলায় মত্ত ছিল। সহসা স্বামীকে আসতে দেখে বণিক পুত্রকে ছেড়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আর স্বামীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। ইত্যবসরে বণিকপুত্র চলে গেল। হঠাৎ লীলাবতী তার বৃদ্ধ স্বামীকে জড়িয়ে ধরল দেখে কুট্টনী (দূতী) তো অবাক। অবশেষে সে সব কিছু বুঝল আর লীলাবতীর কাছ থেকে মোটা রকমের পুরস্কার আদায় করে ছাড়ল।

॥ দুই ॥

কান্যকুব্জের রাজা বীরসেন, তুঙ্গবল নামে এক রাজপুত্রকে বীরপুরের শাসক রূপে নিয়োজিত করেছিলেন। তুঙ্গবল বয়সে নবীন, অর্থেরও অভাব নেই, পদমর্যাদাও রয়েছে। একদিন আপন মনে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই

সময় চারুদত্ত নামে এক বণিকের স্ত্রীকে দেখে কামনার আগুনে দগ্ধ হলেন তিনি। সেই রূপসীর নামটিও বড় সুন্দর—লাবণ্যবতী।

কামাসক্ত তুঙ্গবল এক দূতীকে পাঠালেন লাবণ্যবতীর কাছে। পুরুষ ততক্ষণই সুশীল, চরিত্রবান, এবং জিতেন্দ্রিয় যতক্ষণ পর্যন্ত না নারীর কটাক্ষ-শরে তাকে জর্জরিত হতে না হয়। তুঙ্গবলকে দেখে লাবণ্যবতীর শরীরের কামের আগুন জ্বলে উঠেছিল। দূতীকে বল সে, 'কি করব বল, আমার কোন উপায় নেই, সতীত্ব খোয়াতে পারব না। পতিগতপ্রাণা নারীই স্ত্রী পদবাচ্য। সতী স্ত্রী প্রতি সর্বদেবতাই তুষ্ট হন। তাই আমার স্বামীর আদেশে ছাড়া আমি কোন কাজই করতে পারব না।'

দূতী ফিরে গেল, তুঙ্গবলকে সবকিছুই বলল। তুঙ্গবল বললে, 'আমায় তুমি হাসালে দেখছি। আমার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে বণিক তার লাবণ্যময়ীযুবতী স্ত্রীকে আমার হাতে সঁপে দেবে, এও কি সম্ভব?'

দূতী বলে, 'ধৈর্য ধরুন প্রভু। গায়ের জোরে নয়, কৌশল অবলম্বন করতে পারলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।'

দূতীর পরামর্শে তুঙ্গবল লাবণ্যবতীর স্বামীকে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করলেন। একদিন তুঙ্গবল স্নান সেরে প্রসাধন দ্রব্যে উত্তমরূপে নিজের দেহকে সজ্জিত ও সৌরভিত করে চারুদত্তকে ডেকে বললেন, আজ থেকে একমাস আমি গৌরব্রত করব। প্রতি রাতে একটি যুবতী মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তার পুজো করব।'

প্রভুর আদেশ মত চারু দত্তও প্রতি রাতে একটি করে যুবতী মেয়েকে নিয়ে আসে। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখে তুঙ্গবল মেয়েটিকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি মেয়েটির পুজো করেন। শেষে তাকে মূল্যবান বস্ত্র, স্বর্ণালংকার এবং নানাবিধ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

অতঃপর লোভী চারুদত্ত একদিন রাতে লাবণ্যবতীকে প্রভুর কাছে সমর্পন করল। কামনার ধনকে কাছে পেয়ে তুঙ্গবলের সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগল, প্রিয়তমার যৌবনবতী শরীর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। আলিঙ্গন-মিলনে ঘেমে নেয়ে উঠল লাবণ্যবতী। আরামে-আনন্দে তার দু'চোখ বুঁজে আসছিল। সুস্মিতা লাবণ্যবতীর সম্ভোগ-বাসনা জাগল। কোমল সিত শয্যায় শুয়ে পড়ে সে। তুঙ্গবল প্রেয়সীকে আদর করতে লাগল। এদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাবণ্যবতীর স্বামী চারুদত্ত। সে দেখল তুঙ্গবল তীব্র কাম-লালসায় লাবণ্যবতীর যৌবনের ফসল পুরুষ্ট স্তন দু'টিকে মর্দন করছে।

পরিতৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে লাবণ্যবতীর মুখশ্রী।

॥ তিন ॥

কাঞ্চনপুরের রাজা বীরবিক্রমের জনৈক কর্মচারী এক নাপিতকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্যত হলে, এক সাধু তাকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি বললেন, "এর কোন দোষ নেই। শোন, আমি সব বলছি। সিংহলের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র আমি। আমার নাম কন্দর্পকেতু। চতুর্দশীর রাতে মাঝ সমুদ্রে কল্পতরু আর তার নিচে মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণাসনে খচিত উপবিষ্টা বীণাবাদনরতা অপরূপ সুন্দরী এক তরুণীকে দেখা যাবে—একজন বণিকের মুখে এই কথা শুনে আমার কৌতুহল জাগল। আমি বণিকের সঙ্গে তার নৌকায় উঠলাম। মাঝ সমুদ্রে গিয়ে সেই তরুণীকে দেখলাম। তার যৌবন-সৌন্দর্যের প্রলোভনে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। তারপর জানিনা কেমন করে এক সুবর্ণ ময় দেশে গিয়ে পেঁৗছেছিলাম। সেখানে সোনার প্রাসাদের অভ্যন্তরে, সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে সেই সুন্দরী। ঝল-মল করছে তার সোনালী যৌবন। সখীরা পরম সমাদরে আমার সেই মোহিনী তরুণী রত্নমঞ্জরীর কাছে নিয়ে গেল। গান্ধর্বরীতিতে আমাদের বিয়ে হলো। রত্নমঞ্জরীর মধুর সান্নিধ্যে আমার দিন রাতের মূল্যে গেল বেড়ে। তার যৌবনের গহণ বনে আমার মন গেল হারিয়ে। মিলনে-হাসিতে-খুশিতে আমার দিন কাটতে লাগল। একদিন রত্নমঞ্জরী আমায় বলল, 'আমার মাঝে তুমি, তোমার মাঝে আমি হারিয়ে গেছি। এখানের সবকিছুই তোমার। এখানে সংঘাত নেই, রয়েছে শান্তি। রয়েছি আমি, তোমার রত্নমঞ্জরী। আমাকে নাও—আরো নিবিড় করে, আরো গভীর করে গভীরে। আমার পাত্র ভরে দাও তোমার আনন্দরসে। কিন্তু দোহাই তোমার দেওয়ালে স্বর্ণরেখার ঐ চিত্রটি যেন স্পর্শ করো না!' শিশুদের মতো নিষেধ না মানার একটা প্রবণতায় আমায় পেয়ে বসল। আমি ঐ ছবিটি ছুঁলাম। অমনি স্বর্ণরেখায় নয়নরেখার কোমল চরণের মৃদু আঘাতে আমি আবার আমার রাজত্বে ফিরে এলাম। কিছুই আর আমার ভালো লাগে না। রত্নমঞ্জরীর রূপ, সুধা, যৌবনের গন্ধ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে তুলল। মনে হলো তাকে ছাড়া অর্থহীন এ জীবন। অবশেষে সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলাম।

গত সন্ধ্যায় আমি এক গোপগৃহে আশ্রয় নিয়েছিলাম। গভীর রাতে গৃহকর্তা তার বন্ধুর মদের দোকান থেকে বাড়ি ফিরে তার চরিত্রহীনা যুবতী

স্ত্রীকে দূতীর (কোন এক নাপিতের স্ত্রী) সঙ্গে গুজগুজ করতে দেখে রেগে গিয়ে বললে, 'খুব রস হয়েছে না।' সে থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তার স্ত্রীকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে শুতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দূতী এসে পুণরায় বলে, 'তোমার উপপতি তোমার দেহ-কামনায় উম্মত্ত হয়ে উঠেছে। তুমি না গেলে নির্ঘাত সে বেচারা মারা যাবে। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম।'

গোপবধূ বলে, 'আমার দেহেও তো আগুন জ্বলছে। কিন্তু কি করব বল! দেখছ তো আমার অবস্থা!

দূতী বললে, 'এক কাজ কর। আমি নিজেকে থামে বেঁধে রাখছি। তুমি চটজলদি তোমার তাপ মিটিয়ে ফিরে এস।'

দূতী সেই নাপিতের স্ত্রী গোপবধূর বন্ধন মোচন করে নিজেকে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখল। একটু পরে গোপ এসে বলে, 'কি হলো নাগরের কাছে গেলি না!

বধূকে চুপ করে থাকতে দেখে, উত্তেজিত গোপ বললে, রূপের দেমাকে আমার কথার উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছিস না। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।. গোপ একটা দা দিয়ে নিজের স্ত্রী মনে করে দূতীর নাক কেটে ঘুমুতে গেল।

মিলনান্তিক তৃপ্তি আর শ্রান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল গোপিনী। দূতীর অবস্থা দেখে দুঃখ পেল। দূতী নিজে মুক্ত হয়ে, গোপিনীকে থামে বেঁধে নাকের টুকরো হাতে নিয়ে চলে গেল। সকালে প্রতি দিনের মতো নাপিত তার কাছে ক্ষৌর পাত্র চাইল। নাপতিনী শুধু ক্ষুরটা দিল। রেগে গিয়ে নাপিত ক্ষুরটা ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে নাপতিনী চেঁচিয়ে ওঠে, 'দেখ তুমি কি করেছ! আমার নাক কেটেছ।' তারপর 'ওমা, আমার কি হবে গো, মিনসে আমার নাক কেটেছে'—বলে কাঁদতে কাঁদতে বিচারকের কাছে গেল নাপতিনী।

রাত্রিশেষের আলো-আঁধারিতে গোপিনী তার স্বামীকে বলে আমি যদি সত্যিই সতী হই, তাহলে আমার কাটা নাক আবার জোড় লেগে যাবে।' দীপের আলোয় সেই গোপ দেখে তার স্ত্রীর নাক অক্ষতই রয়েছে। নির্বোধ গোপ তার স্ত্রীর চরণে প্রণত হয়ে ক্ষমা চাইল। বললে, 'তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে, ধন্য আমার জীবন।.

॥ চার ॥

যৌবনশ্রী নগরীতে একজন লোক ছিল—রথ তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ

করত সে। তার স্ত্রী ছিল কলঙ্কিণী। রথনির্মাতা বহুদিন ধরে তার স্ত্রীকে হাতে-নাতে ধরার জন্যে চেষ্টা করত। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারত না। এক-দিন সে এক মতলব আঁটল। স্ত্রীকে বলল সে, 'বিশেষ কাজে অন্য গ্রামে যাচ্ছি আজ আর ফিরব না।'

সামান্য একটুখানি গিয়ে ফিরে এসে অতি সন্তর্পণে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল সে। এদিকে তার কুলটা স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না। প্রেমিককে খবর পাঠাল সে, 'দেরি না করে চলে এস। বাড়িতে আমি একেবারে একা। তোমার জন্যে সেজে-গুজে অপেক্ষা করছি। সারা রাত আজ শুধু খেলব, আনন্দ করব।'

ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে তার প্রেমিক সন্ধ্যে বেলাতেই হাজির হলো। হাস্যে-লাস্যে-কলকাকলিতে তারা মিলন-রজনীতে মধুর শিহরণ অনুভব করতে লাগল। সহসা ক্রীড়াযুক্ত স্ত্রীর কোমল পদ পল্লবে খাটের তলায় গা ঢাকা দেওয়া তার স্বামীর অঙ্গের সামান্য একটু ছোঁওয়া লাগল। সুচতুরা স্ত্রী মুহূর্তেই সব কিছু বুঝে নিল। ফলে মিলনের, মদির মুহূর্তে পড়ল ছেদ। বিরক্তিতে ভরে ওঠে প্রেমিকের মন। রুক্ষ গলায় বললে সে, 'হঠাৎ তোমার কি হলো? এমন ঠাণ্ডা মেরে গেলে যে! আবেগে ভাঁটা পড়েছে—তোমাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক লাগছে। কি ভাবছ?

সে বলে, 'কুমারী অবস্থায় প্রথম যাকে দেহদান করে মিলনের প্রথম রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, আমার সেই প্রাণপ্রিয় স্বামী আজ অন্য গ্রামে গেছেন। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, না জানি কি কষ্টটাই না পাচ্ছেন তিনি। হয়তো তাঁর আশ্রয় মেলেনি, আহার জোটেনি!'

তার প্রেমিক বলে, 'স্বামীর ওপর তোমার এত টান!'

রথ-নির্মাতার স্ত্রী বলে, 'স্বামীই তো স্ত্রীর যথার্থ অলংকার। তিনি রূঢ় আচরণ করলেও সাধবী স্ত্রী রুষ্ট হয় না। স্বামীকে যে স্ত্রী সত্যিকারের ভালোবাসে দেব-দেবীরা তার প্রতি প্রীত হন। স্বামীর সঙ্গে সহমরণে স্ত্রীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। ফুলমালা এবং তাম্বুলের মতো মাঝে মাঝে আমি তোমার সঙ্গ কামনা করি। মন স্বভাতই চঞ্চল। তাই চাঞ্চল্যের বশেই এক এক সময়ে তোমার সঙ্গ পেলে আনন্দ পাই। দু'দণ্ড গল্প করতে কার না ভালো লাগে!

স্ত্রীর কথায় নির্বোধ রথনির্মাতা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল আর আনন্দের আতিশয্যে তার স্ত্রী আর উপপতি সমেত খাটটিকে মাথায় তুলে নাচতে

লাগল।

॥ পাঁচ ॥

বিক্রমপুরে এক সওদাগর বাস করত। তার নাম সমুদ্র দত্ত। সমুদ্র দত্তের স্ত্রী রত্নপ্রভা গোপনে এক ভৃত্যের সঙ্গে মিলিত হতো। বাস্তবিক নারীরা প্রিয়-অপ্রিয়ের বোধ রহিত এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তারা কেবল নিত্যনতুন সঙ্গী কামনা করে।

সমুদ্র দত্ত একদিন দেখলেন, যে তার স্ত্রী সেই ভৃত্যকে চুম্বন করছে। রত্নপ্রভাও তার স্বামীকে দেখতে পেল। সে ছুটে এসে বলল, 'অনেক দিনই সন্দেহ করেছি আজ মুখ শুঁকে টের পেয়েছি। রোজই তোমার বিলাসী ভৃত্য কর্পূর চুরি করে খায়।'

শাস্ত্রে যথার্থই উক্ত হয়েছে—পুরুষের তুলনায় স্ত্রী দ্বিগুণ বেশি আহার করে, তাদের ধীশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি পুরুষের তুলনায় চারগুণ বেশি, শ্রমের ক্ষমতা ছয়গুণ আর যৌন লিপ্সা আটগুণ বেশি।

রত্নপ্রভার কথায় ভৃত্যও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'যেখানে কৃপণ আর সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত প্রভুপত্নী ভৃত্যের মুখ শুঁকে দেখে কর্পূর খেয়েছি কিনা, সে বাড়িতে আমি আর কাজ করব না।'

বলাবাহুল্য সওদাগর তার ভৃত্যকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুণরায় কাজে বহাল করলেন।'

লেখক ও গল্প পরিচিতি

'পঞ্চতন্ত্র' এবং অজ্ঞাত অন্য একটি গ্রন্থ অবলম্বনে **'মিত্রলাভ,' 'সুহৃদভেদ,' 'বিগ্রহ'** এবং **'সন্ধি'** এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত, **'হিতোপদেশ'** গ্রন্থটি নারায়ণ রচিত। হিতোপদেশের নীতি কথা পদ্যে আর গল্পাংশ গদ্যে লিখিত। সহজ-সরল ভাষায় পশু-পাখির গল্প অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত—উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষা ও নীতি বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান। হিতোপদেশকে বাংলাদেশের সম্পদ বলে অভিহিত করা যায়, কেননা বাংলাদেশেই এটির প্রসার ও প্রচলন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের মতো হিতোপদেশের রচনাকাল সম্পর্কেও সঠিক কোন মন্তব্য করা চলে না। অনুমান সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে খ্রীস্টিয় নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে সম্ভবত গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হিতোপদেশের একটি পুঁথি পাওয়া গেছে যেটির লিপিকাল তেরশ-তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ইউরোপে যখন খ্রীস্টিয় ধর্মীয় চেতনা অতি-ক্রমকরে বোকাচিও, চসার প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ জীবনরস, আদিরস, ও জীবন মুখী সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন।

তখন হিতোপদেশে উপদেশমূলক পশু-পাখির গল্প সংকলিত হলেও আদি-রসাত্মক পাঁচটি কাহিনীও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সেই পাঁচটি গল্পই পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। আর একটু বলি। প্রথম গল্পটি **'মিত্রলাভ** দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গল্প দুটি **'সুহৃদ্ভেদ,'** চতুর্থ গল্পটি **'বিগ্রহ'** এবং পঞ্চম গল্পটি **'সন্ধি'** পর্যায়ের অন্তর্গত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম

শিখিধ্বজ চূড়ালা কথা

দ্বাপর যুগে উজ্জয়িনী নগরে কান্তিমান, ধীমান, ধর্মপরায়ণ, প্রজারঞ্জক

স্ত্রৈনাদিব্যসনে অনাসক্ত, ঔদার্য-শম-দম-ক্ষমাদি গুণের আকর শিখিধ্বজ নামে

এক রাজা বাস করতেন। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসে এবং নিজ ভুজবলে দিগ্বিজয় করে মাত্র ষোল বছর বয়সে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত সার্বভৌম নৃপতি রূপে সমলঙ্কৃত সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

শীতের শেষে আবার বসন্ত এলো। প্রসন্ন হয়ে উঠল প্রকৃতি। সঞ্চারিত হলো বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা, জড়তার কুহেলি গেল কেটে, আনন্দের মধুপাত্র হয়ে উঠল পরিপূর্ণ। গন্ধ-মদভরে অলস সমীরণ, সদ্যফোটা ফুলে ভ্রমরের আনাগোনা আর অস্ফুট গুঞ্জন, চন্দ্রের শোভাময়ী কিরণ—সবকিছু মিলে স্বপ্নমদির এক নেশায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন শিখিধ্বজ। তাঁর নব প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সুখে উৎসুক যৌবন উঠল জেগে। সুরাষ্ট্ররাজনন্দিনী চূড়ালার রূপ-গুণের কথা শুনে তিনি তার প্রতি অনুরক্ত হলেন।

চূড়ালা তাঁর জাগ্রত অবস্থার চিন্তা, সুপ্ত অবস্থার স্বপ্ন। রাজা ভাবতেন কবে তিনি পয়োভারে স্তোকনম্রা তাঁর প্রেয়সীকে কুংকুম রাগে রঞ্জিত করে আশ্লেষের রোমাঞ্চ সুখ অনুভব করবেন! চূড়ালাই বা কবে উদগ্র সম্ভোগ বাসনায় পীড়িত হবেন! শৃঙ্গার রসাত্মক কথনে-বচনে শিহরিত হতো শিখিধ্বজের যৌবন। মনের চোখে ছবি উঠত ভেসে—নারীর উম্মথিত যৌবনের। নারীর কেশবিন্যাস, সুবর্ণ কলসের মতো স্থূল স্তন, সুগঠিত নিতম্ব আর ললিত লোভন লীলা তাকে লুব্ধ করত। ঘ্রাণেন্দ্রিয় চঞ্চল হতো তাঁর যৌবনের গন্ধে।

অবশেষে শুভ পরিণয়ের সম্ধুক্ষিত লগ্নে মিলিত হলেন শিখিধ্বজ আর চূড়ালা। পারস্পারিক গুণের সমতায় তাঁরা সুখী হয়েছিলেন। দুধ আর জল যেমন সহজেই মিলে যায় তাঁরাও তেমনি মিলে-মিশে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সুকর্ষিত ক্ষেত সুবৃষ্টির দাক্ষিণ্যে শস্যশ্যামল হয়ে উঠলে আকাশে মেঘের মন্থর সঞ্চারণ এবং নীচে ফসলভারে রোমাঞ্চিত কৃষিক্ষেত্র যে অপরূপ শোভা ধারণ করে সেই রকম অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার শিখিধ্বজ আর চূড়ালা। পরিণয়োত্তর প্রশান্তিতে রঞ্জিত হলো উভয়ের চিত্ত। কদম্ব-কাননে, শ্রেণীবদ্ধ চন্দন-অগরু বৃক্ষযুক্ত সুরভিত বীথিতে, স্বচ্ছ সরোবারের মণিমানিক্যখচিত সোপানে তাঁরা মিলনের আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠতেন। দিনের শেষে ধীরে ধীরে যখন ঘনিয়ে উঠত রাত্রির অন্ধকার, রাজন্তঃপুরের নিঃসীম নির্জনতায় দুধের ফেণার মতো শুভ্র-কোমল শয্যায় শুয়ে দেহ-মিলনের আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠত তাঁদের সমস্ত শরীর।

প্রাত্যহিক রতিবিলাসের অপরিচ্ছিন্ন সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন রাজা-রানী এক দিন উপলব্ধি করলেন অনেকগুলি বছর গেছে কেটে—'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।' দিনফুরালে মহাকাল কুসুম ঝরিয়ে দেবে। মিলন-মদির নানা রঙের সেইসব দিনরাত হারিয়ে যাবে, ঝরে যাবে ফুল, উড়ে যাবে পাখি। সচ্ছিদ্র পাত্রে জল থাকে না যৌবনও তেমনি ক্রমে ক্রমে বিগলিত হয়, শিথিল হয় দেহ। সুখ নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুটে যায়। কেবল লাউ ডগার মত বৃদ্ধি পায় ভোগতৃষ্ণা। আত্মজ্ঞানই সংসার যন্ত্রণা দূর করতে পারে তাই অধ্যাত্মতত্ত্বে আসক্ত হলেন শিখিধ্বজ আর চূড়ালা। এই জগৎ দীর্ঘস্বপ্নের মতো—একমাত্র মহাসত্তা হলো মহাচিৎ। তমোবিলাস লয়ের সাধনায় রত হলেন তাঁরা।

আত্মচিন্তায় বিভোর হলেন চূড়ালা। পূর্ণানন্দে স্পন্দিত, নন্দিত হলো তাঁর চিত্তানিলয়—নবোদ্গত লতার মতো, শরতের স্বচ্ছ মেঘের মতো স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হলেন তিনি। রূপমুগ্ধ শিখিধ্বজ একদিন তাঁকে বললেন, 'এ কী মোহন রূপ তোমার! প্রিয়ে, সংগোপনে তুমি কি অমৃত পান করেছ? না কি যোগবলে লাভ করেছ অনির্বচনীয় এ রূপমাধুরী?' সুস্মিতা চূড়ালা বললেন, 'ভোগতৃষ্ণা লুপ্ত হলে আর অভুক্ত ভোগে তৃপ্ত হলে, মন শান্ত হয়—দেহে শ্রী ফোটে!'

হাস্যোজ্জ্বল শিখিধ্বজ বললেন, তুমি রাজনন্দিনী, রাণী। বিলাস-ব্যসনে কেটেছে তোমার দিন। আর তুমি বলছ অভুক্ত ভোগে তুমি পরিতৃপ্ত। তুমিই ভেবে দেখ তোমার এ উক্তি অসংলগ্ন কিনা!'

রাজার মন্তব্যে দঃখ পেলেন চূড়ালা।

শত্রুদমনে রাজা শিখিধ্বজ একদিন বিদেশ যাত্রা করলেন। বেশ কয়েক বছর তাঁকে প্রবাস-জীবন যাপন করতে হবে। ভোগসুখ ত্যাগ করে নির্জন আশ্রয়ে সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ পেয়ে চূড়ালা আনন্দিত হলেন। দৃঢ় অভ্যাসে রাণী অণিমাদি গুণ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হলেন। সূক্ষ্ম শরীরে আকাশে-পাতালে সর্বত্র যেমন খুশি অবাধে চলাফেরা করতেন তিনি। শিখিধ্বজ ফিরে এলে রাণী তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করতেন। কিন্তু বালককে বেদ পড়ানোর মতোই সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

একদিন শিখিধ্বজেরও বৈরাগ্যভাব দেখা দিল। তিনি সংসার ত্যাগে কৃতসংকল্প হয়ে রাণীকে ডেকে বললেন, 'প্রিয়ে, সুখৈশ্বর্য উপভোগে ক্লান্তি এসেছে। বন গমনের স্পৃহা জেগেছে আমার। দেখ, বনবাসীরা আমার চেয়ে অনেক সুখী। রাজ্য রক্ষার দুশ্চিন্তা কিংবা যুদ্ধে লোকক্ষয়ের দুঃখ কোন

কিছুই তাদের নেই। একদিন তুমি সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিয়েছিলে ছিন্ন করে। আমার নবীন যৌবন প্রবল যৌন সম্ভোগেচ্ছায় তোমাকে বরণ করে নিয়েছিল। অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদের স্বাধিকারপ্রমত্ত করেছিল। আজ সুনীল বনরাজির মাঝে তোমাকে উপলব্ধি করছি। পুষ্পস্তবক যেন তোমার যুগল স্বর্ণ—দুরন্ত যৌবনের পুরন্ত ফসল, মৃণাল যেন তোমার বাহুলতা, সাদা মেঘ তোমার গৌরাঙ্গের গন্ধ মাখা রেশমি শাড়ি, বর্ণগন্ধ বিকশিত ফুলগুলি তোমার অঙ্গরাগের অকৃত্রিম উপকরণ। সুন্দরি, আমার বনগমন সংকল্পে বাধা দিও না।'

চূড়ালা বললেন, 'শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বন গমনের বয়সে এখনও তুমি উপনীত হও নি। সর্বোপরি তুমি রাজা, প্রজা পালনের দায়িত্ব রয়েছে তোমার।'

রাজা বললেন, 'আমার অরণ্যাভিসারী মনকে সংযত করার শক্তি হা রয়েছি। তাই আমায় নিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রেখ না। আমার অবর্তমানে তুমিই রাজ্য চালনা করবে।'

অনন্তর অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের গৈরিক আলোয় সারা আকাশটা করুণ হয়ে উঠল। শত অনুরোধেও কি এই বিদায়ী সূর্যকে নিবৃত্ত করা যায়! তেমনি রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রজাদের উপরোধ সবকিছুই ব্যর্থ হলো—যে যাবার সে যাবেই! শিখিধ্বজ বনগমনের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন। চূড়ালাও স্বামীর অনুগামিনী হলেন। সায়াহ্নের অন্ধকার নামল অরণ্যে! দিগ্বধূদের লাজাঞ্জলি নিক্ষেপেই যেন আকাশে একে একে ফুটে উঠল অজস্র তারা। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হলো বনভূমি। চলতে চলতে ক্লান্ত হলেন রাজা-রাণী। শিখিধ্বজের কোলে মাথা রেখে চূড়ালা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজা সন্তর্পণে নিদ্রিতা চূড়ালাকে নিজের কোল থেকে নামিয়ে রেখে পরিচারকদের ডেকে বললেন, 'দস্যু দমনের জন্য ছদ্মবেশে আমি নগর-পরিক্রমায় বের হলাম।'

শুরু হলো রাজার পথ চলা। অতিক্রান্ত হলো কত পথ, জনপদ, নদনদী, গিরি-নগরী। প্রতিদিন সূর্য ওঠে, দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। তৃষ্ণায় শ্রান্ত হয়ে অঞ্জলি ভরে তিনি পান করেন ঝরণার জল, ক্ষুধায় কাতর হয়ে ফলমূল খান। শেষে মঠিকামন্দিরে আশ্রয় নিলেন রাজা। সংগ্রহ করলেন তিনি ফুলের সাজি, কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষের মালা, শীত নিবারণের জন্য কাঁথা, উপবেশনের জন্য কুশাসন।

এদিকে ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনে চূড়ালা রাজান্তঃপুরে ফিরে গেলেন। মন কিছুটা শান্ত হলে সূক্ষ্ম দেহে তিনি আকাশচারিনী হয়ে ধ্যানমগ্ন শিখিধ্বজকে প্রত্যক্ষ করলেন, চূড়ালার চোখে অনাগত দিনের ছবিও স্পষ্ট হলো। রাজধানীতে

প্রত্যাবর্তন করে তিনি রাজকার্য চালাতে লাগলেন। চলে গেল আঠারোটি বসন্ত। চূড়ালা বুঝলেন সময় হয়েছে। আবার তিনি আকাশচারিণী হলেন। সুশীল জ্যোৎস্নায় স্নাত হলেন তিনি, মন্দার-চন্দন-কস্তুরী সৌরভিত বাতাস ছুঁয়ে গেল তাঁর শরীর। সিদ্ধাভিসারিকা তিনি, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি রমণী। শিখিধ্বজের মিলন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হলেন তিনি। ভাবলেন তিনি এতদিনের এত কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মচিন্তন সবই কি তবে ব্যর্থ হলো ? যৌন সংসর্গের জন্যই কি তিনি চঞ্চল হয়েছেন ? সে সম্ভাবনা তো আর নেই ! আজও তিনি যৌবনবতী, পীবরস্তনী। কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত স্বামী তপঃক্লেশে অবসাদগ্রস্ত, শিথিল-স্নায়ু—তাঁর সে উজ্জ্বল-দ্যুতি আর নেই, জীর্ণ পত্রের মতো মনে হচ্ছে তাঁকে।

চূড়ালা ব্রাহ্মণ-কুমারের রূপ ধরে শিখিধ্বজকে প্রকৃষ্ট বোধ দান করার জন্য পর্ণকুটির অভিমুখে অগ্রসর হলেন,। তিনি রাজাকে বললেন, 'রাজসুখ ত্যাগ করে আপনি তপশ্চরণে লিপ্ত হয়েছিলেন। আশা করি প্রার্থিত ফললাভ করেছেন।'

ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখে রাজার মনে হলো তিনি যেন মূর্তিমান তপস্যা। রাজা বললেন, 'মহর্ষি, আপনার পূত সান্নিধ্যে নিজেকে আজ ধন্য মনে হচ্ছে। অনুগ্রহ করে বলুন আপনি কে ? কি কারণেই বা আপনি এখানে এসেছেন ?'

ব্রাহ্মণ কুমার বললেন, 'বিজয়লক্ষ্মীর ভালে রাজটীকার মতো প্রোজ্জ্বল সুন্দর শুদ্ধচিত্ত নারদমুনির নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। একদিন তিনি স্বর্ণোজ্জ্বল সুমেরু গুহায় জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বভেদশূন্য হয়ে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে একাগ্র-চিত্তে অবস্থান করছিলেন। সমাধি ভাঙলে দেবর্ষির কানে এল মধুর শিঞ্জন-ধ্বনি। সুমেরু গুহার কাছেই মন্দাকিনী। কৌতূহলাবিষ্ট নারদ দেখলেন রম্ভা, তিলোত্তমা এবং আরও অনেক অপ্সরা নগ্ন দেহে নিঃশঙ্কচিত্তে জলক্রীড়া করছে স্বর্ণ কমলের কুঁড়ির মতো তাদের স্তন সংস্পর্শযুক্ত হয়ে তীব্র লালসা জাগাচ্ছে। গলিত সোনা দিয়ে যে কোন ভাস্কর তাদের যৌবনোজ্জ্বল উরুগুলি তৈরী করেছে। মনে হচ্ছে পদ্মগন্ধী পরিপুষ্ট ঐ উরুগুলি যেন অতনু দেবতার মন্দিরের সুরম্য স্তম্ভ। মন্দাকিনী রমনীয়তায় ভাস্বর কিন্তু এই সব অপ্সরার সৌষ্ঠব আর রূপমাধুরীর কাছে সে নিষ্প্রভ। নয়নলোভন অসংবৃত তাদের নিতম্ব। চিরযৌবনা অপ্সরাদের একের প্রতিচ্ছবি পড়েছে অপরের আবরণশূন্য সুচারু অবয়বে। সুকেশিনী সেই স্বর্গ বারাঙ্গনারা পদ্মকোরকগুলি ছিন্ন করছে কেননা ঐসব পদ্ম কুঁড়িগুলি তাদের সুগঠিত কুচ যুগলের অনুরূপ

আর তাদের শরীরে সঞ্চিত রয়েছে অমৃত। জীবন্মুক্ত দেবর্ষিরও চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিল। জোর করে তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কাম-প্রবৃত্তির পরবশ হয়ে পড়লেন তিনি। একটি স্ফটিক কুম্ভে তিনি তাঁর বীর্য নিক্ষেপ করলেন। যথাসময়ে সেই কুম্ভ থেকেই আমার জন্ম হলো এবং আমি কুম্ভ নামেই পরিচিত। নারদ আমায় শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ব্রহ্মলোকে বাস করি। আকাশ পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখে আপনার কাছে এলাম।'

অতঃপর কুম্ভবেশী চূড়ালা রাজা শিখিধ্বজকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিতে লাগলেন আর তাঁকে সর্বস্বত্যাগে প্রলুব্ধ করলেন। রাজা তাঁর পর্ণকুটীর, অশন, আসন, বসন সবকিছু অগ্নিতে নিক্ষেপ করে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হলে কুম্ভ তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। শিখিধ্বজের মোহ অপগত হলো, আত্মজ্ঞান লাভ করলেন তিনি। উভয়ের সম্প্রীতি বর্ধিত হলো এবং তাঁরা অন্য এক রমণীয় বনে আশ্রয় নিলেন। রাজার আর কোন কিছুতেই কোন আকর্ষণ নেই, বিকর্ষণও নেই। অপূর্ব এক রূপ মাধুরী ঘিরে রেখেছে তাঁর সারা শরীর।

এদিকে বরবর্ণিনী চূড়ালার কাম লালসা জাগল। তাঁর মনে হলো, 'যে রমণীর স্বামীসম্ভোগ-বাসনা জাগে না সে নিন্দিতা-ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও প্রারব্ধ কর্মের উপেক্ষা জনিত পাপ তাকে স্পর্শ করে। তাই রতিক্রীড়ার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন!' অতঃপর কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা শিখিধ্বজকে বললেন, 'ইন্দ্রপুরীর আনন্দময় এক অনুষ্ঠানে আজ আমার নিমন্ত্রণ। আমাকে তাই যেতে হবে। উৎসব শেষ হলেই ফিরে আসব।'

কুম্ভ ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর শোভন মুখটি বিষাদ-ম্লান, শ্রীহীন। শিখিধ্বজ বললেন, 'আপনাকে মনে হতো বেদনার স্পর্শলেশহীন এক সৌন্দর্য-ছবি, আজ কেন আপনাকে মলিন লাগছে?'

কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা বললেন, 'প্রত্যাবর্তনকালে আকাশপথচারী দুর্বাসা-কে দেখে বলেছিলাম—আপনাকে আজ অভিসারিকার মতো সুন্দর লাগছে। আর যায় কোথা! সুলভকোপা দুর্বাসা সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন-দিবসে তুমি কুম্ভই থাকবে, রাত্রির আগমনে পীবরস্তনী কামিনী নারীতে পর্যবসিত হবে। বিধিনির্বন্ধে কী অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থার মাঝে পড়তে হল আমায়! আমার উচ্চ যৌবন, স্বর্ণকমলের মতো স্ফীত পয়োধর দেবকুমারদের কামার্ত করে তুলবে—আমাকে নিয়ে তারা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হবে, ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে! দেবর্ষিকেই বা আমি কি ভাবে নিষ্ঠুর এ অভিশাপের কথা জানাব!'

উদাসী শিখিধ্বজ বললেন, 'রূপান্তর নিয়ে মিথ্যা শোক করছেন। দেহ

দুঃখ-সুখে লিপ্ত হয়, দেহী নির্লিপ্তই থাকেন।'

সূর্য অস্ত গেল। নিমীলিত হলো পদ্ম। পাখীরা নীড়ে ফিরছে। পাথিকের পথ চলা সেদিনের মতো শেষ হলো। ঘণিয়ে এলো সাঁঝের আঁধার। যাদের প্রণয়ীজনেরা ঘরে ফিরল না সেইসব বিরহিণী স্ত্রীরা কষ্ট পাচ্ছে। চক্রবাক দম্পতিকে বিচ্ছেদ-ব্যথা সইতে হবে। আকাশে চাঁদ উঠল। কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হলো। কুম্ভ সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগছে। আমার কেশরাজি বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশ তারার আলোয়

সজ্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অলকেও ঝকঝক করছে মুক্তোর মালা। দেখ আমার বুকে ঠেলে উঠেছে উদ্ধত দুটি স্তন--যেন সৌগন্ধময় দু'টি পদ্মকোরক। রঙীন কাঁচুলিতে আবৃত হচ্ছে পয়োধরযুগল। এই দেখ কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত রেশমি শাড়িতে ঢেকে গেল। সুপুষ্ট নিতম্বের ভার অনুভব করছি। আমার অঙ্গ থেকে একে একে নির্গত হচ্ছে হীরা-চুনী-পান্না খচিত নানাবিধ অলংকার। পরিবর্তন আর সংবেদনের এই চমকে লজ্জা পাচ্ছি'।

শিখিধ্বজের মনও বিষাদে ভরে উঠল। এই রূপান্তর নিয়তি-নির্দিষ্ট, অন্যথা করার উপায় নেই। আড়ষ্ট হয়ে উভয়ে এক শয্যাতেই শয়ন করলেন। প্রভাতে রাতের সেই মায়াবিণী সুন্দরী পুনরায় কুম্ভের রূপ পরিগ্রহ করলেন। কুম্ভবেশধারিনী চূড়ালা একদিন রাজাকে বললেন, 'প্রতিরাতে আমার দেহে রমণী চিহ্ন ফুটে ওঠে। আর আমরা এক শয্যাতেই শুই। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। নিজেকে নিবৃত্ত করার সাধ্য নেই আমার। দেহ-দানের মাধ্যমে তৃপ্তির স্বাদ পেতে চাই। সম্ভোগের মহাসুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে কি লাভ! আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা, শুভদিন। আজ রাতে মহেন্দ্র পর্বতের রত্নদীপ প্রজ্বলিত রমণীয় গুহায় যথাবিহিত পরিণয়-পর্ব শেষে আমরা মিলিত হব।' রাজর্ষি রাজী হলেন।

সায়ন্তন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে চারিদিক। জ্যোৎস্না-পুলকিত মন্দাকিনী নদীতে অনাচ্ছাদিত দেহে জলক্রীড়ায় রত হলেন রাজা আর মোহিনী সেই নারী। একে অপরকে স্নান করিয়ে দিলেন। শরীর স্পর্শে উভয়েই কামার্ত হলেন। কর্পূর-কুংকুম-কস্তুরী চন্দনের অলংকারে তাঁরা সজ্জিত হলেন, ধারণ করলেন নানাবিধ অলংকার। পীনস্তনভারণতা লাজনম্রা বধূ নাম নিলেন মদনিকা। অনবদ্যাঙ্গী লক্ষ্মীর মতো প্রতিভাত হলেন তিনি। রাজা বললেন, 'এ কী সুন্দর রূপ তোমার, প্রিয়ে। তোমার ফরসা গায়ে পদ্মের গন্ধ, নবীন কিশলয়ের মতো তোমার করতল, তোমার সস্মিত মুখটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনোরম আর অধর-ওষ্ঠে লুকিয়ে আছে অমৃত।'

বিবাহ বেদীর চারিদিকে রয়েছে চারটি নারিকেল, সোনার কলস মন্দাকিনীর পূত বারিধারায় পূর্ণ। সংরক্ষিত চন্দন কাঠে অগ্নি সংযোগ করা হলো। তাঁরা অগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন, লাজাঞ্জলি দিলেন। মিলনানুষ্ঠান শেষে মণিময় পালংকে গন্ধপুষ্প বিছানো শয্যায় শুয়ে একে অপরের মাঝে হারিয়ে গেলেন। অনির্বচনীয় সম্ভোগানন্দে অতিবাহিত হলো রাত্রি।

প্রভাতে মদনিকা পুনরায় কুম্ভরূপ ধারণ করলেন। পারস্পরিক সম্প্রীতিতে পূর্বের মতোই তাঁরা শাস্ত্রালোচনা করলেন, ঘুরে বেড়ালেন, স্নান সেরে ফলমূল খেলেন। দিনের শেষে কুম্ভ রজনীর নর্ম-সহচরীর রূপ নিলেন তা। তাঁর নিরাবরণ যৌবন মুগ্ধ করে রাজাকে। রতিশ্রমে ক্লিন্ন-ক্লিষ্ট শিখিধ্বজ নিদ্রিত হলে মদনিকাবেশিনী চূড়ালা উজ্জয়িনীতে ফিরে অমাত্যদের রাজকার্য পরিচালনা নির্দেশ দিতেন। চূড়ালারূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে তিনি শিখিধ্বজকে আর একবার পরীক্ষা করবেন বলে মনস্থ করলেন।

একদিন সায়াহ্নে শিখিধ্বজ মন্দাকিনী তীরে সন্ধ্যাহ্নিক করছিলেন। চন্দ্রালোক প্লাবিত অরণ্যের অনুষঙ্গিনী মদনিকাবেশিনী মনোহারিণী চূড়ালা নিজেকে সম্যকরূপে সজ্জিত করে যোগবলে তিনি সুশ্রী এক উপপতি সৃষ্টি করলেন এবং পুষ্পশয্যায় তাঁর সঙ্গে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হলেন। জপ সেরে শিখিধ্বজ মদনিকার সন্ধানে এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তাঁকে দেখতে পেলেন। যৌবনবতী মদনিকার নগ্ন শরীরে চাঁদের আলো পড়েছে, স্বেদাসক্ত তার কপোল, সস্মিত তাঁর মুখশ্রী, দৃঢ় আলিঙ্গনে তাঁর বুকের পুষ্প-মাল্য পিষ্ট হয়েছে।

মদনিকাকে পরপুরুষের বাহুলগ্না হয়ে থাকতে দেখেও শিখিধ্বজ বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উত্তেজিত হলেন না। তাঁর মনে হলো, 'এই যুবক-যুবতী দেহ-মিলনের আনন্দ উপভোগ করছে। আমাকে দেখলে লজ্জা পাবে। আমি বরং অন্যত্র গমন করি।'

শিখিধ্বজ চলে গেলে মদনিকা সেই মায়া নাটকের অবসান ঘটিয়ে সম্ভোগ ক্লিষ্ট দেহে স্বামীর কাছে এলেন এবং লজ্জায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিখিধ্বজ সস্নেহে বললেন, 'প্রিয়ে সাংসর্গিক আনন্দ থেকে বিরত হলে কেন ? যৌন মিলনের নিবিড় সুখানুভবে আকস্মিক ছেদ টেনে কেন তুমি চলে এলে ? মিলনরত অবস্থায় তোমাদের দেখে আমার কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর ঘটে নি। তুমি প্রত্যহ রাত্রিতে তোমার প্রণয়ী যুবকটির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে কামেচ্ছা পূরণ কর, আমি বাধা দেব না। আমি জানি প্রভাতে কুম্ভরূপে তুমি আমার মতোই বীতরাগ, স্থিতপ্রজ্ঞ—আমার সাধন পথের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।'

মদনিকা বলল, 'স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাদের কামপ্রবৃত্তি পুরুষের চেয়ে আটগুণ বেশী। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কামাতুরা হয়ে আমি তোমার খোঁজ করছিলাম। দেখলাম মন্দাকিনী তীরে তুমি অর্চনারত। সুনীল অন্ধকারে নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় কামুক যুবকটি আমার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করল। সুতীক্ষ্ন দেহ কামনায় আমার তখন শরীরব্যাপী অস্থির একটা আলোড়ন চলছে। কিছুতেই আমি নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। নারী কুমারীই হোক আর বিবাহিতাই হোক মনের মতো পুরুষপেলে অবশ্যই সে আত্মসমর্পণ করবে। তাই যতদিন পরপুরুষের সংস্পর্শে না এসে পড়ে তত-দিনই রমনী শুদ্ধ থাকে। সংসর্গ থেকেই প্রেম জন্মায়। কান্ত, তোমাকে সবকিছুই বললাম। আমি অবলা নারী, আমায় তুমি ক্ষমা কর।'

শিখিধ্বজ বললেন, 'প্রিয়ে, পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তুমি তাকে দেহ-

দান করেছ। কাজেই স্ত্রীরূপে তোমায় গ্রহণ করলে নীতিগর্হিত অশাস্ত্রীয় কাজ করা হবে। তাই আমরা আগের মতো মিত্রভাবাপন্ন হয়েই থাকব, কেমন ? আর বিশ্বাস কর, তোমার ওপর একটুও ক্রুদ্ধ হইনি আমি।'

রাজাকে রাগদ্বেষ শূন্য দেখে মদনিকা প্রীত হলেন। তিনি বুঝলেন শিখিধ্বজের বিষয় বাসনা দূর হয়েছে এবং চূড়ালা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

শিখিধ্বজ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কে ? আমার মনে হচ্ছে তুমিই আমার প্রিয়তমা মহিষী চূড়ালা। এখানে তুমি কি ভাবে এলে ?'

চূড়ালা বললেন, 'হ্যাঁ আমিই তোমার প্রিয়তমা মহিষী চূড়ালা। তোমাকে বোধ প্রদান করার জন্য ছায়ার মতো সব সময় আমি তোমাকে অনুসরণ করেছি এবং যোগবলে আমি কুম্ভ, পরে মদনিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিলাম। তোমাকে শেষবারের মতো পরীক্ষা করার জন্য মায়াবলে উপপতি সৃষ্টি করে তার সঙ্গে যৌন সম্ভোগরত হয়েছিলাম। শেষ পরীক্ষায় তোমায় জয়ী হতে দেখে অকৃত্রিম শরীরে তোমার সামনে আবির্ভূত হয়েছি। এখন তুমি ধ্যান যোগে সব কিছু প্রত্যক্ষ কর।'

শিখিধ্বজ ধ্যানস্থ হলেন এবং আনুপূর্বিক সবকিছু প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি বললেন, 'প্রিয়ে, তোমার তনু-দেহখানি আমার জন্যে কত ক্লেশ সহ্য করল। আমি মার্জনাপ্রার্থী। আমায় তুমি মোহবন্ধন থেকে মুক্ত করেছ। তুমি গৃহিনী, সচিব, সখা অধ্যাত্ম পথের সঙ্গিণী—তুমি আলোকদূতী।'

চৈত্তিক প্রশান্তিতে দীপ্তিমতী চূড়ালা জিজ্ঞেস করেন, 'প্রিয়, তোমার কী ইচ্ছে ? আমরা এখন কী করব ?'

রাজর্ষি শিখিধ্বজ বললেন, 'প্রিয়ে, আমি যন্ত্র মাত্র—তুমি যন্ত্রী। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

চূড়ালা বললেন, 'চল, আমরা আবার উজ্জয়ীনিতে ফিরে যাই। তুমি রাজা, পুণরায় সিংহাসন অলংকৃত কর। আর আমি রাণী। আমাদের ফিরে পেয়ে প্রজারা আনন্দমুখর হবে, পুণরায় সজ্জিত হবে রাজপুরী, বৈতালিক-কণ্ঠে ধ্বনিত হবে রাজার স্তুতি, নটীরা নৃত্য পরিবেশন করে মনোরঞ্জন করবে।'

রাজা বললেন, 'উজ্জয়িনীতেই আমরা ফিরে যাব। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন—স্বর্গসুখ ছেড়ে কেন তোমার রাজৈশ্বর্য ভোগের ইচ্ছে জাগল ?'

চূড়ালা উত্তর দিলেন, 'আমরা এখন দুঃখ-সুখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি। কাজেই রাজ্য আর বণ—এদের মাঝে কোন প্রভেদ খুঁজে পাই না।

কেবল স্বভাববশত বিষয়কে আশ্রয় করে থাকতে চাই।'

রাজা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

সূর্য উঠল। সূচনা হলো নতুন একটা দিনের। রাজা-রাণী উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। নতুন করে অভিষেক হলো রাজার। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন। চূড়ালা বললেন, 'প্রিয় মুনিসুলভ শান্ত তেজ পরিহার করে তুমি এখন রাজকার্য্য পরিচালনা কর।' উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল উজ্জয়িনী। সুখে-শান্তিতে দীর্ঘদিন রাজত্ব করে শিখিধ্বজ এবং চূড়ালা একই সঙ্গে দেহ-ত্যাগ করে অরূপ লোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

।। টীকা ।।

১। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে, কাব্য-নাটক এবং কাহিনীতে স্ত্রী লোকের সম্পর্কে অনেক প্রতিকূল মন্তব্য করা হয়েছে। কয়েকটি উক্তি এখানে সংকলিত হলো—

মাংস, অস্থি, স্নায়ু দিয়ে নির্মিত স্ত্রী-শরীরে শোভার বিষয় কোনটি যে মানুষ তাতে মুগ্ধ হয়? [যোগ বাশিষ্ঠ ১ ১২।১, পঞ্চাদশী ৭।১৪০, যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষৎ ৫]

স্ত্রী থাকলেই ভোগেচ্ছা জন্মে। যার স্ত্রী নেই ভোগেচ্ছা পূরণের স্থানও নেই। স্ত্রী ত্যাগ করলেই জগৎ ত্যাগ করা হয় এবং জগৎ ত্যাগ করলেই সুখ লাভ হয়।

[যোগ বাশিষ্ঠ ১।২১।৩৪, যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষৎ ১৪]

স্ত্রী লোকের দেহ বিচার করলে দেখা যায়, এখানে কেশ, সেখানে রক্ত প্রভৃতি। এই ধরণের দেহে যাদের রতি, তারা মানুষ নয় কুকুর।

[যোগবাশিষ্ঠ ৩।৫৯।৩]

নাড়ীব্রণের ক্লেশযুক্ত স্ত্রীলোকের যে অবাচ্য স্থান, তাকেই সুখের মন করে বুদ্ধিভ্রমবশতঃ লোকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্বিধাভিন্ন চর্মখণ্ডে যাদের আসক্তি তাদের সাহসকে ধন্য বলতে হয়; তাদের চরণে নমস্কার।

[নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৪।৩৯--৩০]

চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থিসমন্বিত দেহে যাদের আসক্তি, তাদের সঙ্গে কৃমি-কীটের কোন পার্থক্য নেই।

[শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।২১]

ঘৃতকুম্ভ যেমন অগ্নি সংসর্গে বিগলিত হয়, পুরুষও সেরূপ স্ত্রীলোকের সংসর্গে অভিভূত হয় ; অতএব স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত।

[অবধূত গীতা ৮।২৪]

কোনও স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করবে না, পূর্বদৃষ্ট কোনও স্ত্রীলোককে স্মরণ করবে না, তাদের সম্বন্ধে কোনও কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের লিখিত বিষয়ও পাঠ করবে না। [নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৪।৩]

অশ্বের স্বচ্ছন্দ চলন ভঙ্গি, বৈশাখী মেঘের গর্জন, স্ত্রীলোকের চরিত্র পুরুষের ভাগ্য, অবর্ষণ বা অতিবর্ষণ—মানুষ তো দূরের কথা দেবতাগণেরও দুর্জ্ঞেয়।

ব্যাধেরা গতিমান বনের পাখিকেও ধরতে পারে, বেগবতী নদীতেও নৌকা চালান সম্ভব কিন্তু কেউই স্ত্রীলোকের চপল মনের গতি নির্ধারণে সমর্থ নয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিরাও মোহমুগ্ধ হয়ে নারী অসদভিপ্রায় বুঝতে অসমর্থ হন।

পূত-চিত্ত মুনি-ঋষিরা বলেন যে এক জনের সঙ্গে যৌন সম্ভোগ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই নারী অন্য পুরুষের যৌন সংসর্গ কামনা করে।

কল্যাণ-অকল্যাণের বোধ রহিত, কুল ও জাতিভ্রষ্ট নিকৃষ্ট দুষ্কর্মলিপ্ত, অশুচি-অচ্ছুত, মরণোন্মুখ ব্যক্তিকেও তারা প্রিয়তম বলে মনে করে।

অতএব কুল-শীলে উজ্জ্বল ব্যক্তি সব সময়েই নারীদের শ্মশান-পুষ্পের মতোই বর্জন করা উচিত।

[ভর্তৃহরে বৈরাগ্য কথা। দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। শ্লোক ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২২]

॥ **পরিচিতি** ॥

বেদান্ত দর্শনে অমূল্য গ্রন্থ 'যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ'-এর রচয়িতা কে সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পন্ডিতেরা সংশয়াতীত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। অনেকে মনে করেন এই রামায়ণটি কবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের

উত্তরভাগা গ্রন্থটির বাক্‌ভঙ্গী রামায়ণের অনুরূপ আর রামশ্রোতা, বশিষ্ঠ বক্তা—সম্ভবত এই কারণে গ্রন্থটি বাল্মীকি রচিত, এই মতটি প্রচলিত। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ যোগ্য নয় বলেই মনে হয়। যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রতিটি সর্গ শেষে 'ইত্যর্ষে বাশিষ্ঠ-মহানারায়ণের বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে'—অংশটির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ রামের প্রতি ঋষি বশিষ্ঠর উপদেশ, যা বাল্মীকি ভণিত এবং দেবদূত কর্তৃক কথিত। বাল্মীকি প্রণীত হলে 'বাল্মীকিয়ে' না লিখে 'বাল্মীকিনা' (তৃতীয়ার এক বচন) লেখা হতো। তা ছাড়া গ্রন্থটির বিভিন্ন প্রকরণে ভাষা-গঠনের কোন মিল নেই। তাই মনে করা যেতে পারে যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নয়—যোগ ও আত্মজ্ঞান বিষয়ক বশিষ্ঠের উপদেশের একটি সাধারণ সংকলন গ্রন্থ। বশিষ্ঠ নামযুক্ত একমাত্র প্রামান্য ধর্মগ্রন্থ বশিষ্ঠ-সংহিতা। কিন্তু বশিষ্ঠ সংহিতার বিষয় দেখে মনে হয় এটি যোগ বাশিষ্ঠের পরবর্তীকালে অপর কোনও গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর বি, এল. আত্রেয় অনেক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে যোগবাশিষ্ঠ ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে (ভর্তৃহরির আগে, কালিদাসের পরে) লেখা হয়েছিল। আর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রাঘবনের মতে, গ্রন্থটি খ্রীস্টিয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতব্দীর মধ্যে রচিত হয়।

মোঘল-সম্রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ অধিপতি মহামতি আকবরের নির্দেশে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রথম অনুবাদ কার্য শুরু হয়েছিল ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৬৫৬ খ্রীস্টাদে 'ভারত-ঈশ্বর' শাহ্‌জাহানের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র, উচ্চ শিক্ষিত এবং অতীন্দ্রিয়বাদী দারা শুকোহ্‌-র ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থ ফারসীতে অনুদিত হয়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম এবং নির্বাণ (পূর্ব ও উত্তর ভাগ) এই ছয়টি প্রকরণে বিভক্ত। শিখিধ্বজ-চূড়ালার উপাখ্যানটি (৭৭ সর্গ—১১০ সর্গ) নির্বাণ প্রকরণে পূর্বভাগের অন্তর্গত।

জগৎ সত্য না মিথ্যা (ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য, পরমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা), মোক্ষ কেন, মুমুক্ষু কে—এইসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর আর আলোচনা সন্নিবেশিত ধর্মগ্রন্থে আদি রসাত্মক অংশের উপস্থাপনা, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। ভোগটাই যে চরম নয়—কেবল দৃষ্টান্ত মেলে ধরার জন্যেই প্রেম ও সম্ভোগের কাহিনী সংযোজিত হয়েছে,—এমন ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে।

আবার পথ দেখাবে কে, যে জন দৃষ্টি হারা ? ভোগ না করলে ত্যাগ করবে কি ভিক্ষুকে ?

'কবীনাং কবিতমঃ' রবীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে খোদিত ছবিগুলি দেখে বলেছেন, "চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয় সমস্তই আছে।'—'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' সম্পর্কেও বোধহয় এরূপ মন্তব্য করা চলে। আর 'দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ বিচার ও বিশ্লেষণ সমন্বিত' শিখিধ্বজ-চূড়ালার উপাখ্যানটিকে 'একই সঙ্গে সৌন্দর্য ভোগ এবং ভোগবিরতির' কাহিনী বলা যায়।

বার্থা

অনরেদ্য
বালজ্যাক

ষোড়শ শতাব্দীতে স্যার ইমবার্ট-দ্য-বাসতারনে ছিলেন তুরেনের সবচেয়ে বড় জমিদার। তাঁর সভাবটা ছিল অন্য মানুষের থেকে স্বতন্ত্র। স্ত্রী জাতির ওপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তাঁর ভাষায় ওরা বড় বেশী মাত্রায় ইন্দ্রিয় পরায়ণা। হয়তো তাঁর ধারণাটা ভুল নয়, কিন্তু এই ধারণা মনে বদ্ধমূল থাকায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁকে অবিবাহিতই থাকতে হ'ল। এতে বিশেষ
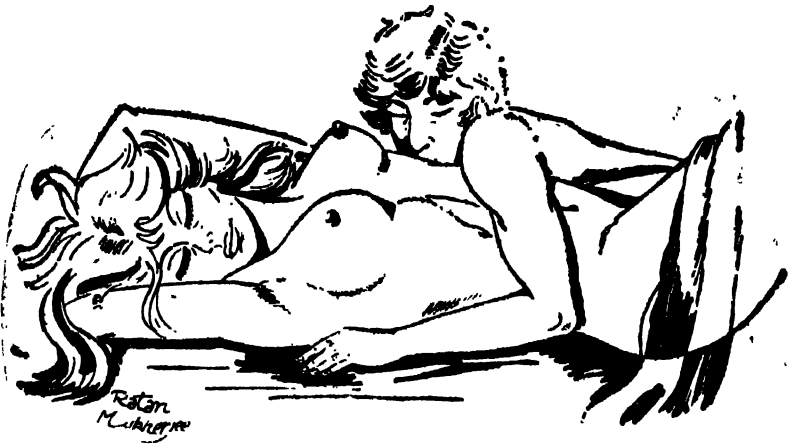
লাভ হ'ল না তার উপরন্তু অনেক সময়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে করতে ভদ্রলোক ক্রমেই অসামাজিক হয়ে পড়তে লাগলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই তাঁকে কাটাতে হ'ল যুদ্ধক্ষেত্রে আর অবিবাহিত ব্যক্তিদের সাহায্যে। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে ছিল না জৌলুষ, হাতগুলো ছিল অপরিচ্ছন্ন আর সব সময়ে বিরক্ত থাকার কারণে মুখটা হয়ে উঠেছিল বাঁদরের মতো। সত্যি কথা বলতে কি তৎকালীন খ্রীষ্টান জগতের সবচেয়ে কুৎসিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর অবয়বে এমনকি গোপন স্থানগুলোতেও নিন্দা করার মতো কিছু ছিল না।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন স্বল্পবাক্ এই বীর যোদ্ধা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের রাজার প্রতি অনুগত প্রকৃত ধনী জমিদারটিকে বোধ হয় কোন দেবদূতও উপেক্ষা করতে পারতো না।

অনেকেই বলতেন, এই ব্যক্তিটির মানুষকে সৎ উপদেশ দেবার ক্ষমতা ছিল, তাই অনেকেই আসত তাঁর কাছে পরামর্শ নেবার জন্যে। ভগবানের লীলা সত্যিই বোঝা ভার। অশেষ গুণাবলী সম্পন্ন লোকটির পোষাক পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন থাকতো কেন তার কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বয়স যখন সবে পঞ্চাশ তাঁকে দেখাতো ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধের মতো। সেই বয়সে তিনি মনস্থ করলেন বংশরক্ষার জন্য এবার তিনি বিয়ে করবেন। অতএব তাঁর মনোমতো কন্যার সন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। সন্ধানও পেলেন। দক্ষিণ দেশের খ্যাতনামা রোহন পরিবারের বার্থা নারী কন্যাটি সবদিক থেকেই মনে ধরল তাঁর। ইমবার্ট তাকে দেখেছিলেন সব্যাজনের দুর্গে। মেয়েটির রূপ গুণ এবং নিষ্কলুষ মুখভাব তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মেয়েটির পাণিগ্রহণ করার উদগ্র বাসনায় তিনি প্রায় পাগলই হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণায় এত সুন্দর এবং উচ্চবংশোদ্ভূত কোন মেয়ে কখনই খারাপ হ'তে পারে না। বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'তে দেরী হোল না কারণ স্যার রোহনের সাত সাতটি কন্যা, পার করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। বিশেষ করে যুদ্ধাবসানে তখন সকলেরই অবস্থা খারাপ। বাস্তারনে দেখলেন তিনি সত্যিই একটি কুমারী মেয়ে পেয়েছেন। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে কন্যাটি কড়া শাসনেই মানুষ হয়েছে, সুশিক্ষা পেয়েছে। আলিঙ্গণ করার প্রথম অধিকার পাওয়ার দু'মাসের মধ্যেই বার্থার গর্ভে সন্তান এল। স্যার ইমবার্টের আনন্দের আর সীমা রইল না। এই আইন সঙ্গত সন্তানই পরবর্ত্তী কালে খ্যাতিমান ডিউক অফ বাস্তারনে হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাবার মতোই সাহসী বীর যোদ্ধা, রাজানুগত এবং একাদশ লুইয়েরপ্রসাদে প্রথমে মন্ত্রী ও পরে ইউরোপের বহুদেশে রাষ্ট্রদূতের পদে আসীন ছিলেন। তাঁর বাবা একাদশ লুই যখন সিংহাসনের অধিকারী—রাজপুত্র, তখন থেকেই তাঁর অনুগত ছিলেন, ছেলেও তেমনি বাবার পন্থানুসরণ করেছিলেন। রাজার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল বন্ধুর মতো। বার্থা সম্পর্কে কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিল না, উপরন্তু সকলেরই ধারণা ছিল তিনি দেবীর মতোই পূজণীয়া। বার্থার সন্তানটি দুবছর বয়স পর্যন্ত মার কোলেই মানুষ হোল। এক মুহূর্তের জন্যেও বার্থা ছেড়ে থাকতে পারতো না তাকে। ওর লাল ঠোঁট দুটো প্রায় সবসময়েই লেগে থাকতো বার্থার

শুনে। ওর ছোট ছোট হাত পাগুলোও বার্থার মনে আনন্দের সৃষ্টি করতো। তার কান্নাও বার্থার কানে বাজতো সঙ্গীত হ'য়ে। চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তুলতো বার্থা এই শিশুটিকে। মা মেরীও বোধ হয় আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকে এত ভালোবাসেন নি কখনও। বৃদ্ধ ইমবার্টও খুব খুসী হতেন বার্থার এই কাজে। স্বল্পবাক্যে এই বন্ধুটির যৌন চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তা ছাড়া তিনি তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চেষ্টা করছিলেন আর একটি সন্তান লাভের আশায়। ঈশ্বরের পদে না বাধ্য হ'লেন ছেলেটিকে কর্ম্মচারীদের হাতে তুলে দিতে যাতে তারা তাকে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে। বার্থা ছেলেটিকে হাতছাড়া হ'তে দেখে কেঁদে ফেলেছিল, কিন্তু কিছুই করার ছিল না তার। ওর দুঃখ দেখে স্যার ইমবার্ট ওকে আর একটি সন্তান উপহার দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নি। বার্থা নিজেও অসন্তোষ প্রকাশ করে [illegible] সন্তান প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজী ছিল না সে।

[illegible] যুবক ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বীর যোদ্ধা হ'লেও প্রেম [illegible] যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। দুশ্চরিত্র লো[illegible] নৈপুণ্যের জন্যেই তারা মেয়েদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ ওদে[illegible] মানুষের মনুষ্যত্ব অপেক্ষা বিড়ালের বিড়ালত্বই বেশী প্রকট। এর প্রমাণ [illegible] যাবে মেয়েরা যখন খায় সেই সময়ে ওদের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখলে। [illegible] সন্তানেরা এতে আনন্দই পায় কারণ তাদের আচরণ ওদের [illegible] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃদ্ধ সৈনিক ইমবার্ট দ্য বাস্তারণেব মদনের উদ্যানে [illegible] করেছিলেন বটে কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ [illegible]। বার্থার বয়স মাত্র পনের। তার কুমারী মনের বিশ্বাস অনু[illegible] ধারণাই ছিল না মা হওয়ার আনন্দ লাভের জন্য মানুষকে এমন নোংরা [illegible] ভোগ করতে হয়। সেইজন্যে বিয়ের পরে শুধুমাত্র যন্ত্রণাই ভোগ করেছে সে, কোন আনন্দই পায়নি। সুতরাং সেই পুরোনো নিপীড়নের পুনরাবৃত্তি আর চায়নি সে। তাই সে সুরু করল সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপন করতে। মানুষের সাহচর্য আর ভালো লাগত না তার, এবং সে বিশ্বাসও করতে পারতো না যে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এত আনন্দ সুখের ব্যবস্থা করেছেন, কারণ নিজের ক্ষেত্রে সে পেয়েছে শুধু কষ্ট আর যন্ত্রণা। কিন্তু নিজের সন্তানকে সে যথার্থই ভালোবাসতো যদিও তার জন্মের জন্য অনেক যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়েছিল বার্থাকে। প্রাচীন লোকেদের মুখে থেকে এরকম অসুখী বিবাহের অনেক কথাই শুনি আমরা।

মা হয়েও কার্যতঃ কুমারী বার্থার এখন বয়স হো'ল একুশ, তাজা প্রস্ফুটিত ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি তুরেনের এই দুর্গ আর দুর্গের মালিকের গর্ব্বের বস্তু। বাস্তারণে ও প্রাণবন্ত এই মেয়েটির পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। এখন বার্থা লোচে সহরের কাছে তার স্বামীর দুর্গে বাস করে। গৃহকর্ম্ম দেখাশোনা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার। একদিন রাজা লোচে সহরের কাছে দিন কয়েক কাটাতে এলেন। সেখানে নিমন্ত্রণ হোল লর্ড ও লেডী বাস্তারণের। রাজসভায় লেডী বাস্তারণের রূপে সবাই মুগ্ধ। রাজা নিজে ভোজসভায় আপ্যায়ণ করলেন ওদের বিশেষ করে বার্থাকে। সভায় উপস্থিত যুবকেরা লোভের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে, বৃদ্ধদের শরীর গরম হয়ে উঠল ওর যৌবনের উত্তাপে। ওদের যে কেউ বার্থার কোণ ইচ্ছা পূরণ করতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী, ভগবান বা বাইবেলের উপদেশ অপেক্ষাও বেশী আলোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াল বার্থা। অন্য মেয়েরা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হোলো। ওদের উষ্মাও প্রকাশ পেতে থাকল নানা ভাবে। বার্থাকে তার নিজের দুর্গে ফেরত পাঠাবার চেষ্টাও চলতে থাকল মেয়েদের তরফ থেকে। ওদের মধ্যে একজনের স্বামী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠল বার্থার প্রতি। সেই মেয়েটি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকল আর সেই ঈর্ষাই বার্থার জীবনে নিয়ে এল দুর্যোগ। অবশ্য বার্থা সুখের ও আস্বাদন পেল সেই দুর্যোগে। প্রেমের জগতে যে এত সুখ, সে অনুভব করল এখন, অনুভব করল দৈহিক মিলনের আনন্দ। এর আগে যা কখনও পায়নি সে। সেই দুষ্টা স্ত্রীলোকটির একটি অল্পবয়সী যুবক আত্মীয় ছিল, বার্থাকে দেখার পর সে তাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। এমনকি সে ঐ দুষ্টা স্ত্রীলোকটিকে জানিয়ে রেখেছিল যে যদি মাত্র একমাসের জন্যেও বার্থাকে ভোগ করার সুখ লাভ করার সৌভাগ্য পায় তাহলে সে স্বেচ্ছায় তারপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। রমণীর ঐ ভাইটি ছিল মেয়েদের মতোই সুন্দর ও কোমল দেহবিশিষ্ট। তার দাড়ি গোঁফ কিছুই ছিল না, মুখের আদলটা ছিল এতই সুন্দর যে, যে কোন শত্রুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা মাত্র সে তা পেতে পারতো। আন্দাজ কুড়ি বছরের মতো বয়স তার, গলার স্বরটাও মেয়েদের মতো সুরেলা।

ভদ্রমহিলা ওকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভাইটি এখন বাড়ী যাও ; তুমি যাতে তোমার কাম্য স্বর্গসুখ লাভ করতে পারো তার চেষ্টায় থাকব আমি। কিন্তু দেখো, সে যেন আমি ব্যবস্থা করার আগে তোমার মুখ না দেখতে পায়, কিম্বা ওর প্রভু ঐ বাঁদরমুখো লোকটাও না দেখে তোমাকে।'

যুবকটি চলে যাবার পরই ভদ্রমহিলা বার্থার কাছে এসে নানা মিষ্টি কথা বলে ওর মন জয় করতে চেষ্টা করলেন, তাঁর একটাই বাসনা বার্থার সর্ব্বনাশ করে, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। বার্থার মনটা সরল, ভদ্রমহিলার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হল সে। ভদ্রমহিলাও ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলেন প্রকৃত প্রস্তাবে বার্থা কামলীলায় কুমারীর মতোই অনভিজ্ঞা। তার সারা মুখাবয়বে কামলীলার কোন চিহ্নই নেই। বিশ্বাসঘাতিকা ভদ্রমহিলা কয়েকটা প্রশ্ন করেও জানলেন যে সন্তানের জননী হলেও প্রকৃত প্রেম ও পরবর্ত্তীস্তরে সম্ভোগের খেলায় সে কোন দিনই সুখলাভ করতে পারেনি। নিজের দূর সম্পর্কের ভাই সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে কথা পাড়লেন। লোচে সহরেই রোহান পরিবারে এক ভদ্রমহিলা বিষম বিপদে পড়েছেন। স্বামীর সঙ্গে বিশেষ বনিবনা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে যদি বার্থা তার নিষ্পাপ মন দিয়ে ওদের মত-পার্থক্য দূর করতে সক্ষম হয়। অন্ততঃ রাজী হয় তাহলে উনি তাকে বার্থার দুর্গে নিয়ে যাবেন। বার্থা দ্বিরুক্তি না করে রাজী হো'ল, কারণ মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা তার জানা ছিল আগে থেকেই, কিন্তু মেয়েটি যার নাম শুনল "সিলভিয়া" তার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ছিল না। কারণ সে জানতো সিলভিয়া বিদেশে থাকে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন রাজা সায়ার দ্য বাস্তারণকে কেন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল তাঁর পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ডফিন বার্গাণ্ডিতে চলে গিয়েছে এবং বাস্তারণের মতো বিবেচক মন্ত্রীর মন্ত্রণা যাতে সে না পায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তারণে ছিলেন ডফিনের প্রতি একান্ত অনুগত, তাই ইতিমধ্যেই তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি বার্থাকে নিয়ে ফিরে গেলেন তাঁর নিজের দুর্গে। বার্থা সেই সময়ে বাস্তারণকে জানালেন যে তার একটি সঙ্গিনী জুটেছে। মেয়েটির সঙ্গে সে আলাপ-পরিচয় ও করিয়ে দিল স্বামীর। মেয়েটি কিন্তু আসলে সেই দুশ্চরিত্র যুবক। মেয়ের ছদ্মবেশে ঈর্ষাকাতর ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে এসেছিল। সিলভিয়া দ্য রোহনের কথা শুনে ইমবার্ট প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বার্থার কথা শোনার পর কোন আপত্তি করেননি তিনি। স্ত্রীর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। বার্গাণ্ডি যাত্রা করার আগে স্ত্রীকে অনেক আদর-টাদর করে যুদ্ধের পোষাক পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ছোট ছেলেটির মুখটা তাঁর পরিচিত ছিল না তাই তিনি ওকে একটি শান্ত, নম্রস্বভাবের মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ছেলেটিও যথাসম্ভব বাস্তারণেকে এড়িয়ে চলছিল পাছে

বার্থার সঙ্গে প্রেম করার আগেই ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বাস্তারণে দুর্গ ত্যাগ করায় নিশ্চিন্ত হো'ল সে।

(২)

এই অবিবাহিত যুবকটির প্রকৃত নাম সায়ার যেহান দ্য সাফেৎ, সিউর দ্য মমারোনেসির দূর সম্পর্কীয় ভাই। যেহানের মৃত্যুর পর তার বিষয়-সম্পত্তি ঐ ভদ্রমহিলার অধিকারে আসবে। তার বয়স মাত্র কুড়ি, কামানলে জ্বলছে সে, তাই প্রথম দিনটা যে কি কষ্ট করেই না তাকে কাটাতে হোল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বৃদ্ধ ইমবার্ট যখন ঘোড়া চালিয়ে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওরা দুজন অলিন্দে দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছিল। দূরের বাঁকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নেমে নীচের বড় ঘরটায় এসে বসল।

বার্থাই প্রথমে ছদ্মবেশী সিলভিয়াকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'এবার আমরা কি করব বোন? তোমার কি গানবাজনা ভালো লাগে? তাহলে এস আমরা একসঙ্গেই গানবাজনা করি। প্রথমে আমরা একটা মিষ্টি সুরের চারণ গান দিয়ে আরম্ভ করি কেমন? তুমি অর্গানে এসে বসো, আমি গান করি।'

যেহানের হাত ধরে সে বসিয়ে দিল অর্গানে। মেয়েদের ভঙ্গীতে সে সুরু করল অর্গান বাজাতে। প্রথম সুরটা উঠতেই বার্থা উল্লসিত হয়ে বলল, বোন, কি সুন্দরই না বাজাও তুমি। ছেলেটি ওর দিকে মুখ ফেরাল, যাতে ওরা দুজনে গলা মিলিয়ে গাইতে পারে। 'তোমার চোখ দুটোও কি সুন্দর। বার্থা আবার বলল।

ছদ্মবেশী সিলভিয়া বলল, 'এই চোখ দুটোই তো আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সমুদ্র পারের দেশের একজন লর্ড আমাকে প্রায়ই বলতেন, আমার সুন্দর চোখের কথা, আর বারবার চুমু খেতেন আমাকে। খুব ভালো লাগতো আমার।

'আচ্ছা বোন, ভালোবাসার সুরু কি চোখেতেই?'

'বার্থা, প্রিয়তমা, চোখেতেই তো মদনের আগুন।'

'যাক্, এখন আমরা গান করি।'

ওরা গান সুরু করল, প্রেমের গান। যেহান সেই গানই চায়।

তোমার গলায় কি আছে বোন, আমাকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

'কোথায়?' সিলভিয়া বলল।

'এইখানে।' বার্থা ওর হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উত্তর দিল।

'এখন গান থাক্, আমি বড্ড অভিভূত হয়ে পড়েছি। জানালার ধারে এস। আমরা একসঙ্গে বসে একটু সেলাই এর কাজ করি। সন্ধ্যের তো দেরী আছে এখনও।

'আমি তো জীবনে ছুঁচ ধরিনি হাতে, প্রিয়তমা।

'তাহলে তুমি সারাদিন কাটাতে কি করে ?'

'আমি প্রেমে ভেসে বেড়াতাম, তাতে দিনগুলোকে মনে হতো মুহূর্ত্তের মতো, মাসগুলো হয়ে উঠতো দিন, আর বছর গুলো মাস। ওই রকম চললে সারাটা জীবনই ভরে থাকতো সুগন্ধ, মাধুর্য্য আর অপরিসীম আনন্দে।

কথাটা শেষ করেই যুবকটি এমন একটা বিষাদ মলিন ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলল যে মনে হয় প্রেমিকের সাহচর্য না পেয়ে সে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

'আচ্ছা বোন, তোমার বিবাহিত জীবনে কি সে প্রেমের আস্বাদ পাওনা তুমি ?'

সিলভিয়া উত্তর দিল, 'মোটেই না। কারণ বিবাহিত জীবনে সবটাই কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রেমে মনের স্বাধীনতা আছে। প্রেমিকের চুমুর আস্বাদ স্বামীর কাছে পাওয়া যায় না।'

'আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তুটা বদলে ফেলা যাক্। তোমার গানের থেকেও এই আলোচনা আমাকে বেশী চঞ্চল করে তুলছে।'

একটা চাকরকে ডেকে সে তার ছেলেকে নিয়ে আসতে বলল। ছেলেটিকে দেখে সিলভিয়া বলল—'আরে এযে প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক !'

আবেগভরা একটা চুমু এঁকে দিল সে তার কপালে।

মায়ের ডাকে শিশুটি কোলে উঠে বসল। আদরে আদরে তাকে অস্থির করে তুলল বার্থা।

সিলভিয়া বলল, 'ওকি বোন, তুমি যে ওকে প্রেমিকের মতো সম্ভাষণ করছ !'
'প্রেম তাহলে শিশু, কেমন ?'

'হ্যাঁ, বোন, তাই তো অবিশ্বাসীরা তাকে শিশু রূপেই কল্পনা করে, আর সেই ছবিই আঁকে প্রেমের দেবতার।'

এইরকম কথাবার্ত্তা বলতে বলতে যাওয়ার সময় হয়ে এল।

'আর একটা ছেলে চাও না তুমি', সুযোগ পেয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একটা আলতো চুমু খেয়ে বলল সিলভিয়া।

'ওঃ, সিলভিয়া আর একটার জন্যে আমি একশ বছর ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজী, যদি ভগবান দয়া করে আমাকে দেন তা। কিন্তু আমার স্বামী

অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম করেও তা করতে পারেন নি। আমাকেও কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমার পেটের আয়তন একটু বাড়েনি তাতে। সত্যিই একটা সন্তান কিছুই নয়। দুর্গে যখনই আমি কোন শিশুর কান্না শুনি আমার বুকটা যেন ফেটে পড়ে। এই নিষ্পাপ শিশুটির জন্যে আমি সব কিছুতেই ভয় পাই। কিন্তু কি করব সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

কথাগুলো শেষ করে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরল। একমাত্র মায়ের পক্ষেই সম্ভব শিশুকে এভাবে আঁকড়ে ধরা। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যাবে বিড়াল কিভাবে তার শিশুকে মুখে করে ধরে নিয়ে যায়, বাচ্চার গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত না লাগিয়ে। যুবকটির একটু ভয় ছিল, বার্থার মন গলাতে পারবে কিনা। বার্থার কথায় সন্দেহের নিরসন হল।

রাত্রে প্রাচীন প্রথানুযায়ী বার্থা সিলভিয়াকে তার রাজশয্যায় সঙ্গিণী হতে অনুরোধ জানাল। সিলভিয়া আনন্দে অধীর হয়ে রাজী হল। এত সহজে যে সুযোগ আসতে পারে তা ছিল তার কল্পনার অতীত। রাত্রের অন্ধকার নেমে আসতে ওরা প্রবেশ করল সুসজ্জিত শয়ন কক্ষে। বার্থা পরিচারিকাদের সাহায্য নিয়ে পোষাকগুলো খুলে ফেলল। সিলভিয়া রাজী হল না ওদের সাহায্য নিতে। শুধু বলল নিজেই পোষাক খোলার অভ্যাস আছে তার। বার্থা একটু অবাক হল তার কথা শুনে, কিন্তু আর কিছু না বলে একত্রে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়ে শোবার আয়োজন করতে সুরু করল। যুবকটি কামানলে জ্বলছিল বার্থার নগ্ন দেহ দেখে। একজন অভিজ্ঞ মেয়ে তার সঙ্গে আছে মনে করে বার্থা নৈমিত্তিক কাজগুলো করে যেতে লাগল। পা দুটো ধুয়ে নিল সে, একবারও ভাবল না যে কতখানি তুলছে সে পা দুটো, দেহের কতখানি প্রকট হল তাতে। তারপর সে উঠল বিছানায়, আরাম করে বসে সিলভিয়ার ঠোঁটে চুমু খেল নিবিড়ভাবে, দেখল যেন জ্বলছে তার সারা অঙ্গ।

'তোমার কি কোন অসুখ করেছে সিলভিয়া? গাটা বেশ গরম লাগছে।'

শোবার সময় আমার গাটা গরমই হয়ে ওঠে, এই সময়ে আমার পুরোন প্রেমের খেলার কথাগুলো মনে পড়ে কিনা! ওঃ কত নতুন নতুন খেলা আবিষ্কার করত আমার প্রিয়তম।'

'আমাকে সব কথা খুলে বল বোন.। বড্ড শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'তোমার আদেশ আমার শোনা উচিত কিনা, ভাবছি আমি।'

'কেন নয়, বল।'

'কথার থেকে কাজে আরও বেশী বোঝা যায় নাকি? ছদ্মবেশী কুমারী

বলল, 'কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে আমার প্রেমিক আমাকে যত আনন্দ দিতে পেরেছিল আমি ততটা পারব কিনা! আমি বড় জোর একটা মেয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

'খুব ভাল হয় তাহলে, দেবদূতেরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। এখন তাড়াতাড়ি সুরু কর।' বার্থা বলল।

'আমার প্রিয়তম এইভাবে আমাকে সুখ দিতেন।' কথাটা বলেই যেহান বার্থাকে কোলে টেনে নিল। বাতির ম্লান আলোয় পাতলা আচ্ছাদনে আরাম-দায়ক বিছানায় বার্থাকে দেখাচ্ছিল একটা সুন্দর লিলি ফুলের মতো।

'আমাকে এইভাবে কোলে নিয়ে আমার থেকে অনেক মিষ্টি সুরে সে বলত, আঃ বার্থা তুমি আমার চিরকালের প্রিয়তমা, আমার হৃদয়ের রাণী। পৃথিবীতে তোমার মত প্রিয় কিছুই নেই! ভগবানের থেকেও আমি তোমাকে বেশী ভালোবাসি। তোমার কাছে সুখ পাবার জন্যে আমি হাজার বার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী। তারপর সে আমাকে চুমু খেতো, স্বামীরা যেভাবে খায় সেভাবে নয়, পায়রা যেভাবে খায় সেই ভাবে।

বার্থার ওষ্ঠাধব থেকে সবটুকু মধু চুষে নিয়ে সেটা দেখিয়ে দিল সে। বার্থাকে সে বুঝিয়ে দিল তার গোলাপী ছোট পাতলা জিভটা দিয়ে মুখে কোন কথা না বলেও হৃদয়ের ভাষা কিভাবে প্রকাশ পায়। তারপর চুম্বন বৃষ্টি শুরু হল মুখ থেকে ঘাড়ে বুকে আর সুগঠিত নরম পয়োধরে।

বার্থা নিজের অজান্তেই প্রেমে গলে গিয়ে 'আহা, কি মধুর! আমি ইমবার্টকে অবশ্যই এরকম করতে বলব।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বোন? তোমার বুড়ো স্বামীকে এসব কথা কিছুই বলবে না। তার হাত আমার মতো নরম কি করে হবে? ধোবার হাতের মতো শক্ত ওর হাত, আর খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো তোমার বুকে লাগলে কি ভাল লাগবে? এই বুকেতেই তো রয়েছে তোমার প্রেম ভালবাসা আর আনন্দের অফুরন্ত উৎস। এটা তাজা ফুল, এইভাবে চুমু খেতে হয় এখানে, নিপীড়ন করলে সুখ লাভ হয় না। এই রকমই ছিল আমার প্রিয়তম ইংরেজ প্রেমিকের প্রেম করার ভঙ্গী।

এইসব কথা বলতে বলতে সুদর্শন যুবকটি কামোত্তেজিতা বার্থাকে সম্ভোগ করতে সুরু করল। বার্থা আনন্দে উদ্বেল হয়ে জড়িয়ে ধরল যেহানকে।

'আঃ বোন, আমি দেবদূতের উপস্থিতি অনুভব করছি। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি, কিন্তু ওদের দেহের উজ্জ্বল আভায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে,

কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি।

সম্ভোগ সুখের আধিক্যে এলিয়ে পড়ল ওর দেহটা শেষ পর্যায়ে। দেহের প্রতিটি তন্ত্রী, শিরা উপশিরায়, বার্থা অনুভব করতে লাগল স্বর্গসুখ। তার বিশ্বাস জন্মাল সত্যিই সে উপনীত হয়েছে স্বর্গে। যেহানের বাহু ডোরে তখনও আবদ্ধ সে, বাকশক্তি হীন, শুধু একটা কথাই বেরুল ওর মুখ থেকে,—

'আঃ, ইংল্যাণ্ডে বিয়ে হওয়ার কি সুখ!'

যেহানের রেতঃস্খলন হয়ে গিয়েছে, সম্ভোগ সুখের আনন্দ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে, সে উত্তর দিল, 'প্রিয়তমা. ফ্রান্সেই তোমার বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হয়েছে আমার সঙ্গে। আমি পুরুষ, তোমার জন্য আমি হাজার বার মরতেও রাজি।'

বার্থা চমকে উঠে এমন চিৎকার করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল যে যেহান ভয় পেয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে বার্থা যেহানের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা সুরু করল। দু'চোখের কোল বেয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগল তার। 'আমার মৃত্যু হোক'! দেবদূতের মতো সুন্দর মুখের শয়তান, আমায় প্রতারণা করেছে। নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর শিশুর মা হতে চলেছি আমি। হে মা মেরী, ক্ষমা করো আমায়।'

যেহান যখন দেখল তার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না, তখন সে উঠল। বার্থার সজল চোখের দৃষ্টিটা মুগ্ধ করল তাকে। বার্থা শয়তানকে উঠতে দেখে লাফিয়ে উঠল। 'এক পা এগোবে না। এই আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে।' বললাম।

আবছা আলোয় যেহান দেখল একটা কিছু হাতে ধরে রয়েছে সে।

দৃশ্যটা এত হৃদয় বিদারক যে যেহান অভিভূত হয়ে পড়ল। 'তোমার নয়, মৃত্যুটা আমারই বরণ করা উচিত, প্রিয়তমা। তোমার মতো অসামান্যা রমণী পৃথিবীতে আর জন্মাবে না।'

'তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতে তাহলে এভাবে আমার মৃত্যুর কারণ হ'তো না। কারণ স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হবার আগেই আমাকে মরতে হ'বে।'

'তুমি মরবে?' সে বলল।

'অবশ্যই।' সে উত্তর দিল।

'দেখো, যদি তীক্ষ্ন তরবারি দিয়ে আমাকে হাজার বার বিদ্ধ করো তো তুমি তোমার স্বামীর ক্ষমা নিশ্চয়ই পাবে। তুমি তাকে বলবে তোমার সরলতার

সুযোগ নিয়ে যে তোমাকে ঠকিয়েছে তাকে হত্যা করে তুমি তার শোধ নিয়েছ। আর আমিও এই আনন্দ নিয়ে মরতে পারব যে তোমার মতো প্রেমিকার হাতে আমার মৃত্যু হয়েছে, যে আমার প্রেমকে উপেক্ষা করে আমার সঙ্গে বাস করতে রাজী নয়।'

চোখের জলে মেশা মিষ্টি কথাগুলো শুনে বার্থা ছুরিটা ফেলে দিল হাত থেকে। যেহান একলাফে কুড়িয়ে নিল সেটা, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের বুকে বসিয়ে দিল সেটা।—বলল, 'যে সুখ আমি পেয়েছি একমাত্র মৃত্যু দিয়েই তা শোধ করা যায়।'

কথাটা বলেই সে পড়ে গেল। শক্ত হয়ে উঠল ওর দেহটা।

বার্থা ভয় পেয়ে চিৎকার করে পরিচারিকাকে ডাকল। একজন পরিচারিকা ছুটে এল। মাদামের ঘরে একজন আহত ব্যক্তিকে দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল সে। মাদাম তখন তার মাথাটা তুলে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'একি করলে তুমি প্রিয়তম? ও বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে যেহান মারা গিয়েছে। তখন ওর মনে যে চিন্তাটা সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হ'চ্ছে, যেহানের আকৃতিটা কি সুন্দর। এমন কি ইমবার্টও ওকে মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছিল। দুঃখে তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে পরিচারিকার কাছে সবকিছু স্বীকার করে ফেলল সে। ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে হতভাগ্য প্রেমিকটি তার চোখ খুলতে চেষ্টা করল।

মাদাম কাঁদবেন না, পরিচারিকাটি বলল, 'আসুন আমরা মাথা ঠিক রেখে এই সুন্দর পুরুষটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। আমি গিয়ে লা ফ্যালোকে ডেকে আনাই। অনেক টোটকা ওষুধ-বিষুধ সে জানে আর এমনভাবে ক্ষত সারাতে পারে যে ক্ষতস্থানে কোন আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। এইরকম গোপন ব্যাপারে কোন চিকিৎসককে ডাকা ঠিক হবে না।'

'তাহলে দৌড়ে যাও! বার্থা বলল।' আমি তোমাকে ভালোবাসব, আর আমাকে এই সাহায্য করার জন্যে তোমাকে মোটারকম পুরস্কার দেব।'

কোন কিছু করার আগে মাদাম ও তাঁর পরিচারিকার মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হোল যে দুজনেই মুখ বুজে থাকবে এবং যেহানকে লুকিয়ে রাখা হ'বে যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে। অতঃপর পরিচারিকাটি লা ফ্যালোকে ডেকে আনতে গেল। 'বার্থা দুর্গের ফটকটা শান্ত্রীকে বলে খুলিয়ে দিল ওর জন্যে। বার্থা ঘরে ফিরে এসে দেখল তার প্রেমিক অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। যেহান যে তার জন্যই মৃত্যু বরণ করতে গিয়েছে

একথা ভেবে সে তার রক্ত একটু মুখে দিল, তারপর ওর ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটোয় একটা চুমু খেয়ে, চোখের জলে ক্ষত স্থানটা ধুয়ে ভালো করে বেঁধে দিল। বার বার অনুরোধ জানালো, 'প্রিয়তম, বেঁচে ওঠো তুমি, তোমাকে আজীবন ভালোবাসব আমি।' বৃদ্ধ ইমবার্টের সঙ্গে যেহানের তুলনা করে সে মনকে প্রবোধ দিল, এই সুন্দর পুরুষটি তার জীবনে স্বর্গসুখ এনে দিয়েছে, সম্ভোগের যে অপরিসীম আনন্দ ইতিপূর্বে সে আস্বাদন করেনি তাই সে পেয়েছে যেহানের কাছে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে বারবার চুমু খেল যেহানের মুখে। তার উষ্ণ চুম্বনের স্পর্শে যেহানের জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল। তখন সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমায় ক্ষমা করো প্রিয়তমা।' বার্থা তাকে যতক্ষণ না লা ফ্যালো আসেন ততক্ষণ চুপ করে থাকতে বলল। দুজনে চুপচাপ সময় কাটাতে লাগল চোখে চোখে ভালোবাসা দেখিয়ে।

লা ফ্যালো, কুঁজো, অনেক তন্ত্রমন্ত্র জানা আছে তার। আর ডাইনিদের স্বভাবজাত বিদ্যায় পারদর্শিনী। সত্যি কথা বলতে কি অনেক ঔষধ-বিষুধই জানা আছে তার এবং মেয়েদের ও অভিজাতদের অনেক রকম গোপন ব্যাধির চিকিৎসা সে করে থাকে। অনেক অর্থই উপার্জ্জন করে সে, যদিও প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকেরা প্রচার করেন যে লা ফ্যালো গোপনে বিষ বিক্রি করে। কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়। লা ফ্যালো এবং পরিচারিকাটি একই গাধায় চেপে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌছল। ঘরে ঢুকে চশমাটা চোখে লাগিয়ে সে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করল, তারপর স্পঞ্জ দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করে ভালো করে বেঁধে ছিল। 'ক্ষতটা গভীর নয়, প্রাণে অবশ্যই বাঁচবে, কিন্তু গতরাতের পাপের জন্যে এর জীবনে ভয়ানক দুর্যোগ আসবে।' লা ফ্যালোর এই ভবিষ্যদ্বানীতে বার্থা এবং পরিচারিকা দুজনেই ভয় পেয়ে গেল। কয়েকটা ঔষুধ দিল সে, আর জানাল আগামী রাতে সে আবার আসবে। একপক্ষকাল ধরে প্রতিটি রাতেই আসতো সে। দুর্গবাসীরা শুনেছিল, সিলভিয়া দ্য রোহন মারাত্মক রকম অসুখে ভুগছেন, পেটে জল জমেছে তার এবং যেহেতু তিনি মাদামের সম্পর্কীয় বোন সেই কারণে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা। সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল এই গল্প।

অনেকের ধারণা হয়েছিল অসুখটা সাংঘাতিক রকমের, বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেটা মোটেই সত্যি নয়। যেহান আরোগ্য লাভ করেছিল। যেহানের শক্তি যত বাড়ছিল বার্থা তত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যেহান যে স্বর্গের দ্বার তার জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সেই দিকেই সে এগিয়ে চলছিল দ্রুত

গতিতে। এক কথায় যেহানের প্রতি তার প্রেম বাড়ছিল দিন দিন। কিন্তু এই সুখের মধ্যেও মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হোত ফ্যালোর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ায়। স্বামীকে খুব ভয় করতো সে। বার্থা দিনের বেলা এড়িয়ে চলতো যেহানকে। সেই সময়ে সে চিঠি লিখতো ইমবার্টকে। যেহান ভাবতো বার্থা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, তাই সেও কাঁদতো। রাত্রে যখন বার্থা তার গালে চোখের জলের দাগ দেখতো সেও অভিভূত হয়ে পড়তো। নানা কথায় সে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতো যেহানকে। যেহানও তাকে সান্ত্বনা দিত এই বলে যে এইজগতে এবং মৃত্যুর পরেও সে একান্তভাবে তারই কৃতদাস হ'য়ে থাকবে। বার্থা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ত ওর বুকে।

এইভাবে অনেকদিন ধরেই চলল ওদের প্রেমলীলা। মনে দ্বন্দ্ব সংশয় থাকা সত্ত্বেও সম্ভোগের আনন্দ ওরা উপভোগ করতো পরিপূর্ণ ভাবেই।

মসিয়ে ইমবার্ট দ্য বাস্তারণের ফেরার সময় এগিয়ে এল। আগের দিনই সিলভিয়া দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হোল। অনেক কান্নাকাটি চুম্বন আদান-প্রদানের পর বার্থা বিদায় দিল তাকে…

এদিকে ইমবার্ট ফিরে এসে দেখলেন বার্থার কোমরটা বেশী ভারী হ'য়েছে, আনন্দিত হলেন তিনি। আর বার্থা যখন একটি ফুটফুটে দেবদূতের মতো ছেলেকে পৃথিবীতে নিয়ে এল তখন তিনি আনন্দে অধীর হয়ে স্থির করলেন, ছোটছেলেকেই তিনি মনে করবেন বড় বলে, আর বড় ছেলে থাকবে ছোট হয়ে। কারণ বড়টির তখন মুখের আদল হয়েছে তাঁর নিজের অর্থাৎ বাঁদরের মতো।

পরিচিতি

HONORE DE BALZAC : Bertha the Renilent

॥ অনের দ্য বালজাক ॥ বালজাক ফরাসী সাহিত্যে এক প্রধান পুরুষ। যে সমস্ত সাহিত্যিক গল্পের রূপ, রস ও আঙ্গিককে রহস্যকাহিনী ও আদিরসের শিহরণে জাগরিত করেছেন অনের দ্য বালজাক তাঁদের মধ্যে একজন। ফলে তার লেখায় রহস্য গল্পের স্বাদ ছাড়াও যা সমগ্র গল্পকে ব্যাপ্ত করে আমাদের আপ্লুত করে তা এক মহান অনুভূতি। তিনি ১৭৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৫০ সালে পরোলোকগমন করেন।

জেনি | আলেকজাণ্ডার ক্যুপেরিন

ঘোড়ায়টানা গাড়ীর জায়গায় যখন লোহার ঘোড়া অর্থাৎ রেল গাড়ীর পত্তন হো'ল তখন দক্ষিণ রাশিয়ার ইয়ামা জেলার বড় সহরটার সহরতলীর যে জায়গাটায় কোচোয়ানদের বাসস্থান ছিল সেই জায়গায় গড়ে উঠল এক বেশ্যাপল্লী। আগে যেখানে পুরোণ বাড়ীগুলোতে গোলাপ রাঙা গাল আর ফুলে ওঠা বুক নিয়ে কোচোয়ানদের বিধবারা ভদ্‌কো আর বিনি পয়সায় প্রেম বিক্রি করত, সেইখানেই রাস্তার দুপাশে দ্বিতলায় বাড়ীগুলো দাঁড়ালো মাথা

তুলে। ইয়ামার ঐ পল্লীর ত্রিশটা বাড়ীর জীবনযাত্রা ছিল একই ধরণের। সবগুলোই ছিল সরকারী তত্ত্বাবধানে। একমাত্র পার্থক্য যা চোখে পড়ত তা হচ্ছে তাৎক্ষণিক নিবিড় অনুরাগ আর ভালোবাসার মূল্যের পার্থক্য।

বড় ইয়ামা স্ট্রীটের বাঁদিকের প্রথম বাড়ীটা অর্থাৎ ট্রেপেলের বাড়ীটাই ছিল সবচেয়ে জমকালো। ট্রেপেলের গর্ব ছিল যে তার বাড়ীর সিঁড়ি ছিল কার্পেটে ঢাকা, আর প্রবেশ পথের সামনের হলটায় ছিল প্রসারিত থাবায় থালাধরা একটা মৃত ভল্লুক। শোবার ঘরগুলোয় ছিল গোলাপী কাঁচ দেওয়া লণ্ঠন, বিছানার চাদরগুলো সিল্কের আর বালিশগুলো পরিচ্ছন্ন। ট্রেপেলের মেয়েরা ছোট ছাঁটের ফার লাগানো সান্ধ্য গাউন পরত, আবার কখনও পুরুষের পোষাক, যেমন সৈনিক, বড়লোকের ভৃত্য অথবা নাবিকের পোষাক পরেও থাকত। বেশীর ভাগ মেয়েই ছিল বাল্টিক রাজ্যগুলির জার্মান মেয়ে, দীর্ঘকায়া, সুন্দরী। দুধের মতো ধবধবে ছিল ওদের গায়ের রং, আর বুকের গঠনও ছিল নিখুঁত। ট্রেপেলের মেয়েদের বাঁধা ধরা দর ছিল একবার যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে যাবার জন্য তিন রুবল, আর সারা রাতের জন্য দশ রুবল।

ট্রেপেল ছাড়াও আরও তিনজনের বাড়ী ছিল ওখানে। সেগুলোতে তিন রুবলের জায়গায় দু'রুবল করে নেওয়া হ'ত। সোফিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার বাড়ী, বুড়ো কিয়েভের বাড়ী আর আন্না মারকোভ্‌নার বাড়ী; এগুলোও অভিজাত তবে ঠাট্ ঠমক কম। বড় ইয়ামাস্ট্রীটের অন্যান্য বাড়ীগুলোতে মাত্র এক রুবলের বিনিময়েই সব পাওয়া যেত, কিন্তু কোনোরকম আভিজাত্য ছিল না সে সব বাড়ীতে। ছোট ইয়ামাস্ট্রীটের বাড়ীগুলিতে যাতায়াত ছিল সৈনিক আর নিম্নশ্রেণীর লোকেদের। সেখানকার দর ছিল মাত্র পঞ্চাশ কোপেক। এসব জায়গায় শোবার ঘরগুলো ছিল কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট সুপরির মতো। পার্টিশনগুলো আবার ছাদ পর্যন্ত নয়। ঘরের উচ্চতার মাত্র অর্ধেকটা ঢাকা পড়ত তাতে। মদ আর মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনায় স্থানটা ছিল দুর্গন্ধময়, আর এখনকার মেয়েরা সাধারণ সুতির পোষাক পরে থাকত। তাদের মধ্যে কোমলতা আর সৌন্দর্যের আভাষ খুঁজে পাওয়া যেত না, আর বিগত রাতের আঘাতের চিহ্নও তারা ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা করত না।

রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে পতিতালয়গুলির বাঁকানো প্রবেশপথে লাল আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত। তারপর রাস্তাগুলোয় নেমে আসত ছুটির দিনের আবহাওয়া। জানালার খড়খড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ভেসে আসত টুকরো টুকরো গানের কলি। সারারাত ধরে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির শব্দ শোনা যেত। ভোর পর্যন্ত শ'য়ে শ'য়ে, না, হাজারে হাজারে লোক আসা যাওয়া করত। এখানে সকলেই আসত,—বিগত যৌবন বৃদ্ধ তার শেষ উত্তেজনার আগুন প্রশমিত করার জন্যে, স্কুল কলেজের ছাত্রেরা, সমাজের স্তম্ভস্বরূপ গণ্যমান্য

ব্যক্তিরা, চোর, গোয়েন্দা, এমনকি স্ত্রীজাতির সমানাধিকারের জন্যে ওকালতি করেন যেসব খ্যাত অখ্যাত লেখক সাহিত্যিক, তাঁরাও আসতেন। একের পর এক আসতেন তাঁরা, লাজুক আর সাহসী, পীড়িত আর সুস্থ্য, স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রথম যাঁরা জানবেন, আর পুরোন পাপী যারা সবরকম পাপেই অভ্যস্ত, সকলের আগমন ঘটত এ জায়গায়। এদের মধ্যে থাকতেন প্রকৃত সুপুরুষ, আবার প্রকৃতির অভিশাপে কুরূপ ঘৃণ্য ব্যক্তি, বোবা, অন্ধ. নাসিকাহীন, অত্যধিক মেদবিশিষ্ট, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত অথবা উকুনে ছাওয়া সারাদেহ এমন অপরিচ্ছন্ন লোকেরও সমাগম হ'ত এইসব বেশ্যালয়ে। এরা আসত লজ্জাকে দূরে সরিয়ে রেখে, যেন কোন রেস্তোঁরায় খেতে এসেছে। তারা বসত, মদ খেত, হাসত, আর ভান করত যেন যথেষ্ট আনন্দ লাভ করছে। কখনও আড়ম্বর সহকারে কখনও অশোভনীয় তৎপরতায় তারা পছন্দ করে নিত এক একটি মেয়েকে। তারা ভালোভাবেই জানত যে প্রত্যাখানের কোন প্রশ্ন এখানে নেই। জগতের সুন্দরতম অনুষ্ঠান, এক নতুন প্রাণের আবির্ভাবের সম্ভাবনা—সেই অনুষ্ঠানকে কলুষিত করত তারা। আর ঐ স্ত্রীলোকগুলো, সর্ব্বদাই যারা অর্থের বিনিময়ে দেহদানে প্রস্তুত—যন্ত্রের মতো কাজ করে চলত। সেই একই প্রকারের চুম্বন, আদর আর পেশাগত ঠাট ঠমক দেখিয়ে ওদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। একই রাত্রে একই রকম কথা বলে, হেসে আর অঙ্গভঙ্গী করে তারা তৃতীয়, চতুর্থ…দশম ব্যক্তিকেও গ্রহণ করত এবং সেই সময়েই হয়ত একাদশতম ব্যক্তি বাইরের বসার ঘরে অপেক্ষা করে আছে, কখন তার ডাক পড়বে। এই ভাবেই চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যেন এর শেষ নেই। সর্ব্বসাধারণের জন্যে অবারিতদ্বার এই হারেমে সমাজবহিস্কৃত এই নারীরা এক অসম্ভব জীবন যাপন করত।

আন্না মারকোড়নার দু'রুবলের বাড়ীতে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই খাওয়ার পাট চুকে যেত ; তারপর বয়ে চলত সারারাতের হৈ-হুল্লোড়। গতরাতেও অন্যান্য রাতগুলোর মতো সারা বাড়ীটা মুখরিত হয়েছিল প্রাণবন্ত গানের সুরে। বৈঠকখানা ঘরে স্ত্রীপুরুষে একত্রে পাছা দুলিয়ে, পরস্পরের পায়ে পা লাগিয়ে মাতামাতি করেছিল। কিন্তু এখন সেখানে কেউ নেই, আর যারা স্থায়ী বাসিন্দা তারাও তন্দ্রাচ্ছন্ন। স্থির বাতাসে কিন্তু এখনও উত্তেজনার নারীপুরুষের গায়ের সুগন্ধি পাউডার, ওষুধযুক্ত সাবান, উগ্র এসেন্স আর তামাকের গন্ধ ভাসছে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে মাংস পোড়ার শব্দ। ওগুলো দিয়ে তৈরী হ'বে কাটলেট, সান্ধ্যকালীন আহারের জন্যে।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে লম্বা উঠোনে নেমে এল। শুধু মাত্র সায়াপরা, খালি পা। সুন্দরী না হ'লেও ওর দেহটা বেশ সুগঠিত আর তাজা। গতরাত্রে ওর ঘরে মাত্র দুজন অতিথি এসেছিল, সারারাতের জন্যে কেউ ছিল না। প্রশস্ত বিছানায় একা একা বেশ ভালোই ঘুম হয়েছে ওর। তাই সবার আগে ওরই ঘুম ভেঙ্গেছে। এখন বাড়ীর বাদামী রং এর বড় কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছে ও।

সারারাতের অতিথিরা সকলেই চলে গিয়েছে। এক এক করে মেয়েরা ওদের নিজের নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে খারাপ লাগে। এক অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে মেয়েরা। ওদের পরনে শুধুমাত্র সেমিজ। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় ওরা। কখনও পিয়ানোয় ছোট একটুখানি সুর তোলে, কখনও বা কয়েকজনে মিলে তাস খেলতে বসে, একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি করে, আর অপেক্ষা করে থাকে কখন সন্ধ্যা নামবে ; আরম্ভ হ'বে ওদের কাজের পালা।

কয়েকজন মেয়ের একটা জটলা জমা হ'য়েছে ছোট মান্‌কার ঘরে! ছোট মান্‌কা এই নামকরণ হয়েছে ওর, কারণ একজন বড় মান্‌কা আছে ওখানে, যার পরিচিতি 'কুমীর মান্‌কা' নামে। বিছানার ধারে বসে ছোট মান্‌কা আর একটি সুন্দরী মেয়ে যার ভ্রূযুগল ধনুকের মতো বাঁকা আর বড় বড় চোখদুটি ধূসর, তাস খেলছিল। জেনীও পেছনে বিছানার ওপর শুয়েছিল। ডুমাসের 'রাণীর হার' বইটা পড়ছিল ও। ওর ঠোঁটে ঝুলছিল একটা সিগারেট। এই বাড়ীতে একমাত্র ওই বই পড়তে ভালোবাসে। কোনরকম বাছ বিচার না করে যা পায় তাই মনোযোগ সহকারে পড়ে ও। অবশ্য ওর সবচেয়ে ভালোলাগে রোমাণ্টিক উপন্যাস, যে সব কাহিনীর বুনুনি ভালো আর বেশ কায়দা করে একের পর এক জট্ ছাড়ানো হ'য়েছে। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে জেনী সর্বকিছুর ওপরই বিরক্ত। আন্না মারকোড়নার বাড়ীতে ওরই নাক সবচেয়ে উঁচু। ওর স্থান সবার উঁচুতে, সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল ওর প্রাপ্য। রোগা লম্বা চেহারা ওর, মুখে গর্ব্বের ছাপ আর হ্যাজেলের মতো ওর চোখ দুটোয় যেন ওর মনের আগুনের উত্তাপ। মুখ থেকে সিগারেট না নামিয়েই কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে ও বই এর পাতা উল্টে চলেছিল আঙ্গুল দিয়ে। তামারাও বসেছিল ওই বিছানায়, পায়ের ওপর পা দিয়ে একমনে ঝুঁকে সেলাই এর কাজ করছিল সে। বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা মেয়েটির, একমাথা লালচুল। শীতকালে শিয়ালের পিঠের লোমগুলো যেমন জ্বল জ্বল করে তেমনই আগুন রাঙা চুল। তামারা আগে কিছুদিনের জন্যে একটা কনভেণ্টে সন্ন্যাসিনী হিসাবে শিক্ষানবিশী

করেছিল। তার বিবর্ণ মুখে সন্ন্যাস-জীবনের সেই ছাপ অস্পষ্ট হ'লেও এখনও বিদ্যমান। সে নিজেকে সব সময়ে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত। তার ভাসা-ভাসা চোখে একটা রহস্যময় অপরাধীর দৃষ্টি। সম্ভবতঃ কনভেন্টের দিনগুলো থেকেই অনেক রহস্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল সে। আগে এখানকার মেয়েরা শ্রদ্ধা সমন্বিত বিস্ময় নিয়ে তার নির্ভুল ফরাসী আর জার্মান ভাষায় কথা বলা শুনত। ওর বাইরেকার শান্ত স্বভাব দেখে ওর অন্তরের শক্তি আর জেদের পরিচয় পাওয়া যেত না। এই প্রতিষ্ঠানের সকলেই, এমনকি বেশ্যালয়ের সর্ব্বশক্তিমান সর্দ্দার পর্যন্ত ওকে সমীহ করে চলত।

জয়া তেলচিটে নোংরা তাসগুলো ফাঁটিয়ে মানকাকে দিয়ে কাটিয়ে থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে নিয়ে বাঁটছিল। তামারা সেলাই থেকে মুখ না তুলেই নীচু গলায় মানকার সঙ্গে কথা বলছিল।

'আমরা কাপড়ের ওপর সোনার কাজ করতাম। শীতকালে আমরা বসে থাকতাম জানালার ধারে। কথা বলা আমাদের বারণ ছিল। আশ্রমের মাতাজ ছিলেন খুব কড়া। আমাদের মধ্যে একজন স্তোত্রের প্রথম লাইনটা গাইতে আরম্ভ করত, 'শোন, ওহে স্বর্গবাসী আমার স্তুতি গান'। আমরা বেশ ভালোই গাইতে পারতাম আর সেই জীবনটা ছিল শান্তিতে ভরা—হ্যাঁ, ফেলে আসা সেই জীবনটা এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।'

জেনী তার বইটা পেটের ওপর রাখল, সিগারেটটা জয়ার মাথায় একবার ঠুকে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বল্‌ল—'আমরা তোমাদের ঐ শান্তির জীবনের সব কথাই জানি। তোমরা তোমাদের পেটে আসা অর্দ্ধেক সন্তানদের পায়খানায় ফেলে দিতে। তোমাদের ঐ সব পবিত্র জায়গার আশেপাশেই শয়তান ঘোরাফেরা করে।'

জেনীর এই ঠাট্টার জবাবে তামারা মৃদু হাসল। তার ঠোঁট নড়ল না, কিন্তু মুখের দু'প্রান্ত সামান্য সংকুচিত হো'ল। সেই হাসির আভাষ পাওয়া যায় দা ভিঞ্চির মোনালিসার ছবিতে।

'তোমরা সন্ন্যাসিনীদের সম্পর্কে অসম্ভব সব কাল্পনিক গল্প সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত।' সে বলল, 'কিন্তু যদি কিছু পাপ থেকেই যায় তাতে কার কি এসে যায়।'

'পাপ না করলে অনুতাপ করতে হয় না। জয়া বলল। জেনী তামারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল। 'নাঃ তুই সত্যিই খুব মজার মেয়ে তামারা। অতিথিদের কাছ থেকে তুই সব সময়েই আমাদের থেকে অনেক বেশী পাস্। কিন্তু সে পয়সা না জমিয়ে তুই সাতরুবল খরচ করে

এক বোতল সেণ্ট কিনিস্। কি জন্যে? আর এখন তুই পনের রুবল দিয়ে সিল্ক কিনেছিস্। ওটা তোর প্রেমিক সেন্কার জন্যে, তাই না?'

'স্বভাবতই।'

'তুই নিশ্চয়ই ওর কাছ থেকে বিশেষ কিছু পেয়েছিস্। হতভাগা চোরটা! এমনভাবে এখানে ঘুরে বেড়ায় যেন পাঁচটা তারা পাওয়া সেনাপতি। অবশ্য তোর যা কিছু আছে সবই নেয় সে।'

'আমার যা দেবার ইচ্ছে হয় সেইটুকুই দিই আমি।' তামারা দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে বলল।

'সেইটাই তো অবাক লাগে আমার। তোর মত সুন্দর মুখ আর বুদ্ধি থাকলে আমি এমন একজন বড়লোককে গাঁথতাম যে আমাকে সুখে রাখত।'

'ওটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার জেনিচ্কা। তুমিও যথেষ্ট সুন্দর আর স্বাধীনও বটে, কিন্তু এখানে তুমি আমি দু'জনেই আন্নামারকোড়নার তাঁবে রয়ে গিয়েছি।'

জেনী জ্বলে উঠ্ল, 'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তুমি ভাগ্যবতী, সবচেয়ে ভালো অতিথিগুলোই তুমি পেয়ে থাক। তুমি তাদের নিয়ে কি করতে চাও? আমার ভাগ্যে জোটে হয় বুড়ো না হয় অনভিজ্ঞ খোকা। ঐ খোকাগুলোকেই সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার। কতকগুলো আবার ভীতু বাচ্চাও আসে। খুব তাড়া থাকে তাদের। আর যখন ওদের কাজ হ'য়ে যায় তখন এত লজ্জা পায় যে মুখের দিকে তাকাতেই পারে না ওরা। সব সময়েই চুল বুল করে। আমার ইচ্ছে হয় সজোরে চড় মারি ওদের গালে। ওরা মার কাছ থেকে পাওয়া টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে এখানে খরচ করতে আসে। সেদিন একটা বাচ্চা সৈনিক এসেছিল। আমি তাকে বললাম, 'মিষ্টি ছেলে, এস একটা ক্যারামেল নাও। তোমার সামরিক স্কুলে ফেরার পথে ওটা খেও, প্রথমে ওটা নিতে চায়নি সে। আমি জানালা দিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম তাকে, দেখলাম বাইরে বেরিয়েই এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে সেটা মুখে পুরে দিল ও। বাচ্ছা শুয়োর একটা!'

মান্কা বলল, 'বুড়োগুলো আরও পাজী। তুই কি বলিস্ জয়া?' জয়া ঠিক করতে পারল না, হাসবে না রাগ করবে। তার একজন বাঁধা খরিদ্দার আছে, বয়স্ক, পদমর্য্যাদায় ভারী আর কামক্রীড়ায় অত্যন্ত অসভ্য। সকলেই জানে সে কথা। বুড়োটার জয়ার কাছে আসা যাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করে।

'উচ্ছন্নে যা, বুড়ো বেজম্মাটার সঙ্গে নরকে যা! বলল জয়া।

'ওদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে তামারার প্রেমিক। চুরচুরে মাতাল

হ'য়ে আসে সেটা। সব সময়েই সুযোগ খোঁজে ঝগড়া মারামারির; কুত্তার বাচ্চা! ওহ্ মারামারিটা আমার সঙ্গে করে না! বলে, আমার ছোট্ মান্কা, মানেচ্কাকে আমি চিরকাল ভালবাসি।'

হঠাৎ মান্কার গলা জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল জেনী। জোর করে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়, তারপর গভীর আবেগে একের পর এক চুমু খেয়ে যেতে লাগল। মান্কা অস্বস্তিবোধ করলেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

এই বাড়ীটায় মান্কাই সবচেয়ে শান্ত মেয়ে। ওর মনটা খুব নরম, কখনও কোন অনুরোধ এড়াতে পারে না। সকলেই ওকে স্নেহ করে। সহজেই রাঙা হ'য়ে ওঠে ওর মুখ। যারা নিরীহ মেয়ে খোঁজে তাদের কাছে ওর খুব কদর। কিন্তু একটুখানি মদ খাইয়ে দিলেই ওর মূর্ত্তি হয় অন্য রকম। তখন এমন গোলমালের সৃষ্টি করে যে সর্দ্দার এমনকি পুলিশকেও ডেকে আনতে হয় ওকে সামলাবার জন্যে। কোন অতিথিকে মারধোর করা বা মুখের ওপর মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারা মান্কার কাছে কিছু নয়। জেনীই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আর সে পারেও ওকে আদর সোহাগে বশ করতে।

'আমাকে ছেড়ে দাও জেনিচ্কা। কি হয়েছে তোমার! ছেড়ে দাও আমাকে।

'মেয়েরা, চলে এস, খাবার দেওয়া হয়েছে, 'বারান্দা দিয়ে দ্রুত পদে যেতে যেতে গৃহকর্ত্রী জানিয়ে দিলেন। মান্কার ঘরে মাথা গলিয়ে আর একবার ঘোষণা করলেন তিনি, 'মেয়েরা, চল খাবার দেওয়া হয়েছে।'

মেয়েরা, যাদের অধিকাংশই শুধু সায়া পরা, খালি পা ছুটল রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু ক্ষিদে ছিল না কারো। জেনী একটু নাড়াচাড়া করল তার খাবার নিয়ে। শুধু নিনা, একটা গ্রাম্য মেয়ে, যাকে একজন ফেরীওয়ালা ফুসলে নিয়ে এসে কিছুদিন মজা লুটে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে, একাই চারজনের খাবার খাচ্ছিল। এখানে মাত্র দু'মাস এসেছে সে, চাষীসুলভ ক্ষিদে এখনও কমেনি। ঠোঁটের কোনে বিদ্রূপের হাসি টেনে জেনী তার অস্পৃষ্ট খাবারের থালাটা বাড়িয়ে দিল ওকে।

'আমার কাটলেটটাও খেতে পারবে তুমি নিন্কা। লজ্জা পেও না। তোমাকে শরীরটা ধকল সইবার মতো করে তৈরী করতে হ'বে। আচ্ছা মেয়েরা তোমরা কি জানো, নিনার পেটে একটা ফিতে কৃমি আছে! আর যাদের ফিতে কৃমি থাকে তাদের অন্ততঃ দুজনের খাবার খেতে হয়। নিজের জন্যে আর কৃমিটার জন্যে।'

'আমার কোন কৃমি নেই,' নিনা ন্যাকি সুরে বলল, 'তোমারই আছে, সেই

জন্যেই তোমার চেহারাটা এমন হাড্ডিসার।'

কথাটা শেষ করেই আবার খাবারে মনোনিবেশ করল সে। বড় বোড়া সাপের মতো পেটটাকে ফুলিয়ে খেয়ে চলল সে।

অল্পক্ষণ পরেই বারান্দায় গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'মেয়েরা আর বসে থাকা নয়, পোষাক আসাক পরে সেজেগুজে তৈরী হয়ে নাও, এখন কাজের সময়।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ীটার প্রতিটি ঘর থেকে ভেসে আসতে লাগল কমদামী সেন্ট, তেল আর জীবাণু দূরকারী প্রতিষেধক ওষুধের গন্ধ। মেয়েরা তৈরী হচ্ছে আর একটা রাতের কাজের জন্যে।

যদিও আন্নামারকোড়নার বাড়ীর সব মেয়েই একমাত্র নিজ নিজ পীরিতের নাগর ছাড়া অন্য সব খরিদ্দারের প্রতি ছিল একরকম অনাসক্ত, কিন্তু প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই একটা বিশেষ প্রত্যাশায় চঞ্চল হ'য়ে উঠত ওরা, ওরা জানত না কে সেদিন তাদের পছন্দ করবে, অসাধারণ অথবা উত্তেজনাময় কিছু ঘটবে কিনা। কোন অতিথি কি বিশেষ উদারতা দেখিয়ে তাদের চমকে দেবে? এমন কোন দৈব ঘটনা কি ঘটবে যাতে তাদের সমস্ত জীবনটাই বদলে যাবে? ওদের ভাবাবেগটা ঠিক যেন জুয়াড়ীর মতো, খেলতে যাবার আগে যে তার টাকা পয়সা গুণে সেটা কতগুণ বাড়িয়ে আনবে সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে। যদিও একাজে তাদের যৌন উত্তেজনা স্তিমিত তবুও কাজে নামার আগে একটা লোভ উঁকি মারে ওদের মনে, সেটা হ'চ্ছে আদর পাবার লোভ।

মাঝে মাঝে মজার ঘটনাও ঘটে। হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব ঘটে। সাজ পোষাক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মতো দেখতে কাউকে ধরে নিয়ে যায়। কখনও বা হাতাহাতি সুরু হ'য়ে যায়। জানালার কাঁচ ভাঙ্গে, চেয়ারের পায়াগুলো ব্যবহৃত হয় হাতিয়ার হিসাবে আর হাত পা ভাঙ্গা, মাথায় আঘাত পাওয়া দুশ্চরিত্র পুরুষগুলোকে বাড়ীর প্রবেশ পথে কাদার ওপর শুইয়ে রাখা হয়। জেনীর পাশবিক প্রবৃত্তিটা সেই সময়ে জেগে ওঠে। আনন্দের আতিশয্যে হো হো করে হাসতে থাকে বিবাদমান জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অন্য মেয়েরা সেই সময়ে কেউ বিছানার নীচে, কেউ দরজার আড়ালে আবার কেউ বা শৌচাগারে লুকিয়ে কাঁপতে থাকে।

কখনও বা কোন ক্যাশ ভাঙ্গা ক্যাশিয়ার এসব বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। ধরা পড়ার অথবা আত্মহত্যা করার আগে শেষবারের মতো যৌনক্ষুধাটা মিটিয়ে নেবার জন্যে। ভাঙ্গা ক্যাশের শেষ কপর্দকটুকু ও খরচ করে ফ্যালে সে, মদের নেশায়

সবকিছু কবুলও করে। এদের পরিণতির কথা অবশ্যই বুঝতে পারে ওরা। সেদিন ঘরের দরজা জানালাগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'স্বর্গীয় রাত্রি' অর্থাৎ উপভোগের শেষ রাত্রি পালন করা হয়, বেহেড মাতাল হ'য়ে উলঙ্গ নাচ নেচে।

মাঝে মধ্যে দু'একজন ব্যায়ামবীরও উপস্থিত হয়। নীল জোকাধারী চীনাও আসে কখনও সখনও, আবার এক আধজন সৌখীন নিগ্রোও কোটে ফুল গুঁজে আসে। তাদের গায়ের রং এ পরনের সাদা জামাটা একটুও ময়লা হয় না, পরন্তু আরও ধবধবে দেখায়।

এই সব বিরল অতিথিদের আগমনে বারবণিতাদের মনে একটা নতুন বৈচিত্র্যের আস্বাদ সৃষ্টি করে। যে কোন নতুন অতিথিই ওদের স্তিমিত যৌন বোধকে নাড়া দেয় আর সেই জন্যেই কে তাকে দখল করবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি সুরু করে দেয়।

এক রাত্রে অভ্যর্থনাগৃহের দরজায় একজন সাধারণ পোষাক পরিহিত বয়স্ক ব্যক্তি হাজির হ'লেন। তাঁর চেহারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। ঘরে ঢুকেই তিনি কপালে তিন আঙ্গুল ছুঁইয়ে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে গেলেন, কিন্তু ঘরে পবিত্রতার কোন আভাষ না পেয়ে হাত নামিয়ে থুতু ফেলে কাজের লোকের মতো ব্যস্ততা দেখিয়ে বেশ্যালয়ের সবচেয়ে মোটা মেয়ে কাটকার দিকে এগিয়ে গেলেন। মাথা নেড়ে শয়নকক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে আদেশের ভঙ্গীতে তিনি বললেন চলে এস।

সেই অতিথি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দার বেশ গর্ব ভরে জানিয়ে দিল, ইনিই সেই কুখ্যাত দাদচেংকে। গতবার সরকারী জল্লাদের অনুপস্থিতিতে যিনি স্বেচ্ছায় এগারজন বিপ্লবীকে ফাঁসি কাঠে লটকে ছিলেন। দুদিন ধরে সকালে তিনি নিজের হাতেই ফাঁসির দড়ি ওদের গলায় পরিয়ে পায়ের নীচের পাটাতন সরিয়ে দিয়েছিলেন। যত ভয়ঙ্করই মনে হো'ক না কেন তখন কিন্তু ঐ বাড়ীর সকলেরই কাট্‌কার ওপর হিংসে হয়েছিল। আধঘণ্টা পরে ঐ জল্লাদ, আপাতঃদৃষ্টিতে যাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, বিদায় নিলেন। সব মেয়েরাই একত্রে তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। অদম্য কৌতুহল বশে তারপর সেই মেয়েরা ছুটল কাটকার ঘরে। প্রশ্নবানে অস্থির করে তুলল তাকে। কাটকা তখন সবে তার শরীর ঢাক্‌ছে। ওরা তার লাল খোলা বাহু দুটো মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখল। অবিন্যস্ত বিছানাটা আর তেলচিটে রুবলের নোটটাও ওরা দেখল নিরীক্ষণ করে। কাট্‌কা ওদের কিছুই বলতে পারল না। অন্য যে কোন লম্পটের মতোই একজন লম্পট শুধু এইটুকুই

জানালো সে। কিন্তু যখন সে লোকটার পরিচয় জানতে পারল তখন হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করল সে। অবশ্য তার কান্নার কারণ সে নিজেও জানে না।

ঐ সমাজ বহির্ভূত জীবটি অর্থাৎ জল্লাদটি কোনরকম নিষ্ঠুরতা দেখায় নি, অবশ্য বিশেষ আদর সোহাগও করে নি সে। এমনভাবে তাকে উপভোগ করেছে সে যেন ও একটা নোংরা জিনিস, আর প্রয়োজনের তাগিদে সেই নোংরা জিনিসটাতেই হাত দিতে হ'চ্ছে তাকে। কিন্তু যখনই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল সেটা আবার ঘৃণার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। কাট্‌কা যেমন মোটা তার বুদ্ধিটাও তেমনি মোটা। তাই শুধু লোকটার পরিচয় পেয়েই ভয়ে শিউরে উঠে কেঁদে ফ্যালে সে—অন্য কোন কারণ আর নিশ্চয়ই থাকতে পারে না।

আরও অনেক ছোট ছোট ঘটনাই এইসব হতভাগ্য, গরীব, অসুস্থ..অসুখী স্ত্রীলোকদের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাঝে মধ্যে অসুরা পরবশ অতিথিদের মধ্যে মারামারি এবং নাকি রিভলবারের গুলি বিনিময়ও হয়। কখনও কখনও কোমল চিত্ত কোন ব্যক্তি এইসব সমাজ বহির্ভূত মেয়েদের সত্যি সত্যিই ভালোবেসে ফেলত। আবার দেখা যেত কোন মেয়েকে তার প্রেমিকের সঙ্গে বেশ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে যেতে। অবশ্য কিছুদিন বাদেই আবার এখানে ফিরে আসতে বাধ্য হ'ত সে। দু'একবার কোন কোন মেয়ের গর্ভ সঞ্চারও হ'ত। বস্তুত ওদের জীবনে এইসব ঘটনা বেশ মজার আর নিন্দনীয়ও বটে, তাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত ভালোভাবেই।

জেনী দুহাত দুলিয়ে অভ্যর্থনা গৃহে পায়চারী করছিল। ঘরের আয়না গুলোয় যখনই নিজের প্রতিবিম্বের ওপর চোখ পড়ছিল তার, নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধ হয়ে উঠছিল সে। কমলা রং-এর পোষাক আর কুচি দেওয়া স্কার্টে তার চলাফেরার মধ্যে এনে দিয়েছিল একটা বিশেষত্ব। গাঢ় নীল রং-এর পোষাক পরা ল্যুবা, আর বাদামী রং-এর স্কার্ট পরা পুতুলের মতো ন্যুরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ঘুরতে ঘুরতে মৃদুস্বরে গান গাইছিল।

—ছোট মান্‌কা যার তাসে অপরিসীম আগ্রহ, পাশার সঙ্গে সিক্সটি সিক্স খেলছিল। মেয়ে দুটি সামনা সামনি বসে মাঝখানে একটা চেয়ার রেখে খেলছিল। নিজের নিজের জেতা তাসগুলো ওরা রাখছিল হাঁটুর ওপর স্কার্ট বিছিয়ে। মান্‌কার পরণে ছিল একটা কালো কুঁচি দেওয়া ঘাঘরা। ওকে দেখাচ্ছিল একটা স্কুলের ছাত্রীর মতো। ওর খেলার সঙ্গী পাশা এক অদ্ভুত চরিত্রের অসুখী মেয়ে। এই বেশ্যালয়ে না থেকে ওর উচিত ছিল কোন মানসিক

চিকিৎসালয়ে থাকা। অসম্ভব রকম কামোত্তেজনায় ভোগে মেয়েটা। যে কোন কামুক পুরুষের কাছে ও অত্যুৎসাহে নিজেকে বিলিয়ে দেয় ; কোন রকম বিকার বা বিতৃষ্ণাবোধ থাকে না সে সময়ে। ওর সঙ্গীরা যারা স্বভাবতঃই পুরুষের ওপর বিতৃষ্ণ, তার জন্য ঘৃণা করতো ওকে। ন্যুরা সম্ভোগের সময় ওর আনন্দের অভিব্যক্তি, যা পাশের ঘর থেকে শোনা যেত, তা নকল করে ওকে রাগাবার চেষ্টা করতো।

শোনা যায় পাশা তার এই অসম্ভব রকম যৌন ক্ষুধার জন্যে স্বেচ্ছায় এই বেশ্যালয়ে এসেছে। বেশ্যালয়ের পরিচালিকা অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী ওর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছে। পাশা অন্য সকলের চেয়ে চার পাঁচগুণ বেশী উপার্জ্জন করে, কারণ যে কোন সময়ে লম্পটদের চাহিদা মেটাতে সে সক্ষম। ওর কয়েকজন বাঁধা খরিদ্দার আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ওর প্রতি একান্ত ভাবে অনুরক্ত। অল্প কিছুদিন আগে দুজন নাগর ওকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পাশা তার যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্যে যে কোন ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বেশ্যালয়ের পরিচারিকা নিজের স্বার্থে ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে। পাশার ভাবলেশহীন আধ বোজা চোখে তার এই অপরিসীম ক্ষুধার পরিচয় পাওয়া যায়। ওর ভিজে ঠোঁট দুটোয় সবসময়েই একটা বিস্ময়ের হাসির আভাষ, সে হাসিটা নির্ব্বোধের হাসি। পাশা এই বাড়ীর অন্য সব মেয়ের প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীলা, সকলকেই আদর করতে চুমু খেতে এবং অন্যদের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে ভালোবাসে। কিন্তু অন্যেরা ওকে এড়িয়েই চলতে চায়।

—মানকা, মিষ্টি মেয়ে, আমার ভাগ্যে কি আছে একটু বল্‌তো ?

মানকা তাসগুলো তার হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দিল। হার্টস-এর টেক্কায় বাড়ী, ক্লাবের সাহেবে অর্থ, স্পেডের সাহেবে বোঝায় আনন্দ। পাশা আনন্দে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠ্‌ল।

—তাহলে আমার লেভান আজ নিশ্চয় আসছে। আমার ছোট জর্জিয়ান। এত সুন্দর ও যে সারাজীবনই ওকে আমার কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। সেবার ও আমাকে কি বলেছিল জানো ? —তুমি যদি এরকম কুখ্যাত বাড়ীতে থাকো তাহলে আমি তোমাকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করব। ওর চোখ দুটো তখন জ্বলছিল।

জেনী শুনেছিল পাশার কথা। শেষ হতেই সে বলে উঠ্‌ল।—হায় ভগবান ! মরণ হোক্ তোর আর মরণ হোক্ আমার। ওর চোদ্দ পুরুষেও কেউ জর্জিয়ান

নয়।

পাশা প্রতিবাদ করল,—হ্যাঁ, ও জর্জিয়ান।

—আমি বলছি, ও আর্মেনিয়ান।

—জেনী তুমি ও ভাবে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি, বলেছি কি?

—বেশ তো। আমাকে বলিস্ নি। কিন্তু ও কি বা কোথাকার লোক তাতে কি এসে বয়ে যায়? তুই কি ওর প্রেমে পড়েছিস্?

—যদি তাই হয়।

—তা হ'লে বলতে হয়, তুই একটা আস্ত পাগল। তুই কি কেরাণী কোলকার প্রেমে পড়েছিস্, ঐ এক চোখ কানা ঠিকাদারটার, বা ঐ মুটকো অভিনেতাটার? নিজের দিকে চেয়ে দ্যাখ্। কুকুর কোথাকার! আমি যদি তুই হতাম তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম। নির্ব্বোধ পাগল কোথাকার!

পাশা কাঁদতে সুরু করল। মান্কা আঘাতটাকে হাল্কা করার অভিপ্রায়ে বল্ল—তোর হয়েছেটা কি জেনী? ওকে ওভাবে বলছিস্ কেন?

—আহা! দলটি হয়েছে ভালো। জেনী ওকে বাধা দিয়ে বলল। কতকগুলো হতভাগা এখানে আসে, তোমাদের মাংসের টুকরোর মতো কিনে নেয়, ছ্যাকড়া গাড়ীর মতো ঘন্টাখানেকের জন্যে ভাড়া করে আর তাতেই গলে যাস্ তোরা। আহা, আমার প্রেমিক! অনন্তকালের প্রেম! হায় রে!

ঘৃণাভরে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, পাছা দুলিয়ে জেনী ঘরময় পায়চারী সুরু করল আর মাঝে মাঝে আয়নার দিকে তাকিয়ে নানারকম মুখভঙ্গী করে নিজেকে দেখতে লাগল। পিয়ানোবাদক তখন নাচের সুর বাজিয়ে চলেছে। জয়া সারামুখে পাউডার স্নো মেখে আর রুজের রং-এ মুখ রাঙিয়ে পিয়ানোর ওপর কনুই এর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট ভারকা জকির পোষাকে উঁচু পাছা তুলে ওর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। পুরুষের মতো ভাবভঙ্গী করে জয়াকে সে ওয়ালট্জ নাচতে আহ্বান জানালো। জয়া সাড়া দিল ওর আহ্বানে আর দু'জনে সারা ঘর ঘুরে নাচ সুরু করে দিল। একটা ছ্যাকড়া গাড়ী এসে থামল বাড়ীটার সামনে। ইয়ামা সজাগ হ'য়ে উঠ্ল। সর্দ্দার হ'লের মধ্যে এক ব্যক্তিকে এনে তাকে কোট খুলতে সাহায্য করল। জেনী বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে ফিরে দাঁড়াল আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দূরে সরে গেল।

একে আগে কখনও এখানে দেখা যায় নি। মুটকো! বেশ বাবা বাবার

মতন দেখতে।

গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল বাঁশির মতো,—মেয়েরা বৈঠকখানায় চলো, দেরী কোরো না।

একে একে সারবন্দি হ'য়ে ওরা বাইরের ঘরে উপস্থিত হ'ল। তামারা, যার হাতদুটো ছিল সম্পূর্ণ অনাবৃত, গলায় একছড়া ঝুটো মুক্তোর মালা, মোটা কাটকা, তার মাংসপেশীগুলো লাল গুলিতে ভরা, নতুন মেয়ে নিনা, থ্যাবড়া নেকো নিনা আর একটা মানকা অর্থাৎ কুমীর মানকা (যে নামে সে সাধারণতঃ পরিচিত) সোনকা যার চোখ দুটি ছিল খুব সুন্দর আর নাকটা ছিল বেশ বড়—আন্নামারকোড়নার মেয়েরা একে একে যে যার জায়গায় গিয়ে বসল।

সরু ফ্রেমের চশমা পরা মোটাসোটা ভদ্রলোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন হাত ঘষতে ঘষতে। মেয়েরা ছিল একেবারে নিশ্চুপ, যেন ও'র উপস্থিতি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না ওদের। ভদ্রলোক সকলকে অতিক্রম করে ল্যুবার পাশে গিয়ে বসলেন। সৌজন্য দেখাবার জন্যে ল্যুবা শুধুমাত্র তার স্কার্টটা একটু টেনে ঠিক করে নিল। একটা ভদ্র গণিকালয়ের সাধারণ সৌজন্য এই ভাবেই দেখানো হ'য়ে থাকে। অতিথি ভদ্রলোক চুপচাপ চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল আর কপালে ফুটে উঠছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে মনে তিনি মেয়েগুলির রূপের বিচার করছিলেন, কাকে নিয়ে তাঁর প্রবৃত্তি যথার্থভাবে চরিতার্থ হ'বে সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিশ্চুপ থাকার জন্যে একটা বিড়ম্বনাও বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু বলার কিছুই ছিল না।

ল্যুবার আগ্রহের অভাব জ্বালা সৃষ্টি করছিল তাঁর মনে। মোটা কাটকার গরুর মতো শরীরটা অকৃষ্ট করছিল তাঁকে। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলেন তিনি অন্যসব মোটা মেয়েদের মতো সেও হ'বে খুব ঠাণ্ডা। বালকের আকৃতি বিশিষ্ট ভারকা গায়ে লেপটে থাকা সাদা পায়জামা পরেছিল। তার সুপুষ্ট জঙ্ঘা দুটোও আকৃষ্ট করছিল তাকে, আর ছোট মানকা যাকে দেখাচ্ছিল একটা নিষ্কলুষ স্কুলের ছাত্রীর মতো, তাকে এবং উৎসাহ ভরা জেনীর বুদ্ধিদীপ্ত মুখটাও ভালো লাগছিল তাঁর। জেনীকে গ্রহণ করতে মনস্থির করে প্রায় তার দিকেই এগুচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু জেনীর আচরণে এবং চেহারায় এমন একটা উদ্ধত ভঙ্গী ছিল যে ভদ্রলোক তার কাছে এগিয়ে আসতেই সাহস করলেন না, সম্ভবত তিনি ভাবলেন মেয়েটা তার অতিথিদের ভারী পকেট উজাড় করতেই অভ্যস্ত।

ভদ্রলোক বেশ কৃপণ স্বভাবের। তাছাড়া তাঁর যৌন তাড়নার ফলে ও'র স্ত্রী

নানা রকম জটিল স্ত্রী-রোগে ভুগছিলেন। সে সব রোগের চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে করতে তাঁর পকেটও যথেষ্ট হালকা হ'য়ে গিয়েছিল। উনি ছিলেন একটা মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নানা বেশে এবং পরিবেশে উন্মিন্নযৌবনা মেয়েদের দেখতে দেখতে উনি এক যৌন বিকার রোগে ভুগছিলেন। শুধুমাত্র অর্থাভাবের দরুণই প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রেখেছিলেন তিনি। নিজেকে বঞ্চিত করে, অনেক কষ্ট সহ্য করে যা তিনি জমাতে পারতেন তাই নিয়েই তিনি বছরে দু'তিনবার স্ফূর্তি করতে এই রকম গণিকালয়ে আসতেন। অল্প খরচ করে যত সম্ভব দীর্ঘ সময় ধরে তিনি চেষ্টা করতেন সুখ ভোগের। যা তাঁর খরচ হোত তার থেকে বেশী মূল্যের কিছু চাইতেন তিনি। তাঁর কামনা চরিতার্থ করার অদ্ভুত উপায় তাঁকে তাড়িত করত শান্ত শিষ্ট এবং একটু বোকা ধরণের মেয়ে নিতে, যারা তাঁর আদরে গলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সমর্পণ করবে তাঁর কাছে।

সব মানুষই, যত কুৎসিৎ, বিকলাঙ্গ অথবা পুরুষত্বহীন হোক না কেন, নিজেদের পুরুষত্ব সম্পর্কে একই কথা চিন্তা করে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মেয়েরাও পুরুষের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে নিজেদের অনেকটা নির্লিপ্ত রাখার শিক্ষা আপনা থেকেই আয়ত্ব করে রেখেছে।

বাদ্যকার একটা পোলকা নাচের বাজনা বাজাচ্ছিল। সামান্য বিরতির সুযোগ নিয়ে শিক্ষক ভদ্রলোক মান্‌কাকে আহ্বান জানালেন।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে উনি বললেন,—চল আমরা যাই।

—চলুন যাই, হাসতে হাসতে উত্তর দিল মান্‌কা। তারপর তাকে নিয়ে চলল নিজের ঘরের দিকে।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে মান্‌কা আবেদন জানাল,—একটু মদের অর্ডার দাও প্রিয়তম।

—পরে,—শিক্ষক মশায় দৃঢ়স্বরে বললেন,—সবই নির্ভর করছে তোমার ওপর। আমি তোমাকে স্যাম্পেনও খাওয়াতে পারি। বললাম তো, সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। শুধু আমাকে সুখ দাও। তুমি কি এখানে অনেক দিন আছ?

তাঁর মনে হো'ল প্রেমের এই ছলনা কিছুটা উভয়ের ঘন সান্নিধ্যের ওপর নির্ভরশীল। আরও বেশী করে পরস্পরকে জানা, আর সেইজন্যেই অদমনীয় অস্থিরতা সত্ত্বেও তিনি কথাবার্তা সুরু করলেন চিরাচরিত প্রথায় যেভাবে গণিকাদের কাছে একা থাকার সময় সকলেই করে থাকে। মান্‌কা তাঁর হাঁটুর

ওপর বসল আর যন্ত্রচালিতের মতো এই সব প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিতে লাগল। এটাই এখানকার রীতি।

—বেশীদিন নয়, মাত্র তিন মাস।

—তোমার বয়স কত ?

মান্‌কা নিজের বয়সটা পাঁচ বছর কমিয়ে বলল,—ষোল।

—এত কম ? শিক্ষক মশায় বিস্মিত হলেন। ঠোঁটে আবেগ ভরে চুমু খেয়ে তিনি বললেন,—আমাকে ভালোবাসো তুমি ? অন্য কেউ এমন আছে যার কাছে তুমি খুব আনন্দ পাও ? সে কে ? তুমি তাকে ভালোবাসো কেন ?

—আমি এমনিই ভালোবাসি ওদের।

—আচ্ছা, প্রথমবার কি তুমি খুব লজ্জা পেয়েছিলে ?

—নিশ্চয় ! লজ্জা পাওয়াই তো স্বাভাবিক···আচ্ছা বাবা, তুমি কি পছন্দ কর, আলো জ্বালিয়ে রাখা না নিভিয়ে দেওয়া ? ঠিক আছে, আলোটা আমি একটু কমিয়ে দিই, কেমন ?

উনি একটা নিবিড় চুমু এঁকে দিলেন ওর মুখে। একটা ভয় ওঁর মনকে একটু নাড়া দিয়ে গেল।

—তোমার কোন রোগ নেই তো ?—কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন উনি।

·· নিশ্চয়ই। প্রতি শনিবার ডাক্তার এসে আমাদের পরীক্ষা করে যান।

পাঁচ মিনিট পরে মান্‌কা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মোজার মধ্যে পাওনা টাকাটা গুঁজে রাখার আগে একটু থুতু লাগিয়ে নিল সে। রাতের প্রথম উপার্জ্জনের টাকাটা এইভাবে গ্রহণ করাটাই এখানকার রীতি। স্যাম্পেনের কথা আর উঠলনা। শিক্ষক মশায় মান্‌কার অনুত্তপ্ত শরীর ভোগ করে সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। তিনি বাড়ীওয়ালীকে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন। মান্‌কা নীচের বৈঠকখানায় এসে ঢুকল আবার।

—আমার নাগর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,—মান্‌কা জানাল বাড়ীওয়ালীকে।

—তুমি খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে পারনা কেন ?—প্রত্যুত্তরে বাড়ীওয়ালী বললেন। —আমি পাশাকে পাঠিয়ে দিতাম।

মান্‌কা মুখ ভেঙচাল।—আমাকে হাজার খানেক প্রশ্ন করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে লোকটা।—তোমাকে চুমু খেলে কি রকম লাগে ? তুমি উত্তেজনা বোধ করছ তো ? এই সব !

—ওরা ঐ রকমই বলে,—বাড়ীওয়ালী ঠাণ্ডাস্বরে বললেন।

কিন্তু জেনী যে সারাদিনই মিলিটারী মেজাজে ছিল, হঠাৎ ঝেঁঝে উঠল।
—বুড়ো বেজন্মা! আমি যদি ওকে পেতাম, তা'হলে কান ধরে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে ওর নোংরা মুখটা ওকে দেখিয়ে দিতাম, বলতাম ওরে সুপুরুষ, একটা সুন্দরী মেয়ের মুখে তোর ঐ নোংরা মুখটা ঠেকিয়ে রাখতে লজ্জা করছে না? একটা নোংরা রুবল দিয়ে তুই কি চাস্ আমি তোর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পন করে তোর বিরক্তিকর ভালোবাসার জবাব দিই! ওর নোংরা মুখটা থেঁতলে দেওয়া উচিত।

—জেনী, তুমি থাম। —বাড়ীওয়ালী চুপ করিয়ে দিলেন ওকে।

—না, থামব না। —জেনী চিৎকার করে উঠল। কিন্তু আর কোন কথাই বলল না। দু'হাত দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল ও। তার প্রাণোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

আস্তে আস্তে বাইরের ঘরটা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ছিল। একজন হাস্যরসিক যে রোজই আসে আর মেয়েদের কাছে রোলীপলি নামে পরিচিত সেও এসে উপস্থিত হোল। ঠাট্টা, আদরের চিমটি দিয়ে সব মেয়েদের কাছে একবার করে হাজিরা দিয়ে সে গিয়ে বসল মোটা কাটকার পাশে। কাটকাও সঙ্গে সঙ্গে তার মোটা একখানা পা তুলে দিল ওর কোলে। একদল কেশ সজ্জাকারী এবার প্রবেশ করল। আন্না-মারকোড়নার বাড়ীতে তাদের অবাধ গতি। কোলাহল মুখর আনন্দময় ইয়ামার সব বাড়ীগুলোতেই তখন লোকজনের আসা যাওয়া সুরু হ'য়েছে। কেরানী, হিসাব-রক্ষক আর সরকারী কর্ম্মচারীরা আসেন আর অল্পক্ষণ থেকেই বেরিয়ে যান্। প্রাণ চঞ্চল ন্যুরা সামনের হল ঘরটার দিকে দৃষ্টি রাখে আর বলে—জেনী, তোর বর এসেছে, ছোট মান্কা, তোর প্রেমিক এসেছে ইত্যাদি।

এবার বাদকেরা একটানা সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে চল্ল, আর ঘরের সকলেই সেই তালে তালে নাচতে লাগল। মেয়েরা মনে করত মাথা উঁচু করে একদিকে ঝুঁকে অলস পদক্ষেপে নাচাটাই বুঝি আধুনিক রুচি সম্মত। বিরতির মাঝে মাঝে তারা হাতপাখা নেড়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নিচ্ছিল। ওদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'চ্ছিল বেশ উঁচুতলার মেয়ে ওরা আর অভ্যাগতদের কাছ থেকে নাচের আহ্বান পেলে ওরা তাঁদের কৃতার্থ করলেও করতে পারে। ওদের নাচের বিশেষ বৈশিষ্ট হ'চ্ছে ওদের নাচের সঙ্গীরা ঐ উদ্দাম নাচের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়ে আর ঘামতে থাকে।

কয়েকটি পতিতালয়ে ইতিমধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়েছে। একটা লোক রক্তাক্ত মুখে রাস্তায় টুপি কুড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। ছোট ইয়ামাস্ট্রীটে

কয়েকজন সৈন্য একদল নাবিকের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে। ক্লান্ত পিয়ানো বাদকেরা ঝিমুতে থাকে। রাত্রি এগিয়ে চলে। এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সাতজন ছাত্র, একজন অধ্যাপক আর একজন সাংবাদিক আন্নামারকোড়নার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। সারাদিন ধরে তারা কয়েকজন ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে পিকনিক করছিল। ওরা নদীতে নৌকায় ঘুরে বেড়িয়েছে, তারপর রাশিয়ান পদ্ধতিতে প্রথমে মেয়েরা পরে পুরুষেরা উলঙ্গ হ'য়ে নদী স্রোতে গরম জলে স্নান সমাপন করেছে। তারপরে একত্রে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে তারা মেয়েদের বাড়ী পেঁছে দিয়েছে।

সারাটা দিনই তারা কাটিয়েছে নির্দোষ আমোদে প্রমোদে। কিন্তু ওদের অজ্ঞাতসারেই মেয়েদের সান্নিধ্য ও স্পর্শে তাদের মধ্যে এখন জেগে উঠেছে উত্তেজনা। এই আদিম প্রবৃত্তি, যাকে মানুষ তার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে অবদমন করতে যতই চেষ্টা করে; স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে এলে তাদের অবচেতন মনে জেগে ওঠে কামনার অদম্য অগ্নি।

এই কারণেই রাত দুটোর সময় তাদের ইয়ামাতে আগমন। মেয়েরা দেখামাত্রই কয়েকজন ছাত্রকে চিনতে পেরে ছুটে যায় তাদের দিকে।

"আমরা তোমার নাগর এই যে। আমারটাও এসেছে মিসকা!" পেট্রোভস্কি নামধারী একটা রোগা লম্বা নাকওয়ালা লোককে জড়িয়ে ধরে বলে ন্যুরা "কিগো মিসা, অনেকদিন যে এদিক মাড়াওনা। আমার খুব খারাপ লাগে কিন্তু।"

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, অধ্যাপক ভদ্রলোক, একটু বোকার মত এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। "আমাদের একটা আলাদা ঘর বা ঐ রকম কিছুর দরকার।" —বাড়ীওয়ালী ওঁর কাছে আসতে তাকে বলেন তিনি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভদ্রমহোদয়গণ, এদিকে আসুন এই বৈঠকখানা ঘরটায়। আপনি যা বললেন তার ব্যবস্থা করতেই হবে। আচ্ছা, আপনাদের মদ বলবে কি? বাঃ বেশ...আপনারা কি. এই যুবতী মেয়েরাও আপনাদের সঙ্গে থাক্ এই চান।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়াল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করার মুখে একে একে পুরুষদের দিকে হাত বাড়িয়ে ওরা নিজেদের নামও বলে চলল। অবশ্য চুপি চুপি মণিকা, কাটকা, ল্যুবা, সব ঘরে প্রবেশ করে যার যার নাগরের কোলে উঠে বসে ওরা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওদের।

সাংবাদিক ভদ্রলোক প্লাটনিভকে দেখা গেল সব মেয়ের কাছেই পরিচিত।

লিখোনিন নামের ছাত্রটি বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনি এখানে প্রায়ই আসেন, *কিন্তু ইতিপূর্বে আপনাকে আমি এখানে দেখিনি কোনদিন!"*

"হ্যাঁ, প্রায়ই আসি।"

ন্যুরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, সাংবাদিক মশায় আমাদের একজন বিশিষ্ট অতিথি, সত্যি বলতে কি উনি আমাদের দাদার মতো।"

তামারা তাকে তিরস্কার করে বলল, "তাই হয় নাকি।"

অধ্যাপক ভদ্রলোক হাসলেন, "আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছি। আমাদের সাংবাদিক মশায় তার লেখার মাল, মশলা যোগাড় করছেন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই আমারা আনন্দের সঙ্গে পড়তে পারব……

বোরিস নামের একটি ছাত্র ঠাট্টা করে কথাটা সম্পূর্ণ করে দিল, "পতিতালয়ের বিয়োগান্ত কাহিনী।"

প্লাটোনভ শান্তস্বরে উত্তর দিল, "না আমি উপকরণ সংগ্রহ করিনা, কিন্তু তা এখানে রয়েছে প্রচণ্ড রকমের ভয়ঙ্কর, যাকে বলে 'একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। বড়, বড় সহরগুলোতে মানুষকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে এই বেশ্যাবৃত্তি। সেই পুরোনো গল্প নয়। যা ভয়ঙ্কর তা হচ্ছে এদের এই বাধাধরা জীবনযাত্রা। অপমান, লজ্জা, ভয়, সব এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যা আছে তা শুধু বিরক্তিকর দেহের ব্যবসা! দেখতে পাচ্ছ না যে সবচেয়ে ভয়ের যা কারণ সেই ভয়ই নেই এখানে?"

লিখোনিন স্বীকার করল—"সেটা সত্যি বটে। বলে যান আমরা আরও কিছু শুনি।"

প্লাটোনভ তার চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর বাঁচিয়ে বলল, "নরকে যাক সব। আজ যা বলেছি তাতে আমার দশ বছর আয়ু বেড়ে গিয়েছে। আর কি জন্যেই বা বলব!"

ছোট মানকা হঠাৎ বলে উঠল, "হায় ভগবান, আমাদের মতো পাপী তাপী পতিতাদের সম্পর্কে যদি পুরো সত্যটা কেউ লিখত!"

দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো, আর জেনী প্রবেশ করল।

সে প্রত্যেককেই অভিবাদন জানাল। তার ভঙ্গীতে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব, যে এখামে তার স্থান হ'বেই। সে বসল গিয়ে সাংবাদিকদের পেছনে। ছোট মানকা যাকে সন্ধ্যেবেলা সন্তুষ্ট করতে পারেনি সেই শিক্ষকের সঙ্গে সে ছিল এতক্ষণ। জেনীর লোভনীয় সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে শিক্ষক মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে

তিনি আবার ফিরে এসে জেনীর সঙ্গ কামনা করেছিলেন। জেনী অন্য একজন ব্যক্তির সঙ্গে ছিল সে সময়, তার শিক্ষক মশায় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে।

তামারার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জেনী দাঁত বার করে হেসে বলল, "হারামজাদাটা চলে গিয়েছে।"

আন্নামারকোভ্‌নার বাড়ীতে বারবার আসার অভিজ্ঞতা থেকে প্লাটোনভ বুকে নিয়েছিল যে অন্য মেয়েদের থেকে জেনী একেবারে আলাদা। সাংবাদিক মহাশয়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল জেনীর দৃঢ় আর আর উদ্ধত মনোভাবের জন্যে। এখন জেনীর উজ্জ্বল চোখ, রক্তাভ গাল আর দৃঢ় নিবদ্ধ শুকনো ঠোঁট দুটো দেখে তার মনে হল এর আগে জেনীকে এত সুন্দর আর কখনও দেখায়নি। সে আরও লক্ষ্য করল একমাত্র লিথোনিন ছাড়া আর সকলেই আগ্রহ কামনার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, জেনীর আপাতঃ সৌন্দর্য আর সে যে তাদের সকলেরই ভোগ্যা হ'তে পারে এই ধারণাই কাজ করছিল ওদের মনে!

"কিছু ভেবে কষ্ট পাচ্ছ জেনী? প্লাটোনভ জিজ্ঞাসা করল।

জেনী স্নেহভরে তার হাতটা রাখল ওর হাতের ওপর।

"না, কিছুনা! —শুধু আমাদের এই মেয়েদের কথাই ভাবছিলাম।"

জেনী তামারার দিকে ফিরে পতিতালয়ের গুঞ্জন কোলাহলের মধ্যেও চুপিচুপি কিছু বলল তাকে। তামারা তার চোখ দিয়ে ইসারা করে সাংবাদিক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল। ঘরের সব লোকের মধ্যে একমাত্র প্লাটোনভই বুঝতে পারল জেনী কি বলছে। সেই সন্ধ্যায় অভ্যাগতদের ভীড় ছিল যথেষ্ট আর, পাশাকে নিজের কামরায় ঢুকতে হয়েছিল দশ বারেরও বেশী। কয়েক মিনিট আগে সে একটু বেসামাল হ'য়ে পড়েছিল। যখন বাড়ীওয়ালী তাকে বৈঠকখানা ঘরে আসতে বলে তখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে নি। জেনী বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকে ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়।

লিথোনিন হতবুদ্ধি হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, ও কি বলছে?"

"ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই, এমন কিছু নয়, "জেনী তাকে বলল। তার গলার স্বরটা তখনও কাঁপছে ঘৃণায়।" আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। প্লাটোনভ একটু মদ খাওয়াবে?"

সে গ্লাসে খানিকটা কনিয়াক ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে গিলে ফেল্‌লে। সাংবাদিক মশায় উঠে দরজার কাছে গেলেন।

"ছেড়ে দাও প্লাটোনভ, এমন কিছু ব্যাপার নয়।" জেনী তাকে ফিরিয়ে

আনতে চেষ্টা করল।

"নয় কেন?" সাংবাদিক উত্তর দিলেন, "আমি পাশাকে এখানে নিয়ে আসছি। একটুখানি বিশ্রাম নিক্ ও। তার টাকা আমি দেব।"

ভালুকের মতো চেহারার চওড়া কাঁধওয়ালা সাংবাদিকের পেছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে একজন, বোরিস, অনুযোগ করে উঠ্‌ল, "দু'পয়সা খরচ করাব ওকে? আমরা সবাই ওর কাঁধেই বা চেপে আছি কেন? ওটা একটা ভূত! হয়ত এদের কাছ থেকে কিছু কমিশন পায়।"

"আজে বাজে কথা বল না বোরিস," লিথোনিন বলল। "আমরা এখানে সবাই সমান।"

কিন্তু বোরিস থামতে পারল না। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে শান্ত দেখালেও মদের প্রভাবে সে স্পর্শকাতর আর ঝগড়াটে হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকের আত্মবিশ্বাস আর এ বাড়ীতে তার প্রভাব দেখে ওর পায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল।

বোরিস গজরাতে লাগল, "ওর গলাটা শুনেছ? আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছিল যেন আমরা কৃপার পাত্র।"

"বাঃ বাঃ! বহুত আচ্ছা আদমি হায় তোম্," জেনী হাততালি দিয়ে বল্‌ল।

তার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে অন্য মেয়েরাও মজা পেয়ে গেল। জেনী যখনই কোন ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে তখনই তার মুখের ভাবটা এই রকমই হয়।

"এক মিনিট দাঁড়াও প্রিয়তম।"

জেনী বোরিসকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে তার কোলে চেপে বস্‌ল। হাত দিয়ে তার গালটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে এমন একটা দীর্ঘ চুম্বন দিল যে তাতে বোরিসের দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম। এক মুহূর্তের জন্যে ছাত্রটির মনে হোল জেনীর উজ্জ্বল চোখ দুটোতে শুধু ঘৃণার দৃষ্টি। একটা অজানা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল তার মন। কোনরকমে দমবন্ধ করে সে নিজেকে মুক্ত করল জেনীর কমনীয় বাহুপাশ থেকে।

"ও, তাহলে তুমিই হ'লে সেই যাকে সকলে জেনী বলে?" সে হাসতে হাসতে বল্‌ল।

প্লাটোনভ পাশাকে নিয়ে ফিরে এল। বাধ্য মেয়ের মতো সে সোফাটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখে সেই করুণ পাগলের মতো হাসি; দেহটাও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছিল। প্লাটোনভ তার কোটটা খুলে বারবণিতাটির গায়ে চাপা দিল।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল বোরিস। তার পায়ের জুতোর ডগাটা পাশার দিকে উঁচিয়ে সে প্লাটোনভকে বলল, "এটা তোমার রক্ষিতা, তাই না?"

"কি?" ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল প্লাটোনভ।

"তা না হলে তুমি ওর প্রেমিক। এখানে ওরা এই সম্বন্ধটাকে কি বলে?"

প্লাটোনভ প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল, "যদিও তোমাকে প্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছে আমি জানি তুমি মদে চুর হয়ে আছ। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ঐ ভাবে যদি কথা বল তাহলে তোমার চশমাটা খুলে বললেই ভাল করবে।"

বোরিস খোলা গলায় বলল, আমার চশমাটা কি করল। সিং-এর ফ্রেমে বাঁধানো চশমাটা সে নাকের ওপর চেপে বসিয়ে দিল।

"কারণ আমি যখন তোমার মুখে ঘুসি চালাব চশমার ভাঙা কাঁচে তোমার চোখের ক্ষতি হতে পারে।"

"বেশ দেখা যাবে! শুধু ভাবছি, সব......আমার হাতটা ময়লা করব কেন!" আপমান সূচক কথাটার উল্লেখ না করেই সে বাচ্চা ছেলের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠল। "যাই হোক আমি আর এখানে থাকতে চাই না।"

বাইরে যাবার দরজার কাছে যেতে হ'লে প্লাটোনভকে অতিক্রম করে যেতে হয়, আর প্লাটোনভও তাকে লক্ষ্য করেছিল বাঘের মতো চোখ নিয়ে। বোরিস একবার ভাবল যাবার সময় ওকে একটা সজোরে ঘুষি ঝেড়ে দিয়ে ছুটে পালালে হয়। ওর বিশ্বাস অন্য সকলে প্লাটোনভকে বাধা দেবে। শোধ নিতে দেবে না। কিন্তু প্লাটোনভের শক্ত হাতুড়ির মতো হাত দুটো দেখে ওর ভয় হো'ল। কারণ সেও সামনে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক ঘুষিতে ওকে শুইয়ে দিতে পারে। আর কিছু বাড়াবাড়ি না করে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, দরজাটা একটা শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল ওর পেছনে।

জেনী ঠাট্টা করে বলল, "যাক বাঁচা গেল।"

কিন্তু মানুষের মনটা এমনই জটিল যে, বোরিস সত্যি মাতাল হ'য়ে বেসামাল হলেও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওর মনে হো'ল এবার জেনীর সঙ্গ লাভের জন্যে ওকে বাইরে নিয়ে আসা খুবই সহজ হ'বে। বাইরের ঘরে পেঁছেই সে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সেই মর্ম্মে চুক্তি করল। কয়েক মিনিট পরেই শিয়ালমুখী বাড়ীওয়ালীর মুখটা সেই ঘরে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে জেনীকে বলল, "তোমার পোষাক আসাক এসে গ্যাছে, ওপরে গিয়ে সেগুলো গুণে নাও।"

দশমিনিট পরে জেনী ফিরে এল। বোরিস তার ঘরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত

হ'য়ে পড়ে আছে। একজন অভিনেতাইতিমধ্যে ওই ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসে একের পর এক অশ্লীল গল্প বলে চলেছেন। মেয়েগুলো আনন্দে হি হি করে হাসছে। একজন ছাত্র, ভেল্টম্যান, কিছুক্ষণ ধরে পাশের সোফাটায় বসে আছে। এখন সে তালে তালে তার ঘাড়ের চুলে চাপড় মারতে শুরু করল। পাশা বরা বরই কাঁপাছিল। ছাত্রটির স্পর্শে সে যেন ফিরে পেল নিজেকে। চাপড়ের উত্তরে সে তার নির্লজ্জ কামনার হাসি হাসল। ভেল্টম্যান চুপিচুপি কি বলল তাকে আর ঘরের ঐ গোলমালের মধ্যে হঠাৎ তারা সকলের অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

লিথোনিন ছাড়া অন্য ছাত্রেরা সকলেই একে একে বেরিয়ে গেল। কেউ কেউ বাজে যুক্তি দেখিয়ে আবার কেউ বা সোজাসুজি মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছি বলে তাদের যৌনক্ষুধা মেটাতে গেল। পাভলভ বলল সে বৈঠকখানায় নাচ দেখতে চায়। টলপাজিন তামারাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিতে বলল। পেট্রোভস্কি লিথোনিনের কাছে তিন রুবল, ধার করল, তারপর বাইরে গিয়ে বাড়ীওয়ালীকে মানকাকে পাঠিয়ে দিতে বলল। এমন কি চরিত্রবান ও যথেষ্ট সাবধানী আইনের ছাত্র রামসেস জেনীর নগ্ন উদ্দাম সৌন্দর্যে উত্তেজিত হ'য়ে বাইরে যেতে যেতে বলল সকালেই তার বিশেষ কাজ থাকায় একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। সঙ্গীদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে জেনীকে চোখ টিপে ইসারা করল। জেনীও চোখ নীচু করে সে ইসারার জবাব দিল। প্লাটোনভ, যে এই হাস্যকর খেলা দেখছিল, জেনী কয়েক মিনিট পরে উঠে যাবার সময় তার চোখের জ্বলন্ত চাহনি দেখে চমকে উঠল।

ছাত্রেরা শোবার ঘর থেকে তাদের সঙ্গীদের নিয়ে একে একে ফিরতে সুরু করল। ওদের মনে হচ্ছিল যেন জোড়াজোড়া মাছি, যারা সবে মাত্র জানালার কাঁচে বসে সম্ভোগ শেষ করে উড়তে সুরু করেছে। তারা হাই তুলতে লাগল, লম্বা হয়ে পা ছড়িয়ে দিল, আর তাদের নিদ্রাবিহীন বিবর্ণ মুখে ক্লান্তি আর বিরক্তির ছাপ। যখন তারা ভদ্রভাবে পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুতে সুরু করল তখন তাদের চোখে একটা বিদ্বেষের চিহ্ন, যেন ওরা একত্রে একটা নোংরা অপরাধে কোন কারণে জড়িত হ'য়ে পড়ে এখন মুক্ত হতে চাইছে।

অধ্যাপক মশায় বেরলেন সকলের শেষে। সবাইকে তিনি শুনিয়ে গেলেন যে তাঁর মাথা ধরেছিল। তিনি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লাটোনভ লিথোনিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বারান্দায়। দাগ ধরা কাঁচের দরজা দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন অধ্যাপক মশায় বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে কথা বলছেন। এক মুহূর্ত পরেই একটা দরজা খুলে গেল আর অধ্যাপক মশায়ের সঙ্গ নিল জকির সাজ পারা

ছোট একটি মেয়ে।

লিখোনিন্‌ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানলে কি করে?"

',খুব সহজেই, আমি ওর মুখটা লক্ষ্য করেছিলাম আর দেখেছিলাম ওঁকে ভারকার পায়ে চাপড় মারতে। লোকটা কামুক। এখন তোমার পালা লিখোনিন।" সাংবাদিক ঠাট্টার সুরে বলল।

"না ভাই, কামনা চরিতার্থ করার চেয়ে কামনার হাত থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছাটাই আমার বেশী। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে আমাদের উভয়ের চিন্তাটা একই পথ ধরে চলছে। আমিও তোমায় ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

"আমি? না! এখানকার মেয়েদের ধারণা আমি একটা ক্লীবলিঙ্গ জীব।"

"সত্যি! তুমি কখনও...?"

"কখনও নয়।"

ল্যুবা বলে উঠল, "সত্যি কথাই বলেছেন উনি। প্লাটোনভ সাধুপুরুষ।"

প্লাটোনভ আগের কথার জের ধরে বলল, "এসব আমার দেখা আছে। কিন্তু আমার কাছে এই কাজটা অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা আমি যে এখানকার সকলের বন্ধু হয়ে উঠেছি সে সম্পর্কটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।"

লিখোনিন সন্দেহের সুরে বলল, "তাহলে এখানে এত সময় নষ্ট কর কেন? তুমি যদি একটা বই লেখ তাহলে অবশ্য অন্য কথা।"

"আমি তো বলছি আমি লেখক নই।"

"এখন কোথায় যাবে তুমি?" লিখোনিন সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করল।

"আমি সত্যি জানি না।"

"আমি চাই তুমি কিছুক্ষণ থাক। কতকগুলো দরকারী কথা আমি জানতে চাই তোমার কাছে।"

"বেশ, তাই হোক্‌।"

সেই ঘরে তখন দুটি মাত্র মেয়ে উপস্থিত ছিল। জেনী তার পোষাক পরে ফিরে এসেছিল, আর ল্যুবা গুটিশুটি মেরে একটা বড় আরাম কেদারায় শুয়ে ঢুলছিল। ঘুমন্ত ল্যুবার তাজা মুখে ফুটে উঠেছিল একটা শিশুসুলভ ভাব। জেনী সোফাটার ওপর হাঁটুর ওপর হাত দুটো নিবদ্ধ করে বসেছিল।

"আমি যা বলব তাতে খুব বেশীক্ষণসময় লাগবে না," লিখোনিন বসে পড়ে বলল। "কিন্তু কোথা থেকে সুরু করব বুঝতে পারছি না।"

জেনীর দিকে একবার তাকাল সে।

"আমি বাইরে যাব ?" জেনী জিজ্ঞাসা করল।

"তুমি থাকতে পার।" সাংবাদিক লিথোনিনের হ'য়ে উত্তর দিল। "ও কোন বাধা সৃষ্টি করবে না ; তুমি পতিতাবৃত্তির সম্পর্কে কথা বলতে চাইছ তাই না ?',

"হ্যাঁ, একরকম তাই।,'

লিথোনিন তার মুখটা একবার হাত দিয়ে ঘষে নিল, তারপর হাতের আঙ্গুলগুলো মট্‌মট্‌ করে মট্‌কাল। বোঝা যাচ্ছিল সে বেশ নার্ভাস হ'য়ে পড়েছে।

"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মানুষের জঘন্যতম আবিষ্কার এই পতিতাবৃত্তি, আর যারা তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের তুমি বরদাস্ত করো কি করে ?" ঘরটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল লিথোনিন।

"এ ব্যাপারে তুমি কিছুই করতে পারবে না লিথোনিন। যতদিন বিবাহ প্রথা থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে এই পতিতাবৃত্তি। কে সমর্থন করে এই জঘন্য বৃত্তি ? তোমাদের শ্রদ্ধেয় অভিজাত ব্যক্তিরা আর সভ্য 'স্বামী' নামধারী লোকেরা। আমার মতে পতিতাবৃত্তি তাঁদের নিজেদের শোবার ঘর থেকে প্রবৃত্তির তাড়না দূরে সরিয়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ একই জিনিস ভোগ করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ বহুনারীভোগী প্রাণী। তাদের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ঘটে আন্নামারকোড়নার এইরকম মুরগীর খাঁচায়।"

জেনী তিক্ত স্বরে বলল, "ওরাই আমাদের সবচেয়ে ভালো খরিদ্দার।"

আমার জীবনে এই প্রথম আমি খোলা চোখে এসব দেখে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। আমাকে বোকা আর আমার কথাবার্তাগুলো হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু আগুনে লোক স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে, এদৃশ্য দেখে আমি চুপ করে থাকতে পারছিনা।' লিথোনিন বেশ রাগত স্বরেই বলল।

প্লাটোনভ কর্কশ স্বরে বলল, "বেশতো, কি করতে চাও তুমি ? একটা পাত্র থেকে জল ছিটিয়ে এই আগুন নেভাবে ?"

লিথোনিন আবেগ ভরে বলল, "নিশ্চয়ই, নয় ! কে বলতে পারে। আমি হয়তো একজন মানুষকেও বাঁচাতে পারি। এই বিষয়েই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। প্লাটোনভ তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। ঠাট্টা করো না, অন্য কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না।"

"তুমি কি এখান থেকে একটা মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চাও? বাঁচাতে চাও তাকে?" প্লাটোনভ স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল।

লিথোনিন একটু ইতস্ততঃ করে বলল, হ্যাঁ; আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই।"

জেনী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "শুধু এই হ'বে, যে সে দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে এখানে।"

লিথোনিন উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার পর ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

"জেনী, তুমি কি রাজী হ'বে? না, রক্ষিতা হিসাবে নয়—শুধুমাত্র বন্ধু হিসাবে। তুমি ছ'মাসের জন্যে বিশ্রাম পাবে। তারপর তোমাকে কোন একটা কাজ শিখে নিতে হ'বে। আমার—"

জেনী রেগে গিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল তার। "না!" চিৎকার করে বলল সে। "তোমাদের মতো লোকেদের আমি জানি। তুমি চাইবে আমি তোমার মোজা সোলাই করি, রান্না করি তোমার জন্যে, যতক্ষণ তুমি তোমার ঝাঁকড়া চুলওয়ালা বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটাবে ততক্ষণ গরম রাখতে হবে তোমার বিছানাটা। আর যখন তুমি উকিল, ডাক্তার বা সরকারী কর্ম্মচারী হ'বে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমাকে। বেরিয়ে যাও, চরিত্রহীন, শয়তান কোথাকার!"

"আমি সে কথা বলতে চাই নি। আমি কি তোমার দাদা হতে পারিনা! আমি, মনে, তোমার···লিথোনিন আমতা আমতা করে বলল।

"ও সব দাদা ভাই এর ব্যবসা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। সেটা মাত্র একরাত্রির জন্যে থাকবে, তারপর—কথা বাড়িও না, আমি বিরক্তি বোধ করছি।"

"এতে কাজ হ'বে না লিথোনিন," সাংবাদিক বেশ জোর দিয়েই বললেন, "এ ভার বহন করা খুবই শক্ত।"

তিনজনেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। লিথোনিন রুমাল বুলিয়ে নিল কপালটায়। "দূর হোক গে যাক্. আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। ল্যুবা, ল্যুবা।"

ল্যুবা তার চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে হাসল। "আমি ঘুমোই নি। সব কথাই শুনেছি আমি।" সে বলল।

"ল্যুবা তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে? চিরকালের জন্যে এই জায়গা ছেড়ে ছেড়ে যাবে, আর কখনই ফিরে আসবে না, রাস্তাতেও দাঁড়াবে না।"

ল্যুবা উত্তরের জন্যে জেনীর মুখের দিকে চাইল।

"বলে যাও," ল্যুবা ধূর্ত্ত স্বরে বলল, "তুমি এখনও ছাত্র, একটা মেয়েকে পুষবে কি করে?"

"আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি ল্যুবা। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। আমার সঙ্গে চলে এলে দেখবে, তুমি নিশ্চয়ই কিছু করতে পারছ। তুমি নিজেই তা করতে পারবে।"

"আমি কিছুই করতে জানি না। মজা করো না আমাকে নিয়ে।" ল্যুবা লাল হ'য়ে উঠে জেনীর দিকে তাকাল।

"না, ও ঠাট্টা করছে না।" একটা আশ্চর্য রকম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জেনী।

"আমি শপথ করে বলছি।" লিখোনিন আবেগ ভরে বলল।

"বেশ, জেনীর মতো গর্ব্ব আমার নেই। এ জায়গায় আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি।"

"ঠিক, জেনী বলল, "ল্যুবাকে নিয়ে যাও। ও আমার মতো নয়। আমি একটা বুড়ো ঘোড়া, ঘাস দিয়ে বা চাবুক মেরে আমাকে বদলানো যাবে না। ল্যুবা খুব ভালো মেয়ে। এখানে থেকেও আমাদের সাহচার্য্যে ও নিজেকে নষ্ট করে ফ্যালেনি। আচ্ছা তুমি যেতে চাও, না চাওনা?

"বেশ, যদি ও তাই চায়! তুমি কি বলো জেনী?"

"আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? ও তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। উত্তরটা ওকেই দাও। তোমার কি মনে হয় এখানে থেকে পচে মরা ভালো? তোমার উচিত কৃতজ্ঞ হয়ে ওর হাতে চুমু খাওয়া, তা না করে তুমি গব্ গব্ করছ?"

সরল প্রকৃতি ল্যুবা সত্যি সত্যিই তার ঠোঁট দিয়ে লিখোনিনের হাত স্পর্শ করতে এগিয়ে গেল।

"সুন্দর। ভারী সুন্দর।" লিখোনিন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। "যাও, ওদের বলে এস, যে চিরকালের মতো তুমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছ। যে কোন মেয়ে ইচ্ছে করলেই পতিতালয় ছেড়ে চলে যেতে পারে।"

"না।" জেনী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। "ও ভাবে কিছু করতে যেও না। একথা অবশ্য সত্যি আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার অধিকার আছে, কিন্তু সে যাওয়াটা আটকাতেও পারে এরা। আচ্ছা তোমার কাছে কি দশটা রুবল হবে?"

"নিশ্চয়ই! এই নাও না।"

"ল্যুবা এখন বাড়ীওয়ালীকে বলুক যে আজ রাতের মতো তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছ। তার মূল্য দশ রুবল। তারপর কাল তুমি ওর পাশপোর্ট আর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাবে। আমরা সেগুলো ঠিক করে রেখে দেবো। ল্যুবা, তুমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? টাকাটা নিয়ে যাও। মনে রেখো তোমাকে যেন বেশ সপ্রতিভ দেখায়। ওরা যেন কিছু বুঝতে না পারে।"

আধঘণ্টা পরে ল্যুবা আর লিখোনিনএকটা ভাড়া করা ছ্যাকরা গাড়ীতে উঠে বসলো। জেনী আর সাংবাদিক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো তা!

"লিখোনিন. এটা খুব বোকার মতো কাজ হলো। যাই হোক্ তা সত্ত্বেও আমি শ্রদ্ধা জানাই তোমাকে।" সাংবাদিক মৃদুস্বরে বললেন।

'আমাকে কিন্তু ওর নতুন নামকরণের সময় নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না।' জেনী ব্যাঙ্গের সুরে বলল।

লিখোনিন হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "তারজন্য তোমায় অনেকদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

ওরা চলে গেল। সাংবাদিক মশায় জেনীর চোখে জল দেখে বিস্মিত হ'লোনা

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হোক্," জেনী নিম্নস্বরে বলল।

"তোমার বিশেষ একটা কষ্ট আছে, মনে হ'চ্ছে জেনী! কি কষ্ট? আমি কি কোন সাহায্যে আসতে পারি?" সাংবাদিক বললেন।

জেনী মুখটা ফিরিয়ে নিল।

"অমোর প্রয়োজন হ'লে তোমাকে কোথায় চিঠি লিখব?" সে কান্না চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"কাগজের অফিসে আমাকে লিখো, আমি পেয়ে যাব।"

"আমি—আমি—আমি—জেনী বলতে শুরু করে হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

মুখ থেকে হাত না নামিয়েই জেনী উঠে দাঁড়ালো, আর দৌড়ে আবার চলে গেলো পতিতালয়ের অভ্যন্তরে।

(২)

প্রায় এক মাস পরে এক বর্ষণমুখর অপরাহ্নে মেয়েরা জমা হ'য়েছে জেনীর ঘরে। কোন কারণে জেনী আজ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। অপ্রীতিকর ঠাট্টা আর মন্তব্য ছিল না তার মুখে। ছেঁড়া উপন্যাসখানা আজ আর খোলেনি সে। তার চোখ দুটো যেন ঘৃণায় হলুদ হ'য়ে জ্বলছিল। মান্‌কা, যে তাকে সত্যিই ভালবাসে, চেষ্টা করেছিল ওকে অন্যমনস্ক রাখার। কিন্তু জেনীর

সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। মেয়েদের মধ্যে কথাবার্তা চলতেই থাকলো। কিন্তু কোন মজা ছিল না তাতে। সম্ভবতঃ গ্রীষ্মের একটানা বর্ষণই ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক।

তামারা বিছানায় জেনীর পাশেই বসেছিল। ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে চুপি চুপি বলল, "জেনীচ্‌কা কি হয়েছে তোর? কোন গোলমাল? মানকাও এটা বুঝে ফেলেছে। আমাকে বল্‌না কি ব্যাপার। হয়তো আমি তোকে সাহায্য করতে পারবো।"

জেনী চোখ দুটো বন্ধ করে মাথা নাড়ল। তামারা তার কাঁধে মৃদু মৃদু টোকা মেরে বলল, "ওটা তোর নিজের ব্যাপার জেনী। আমি খোঁচা দিতে চাই না তোকে। শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম, কারণ......',

হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জেনী। তামারার হাতটা ধরে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "বেশ চল, এখান থেকে। আমি তোদের সবকিছুই বলব।"

বারান্দায় জানলার পাশে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালো সে। তারপর বিকৃত মুখে ধরা গলায় বলল, "শোন্‌, আমাকে কেউ উপদংশের বিষে সংক্রমিত করছে।"

"হায় হতভাগী! কতদিন আগে?"

"অনেকদিন হল।"

তামারা চাপা গলায় বলল, "আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। জেনী তোমার উচিৎ উপযুক্ত চিকিৎসা করানো।"

"না!" হাতের যে রুমালটা পাকাচ্ছিল জেনী সেটা রাগে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। "না, কক্ষনো না। আমার থেকে তোদের কেউ সংক্রামিত হবি না। তোরা লক্ষ্য করেছিস আমি তোদের সঙ্গেএকসঙ্গে বসে খাচ্ছি না। আমার খাবার পাত্রগুলো আমি নিজেই ধুয়ে নিচ্ছি। এই কারণে মান্‌কাকেও আমি দূরে সরিয়ে রাখছি। তোরা জানিস, আমি ওকে কত ভালবাসি। কিন্তু পুরুষদের ঐ দু'পাওয়ালা জানোয়ারদের—আমি সকলকেই সংক্রামিত করব। প্রতিটি রাতেই আমি ওরকম দশ, বারো, পনের জনকে পাচ্ছি। ওরা পচে মরুক! ওদের মাধ্যমে ওদের বিয়ে করা বউ আর প্রেয়সীরাও সংক্রামিত হোক্‌। হ্যাঁ, ওদের মা-বাবারাও পচে মরুক! বেজম্মার দল সব!"

তামারা জেনীর মাথায় আস্তে আস্তে টোকা মারছিল। "জেনী তুই কি সত্যিই একাজ করতে চাস?"

"হ্যাঁ, ওরা আমাকে যে রকম দয়া করেছে, সেই রকম দয়াই ফিরিয়ে দিতে

চাই আমি। কিন্তু তোমরা, মেয়েরা ভয় পেও না। আমার লোকদের আমি বেছে নেব। আমি নিশ্চিত হ'য়ে নেব যে তারা আর যাতে পরে তোদের কাছে না যায়। আমি এমনভাবো থাকবো যে আমাকে দেখেই ওদের কামনা উদগ্র হয়ে উঠবে। তখন আমাকে দেখে তোরাই হাসতে হাসতে মরে যাবি। আমি ওদের কামড়ে দেব, আঁচড়ে দেব, আর পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের ওপর। এই বোকা জানায়ারগুলো আমাকে বিশ্বাসও করে।”

তামারা দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, “ওটা তোমার নিজের ব্যাপার। হয়তো তুমিই ঠিক। কে জানে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ডাক্তারী পরীক্ষার হাত থেকে রেহাই পেলে কি করে?”

জেনী ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার শার্সিতে মুখ চেপে কেঁদে ফেলল। কাঁপা কাঁপা ধরা গলায় সে তড়বড় করে বলে গেল, ‘কারণ আমার ভাগ্যটা ছিল ভালো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার এমন জায়গায় রোগটা হয়েছে যেখানে ডাক্তারেরা কোনদিনই খুঁজে দেখবে না।

তারপর হঠাৎ নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি বলে জেনী থামালো তার কান্না।

‘চল, তামারা আমরা আমাদের ঘরে যাই। আমি জানি তামরা আমার গোপন কথাটা কখনও প্রকাশ করবে না।

ওরা আবার জেনীর ঘরে ফিরে এল। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল ওরা সবাই শান্ত। সর্দার প্রবেশ করল ঘরে।

‘জেনী মাননীয় সৈন্যাধক্ষ্যমশায় ওয়াণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওকে দশ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।’

আসলে লিথুয়ানিয়ারমেয়ে সুন্দরী গাঢ় নীলচোখ বিশিষ্টা ওয়াণ্ডা জেনীর দিকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকাল।

মহামান্য সেনাপতি মশায় প্রতিমাসে দুবার ওয়াণ্ডাকে দেখতে আসেন। তাঁর বিকৃত চাহিদার ওয়াণ্ডা সব সময়েই হাঁপিয়ে ওঠে, প্রায় দম বন্ধ হয়ে যায় তার। জেনীর মুখের একটা কথায়ই ওয়াণ্ডা না গিয়ে থাকতে পারতো। কিন্তু জেনী ইচ্ছে করেই চোখ বুজে রইল। কোন কথাই বলল না সে। ওয়াণ্ডা শান্ত ভেড়ার মতো বেরিয়ে গেলেন।

জেনী তার উপন্যাসখানা ঘরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। আচ্ছা সেনাপতির বিশেষ কি বিশেষত্ব আছে? ওর থেকেও খারাপ অভিজ্ঞতা আমার আছে। একবার একজন নাগর পেয়েছিলাম যে ছিল সত্যি-কারের বর্বর। আমার বুকে যতক্ষণ না পর্যন্ত পিন ফুটিয়ে যন্ত্রণা দিতে পারছে

ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রেম নিবেদন সম্পূর্ণ হত না। আর ভিল্‌নাতে আমি আর এক বিকৃত রুচির লোক পেয়েছিলাম, যে আমাকে সম্পূর্ণ সাদা পোষাক পরিয়ে সারা গায়ে পাউডার ছিটিয়ে মড়ার মতো হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য করত। যখন সে দেখতো আমার দেহটা সম্পূর্ণ প্রাণহীন দেখাচ্ছে তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার ওপর।'

'সত্যি জেনী!' মানকা বলল, 'আমি একবার ঐরকম একটা বুড়ো ভাম পেয়েছিলাম। সে জোর করে আমাকে চেঁচিয়ে কেঁদে কুমারী মেয়ে সাজতে বাধ্য করত।"

হঠাৎ মোটা কাট্‌কা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'আর আমার ছিল একটা শিক্ষক। অঙ্কের মাষ্টার ছিল সে। সে আমাকে বাধ্য করত পুরুষের মতো জোর করে তাকে......কি চরিত্র! শোন, মেয়ে, সে চেঁচিয়ে বলত, আমি তোমার, তোমারই, আমাকে নাও, গ্রহণ করো।'

'মাথা খারাপ!' প্রাণোচ্ছ্বল ভারকা জোর দিয়ে বলল, 'পাগল সব।'

'পাগল কিসে?' তামারা জিজ্ঞেস করল। 'না পাগল নয়, বিকৃত রুচি. সব পুরুষই যেমন হয়ে থাকে। বাড়ীতে তার একঘেয়ে লাগতো, আর এখানে মাত্র কয়েকটা রুবল খরচ করেই সে যা চায় তাই পেতো। আমার তো তাই মনে হয়।'

'তোমারা বোকা। হ্যাঁ, তোমরা প্রত্যেকেই বোকা!' জেনী হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'ওদের ওসব করতে আস্কারা দাও কেন? তোমরা ওদের ক্ষমা করো কেন? প্রথম দিকে আমিও ছিলাম বোকা, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এখন আমি ওদের নাড়ুগোপাল সাজিয়ে রাখি। ওদের আমি বাধ্য করি আমার পায়ে চুমু খেতে। ওরা ওদের বৌদের, প্রেয়সীদের ফটো আমাকে এনে দেয় আর সেগুলো আমি আমাদের শৌচাগারের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখি। মেয়েরা মাত্র একবারই ভালোবাসে আর সে ভালোবাসা চিরকালের। আর পুরুষ-কুকুর যেমন সঙ্গমে লিপ্ত থাকার সময় তার সহচরীকে ভালোবাসে, সেই রকম ভালোবাসে ওরা মেয়েদের।

ওয়াণ্ডা ফিরে এল। বাতির আলো যেখানটা আবছা হয়ে পড়েছে সেই জায়গায় গিয়ে বসল সে। ও যে আধঘণ্টা কিভাবে কাটিয়ে এল তা আর জিজ্ঞাসা করতে হল না কাউকে। হঠাৎ সে পঁচিশটা রুবল টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মদ আনতে বলল। তারপর মুখটা দুহাতে ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। জেনী তার নিজের

ঠোঁটটা এমনভাবে কামড়ে ধরল যে দাঁতের দাগ বসে গেল সেটায়।

আগস্টের বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা বেশীক্ষণ অতিক্রান্ত হয়নি। ঘড়িতে মাত্র নটা বাজে। আন্নামারকোড়নার অভ্যর্থনা কক্ষটি তখন প্রায় খালি বললেই চলে। কোলিয়া গ্লাডিসেভ সেই সময় উপস্থিত হ'ল।

জকির পোষাক পরা ভারকা লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জেনী, জেনী, তোমার ছোট্ট প্রেমিকটি এসে গিয়েছে। সেনাবাহিনীতে শিক্ষার্থী সেই বোকা বোকা ছেলেটি।

কিন্তু জেনী তখন ওপরে একজন মোটা রেলের গার্ডকে নিয়ে ব্যস্ত! কোলিয়া গ্ল্যাডিসেভ তার একজন ছাত্রবন্ধু পেট্রোভকে নিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে পেট্রোভ কোনদিন পতিতালয়ে পা দেয়নি। এক বছর আগে কোলিয়া যে রকম জ্বরোত্তাপের মতো উত্তেজনা বোধ করেছিল সম্ভবতঃ তারও অবস্থা হয়েছিল সেই রকম। তার মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন ঘরের আলো গুলো তাকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে।

কোলিয়া গ্ল্যাডিসেভ বেশ সুন্দর স্ফূর্তিবাজ ছেলে। তার ওপরের ঠোঁটে নতুন গজানো গোঁফের নীচের দিকে একটা বক্ররেখা থাকায় তার মুখটা ভারী মজার দেখাতো। গত বছর শীতকালে যখন কোলিয়ার সঙ্গে সারারাত কাটিয়েছিল তখন তাই নিয়ে মজা করেছিল জেনী।

এক বছর ক্যাম্পে থাকার পর এখন তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। সে পরিবর্তন সকলেরই চোখে পড়ে। বালকটি এখন যুবকে পরিণত হয়েছে। এখন বেশ পাকানো শরীর তৈরী হয়েছে তার। গত কয়েক মাসে তার বুকের বোঁটা দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। কোলিয়া মনে করে এটা তার পূর্ণ পুরুষত্ব প্রাপ্তিরই লক্ষণ। যদিও মাত্র ন'বছর বয়সে কোলিয়া যৌন উত্তেজনা বুঝতে শিখেছিল কিন্তু তখন প্রেমও সঙ্গমের চূড়ান্ত আনন্দ যে কি তা সে বুঝতো না। বেশীর ভাগ ছেলের মতোই যৌন জগৎ সম্পর্কে একটা ভয় মিশ্রিত লোভের বোধ ছিল তার। একবার ড্রয়ার খুলে সে কতকগুলো বিকৃত সম্ভোগের ফটো দেখে ফ্যালে। তার স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তখন নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ পেয়েছে। যেসব ছেলেরা পতিতালয়ে যাতায়াত করত তারা অনেকেই নিজেদের স্ফূর্তির অভিজ্ঞতা অতিরঞ্জিত করে বলত তার কাছে।

সেই জন্যেই কোলিয়া একদিন আন্নামারকোড়নার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল। তাকে বেশী পিড়াপিড়ী করতে হয়নি, উপরন্তু যাতে তাকে আনন্দ করতে দেওয়া হয় তার জন্যে সে নিজেই অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল।

সেই সন্ধ্যাটার কথা যখনই মনে পড়ে তার তখনই বিরক্তিতে ভরে ওঠে তার মন। ওর মনে আছে, সাহস আনার জন্যে সেদিন অনেকটা মদ গিলতে হয়েছিল তাকে। তখন তার মনে হয়েছিল ঝাড় বাতিটার আলোগুলো যেন চাকার মতো ঘুরছে আর রং বেরং-এর পোষাক পরা মেয়েগুলো যেন রঙীন আতসবাজীর মতো লাফালাফি করছে। মেয়েদের ঠেলে ওঠা বুকগুলো যেন ঝকঝকে করে জ্বলছিল তার চোখের সামনে। তার এক বন্ধু একটা মেয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলল আর মেয়েটি এগিয়ে এসে আহ্বান জানাল তাকে।

"কিগো ভালো ছেলে, তোমার বন্ধু বলছে যে এই তুমি প্রথম এলে এখানে বেশ করেছ, এস, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কিছু।"

আন্নামারকোড়নার বাড়ীর দেওয়ালগুলো একথা শুনেছে হাজারবার। তারপর কি ঘটেছিল কোলিয়ার পক্ষে তা মনে রাখা সম্ভব হয়নি। মিষ্টি মিষ্টি অনেক চুমু আর পরস্পরের শরীরের স্পর্শ তাকে মাতাল করে তুলেছিল। তারপর একটা আনন্দময় ব্যথার অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিছু-ক্ষণ পর সে দেখেছিল তার থরথর করে কাঁপা হাতে পায়জামার বোতামগুলো আঁটছে সে। কোলিয়া তার জীবনে প্রথম নারী জেনীকে জেনেছিল।

প্রতিটি মানুষই সঙ্গমের পরবর্তী অবসাদের অভিজ্ঞতা লাভ করে, কিন্তু এই অসহ্য নৈতিক যন্ত্রণা কেটে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই। কোলিয়া এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বেড়ে গিয়েছিল তার সাহস। মেয়েদের সঙ্গে থাকতে সে আর অস্বস্তি বোধ করতো না। ভারকা যখন বলল, 'জেনী তোমার প্রেমিক এসে গিয়েছে।' তখন কথাটা শুনে বেশ মজাই উপভোগ করল সে।

ছেলে দুটি বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। পেট্রোভ মদ খেয়েছিল অনেকটা তাই মুখটা হয়ে উঠেছিল বিবর্ণ আর পা দুটোরও তালের ঠিক ছিল না। বৈঠকখানায় ভারকা আর তামারা সঙ্গ দিল ওদের।

'আমাকে একটা সিগারেট দাও ভাই। ভারকা পেট্রোভকে বলল, যেন দৈবাৎ লেগে গিয়েছে এমনভাবে সে তার ভারী গরম উরু দিয়ে চাপ দিল তার পায়ে।

গ্ল্যাডিসেভ জিজ্ঞেস করল, জেনী কোথায়? ওকি এখনও রয়েছে কারও সঙ্গে?'

তামারা এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ওর চোখের দিকে যে সে অস্বস্তিবোধ করে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'অন্য কার সঙ্গে? না! ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে ওর। হতভাগীটা কপালে জলপটি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। ব্যস্ত হ'বার কিছু নেই, পাঁচ দশ মিনিটের

মধ্যেই ও বাইরে আসবে।'

ভারকা রেট্রোভের গায়ে গা ঘষেই চলেছে। 'তোমার নাম কি, মিষ্টি ভাইটি আমার ?'

পেট্রোভ কর্কশ স্বরে উত্তর দিল, 'জর্জ'।'

ভারকা ওকে বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে বলল, জিওরজি, পারজি, জিওরজি, তুমি আমার সঙ্গে এস।'

পেট্রোভ মেঝেয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'আমি জানিনা, আমার বন্ধু যা বলবে তাই হবে।'

'সত্যি ভারী মজার কথা তো !' ভারকা হাসল। 'শুনেছ তামারা, আমি ওকে আমার সঙ্গে শুতে বললাম, আর ও উত্তর দিল বন্ধু যা বলবে তাই হবে।'

ভারকা পেট্রোভকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেও বাগাতে পারল না। ওর নেশা কেটে গিয়েছিল আর এই বেশ্যালয়ে আসাটা ওর খুব কুৎসিত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাবার মতো সাহস ওর ছিল না।

'জেনী এখনও বেরুল না কেন ?' কোলিয়া ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছিল।

সকলের অলক্ষ্যে ভারকা ইসারা করে তামারাকে জানিয়ে দিল জেনীর অতিথি বিদায় নিয়েছে।

'আমি গিয়ে ওকে ডেকে আনছি।' তামারা বলল।

'তোমরা সব সময় জেনীকেই বা পেতে চাও কেন ?' বয়স্কা হেনরিয়েটা ছেলেটির গা ঘেঁসে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমিও তো তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারি ভাই ?'

'অন্য কোন সময়ে।' কোলিয়া উত্তর দিল। স্নায়বিক দুর্বলতা কাটাতে একটা সিগ্রেট ধরাল সে।

তখনও পর্য্যন্ত জেনীর পোষাক পরা হয়নি। আয়নার সামনে বসে সে মুখে পাউডার লাগাচ্ছিল।

'ব্যাপার কি তামার ?'

'তোমার সেপাই প্রেমিক হাজির। অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'গত বছরের সেই শিশুটা ? নরকে যাক্ ব্যাটা !'

'কথাটা আমার ভালই লাগছে। কিন্তু ও বেশ বেড়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি যদি না চাও তো আমিই ওটাকে বাগাতে পারি।'

তামারা আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল জেনীর মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

'না, দাঁড়াও। ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'জেনী, সেটা কি ঠিক হবে?',

'ঠিক হোক্ বা না হোক তাতে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই তামারা।' জেনী রূক্ষস্বরে উত্তর দিল।

'ওর জন্যে কি তোমার একটু দুঃখও হয় না?'

'আমার জন্যে কি তোমার দুঃখ হয়?' জেনী গর্জে উঠল। 'ওয়ান্ডার ব্যাপারটার জন্যে কি তোমার দুঃখ হয়? তুমি একটা মরা ঠান্ডা মাছ!'

'আমাদের ঝগড়া করা ঠিক নয়। জীবনটা চড়ুইভাতি নয়; বেশ, ওকে ওপরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তামারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনী আলোটা কমিয়ে দিয়ে একটা কিমোনো গায়ে দিল। এক মিনিট পরে গ্ল্যাডিসোভ্ হাজির হলেন ওর ঘরে। জেনী বিছানা থেকে উঠল না। গত বছর সেই শিশুটির পরিণত যৌবনপ্রাপ্ত মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

'তোমার কি হয়েছে প্রিয়া?' কোলিয়া বিছানায় তার পাশে বসে পড়ে ওর হাতে টোকা মারতে মারতে জিজ্ঞেস করল।

'না। কিছু নয়। মাথাটা একটু ধরেছে। কিন্তু এখন তুমি এসেছ বলে একটু ভাল বোধ করছি। আজ রাতটা তুমি থাকছ তো? তোমার টাকা না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না। বাকীটা আমি তোমায় দিয়ে দেব। তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে!'

কোলিয়ার অমনোযোগী কানেও জেনীর অস্বাভাবিক সুরের কথাটা ঝন্ করে বেজে উঠল। তার গলার সুরে ছিল স্নেহ আর বিদ্রূপের সংমিশ্রণ।

'আমার তো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দশটার মধ্যেই ফিরব বলে বাড়ীতে জানিয়ে এসেছি যে!'

'তাতে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ। তুমি তোমার ইচ্ছে মতই কাজ করবে। আলোটা নিভিয়ে দেব, না ঐরকম থাকবে।'

কোলিয়া ওর নরম শুকনো দেহটা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'তাতে আমার কিছু এসে বয়ে যায় মা।' জেনী আস্তে করে ওকে ঠেলে দিল।

'দাঁড়াও, একটু ধৈর্য্য ধরে থাক; চুমু খাবার অনেক সময় পাবে। এইরকম করে একটু চুপ করে শুয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না। শান্ত হয়ে থাক।'

জেনীর আদেশের ভঙ্গীতে বলা আবেগভরা কথাগুলোর বালকটি যখন সম্মোহিত হয়ে পড়ল। মাথার নীচে হাত দুটো দিয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

জেনী কনুই-এ ভর দিয়ে মাথাটা তুলল ; আর ঘরের সেই মৃদু আলোয় চুপ করে দেখতে লাগল ছেলেটির কাঁপা শরীরটা। তার মুখ ও ঘাড়ের রোদে পোড়া চামড়ায় আর মাংসল ঘাড় ও চওড়া ধবধবে সাদা বুকের রং যেন একটা বৈপ্যরীতের সৃষ্টি করছে।

গ্ল্যাডিসোভ চোখ বন্ধ করল। সে অনুভব করল, জেনী একাগ্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে তার শরীরটা। সে দৃষ্টি যেন স্পর্শ করছে তার চামড়াকে।

'জেনী, তুমি আমাকে অমন করে দেখছ কেন? কি ভাবছ তুমি? নীচু স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'আমার চোখের ওপর রাগ করো না কোলিয়া। এই একবারের মতো আমাকে একটু মজা করতে দাও। চোখ বন্ধ কর আবার। না, এরকম নয়, বেশ জোর করে বন্ধ করে থাকো। আমি একটু জোর করে দিয়ে আসছি আলোটা। তোমাকে একটু ভাল করে দেখতে চাই আমি। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। যদি তুমি নিজে জানতে এখন, মানে এই মুহূর্তে কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! পরে তোমাকে খারাপ দেখাবে! কিন্তু এখন যেন পশুর লোম, দুধ আর বুনোফুলের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। চোখ দুটে বন্ধ করো লক্ষীটি।"

জেনী আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল। তার পছন্দমত সুন্দর ভঙ্গীতে বসল সে। দূর থেকে ভাঙ্গা পিয়ানোটার ঘ্যানঘ্যানে শব্দটা, আর কয়েকটা কামরার পর একটা কামরা থেকে কারো উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ ধাক্কা মারছিল তার কানে।

এবার আমি আমার বিষে সংক্রামিত করব ওকে, ভাবল জেনী! তার চোখ পড়ল সুন্দর দেহী ভবিষ্যতের এক বীর যোদ্ধার ওপর। ওর জন্য আমার দুঃখ পাবার কি আছে? ও কি সুন্দর বলে? না, এরকম মানসিক দুর্বলতা বহুদিন আগেই কেটে গিয়েছে আমার। কারণটা কি হতে পারে? ওর বয়সটা অল্প বলে? এই তো গত বছরেই আমি ওকে মিছরি খাইয়েছি। তখন আমি ওকে কিছু জানাতে চেষ্টা করিনি কেন? হয়তো তখন ও ওসব কিছু বিশ্বাসও করতে পারতো না। হয়তো রাগ করে অন্য কোন মেয়ের কাছে চলে যেতো? আগেই হোক আর পরেই হোক প্রত্যেকেরই হবে এটা। আমি কি ওকে ক্ষমা করতে পারি? অন্যদের মতো ও আমাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। না, কিছু না জেনে, কিছু না ভেবেই করেছে একাজ।

'কোলিয়া, সে মৃদুস্বরে বলল, চোখ খোল এবার।'

চোখ খুলে ওর দিকে ফিরে গ্ল্যাডিসোভ গলা জড়িয়ে ধরে জেনীকে কাছে টেনে নিল। বোতাম খোলা কিমোনোর ফাঁক দিয়ে সে ওর বুকে চুমু খেতে

যাচ্ছিল। আবার তাকে দূরে সরিয়ে দিল জেনী।

'একটু দাঁড়াও। আমার কথা শোন। আচ্ছা কোলিয়া তুমি এখানে আস কেন?'

কোলিয়া উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। 'কি বোকা তুমি। এখানে সকলে আসে কেন? আমার বিশ্বাস আমার বয়স হয়েছে—আর মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মেয়েদের প্রয়োজন হয়। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দিয়ে অন্য কিছু করাবে না......"

'প্রয়োজন, শুধুই প্রয়োজন? মানে, আমাদের যেমন প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে হয়?'

'না, সে, রকম নিশ্চয়ই নয়।' কোলিয়া হাসতে হাসতেই উত্তর দিল। আমি তোমাকে প্রথম থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। অন্য কারো সঙ্গে আমি আর এভাবে সময় কাটাইনি।'

'বেশ, মেনেই নিলাম। কিন্তু সেই প্রথম বারও কি শুধুমাত্র যে প্রয়োজনের কথা বললে, সেই প্রয়োজনই ছিল।'

কোলিয়া ইতস্ততঃ করে বলল, 'না সে কথা বলব না। কিন্তু যাই হোক না কেন আমার মনে হয়েছিল আমার একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। বুঝতেই পারছ, অন্য ছেলেরা এসব ব্যাপারে এত কথা আমায় শোনাত যে একদিন আমিও ওদের সঙ্গ নিলাম।'

'তোমার কি লজ্জা করছিল?'

কোলিয়া বিরক্ত বোধ করছিল। এই রকম জেরা খুব খারাপ লাগছিল তার। সে বুঝতে পারছিল শোবার ঘরের অর্থহীন আবোল-তাবোল কথা নয় এগুলো এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

'আমার লজ্জা যতটা না হয়েছিল তার থেকে বেশী বিব্রতবোধ করছিলাম আমি। সাহস আনার জন্যে বেশ খানিকটা মদ গিলতে হয়েছিল আমাকে।'

জেনী কনুই এর ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল। আর আগের মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'এবার বলোতো আমার চুমু, আদর আর এই শরীরের জন্যে টাকা খরচ করতে কেমন লাগে তোমার? এতে কি লজ্জা পাও না একটুও?'

'আমি জানি না। সকলেই টাকা দেয়। আমি না দিলেও অন্য লোকেরা দেবে। আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কোলিয়া, তুমি কি কখনও ভালোবেসেছ? আমি সত্যিকারের ভালোবাসার

কথা বলছি না। কিন্তু তুমি কি কখনও কোন মেয়েকে ফুল উপহার দিয়েছ? তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছ?'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছি বইকি,' কোলিয়া আরও ধাঁধায় পড়ে গেল।' 'সকলেই তো করে।'

'কিন্তু সে সব মেয়েদের কখনও ছোঁও নি তুমি, তাই না? মনে করো তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে বলল, আমাকে গ্রহণ করো। শুধুমাত্র দুটো রুবল দাও আমাকে। তুমি কি বলবে?'

কোলিয়া হঠাৎ রেগে গেল, তোমার ব্যাপার কি জেনী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এরকম ভনিতা করছ কেন? থাক আমি পোষাক পরে নিচ্ছি।'

'দাঁড়াও কোলিয়া, দোহাই তোমার। আর একটা মাত্র প্রশ্ন করব তোমাকে।'

'বেশ।' গরগর করতে করতে বলল কোলিয়া।

'তুমি কি কখনও ভেবেছে তোমার বোনও এই রকম অধঃপাতে যেতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নিজের বোন, একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে। তখন কি বলবে তুমি?'

কোলিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সে রকম কখনই ঘটবে না। এখানেই শেষ, আমি এবার।''

বিরক্ত আর সঙ্গে সঙ্গে হতবুদ্ধি হয়ে ছেলেটি তার সুঠাম সুগঠিত দেহটাকে উঠিয়ে নিল বিছানা থেকে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মেঝেয় পাতা কম্বলের ওপর দাঁড়িয়ে সে। তার পূর্ণ যৌবনের ছিপছিপে স্বাস্থ্য ভরা দেহটা দেখাচ্ছে ভারী সুন্দর।

জেনী আদরের সুরে ডাকলো, 'কোলিয়া, কোলিয়া!'

জেনীর আবেগ ভরা কণ্ঠস্বর শুনে সে ফিরে তাকাল। তার এই জীবনে জল ভরা কোমল চোখের সৌন্দর্য্যের এই অভিব্যক্তি আর কখনও দেখেনি সে। আপনা হতেই তার হাত দুটো জেনীর গলা জড়িয়ে ধরল।

'আমাদের ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই জেনী।' শান্তস্বরে কথাটা বলল সে।

জেনীও হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। তারপর ওর মাথাটা চেপে ধরল নিজের বুকে। কয়েক মিনিট ধরে এই রকম আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রইল ওরা।

হঠাৎ গলার স্বর হারিয়ে ছড়ছড় শব্দ করে জেনী বলল. 'কোলিয়া, তোমার কি কখনও খারাপ রোগে আক্রান্ত হবার ভয় নেই?'

ছেলেটি কেঁপে উঠল। ভয়ে শিরশির কোরে উঠল ওর শিরদাঁড়াটা। সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

অনেকক্ষণ পরে সে বোলল, "ভয়ানক, অতি ভয়ানক ব্যাপার হ'বে সেটা। কিন্তু আমি তো কেবল তোমার কাছেই আসি। সেরকম হ'লে তুমিই তো বোলতে আমাকে।"

"হ্যাঁ, আমি বোলতাম তোমাকে।" এই প্রথম জেনী তার উক্তির তাৎপর্য্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বোলতাম। উপদংশ কি জিনিস সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?"

"নিশ্চয়ই। নাক ক্ষয়ে যায়।"

"না, কোলিয়া, শুধু নাক নয়, হাড় মাংস, মাথা, সবকিছুই, মানে সারা দেহটাই পচে গলে যায়। যার এই রোগ হয় সে আর মানুষ থাকে না। আধা মানুষ, আধা শব হ'য়ে যায়। আর সকলেই জানে, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে বা চুমু খায় তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে এই রোগে। কোলিয়া এমনই ভয়ঙ্কর এই রোগটা।" জেনী ওর আদুল কাঁধে হাত দিয়ে ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। তার চোখের দৃষ্টির উজ্জ্বলতায় কোলিয়ার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। "এখন কোলিয়া, তোমায় স্পষ্ট কোরেই বলি, প্রায় একমাস হোল ঐ রোগে ধরেছে আমায়।"

"তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাইছ। চাইছ ভয় দেখাতে।" কোলিয়া বিড়বিড় কোরে বোলল।

"সেই জন্যেই আমি তোমাকে চুমু খেতে দিইনি।"

জেনী ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। একটা দেশলাই কাঠি জেবলে সে ধরল নিজের মুখের সামনে। "এখন দেখ, আমি তোমাকে কি দেখাতে চাইছি।"

হাঁ কোরে সে জ্বলন্ত কাঠিটা এমন ভাবে ধরল তার নিজের মুখের সামনে যে তার গলা পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। "সাদা সাদা দাগগুলো দেখতে পেয়েছ তো? ওটাই উপদংশ। বুঝতে পেরেছ কোলিয়া, ওটাই উপদংশ।"

জেনীর দিকে না তাকিয়ে কোলিয়া পোষাক পরতে সুরু কোরল। তার হাত দুটো কাঁপছিল। হঠাৎ সে পোষাকটা ফেলে দিয়ে জেনীর পাশে বিছানায় উঠে বোসল, আর দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু কোরল।

মৃদুস্বরে বোলল সে, "হায় ভগবান! আমি এখন বুঝতে পারছি সবকিছু। আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করতে পারবে, জেনী?"

"হ্যাঁ প্রিয়তম, নিশ্চয়ই পারব।"

জেনী ওর ছোট কোরে কাটা চুল ভর্তি মাথায় মায়ের মতো আদরের চাপড় মারল আর তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে দিল দরজার দিকে।

"বিদায়, কোলিয়া।"

ওর হাত ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে কোলিয়া বোলল, "ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো আমায়।"

"আর তুমিও ক্ষমা কোরো আমাকে। বিদায় প্রিয়তম। আর কখনও দেখা হবে না আমাদের।'

শনিবারটা নিয়মিতভাবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। আন্না মারকোভ্‌নার মেয়েরাও সেদিন তৈরী হয়েই থাকে। তারা স্নান কোরে ভালো পোষাক পরে সাজগোজ করে, যাতে সুন্দর দেখায় তাদের। অভ্যর্থনা কক্ষে রাস্তার দিকের জানালাগুলো ভালোভাবে বন্ধ কোরে দেওয়া হয়। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে একটা জানালার ধারে ছোট নীচু একটা টেবিল রাখা হয়।

মেয়েরা স্বভাবতই সাহস হারিয়ে ফ্যালে। নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তে তারা কোন কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। যৌনরোগ মানেই একটানা অনেকদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা। শুধু বড় মান্‌কা যে কুমীর নামেই পরিচিত আর জয়াই ছিল শান্ত। ওরা দুজনেই ত্রিশ বছর অতিক্রম কোরে গিয়েছে, এবং পতিতালয়ের হিসাবে পেশাদার। ওদের পেশায় অনেক কিছুই দেখেছে তারা তাই নিশ্চিন্ত।

সকাল থেকেই জেনীর মনটা ছিল বিষাদগ্রস্ত। সে আলস্যভরে একের পর এক গ্লাস কনিয়াক পান কোরে চোলেছিল। তামারা জানতো জেনী মদ খাওয়াটা ঘৃণ্য কাজ বোলেই মনে করে, তাই বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল সে। জেনী তাকে স্মারক চিহ্ন হিসাবে তার হৃদয় আর বন্ধ হাত আঁকা প্রিয় আংটিটা ওকে নিতে রাজী করাল।

"আজ কি হয়েছে তোমার, যে অতি প্রিয় জিনিসগুলোও বিলিয়ে দিচ্ছ? তুমি কি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে?"

জেনী অবহেলা ভাবে উত্তর দিল, "তা যদি কোরতে পারতাম! আমার সব কিছুই বড় একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগছে তামারা।"

"বলো তো, কার লাগছে না সেরকম?"

"কোন কিছুই ভালো লাগছে না আমার। এই যে তোকে দেখছি, দেখছি

বোতলটাকে, আমার হাত পা আর সবকিছু, কিন্তু মনে হচ্ছে কোন মানে হয় না এসবের। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ, একজন সেপাই যাচ্ছে। ওকে মনে হচ্ছে যেন একটা দম দেওয়া পুতুল। আর বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে ও মারা যাবে, আমি মরে যাব, তুইও মরবি, কিন্তু কোন কিছুতেই আমার ভ্রূক্ষেপ নেই তামারা। সবকিছুই যেন অর্থহীন।"

আর এক গ্লাস কনিয়াক গলায় ঢেলে নিল জেনী।

তামারা, তুই ভাগ্যবতী। জীবনের কাছে এখনও তোর কিছু পাবার আশা আছে, কিন্তু আমি—অন্ততঃ আমি মৃতা। আমার বয়স মাত্র কুড়ি, কিন্তু আমার হৃদয় এখন ছিন্নভিন্ন, আর একেবারেই প্রাচীন। কবরের গন্ধ সেখানে। যদি আমি একটু ভেবেচিন্তে জীবনযাপন কোরতাম! এখন আমার জীবনটা একটা পাঁকের কুণ্ডছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ওসব কথা ছেড়ে দাও, জেনী। তুমি যথেষ্ট সুন্দরী ও সপ্রতিভা। লোকে তোমার পেছনে ছুটে বেড়ায়। যাও তুমি, এখান থেকে চলে যাও।"

"নাঃ" জেনী মাথা নাড়ল। "আমি যাব না। জীবন আমাকে চিবিয়ে খেয়েছে আর থু থু কোরে ফেলে দিয়েছে। আমি এখন আর মানুষ নই—একটা বুড়ো অপবিত্র পদার্থ। আর একটু মদ খাই। ওঃ বিষ! বিষ!"

তামারা তীক্ষ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোরল, "তুমি কি কোরবে ভেবেছ? বোকার ডিম!"

"তামারা, মনে কর্ আমি কিছু কোরতেই চাই। তুই কি আমাকে তা থেকে বিরত কোরতে চেষ্টা কোরবি?"

তামারা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওরদিকে। জেনীর দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক বিষন্নতা, যেন ভাবলেশহীন। তার চোখের আগুন নিভে গিয়েছে, অবসন্ন হয়ে পড়েছে; শুধু চক্ চক্ কোরছে সাদা অংশটা।

"না" তামারা উত্তর দিল। "আমি তোমাকে কোন সাহায্য কোরতে পারব না। কিন্তু থামাতেও চেষ্টা কোরব না তোমায়।"

এই সময় বাড়ীওয়ালী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা কোরল, "ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন। মেয়েরা সব চলে এস তাড়াতাড়ি।"

জেনী দাঁড়িয়ে উঠে বোলল, "তুই যা, তামারা। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি এক মিনিটের জন্যে। আমার পোষাক বদলানো হয়নি এখনও। যখন ওরা ডাকবে আমাকে তখন এসে নিয়ে যাস্।"

ঘর থেকে বেরোবার সময় সে তামারার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপড় দিল একটা, যেন হঠাৎই ওর কাঁধে হাত পড়ছে তার।

সহরের ডাক্তার! বয়স হয়েছে যথেষ্ট, উনি বহুদিন ধরেই এসব কাজ কোরে চলেছেন। তিনি এখন বীজানুনাশক ওষুধপত্র, ভেজলিন, আর সব প্রয়োজনীয় জিনিস বার কোরে সাজিয়ে রাখছিলেন। মেয়েরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। ওদের সঙ্গে শুধু রাত্রিবাস।

ডাক্তার একটা তালিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে ডাকলেন, "আলেকজান্ডা বুনিনস্কায়া!"

নতুন আসা একটা থ্যাবড়া নাকওয়ালা চাষী মেয়ে এগিয়ে এল। অস্বস্তিতে ক্লান্ত মেয়েটি কোন রকমে উঠে দাঁড়াল পরীক্ষার টেবিলের ওপর। চশমা পরা ডাক্তার নিরীক্ষণ কোরে তাঁর পরীক্ষা শেষ কোরলেন।

"যাও, ঠিক আসে সব। তুমি সুস্থ।" লিখতে লিখতেই তিনি এবার ডাকলেন, "ভট্‌সচেন কোডা ল্যুবা।"!

গত মাসটা ল্যুবা সেই ছাত্রটির সঙ্গেই কাটিয়েছে। যে এক পবিত্র সংকল্প নিয়ে ওকে নরক থেকে উদ্ধার কোরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেমন হয় অল্পদিনের মধ্যেই সে আবার ফিরে এসেছে তার পুরোনো আবাসে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এসব পরীক্ষার ঝামেলা পোয়াতে হয়নি বোলে ল্যুবা পরীক্ষার পদ্ধতি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাই ডাক্তার যখন পোষাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুক পরীক্ষা সুরু কোরলেন, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

জয়া, তামারা, মানকা আর ন্যুরা সকলকেই একবার কোরে টেবিলে উঠে দাঁড়াতে হোল। ছোট ন্যুরাকে প্রমেহ রোগের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থাপত্র দিলেন ডাক্তার। যন্ত্রের মতো নিরাসক্ত নিস্পৃহভাবে কাজ কোরে চোলেছেন ডাক্তার। গত কুড়ি বছর ধরে কয়েক শ' মেয়েকে সপ্তাহে একবার তিনি এইভাবেই পরীক্ষা কোরে আসছেন। মানুষকে নিয়ে যে তিনি কাজ কোরছেন তাঁকে দেখে তা মনে হয় না। সম্ভবতঃ তিনিও জানেন না যে আইনসিদ্ধ এই ভয়ানক বৃত্তি দেহদানের ব্যবসায়ে তিনি নিজেও কি নিবিড়-ভাবে জড়িত। তিনি যা জানেন তা শুধু শরীরবিদ্যা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যতশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা সমাধা কোরে পর পর আরও কয়েকটি এই রকম পতিতালয়ে রোগ পরীক্ষা কোরে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া।

"জেনী রেৎসিনা" তিনি ডাকলেন এবার।

কেউ এগিয়ে এল না। তামারা, যার পরীক্ষা সবে মাত্র শেষ হয়েছে এগিয়ে বোলল, "সম্ভবতঃ সে তৈরী হচ্ছে। একটু দাঁড়ান ডাক্তার বাবু, আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসছি তাকে।"

তামারা এক দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। অনেকক্ষণ হয়ে যেতেও সে ফিরছেনা দেখে বাড়ীওয়ালীও ছুটল এবার। আর কয়েকটা মেয়েও গেল পেছনে পেছনে। অবশেষে আন্না মারকোড্না নিজেই গেলেন দেখতে, ব্যাপারটা কি। জেনীকে কোথাও খুঁজে পেলো না তারা।

বাড়ীওয়ালী শেষে বোলল, "দ্যাখা যাক্ না ও বাথরুমে আছে কিনা?"

বাথরুমটা ভেতর থেকে বন্ধ। আন্না মারকোড্না দরজায় ধাক্কা দিল জোরে জোরে!

"জেনী বেরিয়ে এস। এ আবার কি ধরণের বোকামী?"

গলার স্বর আরও উচ্চে তুলে সে আবার ডাকল, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস কুত্তী? এক্ষুণি বেরিয়ে আয়। ডাক্তার বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।'

কোন উত্তর নেই। মেয়েরা ভয় পেয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। প্রত্যেকেরই মনে এক চিন্তা।

আন্না মারকোড্না হাতল ধরে দরজাটা আবার নাড়া দিল। "সর্দ্দারকে ডাক্," আদেশ দিল সে।

আন্না মারকোড্না আর অন্য মেয়েদের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে সর্দ্দার বুঝে নিল এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে তার আসুরিক শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বন মানুষের মতো হাত দিয়ে সে হাতলটা চেপে ধরে স্বর্বশক্তি প্রয়োগ কোরে দরজাটা টানতে লাগল। হাতলটা ভেঙ্গে বেরিয়ে এল আর দূরে ছিটকে পোড়ল সে।

"জাহান্নমে যাক্ সব।" বিরক্ত হয়ে বোলল সে, আমাকে একটা বড় ছুরি এনে দাও।"

দরজার জোড়ের ফাঁক দিয়ে ছুরিটা ঢুকিয়ে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিটকিনিটা সরিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। শ্বাস বন্ধ কোরে সকলেই একদৃষ্টে দেখছিল তার কাজ।

জেনী সুতো দিয়ে বোনা একটা বেল্টের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছিল। ওপরের জলের ট্যাঙ্কের সঙ্গে সে বেঁধেছিল বেল্টটা। ক্ষণমাত্র কষ্টভোগের পর তার প্রাণহীন দেহটা শক্ত হয়ে হাওয়ায় দুলছিল ঝুলন্ত অবস্থায়। তার মুখটা হয়ে

উঠেছিল বেগ্নী, আর জিবের খানিকটা অংশ দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

চিৎকার চেঁচামেচিতে ডাক্তার এসে হাজির হলেন। শান্তভাবেই তিনি এগিয়ে এলেন, দেখলেন খুঁটিয়ে কি ঘটেছে। তাঁকে দেখে মনে হোলনা যে তিনি একটুও বিচলিত বা উত্তেজিত হয়েছেন। অনেক বছর ধরে সহরের চিকিৎসক হিসাবে এরকম জিনিস তিনি এত দেখেছেন যে এখন আর তাঁর এ সম্পর্কে উত্তেজিত হবার মতো মানসিক দুর্বলতা নেই। তিনি সর্দারকে শবদেহটাকে একটু তুলে ধরতে বোললেন, তারপর নিজেই দড়িটা কেটে ফেললেন। কর্তব্য হিসাবে তিনি চেষ্টা কোরলেন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করাবার। পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় যখন তিনি কিছুই কোরতে পারলেন না তখন চশমাটা ঠিক কোরে নিয়ে বোললেন, "পুলিশকে খবর দাও।"

বাঁধা-ধরা ছকে পুলিশ রিপোর্ট লিখল। তারপর জেনীর অর্দ্ধ নগ্ন দেহটা খড়ের মাদুরে জড়িয়ে পাঠিয়ে দিল মর্গে।

জেনীর লিখে যাওয়া ছোট কাগজের টুকরোটা আন্না মারকোড্নাই প্রথম আবিষ্কার কোরলেন। তার হিসাবের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা পাতায় পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সে লিখেছে, "কারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি একাজ করছি, কারণ আমি উপদংশে সংক্রামিত হয়ে পড়েছি, আর বুঝেছি মানুষ ঠক্ আর ভণ্ড। জীবনের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি। তামারা জানে আমার জিনিসপত্রগুলোর কি ব্যবস্থা কোরতে হবে।"

তামারা ক্রন্দনরত মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। আন্নামারকোড্না ফিরলেন তার দিকে।

"তাহলে বিশ্বাসঘাতিনী, তুই জানতিস সব? তুই জানতিস সে কি কোরতে যাচ্ছে, আর একটা কথাও তুই বলিসনি কাউকে?"

সে তামারার গালে ঠেসে একটা চড় মারবার জন্যে হাত তুলেছিল। হঠাৎ হাতটা নেমে গেল, আর প্রায় শ্বাসবন্ধ হবার উপক্রম হোল তার। তামারাকে যেন এই প্রথম দেখছে সে। মেয়েটা একটা অসহ্য ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে আর একটা ছোট চক্চকে ধাতব জিনিস হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার চোখ লক্ষ্য কোরে।

॥ পরিচিতি ॥

JENNY : Alexander Kuperin

আলেকজান্ডার ক্যুপেরিন : জন্ম জারের রাশিয়ায়। লেখক তাঁর সংবেদনশীল মন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সে দিনের রুশ-জীবনের ব্যথা-বেদনা বিশেষ করে আক্কায়িত সমাজ-জীবনের এক বিশ্বস্ত দলিল রচনা করেছেন, জেনী এই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে। নারী কিভাবে সামাজিক জীব হয়েও ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে। কিভাবে সে পুরুষের ক্ষুধা আর কামনার একমাত্র উপকরণ হয়ে যাচ্ছে তা লেখকের অনবদ্য লেখনীতে বিধৃত হয়েছে তাঁর নানা উপন্যাসে।

স্বৈরিনী

গিয়োভানি বোকাসিও

অবস্থা বিপাকে মানুষকে কত দুর্ভোগই না পোহাতে হয়!

ফ্লোরেন্সের কাউন্ট এক সময় ছিলেন যথেষ্ট ধনী। শরিকদের সঙ্গে মামলা-বিবাদে ক্রমে ক্রমে তাঁর অবস্থা পড়ে গেল। তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্য অন্বেষণে। নানা ঠাঁই ঘুরতে ঘুরতে প্যারিস। সেখানে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় কাউন্টের কপাল খুলে গেল। তার পার্টনার হয়ে নেমে পড়লেন আমদানীর কারবারে। বছর না ঘুরতেই কাউন্ট লাখপতি।

তবু তাঁর মনে সুখ নেই। কারণ একমাত্র সন্তান লোডোভিকো বড় খেয়ালি। লেখাপড়ায় মন নেই, বাপের ব্যবসার দিকেও নজর রাখে না। অগত্যা কি করা যায়? ব্যবসায়ী-বন্ধু পরামর্শ দিল, ওকে ছলছুতো করে রাজবাড়ির কোন কাজে ঢুকিয়ে দাও। ওখানে থাকলে বুদ্ধি খুলবে, আদব-কায়দা শিখবে, পাঁচটা গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গেও আলাপ হবে।

যা ভাবা সেই কাজ। কাউন্ট তরুণ পুত্রকে রাজকুমারের সহচরদের দলে ভিড়িয়ে দিলেন। তোফা আনন্দে দিন কাটে। খাও দাও আড্ডা মারো। একদিন নানাদেশের সুন্দরীর কথা উঠলো। কোন্ দেশের মেয়ে কেমন সুন্দরী? প্রেমের খেলায় তারা কেমন খেলতে পারে? জোর তর্ক। ঠিক তখন সেই আড্ডায় যোগ দিল প্রাচ্য দেশ ঘুরে আসা কয়েকজন নাইট বা ধর্ম যোদ্ধা। কথায় কথায় তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ লোডোভিকোর দিকে চেয়ে সাগ্রহে বললে—'যা-ই বলো তোমরা, আমি ঢের ঢের রূপসী

দেখেছি কিন্তু বোলগ্না শহরের তালুকদার ইগানো ডে' গালুজ্জির বউ মাদোনা বিয়েত্রিচের মত সুন্দরী মেয়ে এ পর্যন্ত আমার নজরে আসেনি।' ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাইটদের মধ্যে যারা তাকে দেখেছে তারা সবাই বল্লে 'সে রূপসী সত্যি অতুলনীয়া!'

ঐ কথায় নবযুবক লোডোভিকোর মনে কামনার আগুন জ্বলে উঠলো। না জানি বিয়েত্রিচে কেমন রূপসী। একবার অন্ততঃ তাকে চোখের দেখাও দেখতে হবে। আর একবার চার চোখের মিলন হলে তাকে কিভাবে জয় করা যায় সে বিদ্যা লোডোভিকোর খানিকটা জানা আছে। ফরাসী রাজবাড়ি তো গোপন প্রেমের লীলাক্ষেত্র!

কিন্তু কিভাবে বাবার কাছ থেকে বোলগ্নাতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়? অনেক ভেবে লোডোভিকো গেল কাউন্টের কাছে। গিয়ে বলল, তীর্থ দর্শনের জন্যে তার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। তাই কিছুদিনের জন্যে সে স্বদেশে যেতে চায়! সেখানে সে বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরে দেখবে। চার্চে ভর্তি হয়ে ধর্মশাস্ত্রও শিক্ষা করবে। কাউন্ট প্রথমটায় রাজি না হলেও অনেক ধরাধরির পর মত দিলেন।

লোডোভিকো যাত্রা করলো বোলগ্নার পথে। কিন্তু আসল পরিচয়টা গোপন রাখা দরকার। তাই ধনী কাউন্টের ছেলে হ'ল গরিব, বেকার যুবক। তার নতুন নাম—আনিচিনো।

বোলগ্নায় পৌছানোর পরদিনই এক নৈশভোজ সভায় সেই রূপসীর দৈবাৎ দেখা পেয়ে গেল আনিচিনো রূপী লোডোভিকো। তার কামনার আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। যা শুনেছিল, আসলে তার থেকেও মাদকতাময়। ঐ বিয়েত্রিচেকে না পেলে লোডোভিকো বাঁচবে না। কিন্তু ঐ রূপসীর কাছে পৌছানো যায় কিভাবে?

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল ইগানো ডে গালুজ্জির প্রাসাদ বাগিচায় বহু দাসদাসী কাজ করে। আর যেখানে সে আছে সেই সরাইখানার মালিকের সঙ্গে ইগানোর ভারী দোস্তি। তাকে জপিয়ে আনিচিনো ইগানোর অন্দর মহলে গৃহ-ভৃত্যের একটা চাকরি জুটিয়ে নিল দু'চার দিনের মধ্যে।

ইগানো নিজেও তরুণ ও সুপুরুষ; সে চায় ভৃত্যেরাও খানিকটা তার মত হোক। তাহলে তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে সঙ্কোচ হবে না। আনিচিনোকে দেখামাত্র তার পছন্দ হয়ে গেল। তাই এক কথায় পাকা হয়ে

গেল তার চাকরি।

এখন কাজের ফাঁকে প্রায়ই মনিব গিন্নির সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। কিন্তু চতুর আনিচিনো মনের কথা মুখে প্রকাশ করে না। বরং প্রাণপণে ইগানোর মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। দেখতে দেখতে সমস্ত ভৃত্যের মধ্যে আনিচিনো হয়ে উঠলো ইগানোর সব চেয়ে বিশ্বাস-ভাজন।

একদিন ইগানো বেশ কয়েকজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে গেছে শিকার করতে। বাজপাখি আর কুকুরের সাহায্যে শিকার করার নেশা ছিল তার প্রবল। বাড়িতে সেদিন আর কেউ নেই। শুধু আনিচিনো আর বিয়েত্রিচে। ইগানোই বিয়েত্রিচের ফাই ফরমাস খাটার জন্য সবচেয়ে দক্ষ ভৃত্য আনিচিনোকে রেখে গিয়েছিল। আর বলা বাহুল্য বিয়েত্রিচেও জানতো না ভৃত্যরূপী ঐ যুবকের আসল মতলবটা কি! সে তাই সময় কাটানোর জন্যে আনিচিনোকে দাবার বোর্ড নিয়ে তার ঘরে আসতে বললে।

শুরু হল দাবা খেলা। চতুর আনিচিনো ইচ্ছে করে এমন চাল দিতে লাগলো যাতে বিয়েত্রিচে সহজে কিস্তি মাৎ করতে পারে! আর খেলায় জিততে পারলে কার না আনন্দ হয়।

একদান জেতার পর খুসিতে ডগমগ মনিব-গিন্নি যখন আবার দাবার গুঁটি সাজাচ্ছে তখন তার হঠাৎ নজর পড়লো সামনে বসে থাকে আনিচিনোর মুখের দিকে। ভারী বিমর্ষ দেখাচ্ছে পরাজিত ভৃত্যটিকে। বিয়েত্রিচে তার পানে তাকানো মাত্র সাড়ম্বরে আনিচিনো ফেলল এক দীর্ঘ নিশ্বাস!

—'কি ব্যাপার আনিচিনো, হেরে যাওয়ায় সত্যি কি তুমি খুব ব্যথা পেয়েছো?'

বিস্মিত বিয়েত্রিচে জানতে চাইলেন নরম গলায়।

—'না, গিন্নিমা, তার থেকেও ঢের বেশি বেদনাদায়ক একটা কথা ভেবেই আমার এই দীর্ঘ নিশ্বাস!'—একান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল আনিচিনো।

—'তাই নাকি? তা' আমি তো কোন ভাবে তোমার সেই দুঃখ দূর করতে পারি, আমাকে বলো না কেন? সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাজকর্মে আমি খুসি···তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ-ও করি।'······

স্নেহ? তার থেকে প্রেমের দূরত্ব আর কতটুকু? ভরসা পেয়ে আনিচিনো আরও লম্বা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো। বিয়েত্রিচের দরদ তাতে উথলে উঠলো —সে সব কথা খুলে বলতে আবার অনুরোধ জানালো।

—'মাই লেডি'—আনিচিনো সুযোগ বুঝে বলতে শুরু করলো—'ভয় হচ্ছে আমার দীর্ঘ নিশ্বাসের কারণ জানতে পারলে আপনি হয়তো দারুণ বিরক্ত হবেন, কিম্বা যা বলবো তা শোনামাত্র মনিবকে জানিয়ে দেবেন!'

—'তোমাকে কথা দিচ্ছি'—বিয়েত্রিচে আশ্বাস দিল—'তুমি যা বলবে তাতে বিরক্ত হব না আর তোমার সম্মতি ছাড়া কাউকে বলবও না!'

অতঃপর আনিচিনো সাবধানে শুরু করলো—'যখন আশ্বাস দিয়েছেন তখন খুলেই বলি মনের কথা, দয়া করে অপরাধ নেবেন না!'

এই ভণিতার পর অশ্রু সজল চোখে আনিচিনো একে একে খুলে বলল সব কিছু। জানালো তার আসল পরিচয়, কত কষ্ট করে সেরা সুন্দরী বিয়েত্রিচেকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে সে প্যারিস থেকে ছুটে এসেছে, তার রূপ কিভাবে তাকে পাগল করে তুলেছে, কেমন ভাবে চাকরের কাজে অতি কষ্টে এই প্রাসাদে দিন কাটাচ্ছে! সে কাহিনী বলতে বলতে তার গলা বুজে এলো।

সব কথা শোনার পর কি বিয়েত্রিচে দয়া করবে না? আনিচিনোর বুকের মধ্যে যে কামনার আগুন জ্বলছে তা নেবাতে সাহায্য করবে না? নির্জন ঘর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সামনে নতজানু আনিচিনো। তার কণ্ঠে অন্তর আকুল করা মিনতি। সুন্দরী, বিয়েত্রিচের মনটাও টলে উঠলো। সুদূর প্যারিস থেকে ছুটে এসেছে ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। প্রেমের জন্যে দাসখৎ লিখে দিতে চায় তার পায়ে। তার কান্না আর মিনতিতে কোন্ রূপসী স্থির থাকতে পারে? বিয়েত্রিচে মোহিনীচোখ তুলে চাইলো আনিচিনোর মুখের দিকে। না, তার আকুলতার মধ্যে কোন ছলনা নেই। সত্যি এ যুবক তার রূপে মাতোয়ারা। তাই তার পীন পয়োধর যুগল কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক দীর্ঘ নিশ্বাস। চোখ ভরা জল নিয়ে সে চাপা গলায় বললো—'লক্ষ্মীসোনা আমার, ভেঙে পোড়ো না, তোমাকে নিরাশ করবো না; তবে তোমার আগে অনেক প্রেমিক আমাকে নানা ভাবে প্রেম নিবেদন করেছে. কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের কারও ডাকে আমার সতীত্ব খোয়াই নি; মিষ্টি কথা, নানা প্রতিশ্রুতি বা উপহার কিছুই আমার মন টলাতে পারেনি! তারা কেউ ধনী ব্যবসায়ী, কেউ অভিজাত কাউন্ট, সবাই তারা সুপুরুষ! কিন্তু তোমার মিনতি মাখা কয়েকটা কথায়

আজ আমার মত বদ্‌লে গেছে। বুঝতে পারছি তোমার প্রেমে খাদ নেই, তা খাঁটি সোনা! তাই প্রিয় আমার, আজ রাতেই মিলবে তোমার সুযোগ, কথা দিচ্ছি এ দেহ-মন হবে তোমার। ঠিক মাঝরাতে যাতে তুমি আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারো তার জন্যে আমি দরজার আগল খুলে রাখবো। তুমি জানো বিছানার কোন্ পাশে আমি শুয়ে থাকি। নিঃশব্দে দরজা খুলে অন্ধকারে ঠিক সেই জায়গায় চলে আসবে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেবে, তখন এতদিন ধরে যা চেয়ে এসেছো তা সব পাবে! আর আমি যা বলছি তার প্রমাণ হিসেবে এই মুহূর্তে একটা পুরস্কার তোমাকে দেবো'—কথা বলতে বলতে বিয়েত্রিচে উঠে দাঁড়ালো আর উদ্‌ভ্রান্ত আনিচিনোকে দুহাতে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর ঠোঁটে এঁকে দিল এক আতপ্ত চুম্বন।

ঠিক তখনই জানালার বাইরে শোনা গেল তূর্য ধ্বনি; অর্থাৎ গৃহকর্তা শিকার সেরে স্ব-পারিষদ বাড়ি ফিরে আসছেন। তাই ঝটিতি প্রেয়সীর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনিচিনো ছুটল মনিবকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু তার বুকে লেগে রইল বিয়েত্রিচের উষ্ণ আলিঙ্গনের সৌরভ; আর মন ভরে রইল নিদাঘ রজনীর সুখ স্বপ্নে। কাজে আর মন বসে না, সারাক্ষণ খালি মনে হয় কখন আসবে মধ্যরাত্রি, মিলনের শুভক্ষণ!

আর এদিকে সারাদিন শিকার খেলা আর উদ্দাম পান ভোজনে ইগানোও ক্লান্ত। হাত-মুখ ধুয়ে, কোনমতে রাতের খাওয়া সেরে সে চলে গেল শয়নঘরে। তাকে অনুসরণ করলো বিয়েত্রিচে। ঘরে ঢুকে যথারীতি দরজা বন্ধ করলো, কিন্তু আগল টানলো না। পতিব্রতা স্ত্রীর মত দেওয়ালে টাঙানো মশাল নিবিয়ে শুয়ে পড়লো তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর বাঁ পাশে। ঘরজোড়া বিরাট পালঙ্কে একধারে ইগানো, অন্য পাশে বিয়েত্রিচে। একজন নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে, অন্যজন অপেক্ষা করে আছে এক অতিথির···

আনিচিনোর চোখেও ঘুম নেই। চাকরদের মহল্লায় নিজের ঘরে উত্তেজনায় সে ছট্‌ফট্ করছে। অবশেষে পথিক গীর্জার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো রাত বারোটা। পা টিপে টিপে আনিচিনো রওনা দিল তখনই। অবশেষে বিয়েত্রিচের শয়নগৃহ! দরজায় চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। যাক্ তার প্রিয়তমা কথা রেখেছে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই ঠাহর হয় না। তবে ঐ ঘরের কোথায় কি আছে তা ভৃত্য আনিচিনোর দখদর্পণে। তাই পা টিপে টিপে সে হাজির হলো পালঙ্কের বাঁ ধারে। তার আগে বন্ধ দরজার আগলটা টেনে দিতে ভুললো না।

যথাস্থানেই শুয়েছিল বিয়েত্রিচে। আনিচিনো আলতোভাবে হাত রাখলো তার বুকে। হাত রাখা মাত্র কিন্তু তার প্রভুপত্নী যে ব্যবহার করলো তাতে ঘাবড়ে গেল আনিচিনো। বিয়েত্রিচে সবলে চেপে ধরলো আনিচিনোর কব্জি।

সে বেচারা ছাড়ানোর শত চেষ্টা করেও ঐ লৌহ মুষ্টি ছাড়াতে পারলো না। সর্বনাশ! এইবার নিশ্চয়ই হাঁক ডাক করে বিয়েত্রিচে তার স্বামীকে জাগিয়ে তুলবে। আনিচিনো তার প্রেমিকার ঐ ব্যবহারের কোনো কূল কিনারা পেলো না।

এদিকে একজন খাটের ওপর দুহাতে চেপে ধরে আছে কব্জি। আর অন্যজন মেঝেতে বসে চেষ্টা করছে কোনো মতে নিজেকে মুক্ত করতে। বলতে কি আনিচিনো ছিল হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে। আর বিয়েত্রিচে বিছানায় অর্ধ-

শায়িতা। উভয়ের ধস্তাধস্তিতে ইগানোর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম জড়ানো চোখে সে জানতে চাইলো—'এত ছট্ফট্ করছ কেন প্রিয়তমা ?' বিয়েত্রিচে তখনও আনিচিনোর হাত ছাড়েনি। সেই অবস্থাতেই সোহাগ ভরা গলায় সে বললো—'ওগো, আজ সন্ধ্যেবেলা তোমার ক্লান্ত চেহারাটা দেখে এমন মায়া লাগলো যে কথাটা বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারিনি! অথচ না বলেও শান্তি নেই। কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে…'

—'কি এমন কথা ?'—বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো ইগানো।

—'কথা তেমন কিছু নয়। তবে জবাবটা আমার জানা দরকার। আচ্ছা বলত তোমার খানসামাদের মধ্যে কার কাজকর্মে তুমি সবচেয়ে সন্তুষ্ট ? তোমার মতে কে সবচেয়ে প্রভুভক্ত ?'

বিয়েত্রিচের এই প্রশ্নের জবাব দিতে একটুও দেরী করল না ইগানো।—'ও এই ব্যাপার। জবাবটাতো তোমার জানাই আছে সোনা। অনেকবারই বলেছি তোমাকে। নতুন ভর্তি হওয়া আনিচিনোকেই আমি সবচেয়ে পছন্দ করি। তাই তো তোমাকে রেখে যাই তার পাহারায়। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে ঐ প্রশ্নটা করছ কেন…'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল মোহিনী বিয়েত্রিচে। তখন তার বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা পড়া আনিচিনো ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার কব্জিতে আরও জোর চাপ দিয়ে বিয়েত্রিচে বললে—'সেই আনিচিনোর কীর্তি-কাহিনী একটু শোনাতে চাই তোমাকে। তুমি শুনলে অবাক হবে। কাল সদলে তুমি শিকারে বেরিয়ে যাবার পর সেই ছোকরা এসেছিল আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে। সে ব্যাটা বলে কিনা আমাকে না পেলে সে নাকি বাঁচবে না। আমার যে কি ভয় করছিল তা তোমায় কি বলব। চালাকির সাহায্যে কোনো মতে সেই পশুটার হাত থেকে নিজের ইজ্জত বাঁচাতে পেরেছি। তাকে কথা দিয়েছি আজ রাতে আমি তার সঙ্গে গোপনে মিলিত হব। রাত বারোটা বাজার পর একটা কালো শাল মুড়ি দিয়ে চুপি চুপি যাবো ফুলবাগানে! ওর জন্যে অপেক্ষা করবো পাইনগাছটার নীচে। বুঝতেই পারছো ঐ সময় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি না দিলে ঐ জন্তুটার হাত থেকে আমার দেহটা বাঁচাতে পারতাম না। কিন্তু আর নয়। ঐ অকৃতজ্ঞ ছোকরাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাই বলি কি, আমার শালটা জড়িয়ে তুমি এখনই যাও ফুলবাগানে! তারপর আনিচিনো কাছে আসা মাত্র তাকে গ্রেপ্তার কোরো হাতেনাতে। আমার স্কার্ট, ভেল, শাল, সবকিছু

খুলে রেখেছি তোমার মাথার কাছে। ওগুলো চট্‌পট্‌ পরে নাও লক্ষ্মীটি। তারপর নাও উচিত প্রতিশোধ…'

বিয়েত্রিচের কথাগুলো যেন চাবুকের কাজ করলো। ঘুম উঠলো মাথায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলো ইগানো।

পালঙ্ক থেকে সে নেমে পড়লো তখনই। ডানধার দিয়ে নামায় আনিচিনোর সঙ্গে তার মোলাকাৎ হোল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে পোষাক ও চাদরটা পেয়ে গেল। সেগুলো দ্রুত পরে নিয়ে বিয়েত্রিচের কপালে একটা চুমু খেয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

স্বামী বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তড়াক করে উঠে বসলো বিয়েত্রিচে। আনিচিনোর হাত ছেড়ে সে ছুটে গেল দরজার কাছে। সেটা বন্ধ করে আগলটা টেনে দিল আস্তে আস্তে।

এতক্ষণ যেন দম বন্ধ করে নাটক দেখছিল আনিচিনো। জীবনে এমন ভয় সে আর কখনো পায়নি। এতক্ষণ মনে মনে কত না অভিশাপ দিয়েছে ঐ নিষ্ঠুরা সুন্দরীকে। কিন্তু এইবার সে খানিকটা বুঝতে পারলো স্বৈরিণী বিয়েত্রিচের মতিগতি। স্বামীকে ঘর থেকে তাড়ানোর চমৎকার ফন্দী এঁটেছে তার প্রিয়তমা—এমন ফন্দী যার তারিফ না করে পারা যায় না!

এ যেন বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। কিন্তু তবু এখানেই শেষ নয়—সবে শুরু!

বিছানার কাছে ফিরে বিয়েত্রিচে জড়িয়ে ধরলো হতভম্ব আনিচিনোকে। তারপর অঙ্গ থেকে খুলে ফেলল রাতের পোষাক। আনিচিনোও অনুসরণ করলো তাকে। বিপরীত বিহারের খেলায় মেতে উঠলো দুজনে। পরম তৃপ্তি দায়ী ক্লান্তিতে যখন আনিচিনো এলিয়ে পড়েছে তখন বিয়েত্রিচে তাকে তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে বিদায় নিতে বলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হবে এবার। কারণ মালিক যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারেন। ঠিক তখনই বিয়েত্রিচে মধুক্ষরা কণ্ঠে জানানো—'লক্ষ্মীসোনা আমার, দেরাজের পেছনে একটা মোটা লাঠি রাখা আছে, ওটা নিয়ে এখনই বাগানে যাও। সেখানে ইগানোকে দেখা মাত্র ভান করবে যেন তার মানে আমার এই ব্যবহারে তুমি খুবই বিরক্ত হয়েছে। আমার সতীত্ব পরখ করার জন্যই তুমি ইচ্ছে করে ঐ কু-প্রস্তাব দিয়েছিলে। তুমি ভাবতেও পারনি ইগানোর মত দেবতুল্য স্বামী থাকতে কোনো নারী বাড়ীর চাকরের জন্য এইভাবে গোপন অভিসার করবে। আচ্ছা রকম গালিগালাজ করতে করতে ইগানোকে এই লাঠি দিয়ে পিটাবে তারপর।

এরপর সে প্রাণের দায়ে আত্মপরিচয় দিলে তখন না হয় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও !'

বিয়েত্রিচের যে কতটা দুষ্ট বুদ্ধি তার আর এক তরফা পরিচয় পেয়ে আনিচিনো অবাক হয়ে গেল। কথামত সে ছুটলো বাগানের সেই পাইন গাছটার দিকে। সেখানে বিয়েত্রিচের পোষাক পরে অন্ধকারে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল ইগানো। আনিচিনোকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আর আনিচিনো তাকে কোনো রকম কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলো—'তবে সত্যিই সতী লক্ষীর আসা হয়েছে ! হারামজাদী মাগী, এই তোর পতি ভক্তি ! তোর স্বামী এত বিশ্বাস করে তোকে আর তুই কিনা তার প্রতিদানে তারই চাকরের কাছে ছুটে এসেছিস। নরকেও তোর ঠাঁই হবে না। তোর জন্যে আমি এনেছি এই লাঠি, এটা দিয়েই আমার সোহাগ জানাবো।'

ক্ষিপ্ত আনিচিনোর হাতে মোটা লাঠি দেখে ইগানো প্রমাদ গুনলো। সে তখনই ছুটে পালালো সেখান থেকে। আনিচিনোও তাড়া করলো সঙ্গে সঙ্গে। চিৎকার করে বলতে থাকলো—'কাল সকালেই আমি সব কথা বলে দোবো আমার মনিব ইগানোকে। তখন ঝাঁটা মেরে তিনি বিদায় করবেন তোকে। বলতে বলতে দু-চার ঘা লাঠির বাড়িও বসিয়ে দিল কর্তার পিঠে। সেযাত্রা নিজের শয়নকক্ষে ঢুকে কোনো মতে প্রাণ বাঁচালো ইগানো। ঢোকা মাত্র বিয়েত্রিচে আনিচিনোর কথা জিজ্ঞেস করলো। ইগানো হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—'কি কুক্ষণেই যে তার সঙ্গে বাগানে দেখা হয়েছিল, তা ভগবানই জানেন। সে আমাকে তুমি বলেই ধরে নেয়। তারপর এই গোপন অভিসারের জন্যে যাচ্ছেতাই ভাবে গালি গালাজ করলো। সে নাকি তোমার সতীত্ব পরীক্ষার জন্যে এমন একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। সত্যি, আনিচিনোর অনুগত্য আর বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ভাবছি আমার মতন ভাগ্যবান আর কে আছে। ঘরে তোমার মত রূপসী সতী লক্ষী স্ত্রী, আর আনিচিনোর মত প্রভুভক্ত ভৃত্য। এখন থেকে নিশ্চিন্তভাবে তার হাতে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি দূর দেশেও যেতে পারবো। তুমি কি বলো ?

মোহিনী বিয়েত্রিচে পাশ ফিরে শুয়ে মুচকি হাসলো। কোন জবাব দিল না।।

*　　　*　　　*

লেখক পরিচিতি লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে প্রকাশিত

লাউরা

ব্যারি মার্টিন

দিনে-রাতে, শয়নে-স্বপনে, শোকে-আনন্দে লাউরাকে আমি ভালোবাসি —চিরদিন তাকে আমি ভালোবাসব। অভিশপ্ত রজনীর ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার পর থেকে লাউরা সুস্থতা হারিয়েছে। আমি ভয় পেয়েছিলাম— ভেবেছিলাম দুর্ঘটনার জন্য আমাকেই সে দায়ী করবে। কিন্তু কিছুই

বলেনি সে। সে যে আমায় ভালোবাসে—ঠিক আমি যেমন তাকে ভালোবাসি।

আপনাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য সেদিনের বিপর্যয়ের বিষয়ে আমি কিছু বলব। হপ্তা তিনেক আগের ঘটনা। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। আমি আর লাউরা জয়েসের জন্মদিনে পানাহার সেরে ব্বস-প্লেস থেকে গাড়ি ছুটিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গাড়িকে আয়ত্তে রাখতে পারবনা সে পরিমাণে মদ আমি খাইনি।

বেশ মনে আছে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। বাইরে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। হিটারের দাক্ষিণ্যে গাড়ির ভেতরটা উষ্ণ ছিল। মনোরঞ্জনের জন্য গাড়ীতে

রেডিও ছিল। মন-মাতানো গান হচ্ছিল রেডিওতে ক্ল্যাগীতির সঙ্গে সুরে মিলিয়ে লাউরা গুন গুন করে গান করছিল, যৌবনোজ্জ্বল পায়ের আঙুল আর গোড়ালি ঠুকে তাল দিচ্ছিল। সহসা চেঁচিয়ে উঠেছিল সে, 'যীশুর দিব্যি, মন দিয়ে গাড়ি চালাও!' ঠিক সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটেছিল —চুরমার হলো কাচ, পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়েছিল, অতলান্তিক অন্ধকারের মাঝে মিলিয়ে গেল লাউরার কাতর আর্তনাদ।

সেদিন থেকে সে আর আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। সেদিন থেকে আমাদের আর তর্কাতর্কি বা কলহ হয়নি। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে আমাদের দাম্পত্য জীবনে বোধ হয় সুখ শান্তি একেবারেই ছিল না—প্রায়ই আমরা ঝগড়া করতাম! কিন্তু বিশ্বাস করুন, বিবাহিত জীবনে একদিন মাত্র আমাদের রাগারাগি হয়েছিল। আর অকপটেই স্বীকার করি দোষটা সম্পূর্ণই আমার। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, মনের ভুলে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটি ফেলেছিলাম ডাইনিং-রুমের কার্পেটে। পরিণতি কি হয়েছিল জানেন? আগাগোড়া কার্পেটটি পুড়ে গিয়েছিল। বিরোধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাময়িক উত্তেজনা আর কথা কাটাকাটির পর আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি যে তাকে ভালোবাসি, সে-ও তো আমাকে ভালোবাসে।

এখনও কানে বাজছে লাউরার সেই তীক্ষ্ন চীৎকার—'যীশুর দিব্যি, মন দিয়ে গাড়ি চালাও।' ঠিক তারপরেই নির্জন নিশীথিনীর শান্তি ভঙ্গ করে গাড়িটি আছড়ে পড়েছিল। আঘাতে আর স্নায়বিক উত্তেজনায় সেদিন থেকে লাউরার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল। আজও সে নির্বাক মৌন। আমাদের দুর্ভাগ্য! দুর্ঘটনা কখন ঘটবে আগে থাকতে তো কেউ জানতে পারে না! আমার স্থির বিশ্বাস শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার সে কথা বলবে, আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেবে, তার আয়ত চোখে ফুটে উঠবে তার প্রেমের গভীরতা।

আগে কত উচ্ছল ছিল লাউরা, এখন সে শ্রান্ত। তাকে দেখি আর চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রতিদিন সকালে তাকে শয্যা থেকে তুলে পোষাক পরিয়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে জানালার ধারে একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিই—ভয় পাই, দুর্বল শরীর—তার আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো। দিনের শেষে সুনীল রাতের বিষণ্ণ অন্ধকারে তার মিষ্টি গালে আমি চুম্বন করি—বলি, 'লক্ষ্মী মেয়ে, ঘুমিয়ে পড়ো শীঘ্রই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

ডাক্তার? না, ডাক্তার আমি ডাকি না। কারণ দুর্ঘটনার পর লাউরাকে

তারা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারা নির্মম, নির্বোধ। সে সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তদের গাল দিয়ে বলেছিলাম, 'জারজ সন্তানের দল, আমার কি করা উচিত কিংবা অনুচিত—তোরা নির্দেশ দেবার কে?'

লাউরাকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। আমি দেখেছিলাম কোথায় তারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি চাই সব সময়েই আমার পাশে থাকবে সে। আমি যেমন লাউরাকে ভালোবাসি আপনি যদি তেমন কারোকে ভালোবাসতেন তাহলে আপনিও কি আমার মতো আপনার প্রেয়সীর তপ্ত সান্নিধ্য কামনা করতেন না?

এখানে আর কেউ লাউরাকে দেখতে আসে না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমার কাছে অনেকেই আসে কিন্তু তারা ভুলেও কেউ লাউরার কথা জিজ্ঞেস করে না পাছে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়! তাকে আমি সন্তর্পণে ওপরের ঘরে লুকিয়ে রেখেছি, কোনদিন নীচে আনিনা। অন্য কারোর সঙ্গ সে আদৌ পছন্দ করে না—সে যে শুধু আমাকেই চায়! সে চায় আমার প্রেম।

আমি জানি অচিরেই আরোগ্য লাভ করবে লাউরা। আবার আমরা ফিরে পাব সেইসব সোনালী দিন—ফায়ার-প্লেসের সামনে আবার আমরা বাঁধ ভাঙা হাসি-গল্পের মাঝে রাতের খাবার খাব, হাত ধরে পার্কে ঘুরে বেড়াব, বেড রুমের নিঃসীম অন্ধকার আর নির্জনতায় চুম্বন মদির পান করব, ব্যাকুল বাসনায় পরস্পর পরস্পরকে চাইব—একে অপরের মাঝে হারিয়ে যাব।

লাউরার প্রেমে আমার জীবনের মূল্য গেছে বেড়ে। তার ভালোবাসার উষ্ণতায় আমি স্নান করি। অঙ্গে অঙ্গে তার উচ্ছল তরঙ্গ—যৌবনের ঝাঁজালো গন্ধ। বসন্তের স্পন্দন তার উদ্ভিন্ন 'যুগল স্তনে'—উদ্ধত তার গোলাপী স্তনাগ্র চূড়া। হাতের মুঠোয় যখন সৌরভিত তার স্তন চেপে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করি তখন স্তনবৃন্তকে মনে হয় গোলাপের তরতাজা কঠিন কুঁড়ি। কামনায় চঞ্চল হয়ে রঙীন নোখে আমার নগ্ন পিঠে আঁচড় কাটে সে—তার কামনা কুসুমিত হয়ে বাইরে ফুটে উঠছে যেন।

তার চোখের মনিতে আমি তখন দেখি নরকের অন্ধকার, বিপর্যয়ের রাতের নিকষ কালো আর ঠিক তার সাত দিন পরে যেদিন কবরের হিম-শীতল প্রকোষ্ঠ থেকে তার নরম দেহটা উঠিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম সেই গোপন রাত্রির মত মৌন আঁধারে মাখা তার চোখ দুটি।

লাউরাকে আমি ভালোবাসি। সে আমার চিন্তা, আমার স্বপ্ন। সে আমার চির দিনের। চির দিন তাকে আমি ভালবাসব।

LAURA : Barry Martin

॥ পরিচিতি ॥

ব্যারি মার্টিন আধুনিক ইংরেজি রোমাঞ্চ কাহিনীর একজন জনপ্রিয় লেখক : তাঁর গল্পগুলি লোকাতীত প্রেম, অভিব্যাপ্ত যৌন চেতনা, রোমাঞ্চের রঞ্জিত ত্রিধারায় সিক্ত-শ্যামল। সহজ-সরল তাঁর রচনাশৈলী—'He brought the art of writing stories to high point of perfection,' লেখায় তাঁর ব্যাঞ্জনার ঝিলিক, নাটকীয়তার দীপ্তি। আর 'লাউরা গল্পটি সম্পর্কে' মন্তব্য করা চলে—'It is remarkably well told and exemplifies the writer's out standing qualities of vivacity, invention and ingenuity.'

দি স্টোরি অফ মিং-ই

জনৈক প্রাচীন চৈনিক লেখক

পাঁচশ বছর আগে মিং-বংশীয় সম্রাট হাউং-ওয়াউয়ের রাজত্বকালে কোয়াং-চাউ-ফু শহরের জিনাইতে, জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়ণ তিয়েন-পিলাউ বাস করতেন। তিয়েন-পিলাউয়ের একমাত্র পুত্র মিং-ই রূপে, সৌজন্যে, বিদ্যাবত্তায় ও নম্রতায় সকলের মনোহরণ করত। তার বয়সের যুবকেরা কেউ কোনদিক থেকে তার সমকক্ষ ছিল না। মিং-ইর বয়স যখন আঠারো
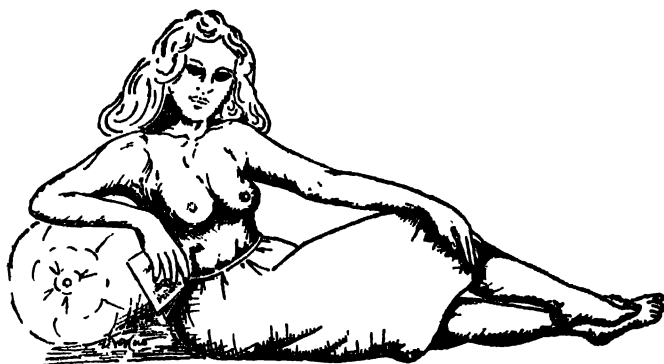
তখন তার বাবা জনশিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। মিং-ইকেও তার বাবা-মার সঙ্গে চিং-টাউ শহরে যেতে হয়েছিল। ঐ শহরের কাছে ধনী এবং উচ্চপদস্থ এক সরকারী কর্মচারী বাস করতেন—তার নাম চ্যাং। তিনি তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের খোঁজ করছিলেন এবং মিং-ই গৃহশিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হলো।

লর্ড চ্যাংয়ের বাড়ি শহর থেকে দূরে। স্থির হলো মিং-ই চ্যাংয়ের বাড়িতেই থাকবে। গোছগাছ সেরে মিং-ই যখন প্রস্থানোদ্যত তখন তার পিতা তাকে লাওসে এবং সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিদের সারগর্ভ বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন—

'সুন্দর মুখ পৃথিবীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে; কিন্তু স্বর্গ তাতে প্রতারিত হয় না। পূর্বদিক থেকে কোন সুন্দরী যুবতীকে আসতে দেখলে, পশ্চিমে তাকাবে আর যদি দেখ পশ্চিম দিক থেকে সে আসছে তোমার তখন পূর্বদিকে তাকান উচিত।'

পরবর্তীকালে মিং-ই যদি এই পরামর্শ গ্রহণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে যৌবনসুলভ আনন্দময় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের জন্যই অমূল্য এ উপদেশ অমান্য করেছে সে।

চ্যাংয়ের বাড়িতে মিং-ইর অনেকগুলো দিন কেটে গেল—অতিবাহিত হলো শরৎ এবং শীত। এলো রঙীন বসন্তের মিলন-মধুর শুভক্ষণ—চীনারা বলে 'শত পুষ্পের জন্মক্ষণ'। মা-বাবাকে দেখার ইচ্ছে হলো মিং-ইর। লর্ড চ্যাংকে মনের কথা খুলে বলল সে। মহান চ্যাং সানন্দে তাকে যাবার অনুমতি দিলেন আর তার মা-বাবাকে দেওয়ার জন্য স্মারক হিসাবে দু' আউন্স রুপোর একটি উপহার তার হাতে গুঁজে দিলেন কারণ 'শত পুষ্পের জন্মক্ষণ' একটি শুভ উৎসব। এ' সময়ে প্রিয়জনকে কিছু উপহার দেওয়াই চীনাদের রীতি।

সেদিন দেবালয়ে প্রজ্বলিত ধূপের সৌগন্ধের মতো প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে বাতাস ছিল স্বপ্নালু আর মৌমাছির গুঞ্জনে, পাখির কল-কাকলিতে বনে বনে জেগেছিল শিহরণ। মিং-ইর মনে হলো যে পথে সে চলেছে সেই পথে অনেক দিন কেউ চলাফেরা করেনি। ছায়াচ্ছন্ন চলার পথ, সবুজ তৃণের রোমাঞ্চ, সন্নিহিত বনস্পতি শাখা-প্রশাখা দিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করছে—স্বর্নালী বাষ্পাচ্ছন্ন এ যেন কোন স্বপ্নময় ছবি। বসন্তের এই শোভন প্রকৃতিকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপভোগ করার জন্য মিং-ই কোমল ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ বসল। বুনো পীচ গাছের শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে উজ্জ্বল বেগুনী একফালি আকাশ। সহসা একটা খসখস শব্দে মুখ ফিরিয়ে সে দেখে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে ফুলগাছের আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে। মিং-ই মেয়েটির সুন্দর মুখ আর অপরূপ চোখদু'টির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জোড়া ভুরু দু'টি দেখে মনে হচ্ছে একটি সুন্দর প্রজাপতি যেন রেশম-কোমল পাখা মেলে রয়েছে। স্মিত হাসিতে রূপসী মেয়েটির ফরসা মুখ ঝক ঝক করে উঠল। মিং-ই লজ্জা পেল এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় তার যাত্রা শুরু করল। কিন্তু রূপিত চোখের

মোহিনী দৃষ্টিতে মিং-ই এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে তার জামার আস্তিনে যে পাথেয় ছিল কখন যে তা পড়ে গেছে তা সে বুঝতেই পারেনি।

কয়েক পা চলার পর তার কানে এল মেয়েলি কণ্ঠস্বর। একটি মেয়ে তার নাম ধরে ডাকছে। বিস্মিত মিং-ইর কাছে এগিয়ে এসে মেয়েটি বললে, 'এই নিন আপনার টাকা। পথে পড়ে গিয়েছিল। আমার কর্ত্রী টাকাটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পাঠিয়েছেন।' মিং-ই পরিচারিকাটিকে ধন্যবাদ আর তার কর্ত্রীর উদ্দেশ্যে জানাল অজস্র কৃতজ্ঞতা। অনেক আনন্দে সে চলতে শুরু করল।

আর একদিন ঐ পথে ফেরার সময় মিং-ই সেখানে দাঁড়াল যেখানে ক্ষণিকের জন্য সেই সুরূপা মেয়েটিকে দেখেছিল সে। এবার বড় বড় সেই গাছের সারির ভেতর দিয়ে সে একটি গ্রাম্য বাসস্থান দেখতে পেল আগে যা চোখে পড়েনি। বাড়িটির উজ্জ্বল নীল টালিগুলি দেখে মনে হচ্ছিল সূর্যস্নাত নীলের সঙ্গে এগুলির রঙ যেন মিশে গেছে। সবুজ-সোনালী কারুকার্য মণ্ডিত বারান্দা ফুলপাতার শিল্প কুশলতায় অনবদ্য। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার আবেগ-কল্পনার ছন্দিত প্রকাশ—তার শ্রেয়সী। সেই পরিচারিকাও রয়েছে তার কর্ত্রীর সঙ্গে এবং তাদের উভয়ের দৃষ্টি তার প্রতি নিবন্ধ। দূর থেকেই তারা মিং-ইকে অভিবাদন করল এবং তাদের কাছে আসার জন্য ইশারা করল। আনন্দ এবং বিস্ময়ের মিলিত অনুভূতি নিয়ে সে এগুতে লাগল। স্নিগ্ধ আনন্দে স্নাত হলো সেই রূপসীর মোহময় মুখশ্রী। মুহূর্তের ভেতর সে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পরিচারিকাটি মিং-ইকে অভ্যর্থনা জানাল—কমলারঙের ফুলে আর গাঢ় সবুজ লতায় ঢাকা অনলংকৃত গেটটি খুলে দিল। সলজ্জ মিং-ই ধীরে ধীরে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করল। বুনো শ্যাওলা রঙের একটা মাদুর পাতা রয়েছে মেঝেতে। প্রশস্ত স্নিগ্ধ ঘরটির সদ্য সংগৃহীত ফুলের গন্ধে ভরে রয়েছে। প্রাসাদের কর্ত্রী নীরবে-নিঃশব্দ প্রবেশ করল এবং মিং-ইকে নমস্কার জানাল।

তন্বী সেই মহিলা সদ্যফোটা লিলির মতোই সুন্দর। অলোক তার ঘি রঙের চুসাকি ফুলের একটি গুচ্ছ আর চলার সময় তার রেশমী পোশাকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছিল—ঠিক আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে বাষ্পের যেমন রঙ বদলায়।

সে বললে, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাক তাহলে আমার সম্মানীয় অতিথি হলেন মিং-ই। তিনি আমার আত্মীয় শ্রদ্ধেয় চ্যাং-য়ের গৃহশিক্ষক। যেহেতু লর্ড চ্যাংয়ের পরিবার পামারপ পরিবার কাজেই তাঁর শিশুদের শিক্ষককে আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে মনে করি।

মিং-ই বলে, 'আপনার পরিবার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন—আমি যাঁদের বাড়ি পড়াই তাঁদের সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি জানতে ইচ্ছে করছে।'

একটু হেসে সেই রূপসী যুবতী উত্তর দেয়, 'আমার পরিবারের নাম পিং—চিং-টাউ শহরের একটি প্রাচীন পরিবার। মাউন-হাশয়ের সাই আমার পিতা, আমি তাই সাই নামেই পরিচিত। পিং-পরিবারের এক যুবক—তাঁর নাম থ্যাং—তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। এই বিবাহ সূত্রেই আমি লর্ড চ্যাংয়ের পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি। বিয়ের পরেই আমার স্বামী মারা যান আর বৈধব্য জীবন কাটানোর জন্য আমি নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছি।'

তার কণ্ঠস্বরে ছিল ঘুমপাড়ানি গানের মাধুর্য, কোন প্রবহমান নির্ঝরের ছন্দ কিংবা স্পন্দিত বসন্তের মাদকতা। ধরণীর এক কোণে সংগোপনে সাই তার বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছে, মিং-ইর মনে হলো এখানে অনেকক্ষণ কাটানো অনুচিত ও দৃষ্টিকটু। ভুর ভুর গন্ধের চা পান শেষ করে পোয়ালাটি টেবিল নামিয়ে রেখে মিং-ই উঠে পড়ল। সাই বললে, 'একি উঠছেন কেন! আর একটু বসুন। যদি মহামতি চ্যাং শোনেন আমি আপনাকে দরদ-যত্ন করিনি তাহলে তিনি কিন্তু আমার ওপর ভীষণ রেগে যাবেন। তাই নৈশাহারের সময়টুকু পর্যন্ত অন্তত থাকুন।'

সাইয়ের প্রস্তাবে মিং-ইর অন্তর আনন্দে ভরে উঠল কেননা এই তপ্ত সান্নিধ্যটুকুই ছিল তার একান্ত কাম্য। মিং-ই বুঝেছিল সাই-কে সে বাবা-মার চেয়ে ভালোবাসে, সাই অনন্যা। ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল হলুদ লেবুর মতো সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু, ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার সুনীল অন্ধকার। 'ত্রি পরামর্শদাতা' রূপে মানুষের জীবন-মরণ ও নিয়তিকে পরিচালিত করে যে তিনটি তারা, ওরা তাদের স্নিগ্ধ চোখ মেলল। সাইয়ের বাসগৃহে সুচিত্রিত ঝাড় লণ্ঠনগুলি আলোকিত করা হলো এবং নৈশাহারের আয়োজন চলল। মিং-ইর খাবার ইচ্ছে ছিল না বলেই চলে—সুন্দরী সাইকে দেখে তার যেন আর আশা মেটে না। সামান্য আহার করল সে তারপর সাই তাকে মদ্যপান

করতে অনুরোধ করে। তারা উভয়েই গোলাপী রঙের বরফ ঠাণ্ডা মদ খেল। এত ঠাণ্ডা মদ কিন্তু মিং-ই শিরায় শিরায় আশ্চর্য এক উষ্ণতা অনুভব করে। আশে-পাশের সবকিছু কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে আলোকময় হয়ে উঠল। দেওয়ালগুলো যেন পিছু হটে গেল, ছাদ আরও উঁচু হলো, আলোগুলি নক্ষত্রের মতো স্পন্দিত হতে থাকল আর সাইয়ের কণ্ঠস্বর নিদ্রালু নিশীথের অশ্রুতপূর্ব কোন সঙ্গীতের মতো ঝরে পড়ল। হৃদয় তার আর কোন বাধা মানল না। সাইয়ের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হলো মিংই—জানালো সে তাকে ভালোবাসে। সাই মিং-ইকে নিবৃত্ত করল না, তার সিক্ত ওষ্ঠে হাসি ফুটে উঠল না কিন্তু চোখদুটিতে তার উপরে পড়ল অনেক পাওয়ার আনন্দ।

সাই বললে, 'আমি জানি আপনি একজন প্রতিভাধর তরুণ—নানা দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছে আপনার মধ্যে। আপনার মতো একজন সঙ্গীত-শিল্পীকে পেয়ে ধন্য আমি। শিক্ষক রেখে গান শেখার সুযোগ আমার হয়নি তবে আমি একটু-আধটু গান জানি। আমার একান্ত অনুরোধ আসুন আমরা একসঙ্গে একটা গান গাই আর আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি রচিত সঙ্গীতগুলি পরীক্ষা করেন।'

সাইয়ের প্রস্তাবে মিং-ই বললে, 'এই সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।' মিং-ই পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগে সহকারে দেখতে লাগল। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি ফিকে হলুদ আভাযুক্ত এবং মাকড়সার জালের মতো পাতলা-হালকা বুননযুক্ত অবিস্মরণীয় শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অক্ষরগুলি দেখে মনে হলো প্রাচীন কালের ললিত-কলার বিস্ময়কর নিদর্শন—লেখার-কালির দেবতা, যিনি মাছির চেয়ে বড় নন, সেই চি চুর তুলিতে যেন এগুলি আঁকা। নীচে আউয়েন-চিন, কাও-পিয়েন আর হাউ-মাউয়ের সাক্ষর রয়েছে—সম্ভবতঃ তাঁরা থাং রাজবংশীয় কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী।

মিং-ই বললে 'পৃথিবীর সমস্ত রাজ-সম্পদের চেয়েও এগুলি মূল্যবান। আমাদের জন্মের পাঁচশ বছর আগে যে সব শিল্পীরা চিরায়ত গান রচনা করে-ছিলেন তাঁদের লিপি এতদিন কিভাবে রক্ষিত হয়েছে ভেবে আমি স্তম্ভিত। কি আশ্চর্য! কবিতার নিচে কতকাল আগে তাঁরা যা লিখে গেছেন আজও তা সত্য হয়ে বিরাজ করছে—শত শত বছরের ব্যবধানেও এইসব কবিতা পাথরের মতোই দৃঢ় থাকবে।'

সাই বলে, 'কাও-পিয়েন আমার প্রিয় কবি। আসুন আমরা পিয়েনের

কবিতা আবৃত্তি করি। সে সময়ে মানুষ আজকের চেয়ে মহৎ আর জ্ঞানী ছিল।'

সৌরভিত রাত্রিতে তাদের মিলিত সঙ্গীত তরল সুধার মতো বর্ষিত হলো। সাইয়ের সুরেলা কণ্ঠস্বরে মোহময় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে—সুরের রামধনু কেমন যেন ঝাপসা করে তুলেছে আলোগুলিকে। মিং-ইর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠেছে। গোলাপী সুরার পাত্র নিঃশেষিত হলো, কথা তাদের শেষ হয় না! আর একবার মিং-ইর বিদায় নিতে চেয়েছিল কিন্তু সাই অচেতন অতীতের সেইসব কবিদের সুন্দর সুন্দর গল্প বলে, যে সব মেয়েদের সে ভালোবাসত তাদের কাহিনী শুনিয়ে মিং-ইকে ধরে রাখল। মিং-ই সহসা তার সংযম হারাল, সাইয়ের শুভ্র কম্বুকণ্ঠ জড়িয়ে ধরে মদের চেয়ে গোলাপী তৃষিত তার অধর-ওষ্ঠ অসংখ্য চুম্বনে ভরিয়ে দিল। সম্ভোগে-সংবেশে অতিবাহিত হলো রাত্রি।

পাখীরা জেগে উঠল, ফুলেরা চোখ মেলল। শ্রান্ত সাইয়ের মগ্ন শরীরে তরুণ সূর্যের আলো পড়েছে—অনন্ত—যৌবন লোভনীয় হয়ে মিং-ইকে যেন কাছে ডাকে। মিং-ই সাইয়ের সারা গায়ে চুমু দিল—প্রাণ ভরে নিল যৌবনের তাপ আর গন্ধ। সাই পোষাক পরল। শেষে বিদায় নিতে হলো মিং-ইকে। সাই মিং-ইর গালে চুম্বনের আলপনা এঁকে দিল এবং সবুজ বনের পথে তাকে এগিয়ে দিল। বললে, 'প্রিয়, অন্তর যখন চাইবে আমার কাছে আসবে। তোমার আদর পাবার জন্য রোজই আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। আমি জানি তুমি বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমাদের অনিঃশেষ প্রেম এবং নিভৃত মিলন আমাদের মনের অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকুক—কোন জীবিত মানুষের কাছে এ ইতিবৃত্ত যেন গোপন থাকে। রাতের আকাশের অগুণতি নক্ষত্র আর দিনের আকাশের বিরাট সূর্য আমাদের চিরায়ত ভালাবাসার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করুক।'

মিলন-রজনীর স্মারক হিসাবে তার প্রেয়সী মিং-ইকে জেড-পাথরে গড়া উপবিষ্ট সিংহের কারুকৃতিতে দীপ্ত অপূর্ব সুন্দর একটি কাগজচাপা উপহার দিল—মিং-ইর মনে হলো পূজনীয় ফুজির সম্মানে এ যেন সাতরঙা সেই স্বর্গীয় উপহার। মিং-ই সাইয়ের নরম হাতের মিষ্টি ঘ্রাণ নিল এবং পুনরায় তাকে চুম্বন করে বলল, 'আমায় যা বললে আমি অবশ্যই তা মনে রাখব—যদি ভুলে যাই দেবতারা যেন আমায় নির্মম শাস্তি দেন।'

সেদিন সকালে চ্যাংয়ের বাড়িতে ফিরে মিং-ই সেই প্রথম মিথ্যে বলল। সে বলল, তার মা তাকে রাতে বাড়িতে থাকতে বলেছেন। পথটা দূর হলেও আবহাওয়া বেশ মনোরম। আর হাঁটতে তার ভালোই লাগে—হাঁটলে শরীর ভালো থাকে, নির্মল বাতাসে মন প্রফুল্ল থাকে।

চ্যাং গৃহশিক্ষকের কথা বিশ্বাস করলেন। মিং-ইও প্রতি সন্ধ্যায় মায়াবিনী সাইয়ের বাড়ি যেত, রাত কাটাতে সেই তপ্ত সান্নিধ্যে। গল্প করত তারা, গান গাইতে, উ-উয়াং আবিষ্কৃত দাবা খেলতে। বুদ্ধিদীপ্ত এই খেলাটি হচ্ছে যুদ্ধের অনুকরণ। মিং-ই কিন্তু প্রতি বারেই হেরে যেত। মাঝে মাঝে তারা ফুল, লতা, মেঘ, নদী, পাখী, মৌমাছিকে নিয়ে কবিতা রচনা করত। পদ্য-রচনার ক্ষেত্রেও শব্দ চিত্রনের সামঞ্জস্যে, গঠন-ভঙ্গীর সাবলীলতায় এবং সমন্বিত চিন্তাধারায় সাইয়ের কবিতা ছিল অতুলনীয়।

গ্রীষ্ম এলো—চলেও গেল। শরতের আবির্ভাবে বেগুনি আর সোনালী আলোর চারিদিক দীপ্তিময় হয়ে উঠল। একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে মিং-ইর বাবা পিলাউয়ের সঙ্গে চ্যাংয়ের দেখা হলো। চ্যাং বললেন, 'আর ক'দিন পরেই শীত পড়বে। আপনার ছেলের প্রতি সন্ধ্যায় শহরে যাবার দরকার কি! পথটাও দূর আপনার বাড়িতে রাত কাটিয়ে, রোজ সকালে সে যখন বাড়ি ফেরে তখন তাকে ক্লান্ত দেখায়। আমার এখানে তার তো কোন অযত্ন হতো না, আগের মতো আমাদের কাছেই সে থাকুক না।'

বিস্মিত পিলাউ বললেন, 'সে কি! মিং-ই তো বাড়ি যায় না—সে তো আপনার কাছেই থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, নিশ্চয় সে অসৎ-সঙ্গে রাত কাটায়। হয়তো জুয়া খেলে কিংবা মেয়েদের নিয়ে মদ খায়।'

চ্যাং উত্তর দেয়, 'না' না সে নম্র, ভদ্র, সংযমী। আর আমাদের এ অঞ্চলে কোন সরাইখানা বা ফুলের নৌকো নেই। এমন হতে পারে সমবয়সী অমায়িক বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করে সে রাত্রিযাপন করে। পাছে তাকে আমি যেতে না দিই সে জন্য সে মিথ্যা বলেছে। আশা করি অচিরেই আমি এই রহস্য-উদ্ঘাটন করতে পারব। সে কোথায় যায় তা লক্ষ্য করার জন্য এবং তাকে অনুসরণ করার জন্য আমি লোক পাঠাব। অনুগ্রহ করে আপনি মিং-ইকে কিছু বলবেন না। পিলাউ চ্যাংয়ের প্রস্তাবে রাজী হলেন।

সায়াহ্নের নির্জনতায় সেদিন যখন মিং-ই চ্যাংয়ের বাড়ি থেকে বিদায় নিল অলক্ষ্যে থেকে তাকে অনুসরণ করল চ্যাংয়ের বিশ্বাসী এক ভৃত্য। কিন্তু পথের সবচেয়ে অস্পষ্ট অংশে পৌঁছে মিং-ই আকস্মিক ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেল— রাতের পৃথিবী যেন তাকে গিলে ফেলল। অনেকক্ষণ তার খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে ভৃত্যটি বাড়ি ফিরে গেল এবং চ্যাংকে সবকিছু বলল। চ্যাং পিলাউকে ডেকে আনবার জন্য ভৃত্যটিকে পাঠালেন।

মিং-ই তার প্রেয়সীর কামনা-মদির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সাই কাঁদছে। তাকে কাঁদতে দেখে মিং-ই ব্যথা পেল। সাইকে আদর করল সে। জিজ্ঞেস করল, কাঁদছ কেন, সোনামণি?' তার গলা জড়িয়ে ধরে সাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অবশেষে সে বলে, 'প্রিয়তম, আমরা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি এবং এর পেছনে যে কারণ আছে তা আমি বলতে পারব না। প্রথম থেকেই আমি জানতাম আমাদের বিচ্ছেদের দুঃখ বইতে হবে। আর আজই আমাদের শেষ মধু-যামিনী। এরপর আর আমাদের দেখা হবে না। আমি জানি যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে আমাকে তুমি ভুলতে পারবে না। আমি এও জানি বিদ্যা-ঐশ্বর্য এবং খ্যাতির চরম শিখরে উঠবে তুমি আর সুশ্রী এক তরুণীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। দুঃখ করে আজ রাতের আনন্দ-উপভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে কি হবে? এসো আমরা আনন্দ করি।' তারা গোলাপী দ্রাক্ষারস পান করল। সাই সাততারা রেশমী তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মিলনের গান করল। মিং-সাইয়ের উন্নত বুকের সৈকতে, পায়ের গোছে চুমু খেল। ক্রমে ক্রমে তারা দেহ-মিলনের নিবিড় আনন্দে তলিয়ে গেল।

বিচ্ছেদের বার্তা বয়ে সকাল এলো। চ্যাংয়ের বাড়িতে এসে মিং-ই দেখে তার বাবা এবং লর্ড চ্যাং বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সম্ভবতঃ তাঁরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। মিং-ইকে কিছু বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই তার বাবা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আজকাল কোথায় তুমি রাত কাটাচ্ছ?' মিং-ই প্রথমটা নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে আনুপূর্বিক সবকিছু বলল, কাগজ চাপা আর সেই দুর্লভ পান্ডুলিপি দেখাল। চ্যাং আর পিলাউ কবিতাগুলিতে সুপ্রাচীন থ্যাং বংশীয় কবিদের রচনাশৈলী লক্ষ্য করলেন।

রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য মিং-ইকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে তারা সাইয়ের বাসস্থানের

দিকে অগ্রসর হলেন। ছায়া-সুনিবিড় সেই মিলন-কুঞ্জে এসে তাঁরা দেখলেন সেখানে বাসস্থানের চিহ্ন মাত্রও নেই। চোখে পড়ল বহুযুগ আগের শ্যাওলা ধরা একটি সমাধি—তাতে যে নাম খোদাই করা আছে তাও অস্পষ্ট। সহসা লর্ড চ্যাং তাঁর প্রশস্ত কপালে আঙুল ঠেকিয়ে প্রাচীন কবি চিং-কাউয়ের কবিতার একটি লাইন বললেন—

'নিশ্চয়ই সাই-থাওয়ের সমাধিতে ফুটে-ওঠা পীচের একটি ফুল।'

চ্যাং পুনরায় বললেন, 'যে মায়াবিনীর সম্মোহনে আপনার ছেলে ঘুমে চলা-রুগীর মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে ঘুরে ফিরেছে আমরা তারই সমাধির ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সাই বলেছিল সে বিবাহিতা, তার স্বামীর নাম পিং খ্যাং। এখানে পিং নামে কোন পরিবার ছিল না—একটি গলির নাম অবশ্য পিং-খ্যাং। সুন্দরী সাই আপনার ছেলেকে যা যা বলেছিল সবই অদ্ভুত একটা হেঁয়ালিতে ঘেরা। পিং-খ্যাংয়ের গলি কিয়াওয়ের পথে যেতে পড়ে এবং সেখানে থাং রাজবংশের রূপোজীবারা বাস করত। মেয়েটি কাও-পিয়েনের গান গেয়েছিল না? কাও-পিয়েন শহর আর নেই কিন্তু কাও-পিয়েন নামে মহান কবি তাঁর কাল-জয়ী কবিকৃতির জন্য আজও সকলের মনে বিরাজ করছে। চাউ প্রদেশে থাকার সময় কাও-পিয়েন সাই-থাওকে কবিতার ঐ দুর্লভ পাণ্ডুলিপি উপহার দিয়েছিলেন সেটি সাই আপনার ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে। সাই ছিল পরমা সুন্দরী এবং তার মৃত্যুটাও ছিল অস্বাভাবিক। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়তো ধুলোয় মিশে গেছে কিন্তু আজও ছায়াছন্ন এই স্থানটিতে মাঝে মাঝে তার ছায়া দেখা যায়।'

তিন জনেই চাপা একটা ভয়ে শিউরে উঠেছে। সকালের হালকা কুয়াশার মাঝে দূরের সবুজ একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে—বনভূমির সৌন্দর্য ফুটে উঠছে। মুমূর্ষু ফুলের গন্ধ নিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়ে চলেছে। নিঃসীম নীরবতার মাঝে বনস্পতিদের জটলা কানে আসছিল—তারা যেন ফিসফিস করে বলছিল 'সাই থাও।'

ভীত পিলাউ তাঁর ছেলেকে কোয়াং-চাউ-ফু শহরে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে মিং-ই তার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার জন্য উচ্চ মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছিল এবং উচ্চবংশীয় একটি কমনীয় রমণীকে বিবাহ করেছিল তার ছেলে মেয়েরাও বাবার গুণগুলি পেয়েছিল। মিং-ই সাই থাওকে কোন-

দিন ভুলতে পারেনি। মিং-ইর লেখার টেবিলে জবলজবল করত জেড পাথরের সেই কাগজ চাপা। সেকিন্তু কখনও কারোকে সাইয়ের কথা বলত না।

THE STORY OF MING-Y : ANONYMOUS

॥ পরিচিতি ॥

প্রাচীন এবং সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়কর কাহিনীগুলির অন্যতম 'দি স্টোরি অফ মিং-ই, অনন্যসাধারণ অলৌকিক এক প্রেম ও আদিরসের কাহিনী। রোমান্সের সঞ্জীবন স্পর্শে, রচনাশৈলীর চরমোৎকর্ষে চিরায়ত এই চৈনিক গল্পটি নিঃসন্দেহেই চিত্তহারী। পরিতাপের বিষয় গল্পলেখকের নাম কিন্তু অজানাই থেকে গেছে। অনুমান সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে লেখক পঞ্চদশ শতাব্দী কিংবা তার পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাংলা রূপান্তরে হার্ন কৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুসারণ করা হয়েছে।

ললিতা

ভ্লাদিমির নবোকভ

আমার নাম হামবার্ট। প্যারিতে আমার জন্ম। শৈশবেই মাকে হারিয়েছিলাম। মানুষ হচ্ছিলাম বাবার কাছে। আমি স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। ছাত্র হিসেবেও ভাল ছিলাম। তের বছর বয়সে স্বপ্নদোষ হয়েছিল—সেই

আমার প্রথম যৌনচেতনা। অবাক হয়ে ছিলাম আমি। এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। হোটেলে কয়েকটি ছবি দেখেও কামোত্তেজনা জেগেছিল। রহস্যময় যৌবনের বিষয়ে বাবা একদিন আমাকে অনেক কিছু বলেছিলেন।

ছেলেবেলার আর একটি স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট ছিল অ্যানাবেল। আমরা পরস্পর পরস্পরকে

খুব ভালোবাসতাম। বালির ওপর শুয়ে তাকে আমি চুমু দিয়েছি। শিহরিত হতো সারা শরীর। যৌন মিলনের সুযোগও মিলেছিল। কিন্তু স্নানরত দাড়িওয়ালা দুজন হতচ্ছাড়া লোক বাধা দিয়েছিল।

আর একবার একের পর এক চুমু দিয়েছিলাম তাকে। কামোপহতা অ্যানাবেল তার নরম পা দু'টো দিয়ে আমার কোমর বেষ্টন করেছিল। তার গায়ের গন্ধ আর পাউডারের ঘ্রাণমিশে অদ্ভুত একটা মাদকতা সৃষ্টি করেছিল। এই তার গায়ের এই রকম একটা উষ্ণ মুহূর্তে তার মা তাকে ডেকেছিল। এরপর আর সুযোগ মেলেনি কেননা অ্যানাবেল মারা গিয়েছিল।

অ্যানাবেলের মৃত্যুর পরে অনাথ আশ্রমের মেয়েগুলো আমায় বড় টানত। দেহকামনায় আমরা সারা শরীর টাটিয়ে উঠত। ছুলক্ষনী যুবতীদের সঙ্গে আমার নিবিড় সখ্যতা ছিল কিন্তু আট থেকে চোদ্দ বছরের মেয়েদের দেখে আমি ছটপট করতাম—কামনায় পাগল হতাম। একবার খুব ঠকেছিলাম। রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলো ঝলমলে একটা ঘরের দিকে আমি হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকতাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে জাঙিয়া ছাড়ত—ঝলমল করত তার নগ্ন দেহ। একদিন আর পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে। সেই ঘরে দেখি যাকে মেয়ে মনে করেছিলাম আদৌ সে মেয়ে নয়—জাঙিয়াপরা একটা কাটখোট্টা লোক।

একদিন বসন্তের এক বিকেলের ম্যাডেলিনের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। দেখলাম টাইট পোশাক পরা অল্প বয়সী এক রূপসীকে। হাসলে গালে তার টোল পড়ে। চোখ দু'টি ভারি সুন্দর। চলার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ হিল্লোল জাগছিল তার নিতম্বে। নাম তার মোনিক। সে গণিকা। বয়স বললে আঠার। সে বয়স বাড়িয়ে বলেছিল। অপরিচ্ছন্ন একটা ঘরে থাকে সে। আঙুলের নোংরা ধুয়ে আমার কাছে এসেছিল সে। অনেকটা সময় কাটল তার ঘরে। সন্ধ্যায় আবার তার কাছে আসতে চাইলে একটু হেসে মোনিক বললে, 'আমাকে মনে ধরেছে মনে হচ্ছে? আমার মাঝে অনেক রস মিলেছে তাই না?'

সন্ধ্যায় আবার গিয়েছিলাম তার কাছে। পরপর তিন দিন তার দেহ নিয়ে খুব খেলেছিলাম।

এরপর আমার একটা ভালোলাগার সম্পর্ক গড়ে উঠল ভ্যালেরিয়ার সঙ্গে। মোটাসোটা যুবতী। স্তন দুটি পুরুষ্টু। পা দু'টো ছিল লোভনীয়। ভ্যালেরিয়ার বয়সটা ঠিক বোঝা যেত না। শেষ পর্যন্ত তাকে

বিয়ে করেছিলাম। একটা ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম। এক দিন আমরা ট্যাক্সিতে ফিরছিলাম। প্যারী ছেড়ে ঝকঝকে ন্যুইয়র্কে যাবার প্রস্তাব শুনে চমকে উঠেছিল সে। জানতে পারলাম প্যারীতে তার এক প্রেমিক আছে জাতিতে সে রুশ—মিলিটারিতে কাজ করে। তাকে ছেড়ে ভ্যালেরিয়া ন্যুইয়র্কে যেতে পারবে না। একটা রেস্তারাঁয় গেলাম। ভ্যালেরিয়া লিপস্টিক ঘষে ঠোঁট রাঙাল। এমন ভাবে নীচু হলো সে যে তার স্তনের খাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার প্রেমিক সেই রুশী মিলিটারি ভ্যালেরিয়ার শখ-শৌখিনতা, পছন্দ-অপছন্দ এমনকি মাসিকের খবর পর্যন্ত জানতে চাইল।

অতঃপর আমি যাকে ভালোবাসলাম, যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম সে হলো মিসেস হেজের বাচ্চা মেয়ে—আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোট। তার ভালো নাম ডলোরেস কুইন—সে আমার পরী—ললিতা। ভ্যালেরিয়ার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা-মকদ্দমা আর সেই সঙ্গে মানসিক অসুস্থতায় আমি বড়ই বিব্রত হলাম। ভুগলাম বেশ কিছুদিন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি মিসেস হেজের বাড়িতে উঠলাম। মিসেস হেজের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। সুন্দরী। উদ্ধত তার স্তন, স্থূল নিতম্ব, হৃষ্টপুষ্ট থাই। মোটামুটি সেক্সি বলা চলে। একাকী থাকার জন্য দুঃখ ভোগ করছে। তার স্বামী ছিলেন ভালোমানুষ, চরিত্রবান। কিন্তু মিসেস হেজ দাম্পত্য সুখ পায় নি। কেননা মিস্টার হেজ তার কুড়ি বছরের বড় ছিলেন।

মিসেস হেজের মেয়ে ললিতা আমার মানসসুন্দরী। ললিতার রঙীন স্তন আর নরম পেটে আদর করেছি আমি। মুখে তার দু'চারটি ব্রণ, সুন্দর পাছা, কোমল উরু। ঘ্রাণেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে ললিতার এলো চুলের গন্ধে। একদিন তার চোখে চুমু দিলাম, প্রাণ ভরে নিলাম ললিতার মুখের বুনো গন্ধ। তার বসাটা বড় বিশ্রী। পায়ের ওপর পা তুলে সে যখন বসত তার পাতলা জাঙিয়াটা চোখে পড়ত। কামনায় গরম হয়ে উঠতাম আমি। ইচ্ছে হতো সারাদিন তাকে আদর করি।

একদিন ললিতা আমার কোলে বসেছিল। তার তপ্ত নিতম্ব, ও নিম্নাঙ্গের মধুর স্পর্শ পেলাম। খেলা করলাম ললিতার সুডৌল স্তন নিয়ে। ঘন ঘন নিবিড় চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম তাকে। চরম পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার মাঝেই বাধা পড়ল। কোথায় একটা মৃতদেহ দেখেছে তাই নিয়ে হৈচৈ করে লুইস। চিৎকার করে সে ললিতাকে ডাকে।

আর এক দিন ললিতা তার পা দুটো রেখেছিল আমার কোলে। বাড়িতে কেউ ছিলনা। মিসেস হেজ গিয়েছিলেন তার বান্ধবী চ্যাটফিল্ডের বাড়ি। ধীরে ধীরে সে তার টসটসে উরু তুলে দিল আমার কোলে। আমি তার প্যান্টিতে হাত দিলাম উরু টিপলাম। তখন আমরা কামনার তুঙ্গে। ঠিক সেই সময় ফোন করে মিসেস হেজ—ললিতা যেন এখুনি চ্যাটফিল্ডের বাড়ি চলে আসে।

চ্যাটফিল্ডের মেয়ে ফিলিপের সঙ্গে সামার-ক্যাম্পে যাবে ললিতা। মিসেস হেজ এইরকম ব্যবস্থা করেছেন। ললিতা যেতে চায়না। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠান হচ্ছে। অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটবে ললিতার সঙ্গে। বিষাদে ভরে ওঠে মন। কেমন করে থাকব আমি।

একদিন এ বাড়ির ঝি আমায় একটা চিঠি দিলে। মিসেস হেজের প্রেমপত্র। অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা। হেজ আমায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আর যদি এই চিঠি পাওয়ার পর আমি থেকে যাই তাহলে সে ধরে নেবে আমিও তাকে ভালোবাসি আর ললিতার পিতারূপে চিহ্নিত করলেও আমি অসম্মতি জানাব না।

স্থির করলাম হেজকে বিয়ে করব। ললিতাকে ফোন করলাম—জানালাম ব্যাপারটা। প্রথমটা বিশ্বাস করেনি সে। পরে বিশ্বাস করল। উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বলে, 'খুব খুশী হয়েছি আমি।'

হেজের শরীর দেখছি মুগ্ধ বিস্ময়ে। তার গায়ের সোঁদা গন্ধ অতিক্রম করে ললিতা সোনার মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। হেজের পেটেই তো একদিন ললিতা ছিল। তার বিশাল, বর্তুল স্তন দুটি থেকে দুধ খেয়েছে ললিতা। হেজের থাই দু'টো যেমনি মোটা তেমনি টসটসে। সহবাসের আনন্দে হেজের জীবনের মূল্য গেছে বেড়ে। তৃপ্তিতে নিমীলিত হয় তার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি।

খুবই ভালো হয় হেজ যদি শীঘ্রই গর্ভবতী হয়। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে রূপসী ললিতার সঙ্গে চলবে আমার একটানা প্রেমলীলা আর যৌন মিলন। অসহ্য লাগে হেজের গন্ধ। তাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অবশেষে ক্যাম্পে গেলাম। ললিতাকে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটিয়ে একটা হোটেলে উঠলাম। ললিতা বলে, 'তুমি আর আমি এক খাটে শোব। মা জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না।' একটা সুন্দর পরিকল্পনা ফেঁদেছি। ললিতাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াব। তারপর। কিন্তু ওষুধটা শালা তেমন

কাজ করল না। তবে চুমু খাওয়া, আদর করা এসব বাদ গেল না। ললিতার উরু, পায়ের ডিম, নিম্নাঙ্গের খাঁজ দেখলাম দু'চোখ ভরে।

প্রাতরাশ সেরে শয্যায় শুয়ে ললিতা ক্যাম্পে অর্জিত তার যৌন অভি-জ্ঞতার কথা বলছিল। সে নাকি খারাপ মেয়ে। গত গ্রীষ্মে এলিজাবেথের সংসর্গে সমকামিতার বিকৃত জীবন চর্চায় অভ্যস্ত হয়েছিল। নিবিড় একটা চুমু দিলাম ললিতাকে। বললাম, তোমার কথা বল। ললিতা বলে, 'কেন গো আমার কথা শুনতে চাইছ? অসভ্য কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করে তাই না?' নগ্ন ললিতাকে আদর করতে করতে বললাম, 'তুমি কারো শয্যা সঙ্গিনী হয়েছ?

সমকামিতা ছাড়া চার্লি হোমসের সঙ্গে কয়েকবার সে অবাধ যৌন সংসর্গ করেছে। ললিতার প্রিয়বান্ধবী বারবারা খুব ভালো সাঁতার কাটত। ক্যাম্পে থাকার সময় ললিতা সকালবেলায় বারবারার সঙ্গে নৌকা করে সাঁতার কাটতে যেত। চার্লি হোমসের বয়স তের। সুদক্ষ মাঝির মতো সে তাদের নৌকা টানত। বারবারা ছিল হোমসের চেয়ে বড়। যৌনক্রীড়ায় হোমস তাই তৃপ্তি পেত না। সে তাই ললিতার পেছনে ঘুর ঘুর করত। প্রথম প্রথম আপত্তি করত কিন্তু পরে আর নিজেকে সামলাতে পারে নি। চুটিয়ে তারা যৌন সম্ভোগ করত। হোমসের সঙ্গে সব সময়েই গর্ভনিরোধক দ্রব্যসম্ভার থাকত। কাজেই সহবাসের কোন ঝুঁকি নিতে হতো না। আর হোমস বলেছিল, 'সঙ্গমে মন প্রফুল্ল হয়, দেহ পুষ্ট হয়।'

বেলা দশটা। ললিতা আর আমি এতক্ষণ মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে-ছিলাম। এই মাত্র ললিতা উঠে গেল। আয়নায় তার রমণীয় শরীরের প্রতি-ছবি পড়েছে। নি র্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। নিরাবরণ নিতম্বে হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা। প্রাতরাশের পর থেকে এ পর্যন্ত আমি তিনবার তাকে উপভোগ করেছি—অনুভব করেছি যৌন মিলনের স্বর্গসুখ।

ললিতা স্নান করতে গেল। স্নান সেরে ঘরে এসে ললিতা আঁট আর খাটো পোষাক পরল। আমি তাকে যে সব পোষাক কিনে দিয়েছিলাম সেগুলি পরল না। ব্লাউজের ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল তার বক্ষ সৌন্দর্য। ললিতার পার্সে আমি কিছু টাকা পয়সা ভরে দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'এখন কি তুমি নীচে যাবে?'

—'যাব, একটু পরে।'

এলোমেলো হয়ে রয়েছে বিছানা। যে কেউ বুঝতে পারবে জোর যৌন লীলা হয়ে গেছে এখানে। প্রৌঢ় আর বালিকার মিলনের সাক্ষী এই বিছানা। লবির লাল টুকটুকে ইজিচেয়ারে বসে ললিতা রগরগে সিনেমা পত্রিকা পড়ছে। অসভ্যের মতো বসে আছে সে। রঙচঙে প্যান্টির ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে দুরন্ত যৌবন। লুব্ধ নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে আছে মাঝবয়সী একটা লোক।

কফি-হাউসে গেলাম আমরা। ললিতার সুন্দর মুখটি জুড়ে বিষাদের ছায়া পড়েছে। আমিও যেন কেমন একটা স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছি। ললিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে তোমার?'

ললিতা বলে, 'জান, তুমি একটা আস্ত পশু। অসভ্য কোথাকার।'

ললিতাকে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়েছি। একমাত্র আমরা ব্রাইসল্যান্ড ছেড়ে গেলাম। পথে যদি কোন একটা নির্জন জায়গা মেলে তাহলে চতুর্থবার মজা লুটব—প্রেয়সীর রসসিক্ত যৌবনের ঘ্রাণ নেব। কিন্তু অনুমতি দেবে তো ললিতা? ললিতা বললে, 'গ্যাস স্টেশনে গাড়ি থামাবে। বাথরুমে যাব।'

মনোরম একটা কাঁচা রাস্তা দেখা যাচ্ছে দূরে। আশে-পাশে ফার্ণের বন। ঐ পথ দিয়ে গেলে সুযোগ মিলবে। ললিতা আমার অভিপ্রায় বুঝে নিয়েছে। কি চালাক মেয়ে রে বাবা। দুষ্টুমি মাখা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ। বললে, 'না মশাই, এ পথে নয়।'

আমি বললাম, 'নিরিবিলিতে আর একবার ... ... '

ললিতা বলে, 'তুমি খুব অসভ্য। আমাকে খারাপ করে দিয়েছ তুমি। ফের দুষ্টুমি! এখুনি আমি পুলিশ ডাকব। বলব—হামবার্ট আমার ওপর বলাৎকার করেছে।'

কি রে বাবা! ললিতা কি সত্যি সত্যি পুলিশ ডাকবে, নাকি নিছক ইয়ার্কি করছে।

ললিতা বললে, 'প্রচণ্ড রকমের কামুক তুমি। আমার ওপর যা অত্যাচার করেছ। আমার ঐ জায়গাটা টনটন করছে—খুব ব্যাথা হয়েছে। বসে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।'

গ্যাস-স্টেশন আসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ললিতা। আমার কাছে পয়সা চাইল মাকে ফোন করবে বলে। আমি বললাম' 'তোমার মা মারা গেছে।'

আমরা লেপিংভিলেতে পেঁছালাম। ঝলমল করছে শহরটি। ললিতাকে অনেক কিছু উপহার দিলাম—বই, চকোলেট, স্যানিটারী ন্যাপকিন, রিফ্রেসিং কোলা, সাজগোজের জিনিস, আংটি, প্যান্টি, রঙীন চশমা ইত্যাদি।

হোটেলে ফিরে আলাদা আলাদা ঘরে আশ্রয় নিলাম আমরা। গভীর রাতে আমার ঘরে এলো ললিতা। আমায় জড়িয়ে ধরল সে। কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর আমায় আদর করল। আবার আমরা দেহমনে সহবাসের সুখ অনুভব করলাম।

LOLITA : Vladimir Navakov

॥ পরিচিতি ॥

ভ্লাদিমির নবোকভের জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে। তাঁর পিতার নাম ডিমিত্রিভিচ্। শৈশবে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি ইংরেজী শেখেন। ভরা যৌবনে লেখেন কবিতা। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলেন জার্মানীতে। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ডিমিত্রীভিচ সপরিবারে জার্মানীতে চলে আসেন।

নবোকভ ইংরেজী, রুশ আর ফরাসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ইংরেজী সাহিত্যের চিরায়ত কবি ও নাট্যকারদের রচনা তিনি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদকর্মে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'ললিতা' ছাড়া 'নিন' এবং 'বেণ্ড সিনিষ্টার উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। 'নাইন স্টোরিজ' তাঁর ছোট গল্পের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বিতর্কিত উপন্যাস 'ললিতার স্রষ্টারূপে দেশে-বিদেশে নভোকভের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে 'ললিতা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং নিষিদ্ধ উপন্যাসরূপে বিবেচিত হয়। পরে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে 'ললিতা' প্রকাশিত হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা আর তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল।

মধ্যবয়স্ক হামবার্ট তার স্কুলে পড়া টিন-এজার প্রেয়সী ললিতাকে নিয়ে যথেচ্ছ ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের অবাধ যৌনচর্চা ও প্রেমলীলার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। আর এখানে 'ললিতা' উপন্যাসের প্রথম পর্বের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ সংযোজিত হলো। দ্বিতীয় পর্ব হামবার্ট আর ললিতার দুবছর ধরে আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী।

'ললিতা' উপন্যাসটিকে সত্য সত্যই অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা যায় কিনা জানিনা। কেননা 'শ্লীল ও অশ্লীল বিচার সাহিত্যে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা—দীর্ঘকাল এ আলোচনা চলছে, স্থায়ী রায় এখনো পাওয়া গেলনা।" অন্নদাশংকর রায় যথার্থই বলেছেন—সাহিত্য হলো একটা সময়ের প্রতিচ্ছবি। তাকে সুন্দরভাবে রূপায়ণ করাই সাহিত্যিকের কাজ। সেক্ষেত্রে কোন চরিত্রকে জীবন্তরূপে প্রকাশ করাকে আমি অশ্লীলতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে পারিনা। সে তো মহামতি প্লেটো নিজেই হোমারের সাহিত্য কীর্তিকে অশ্লীল আখ্যা দিয়েছিলেন। তা বলে হোমারের সাহিত্যকর্ম কি অশ্লীলতার দায়ে দুষ্ট? মোটেই নয়। আমাদের দেশে কালিদাসের লেখাতেও এমন অনেক অশ্লীলতা পাওয়া যাবে। সাহিত্যে অশ্লীল বলে কিছু নেই।"

এতটুকু বাসা

মরিস মেটারলিঙ্ক

অ্যালিমন্ডির রাজকুমার গোলড্ একদিন শিকারে বেরোলো। শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে সে ঢুকে পড়লো গভীর জঙ্গলে। পথ হারিয়ে ফেললো। এদিক ওদিক এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে সে হাজির হলো একটা ঝরণার কাছে।

খানিক বাদেই তার কানে এসে পৌছলো একটা কান্নার আওয়াজ। সে চোখ তুলে তাকালো, কিছুটা দূরেই এক অপরূপ রূপবতী মেয়ে বসে আছে আর কাঁদছে! সে ভাবে কেন মেয়েটি কাঁদিছে? তবে কি তার মত সেও বাড়ী ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছে না?

গোলড্ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। তার পরণে মূল্যবান পোশাক-আশাক। কিন্তু ধূলোয় সব মলিন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে
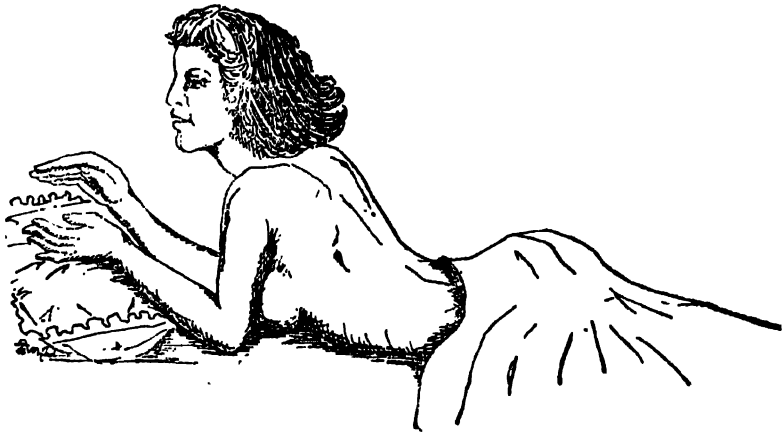
গেছে। সে জানতে পারে মেয়েটির মাথার সোনার মুকুটটি ঐ ঝরণার জলে কি ভাবে পড়ে গেছে। গোলড্ মনে করলো, হয়তো মূল্যবান জিনিসটি হারিয়ে মেয়েটি অত কাঁদছে।

গোলড্ তাকে শান্ত করার জন্য আরো কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটির সতর্কবাণী শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—সাবধান, আমার গায়ে হাত দিয়ো না। আমার কাছে এসো না।

গোলড্ মুকুটটা জল থেকে তোলার জন্য সচেস্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু সেখানেই বাধা পেলো। মেয়েটির অদ্ভুত আচরণে সে ভীষণ অবাক হলো।

মেয়েটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ালো। গোলড্ তাকে অনুসরণ করলো। এবার কিন্তু মেয়েটি কোন আপত্তি করলো না। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই গোলড্ এগিয়ে আসে এবার মেয়েটি তার পিছু পিছু চলে।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর মেয়েটি এক সময় গোলডের হাত ধরলো। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নারীর কাছে পুরুষ অনাদিকাল থেকেই দুর্বল। ফলে যা হবার তাই হলো। তাদের মধ্যে প্রেম সৃষ্টি হলো।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে রাজকুমার গোলডের দাদু তার বিয়ের জন্যে পাত্রী ঠিক করে ফেলেছিল। এটা নাতির অজানা নয়। আবার একথাও তার বেশ ভালো ভাবেই জানা যে দাদুর বিনা অনুমতিতে সে কিছুতেই তার সঙ্গের এই অপরিচিতা সুন্দরীকে রাজবাড়ীতে ঢোকাতে পারবে না। তাই সে অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলো৷ রাজবাড়ী থেকে কিছুটা দূরে অপেক্ষা করবে এবং মাকে খবর দেবে।

সে কোনরকমে তার মা আর ছোট ভাইকে খবর পাঠালো। সেই সঙ্গে দাদুর কাছ থেকে রাজপুরীতে প্রবেশের অনুমতি আদায় করার জন্যে অনুরোধ করলো।

পুত্রের আকুতিতে মায়ের মন গলে গেল। পুত্রবধূর অনুরোধ বৃদ্ধ আ্যারকেলও না রেখে পারেন না। অতএব তার মা, ছেলে এবং সুন্দরী নববধূকে রাজবাড়ীতে বরণ করে নিয়ে এলেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন।

সেদিন সকাল থেকেই গরম হাওয়া বইছিল, গরমের চাপে তিষ্ঠোনো দায়। সন্ধ্যায় হাওয়া গায়ে লাগিয়ে একটু আরাম উপভোগ করার জন্যে গোলডের ভাই পীলিয়স তার নতুন বৌদিকে নিয়ে "চশমা ঝরণায়" বেড়াতে গেলো।

নির্জন সুন্দর পরিবেশ। ঝরণার স্নিগ্ধ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুন্দরী মেলিসেন্ডী অভিভূত হয়।

ঝরণার তীরে বসে তারা গল্প করতে লাগলো। মেলিসেন্ডীর কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে পীলিয়স বুঝলো, এই রকমই কোন একটি ঝরণার তীরেই তার দাদার সাথে মেলিসেন্ডীর প্রথম আলাপ হয়েছিল।

তাই বিশেষ কৌতুহলী হয়ে সে তার বৌদির কাছে আবদার করলো—বৌদি, তোমাদের প্রথম দেখার গল্পটা বলো না, শুনি

বৌদি নীরব, তার ঠোঁটে খেলে গেল দুষ্ট হাসির ঝিলিক। আঙুলের আংটি নিয়ে আপন মনে খেলা করে আর পীলিয়াসের দিকে মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টির অর্থ উদ্ধার করতে পীলিয়াসের দেরী হয় না।

—বৌদি .... ..

আনমনে মেলিসেন্ডী উত্তর দেয়—কি, বল।

—না, এমনি ডাকছিলাম। তোমার মুখ পানে তাকিয়ে সাধ মিটিয়ে দেখছিলাম তোমার সুন্দর মুখের লালিমা।

পীলিয়াসের কথা শুনে মেলিসেন্ডী লজ্জায় মাথা নত করে। সুন্দর মুখখানা সিদুরের মত লাল হয়ে উঠে আরো সুন্দর করে তোলে। তখনও সে আংটিটা নিয়ে খেলতে থাকে। একসময় আংটিটা টুক করে ঝরণার জলে পড়ে গেল। . পীলিয়াসের নজরে তা পড়লো না।

এই সময় রাজপ্রাসাদ থেকে ভেসে আসে ঢং ঢং শব্দে ঘড়ির বারোটা শব্দ।

—ওঠো বৌদি, এবার ফিরি। রাত হলো। সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

বৌদি তার দেওরের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে পা বাড়ালো।

এই সময় গোলড শিকার থেকে ফিরছিল। রাজপুরীর ঘড়ির শব্দ শুনে সে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। এত জোরে ঘোড়া ছুটছিল যে তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়া গিয়ে ধাক্কা খেলো একটা গাছের সঙ্গে। গোলড তার পিঠ থেকে পড়ে যায়। গুরুতর আহত হলো।

তখন সে মোটামুটি ভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেনি। এমন সময় স্ত্রী মেলিসেন্ডী তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

—গোলড্, তোমাকে একটা কথা জানাতে এলাম। এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি এখান থেকে মুক্তি চাই গোলড্। কিছু মনে করো না তুমি।

হঠাৎ স্ত্রীর আঙুলের দিকে গোলডের নজর পড়তে সে চমকে উঠলো। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললো—তোমার আংটি কোথায় ?

—তুমি শুনলে হয়তো রাগ করবে সোনা, কিন্তু আমার দোষ নেই। তোমার ইমিওণ্ডএর জন্য সমুদ্র তীরে ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে একটা বালির গর্তে আংটিটা পড়ে গেছে।

মেলিসেণ্ডীর কণ্ঠে যেন সুধা ঢালা।

—কি করছো তুমি সর্বনাশ। যাও যাও, ছুটে যাও। স্রোতে ধুয়ে চলে যাবার আগে আংটিটা খুঁজে নিয়ে এসো। গোলড আদেশের ভঙ্গীতে বললো।

মেলিসেণ্ডী খুব ভালো করেই জানে ঐ যে আংটি হাজার খুঁজলেও সে আর ফিরে পাবে না। সে তো চেয়েছিল ওটা হারিয়ে যাক। ইচ্ছে করেই তো ফেলে দিয়েছে। অতএব খুঁজে দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তার মন চাইছে পীলিয়সকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার ঝরণার ধার থেকে ঘুরে আসুক।

তাই আপত্তি না করে মেলিসেণ্ডী তার দেওরটিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে। সমুদ্রের ধারে গিয়ে ওরা ভুলে যায় ওদের আসল কাজের কথা। সমুদ্রের নীল উত্তাল ঢেউ ওদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করলো মনকে করলো অভিভূত। দুজনে খুশী হয় সেই নির্জন পরিবেশে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়ে ......।

মেলিসেণ্ডী পেলো পুরুষের আরেকটি স্বাদ। মিলনের আশায় দুটি মন সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। কেবলই সুযোগের অপেক্ষা করে। কিন্তু তাদের কোন অসুবিধা হয় না। গোলডের অনুপস্থিতি তাদের সুযোগ করে দেয়।

অবশ্য ইমিওণ্ডের জন্যে ওদের একটু অসুবিধে হয় ঠিকই। তবে তাতে কিছু আসে-যায় না। ছোট্ট শিশু কি আর বোঝে। কেবল থেকে থেকে ওদের দুজনের দিকে কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন আকাশে উঠেছে গোল চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলোয় রাজবাড়ী ডুবে আছে। গোলড্ বাড়ীতে নেই। তার স্ত্রী মেলিসেণ্ডী ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আঁচড়াচ্ছিল তার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ। সেই সময় পা টিপে টিপে তার পাশে এসে দাঁড়ায় পীলিয়স। সুন্দরীর চুলে আলতো ভাবে হাত রেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

দুজনে আবেগের প্লাবনে ভাসছে এমন সময় লক্ষ্য পড়লো গোলড দ্রুত

পায়ে আসছে কিন্তু তখন এত দেরী হয়ে গেছে যে হাত সরিয়ে নিলেও সামলাতে পারবে না। তাই সে বৃথা চেষ্টাও করল না।

এতরাত্রে ছেলেমানুষের মত দুজনকে ওরকম খেলতে দেখে গোলড অবাক হলো। দুজনকে তিরস্কার করে নিজের ঘরে চলে গেলো।

পরের দিন গোলড তার ভাইকে কাছে ডাকলো। খুব নিম্নস্বরে বললো —দেখো পীলিয়স, মেলিসেন্ডীর সাথে খুব সাবধানে মেলামেশা করবে। ও একেই ছেলেমানুষ তার ওপর স্পর্শকাতর। গতরাত্রে যেমন ভাবে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলে ওটা ঠিক শোভনীয় নয়। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, ও খুব শীগগিরই দ্বিতীয় সন্তানের জননী হবে।

ওদের মধ্যে সম্পর্কটা যে কি ধরনের সেটা আবিষ্কার করতে গোলড কিছুতেই পারে না। মনে চলতে থাকে সংশয়ের দ্বন্দ্ব। কিন্তু কিছুতেই সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না সে। নিরুপায় হয়ে সে তার ছোট্ট ছেলের সাহায্য ভিক্ষা করলো। ইমিওন্ডকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন করলো, প্রলোভন দেখালো, আকার ইঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলো—কিন্তু ফল কিছুই হলো না। হাজার চেষ্টা করেও রহস্য উদঘাটিত করতে পারলো না। অসহায় শিশু কেবল তার বাবার মুখপানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। গোলডের মনের জ্বালা হু হু করে বাড়তে থাকে। দিবারাত্র একই চিন্তায় সে ভুগতে লাগলো।

অনেকদিন ধরেই পীলিয়স ভ্রমনে যাবে বলে ঠিক করেছিল। এবার যাত্রার দিন নির্দিষ্ট হলো। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মেলিসেন্ডীকে চুপি চুপি বলে গেলো—চশমা ঝর্ণার কাছে সে যেন রাত্রে দেখা করে। পীলিয়স তার প্রতীক্ষায় থাকবে।

মেলিসেন্ডী অসম্মতি করে না। খুশী হয়ে ঘাড় নাড়ে সে।

পীলিয়স বাড়ী থেকে চলে যাবার পর মেলিসেন্ডীর মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কেমন উদাস হয়ে যায় সে। কিছুই ভালো লাগছে না তার। বিষণ্ণ মুখে কেবলই ভাবে কখন সেই প্রতীক্ষিত সময়টি আসবে।

নাতবউয়ের বিষণ্ণতা কিন্তু বৃদ্ধ দাদাশ্বশুরের অভিজ্ঞ নজরকে এড়াতে পারে না। তাই একসময় মেলিসেন্ডীকে ডেকে প্রশ্ন করে—

—তোমার মুখ ভার কেন? কি হয়েছে? ভেবেছিলাম, তুমি আসার পর এবাড়ীতে শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সংসারে দেখা

যাচ্ছে অশান্তির আভাস। কিন্তু তোমার মন খারাপ কেন, তা তো ভেবে পাই না। আগে তো এমন ছিলে না।

মেলিসেণ্ডী দাদুর কথায় কোন সাড়া দেয় না। কিন্তু বৃদ্ধ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রবেশ করে মেলিসেন্ডীর মনিকোঠায় পাঠ করে তার মনের গোপন কথা।

পাশের ঘরেই ছিল গোলড। দাদুর সব কথা তার কানে এলো। রেগে গিয়ে সে খাপ খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে এল। মেলিসেন্ডীকে টানতে টানতে ঘর থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। ব্যাপারটা অ্যারকেলের জন্যে আর এগোতে পারলো না। সেদিনের মত ওখানেই ওর গতি থমকে গেল।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। নিয়ম-মাফিক গোলড বেরিয়ে পড়লো তার শিকারে। এবার মেলিসেণ্ডী চঞ্চল হয়ে উঠলো। কেননা সে এখন অনায়াসে নির্ভয়ে যেতে পারে। দেরী না করে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে পা বাড়ালো। সে যেন নিজের পায়ে হাঁটছে না। কোন এক আকর্ষণে সে আপনা-আপনিই এগিয়ে যাচ্ছে।

চশমা ঝরণার কাছে তার প্রেমের নাগরটি আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে তারা দুজনেই দুজনকে দেখলো. দৃষ্টি বিনিময় হলো। দুটি দেহ-মনে জাগলো আনন্দের—হিল্লোল, জ্বললো কামনার আগুন।

মেলিসেণ্ডী এগিয়ে আসতেই পেলিয়স তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। বুকের কাছে টেনে নিলো। মেলিসেণ্ডীও তার নরম হাতে গভীর ভাবে আঁকড়ে ধরলো তার উপপতিকে।

ওরা নিজেদের সুখে এতই মুগ্ধ ছিল যে কখন বারোটা বেজে গেছে শুনতে পায় নি। রাজবাড়ীর সিংহদরজা বন্ধ হাওয়ার শব্দ তাদের চমকে দিলো। তারা সচকিত হলো। সর্বনাশ! সিংহদরজা বন্ধ হয়ে গেলো। মানে সারাটা রাত দুজনকে রাজবাড়ীর বাইরে কাটাতে হবে। তাছাড়া উপায় কি ... ... ?

কষ্ট করে ওদের আর উপায় বের করতে হলো না। দেখতে পেলো, দূর থেকে ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে বড় রাজকুমার গোলড। হাতে তার খাপ খোলা তরোয়াল। তার লক্ষ্য স্থির, চোখে মুখে প্রতিহিংসার প্রদীপ্ত আগুন।

গোলডের আগমন ওদের একটু বিচলিত করে দিলো। ওরা নিশ্চিত যে তার ঐ মুক্ত তরবারি থেকে কারো রক্ষে নেই। তাই শেষ বারের মত

পীলিয়স মেলিসেণ্ডী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো নিবিড় ভাবে। এলোমেলো ভাবে তারা চুম্বন বিনিময় করতে থাকে।

ওরা যখন উত্তেজনায় চরম শিখরে এসে পেঁচেছে এমন সময় গোলডের তরবারি পেছন থেকে তাদের আক্রমণ করলো। তরবারির নির্মম আঘাতে পীলিয়সের রক্তাক্ত দেহটা ঝরণার ধারে লুটিয়ে পড়লো। তার ওঠবার শক্তি লোপ পেলো।

তরবারির আঘাত মেলিসেন্ডীরও গায়ে লেগেছিল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেই অন্ধকারে উন্মত্তের মত গোলড তাঁর স্ত্রীর সংজ্ঞা হীন দেহটা টানতে টানতে নিয়ে এলো প্রাসাদের কাছে। পরদিন ভোরে এক বিশ্বস্ত চাকরের সহায়তায় তারা ভেতরে ঢোকে।

আঘাত মারাত্মক নয়। সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মনের আঘাত ছিল মারাত্মক রকমের। ফলে সময়ের অনেক আগেই তার গর্ভের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়। সে ক্ষণে ক্ষনে জ্ঞান হারাতে থাকে। আনা হলো ডাক্তার বৈদ্য। কিন্তু কেউই তাকে সুস্থ করতে পারে না। এমন কি বাঁচবে কিনা, সে কথাটিও জোর করে বলতে পারলো না।

রাজবাড়ীতে নেমে আসে শোকের ছায়া। সকলের মুখ ম্লান। সকলেই যেন নিষ্প্রাণ।

মেলিসেণ্ডীর আসন্ন মৃত্যুর জন্য গোলড্ নিজেকে দায়ী সাব্যস্ত করে। সে দিবা-নিশা অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। কপাল চাপড়ে কেবলই ভেবেছে, কেন একাজ করতে গেলাম। উদভ্রান্তের মত ছুটে এসে চীৎকার করে সকলকে জানালো যে সেই মেলিসেন্ডীর জন্য দায়ী। সে অপরাধী। সে আমতা আমতা করে উচ্চারণ করে—হয়তো দুজনেরই এখনও বোঝার শক্তি হয়নি; ওরা শিশু মাত্র। ওদের চুম্বনও তাই শিশুসুলভ ছিল মনে হয়।

ঠিক এ সময় মেলিসেণ্ডী তার দুর্বল চোখের পাতা দুটি ধীরে ধীরে খুললো, কেমন ফাকা দৃষ্টি। তার মনে পড়ে না কোন দুর্দৈবের কথা—না কোন অঘটনের স্মৃতি। গোলড্ এর দিকে নজর পড়তেই তার চোখের তারা দুটি স্থির হয়ে যায়। এই মুহূর্তে মনে হয়, গোলড যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, তার বলিষ্ঠ চেহারায় এসেছে শিথিলতা।

স্ত্রীর দৃষ্টি ভঙ্গী লক্ষ্য করে গোলড ভাবলো, মৃত্যুর আগে সে নিশ্চয়ই সত্যি কথাটা বলে যেতে চায়। তাই সকলকে সরিয়ে দিয়ে ঘর ফাঁকা করে

ফেললো। এইবার গোলড ধীরে ধীরে তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা শায়িত মেলি-সেন্ডীর ওপর নামিয়ে নিয়ে এলো। আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলো।

ক্ষীণ কণ্ঠে মেলিসেন্ডী জানালো—তাদের কোন অন্যায় নেই। সে এবং পীলিয়স নিষ্কলঙ্ক।

পীলিয়সের নামটা তার কানে যেতেই সে পাগল হয়ে ওঠে, চঞ্চল দুটি চোখে তাকে সে খুঁজে বেড়ায় ঘরের এদিক-ওদিক। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আবার তার চোখ দুটি অলস পাপড়ির মত বন্ধ হয়ে যায়।

গোলড আর স্থির থাকতে পারে না। দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে ওঠে।

—মেলিসেন্ডী দোহাই তোমার। চুপ করে থেকো না। মৃত্যুর আগে বলে যাও, পীলিয়সের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের আসল রহস্যটা। তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, মেলিসেন্ডী, বলো। মুখ খোল। সত্যি কথাটা বলো। আমি তোমাকে আর জ্বালাবো না।

আবার মেলিসেন্ডীর চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলে যায়। দুর্বল কণ্ঠে বলে—মৃত্যু! কার মৃত্যু! কেন হবে মৃত্যু।

ভয় সঙ্কোচহীন উক্তি শুনে গোলড দারুন ভাবে মুষড়ে পড়লো। সে আর এক মুহূর্তও দেরী না করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন দাদু অ্যারকেল, তার দুহাতে ধরা সদ্য প্রসূত ফুটফুটে শিশুটি। সন্তানকে দেখেও মেলিসেন্ডীর কোন ভাবান্তর হলো না।

মেলিসেন্ডীকে অভিবাদন জানাতে ছুটে এলো দাস দাসীর দল, তারা তার বিছানার চারধারে ঘুরে ঘুরে তাকে অভিনন্দন জানালো, শিশুর শুভ কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো। তবু মেলিসেন্ডীর ঠোঁট খুললো না। কেবল চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু ফোঁটা জল।

ঘর নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি বিছানার দিকে। একসময় মেলিসেন্ডীর সাদা একটা হাত বুকের ওপর থেকে টুক করে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লো। দ্রুত পায়ে ডাক্তার ছুটে এলো। মেলিসেন্ডীর হাতটা তুলে ধরেই নিম্নকণ্ঠে বলে ওঠে মারা গেছে।

হরিবংশ | মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

॥ বিষ্ণুপর্ব ॥

॥ ত্রি পঞ্চাশদধিকং শততম্ অধ্যায় ॥

॥ বর্ষা ॥

ভাদ্রমাস। সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। মদন প্রভাবতীকে বললেন —তোমার মুখের মতো সুন্দর চাঁদকে আর দেখা যাচ্ছে না। তোমার নিবিড় কালো কেশের মতো কৃষ্ণ মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে। বিদ্যুৎ তোমার ফর্সা

শরীরের মতো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বলাকা যেন তোমার শুভ্র দন্তরাজি। সরোবরের জল এখন কানায় কানায়। পদ্ম ডুবে গেছে। জলাশয় তাই শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা—মনে হচ্ছে সেখানে যেন মত্ত হাতীর যুদ্ধ চলছে। ইন্দ্রধনু যেন তোমার কটাক্ষের অনুকরণ করছে।

কামনা-মদির নরনারীর চিত্তমেঘের পটভূমিকায় ইন্দ্রধনুর রঙে আন্দোলিত। ময়ূরেরা উদ্দাম উল্লাসে পেখম তুলে নাচছে। কদম, অর্জুন, চন্দনের ঘ্রাণে চারিদিক সুরভিত। আসঙ্গ-লিপ্সায় চঞ্চল হচ্ছে মন। রতি শ্রম শ্রান্ত স্বেদসিক্ত শরীরে সঞ্জীবনী পরশ বুলিয়ে দেয়। সজল হাওয়া। বর্ষণ-ক্লিষ্ট ভরা ভাদরে সারস আর হাঁসের ঝাঁক মানস সরোবরের পদ্মবনে চলে গেছে। নারায়ণ এখন অনন্ত শয্যায় শায়িত। লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে সম্প্রতি তিনি যেন নিদ্রার সংসার্গিক সুখ অনুভব করছেন। তিনি তাই সুপ্ত। কৃষ্ণের মনে পুলক সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ষড় ঋতু তাদের মঞ্জরিত, গন্ধ-বিধুর ফুলের ডালি উজাড় করে দেয়। সেইসব ফুলে ঘুরে ফেরে যাযাবর ভ্রমর। কানে আসে মধুর গুঞ্জন। প্রিয়ে, ভাবছ তুমি এখন আকাশটাই বুঝি ভেঙে পড়বে—তাই কি শঙ্কায় তোমার মুখশ্রী পাণ্ডুর হয়েছে? তোমার ফুল্ল স্তন-কমল আর ঐ উষ্ণ উরু শিথিল হয়েছে? না, তা নয়। বলাকামালায় শোভিত আকাশটা দেখে তোমার চিত্তচাঞ্চল্য জেগেছে তাই এই বিষন্নতা, উদাসীনতা। চাতকেরা আজ তৃপ্ত। ব্যাঙেরা ডাকছে—মনে হচ্ছে স্বাধ্যায়ী কোন আচার্য তাঁর সুপ্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে সামগান করছেন। সুন্দরী বর্ষার আরেকটি সৌন্দর্য কোথায় জান? কামার্ত যুবতী অন্যসময়ের চেয়ে এ সময়ে আগেই শুতে যায় আর মেঘ গর্জনে ভীত হয়ে স্তনভারনত শরীরে প্রিয়তমকে জড়িয়ে ধরে।

॥ বিষ্ণুপর্ব ॥

॥ পঞ্চসপ্তাধিকং শতম্ অধ্যায় ॥

॥ ধর্ষিত উষা ॥

বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশীর নির্জন রাতে বাণ-তনয়া মনোমোহিনী অনাঘ্রাত কুমারী উষা মনোহর সৌধতলে শুভ্র শয্যায় সুপ্তিমগ্না। তার সখীরাও নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সহসা স্বপ্নাবিষ্টা উষা কান্তিমান এক পুরুষের দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো। অনুভব করলো সে প্রথম সম্ভোগের সোনালী ব্যাথা আর অনির্বচনীয় শিহরণ। স্বপ্নোত্থিতা উষা বিস্মিত চোখ মেলে দেখে তার পরিচ্ছদে রক্তের দাগ। অক্ষত যোনির গৌরব আর তার রইল না, ধুলায় লুটায় তার সতীত্ব বলপূর্বক তার কৌমার্য হরণ করে চলে গেল যে, সে তাকে মৌন অপমানে কাঁদিয়ে গেল!

প্রিয়সখী চিত্রলেখা শুধায়, 'কাঁদছ কেন?' উষা জানাল সবকিছু। বললে 'কুলের গৌরব, কৃচ্ছ সাধনে ধরে রাখা এত দিনের অবদমিত যৌবনের অহংকার —সবকিছুই হারিয়ে আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত, ধর্ষিতা। নারীর একমাত্র কাম্য হলো মৃত্যু। বাঁচার ইচ্ছে আর আমার নেই।'

সান্ত্বনা দেয় চিত্রলেখা, 'সুপ্তির সমুদ্রে যখন তুমি তলিয়ে গিয়েছিলে তস্কর এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তোমার সাধন ধন তোমার সতীত্ব, যৌবনের তপ্ত সুধা। পাপ তাই স্পর্শ করেনি তোমাকে। সুন্দরী, ব্রহ্মচারিণীর পূত জীবনচর্চায় তুমি রত, রূপে গুণে তুমি অনন্যা। নারীকুলে তুমি সুধন্যা—ভগবতীর আশীর্বাদে অভিস্নাত। মনে আছে, ক্রীড়ামুক্ত হর-পার্বতীর মনোরঞ্জন করেছিলে তুমি? প্রীত হয়ে বলেছিলেন উমা—আসন্ন বৈশাখে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে নিশিথের স্বপ্নের মাঝে দেবোপম যে যুবকের সঙ্গে মিলিত হবে, তার সঙ্গেই তোমার পরিণয় হবে।'

উষার মনে পড়ে পার্বতীর সেই আশীর্বাদের ইতিবৃত্ত। স্নিগ্ধ প্রসন্নতার অন্তরতায় সিক্ত হলো—সব হারানোর ব্যাথা মুহূর্তেই অপসারিত হলো। কিন্তু তীব্র সম্ভোগ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে তার সখীকে বলে 'তোর পায়ে পড়ি। স্বপ্নে যে আমার সঙ্গে খেলা করে গেছে, সঙ্গমের নেশা জাগিয়ে দিয়ে সে পলাতক—আমার সেই প্রিয়তমকে এনে দে, নইলে আমার এ জীবন ধারণ অর্থহীন।'

চিত্রলেখা বললে, 'তুমি কি পাগল হলে সখী। চোখে দেখিনি তাকে, নাম জানিনে তার, জানিনে কোথায় থাকে সে—কেমন করে তাকে তোমার কাছে এনে দেব?'

'তাকে না পেলে আত্মঘাতিনী হব আমি।'—উষা বলে।

উষার আকুলতায় চিত্রলেখা অবশেষে স্বপ্নরাজ্যের মনচোর সেই পুরুষটিকে খুঁজে বের করার একটা পথ আবিষ্কার করে। উষাকে বলে সে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে গুণে-শীলে-রূপে যারা সকলের মনোহরণ করে এমন পুরুষদের ছবি সংগ্রহ করে এনে তোমায় দেখাব। তুমি আমায় চিনিয়ে দেবে তাকে।' খুশীতে ঝলমল করে ওঠে উষার মুখ। বললে, 'চিত্রলেখা, এইজন্যেই তো তোকে এত ভালবাসি। সত্যিই তুই বুদ্ধিমতী।'

চিত্রলেখা। সত্যি, অসাধারণ তার নৈপুণ্য। অচিরেই সম্পন্ন হলো অনুসন্ধান পর্ব। সেই ধর্ষক শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ—সুরূপ, সুশীল, অমিত শক্তির অধিকারী। চিত্রলেখার আন্তরিক প্রয়াসে গুপ্তস্থানে গান্ধর্ব প্রথায় অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত পাত্রপাত্রী—অনিরুদ্ধ ও উষার ইচ্ছানুসারে শুভ পরিণয় সপন্ন হলো।

॥ পরিচিতি ॥

হরিবংশ—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস

বিদগ্ধ জনের প্রচলিত অভিমত হরিবংশের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। গ্রন্থটির সঠিক রচনা কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনুমান করা যেতে পারে হরিবংশ মহাভারতোত্তর রচনা। মানুষ আর দেবতা কৃষ্ণের মিশ্রণে কৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত একটি ছবি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত। এছাড়া সমকালীন সমাজের বিশ্বস্ত এবং চিত্তাকর্ষক চিত্রগুলি পাঠক-পাঠিকার উপরি পাওনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আখ্যান রচনাতেও হরিবংশে সাহায্য নিয়েছিলেন।

মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের স্রষ্টা চিরজীবী বেদব্যাসের পিতার নাম পরাশর, মা সত্যবতী। বেদ সনাতন হিন্দুধর্মের আদিতম শাস্ত্র কিন্তু ক্রমে মানুষ ক্ষীণায়ু হয়ে পড়ে, তার শৌর্য ও তেজ হ্রাস পায়। সমগ্র বেদ পাঠ ও আয়ত্ব করাও তাই সম্ভব নয় বলে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদকে ব্যাস অর্থাৎ পৃথকীকৃত করেছিলেন। তিনি তাই বেদব্যাস নামে পরিচিত ঃ—

হিতায় সর্বভূতানাং বেদভেদান করোতি সঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩। ৩। ৬
বিব্যাস বেদান যস্মাৎ স তস্মাৎ বেদব্যাস উচ্চতে। মহাভারত আদি ৬৩। ৮১
পরবর্তীকালে বেদ থেকে নানা কল্পসূত্র, সুবোধ সংহিতাদি রচিত হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্রগুলির পঠন-পাঠন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মহর্ষি ব্যাসদেব তাই আখ্যান-উপাখ্যান পূর্ণ অষ্টাদশপুরাণ প্রণয়ন করেন—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরানার্থবিশারদঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ৩। ৬। ১৬

বিদ্যাসুন্দর । ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

যোগানন্দ আর যোগবতী সিদ্ধি বলে ভৈরব-ভৈরবীতে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু গর্বান্ধ হয়ে তারা লঘুগতি কন্দর্পের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করায়, শিবের কোপে তারা সুন্দর আর বিদ্যা নামে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে।

পুত্রের মুখ দেখে আনন্দিত হলেন কাঞ্চীপুরের অধীশ্বর। শুভার্থীদের তিনি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন। যথা সময়ে মহা সমারোহে ষষ্ঠী পূজা এবং অন্নপ্রাশনের শুভানুষ্ঠান শেষ হলো। অতঃপর দ্বিজোচিত অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করে সুন্দর, অচিরেই অধিগত হলো পাণিনি। ক্রমে ক্রমে যৌবরাজ্যে উপনীত হলো সে।

বর্ধমান রাজকন্যা আলোক-সুন্দরী বিদ্যাবতী অধ্যয়নে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করল। ভক্তিমতী বিদ্যা নিয়তই কালীর আরাধনায় রত থাকে। ভগবতীর স্বপ্নাদেশে বিদ্যার পিতা বীরসিংহ কন্যার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন। গঙ্গাভাটকে ডেকে বললেন তিনি, 'যে জন বিচারে জিনিবে বিদ্যারে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম তাকেই কন্যা দান করব।'

বীরসিংহকে প্রণাম করে ভাট নিষ্ক্রান্ত হলো। অঙ্গ-বঙ্গ-গুজরাট ঘুরে অবশেষে এলো সে কাঞ্চীপুরে। গুণীসিন্ধু রায়ের দরবারে এসে সে বলে,

'বর্ধমান রাজের আদেশ পালনেই এখানে এসেছি আমি। তাঁর কন্যা বিদ্যা —রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। রাজা বলেছেন, রাজকুমারীকে যে তর্কে পরাজিত করতে পারবে তার হাতেই তিনি কন্যা সমর্পণ করবেন, সেইসঙ্গে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। আপনার বিবাহযোগ্য পুত্র রয়েছে তাই হেথায় আমার আগমন।'

ভাট বিদ্যার রূপ বর্ণনা করে। বলে, 'মহারাজ, বিদ্যা অসাধারণ রূপসী। উন্নত তার নাসিকা, রসসিক্ত তার রক্তিম অধর, ধনুকের মত বাঁকা তার ভ্রূ দুটি আর রঞ্জিত তার কটাক্ষ। সুদতী বিদ্যার হাসিতে মুক্তো ঝরে। শোভন তার কটি, কামিনী গজগামিনী। দীর্ঘ তার চিকুর বেণী। উরু তার কদলীতরুর মতো।' সংগোপনে সুন্দরও শোনে বিদ্যার রূপ-লাবণ্য আর গুণের কথা। অতঃপর প্রলুব্ধ সুন্দর বর্ধমান যাত্রা করে। নগরীর রূপ আর ঐশ্বর্য সুন্দরের মনোহরণ করে।

বকুল-মূলে উপবিষ্ট মনোহর সুন্দর, দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে। রূপমুগ্ধ কামিনীদের মদন-জ্বালায় জরজর তনু। তাদের কাঁচলির দৃঢ় বন্ধন আর কটির বসন খসে পড়ে। একটু চলে তারা, একটু থামে। ঠারে-ঠোরে সুন্দরকে দেখে একজন নারী বলে, 'দেখ দেখ সই, পরম সুন্দর এই নাগরকে। মনে হয় কুলে কলংক লেপে এর ভজনা করি, যোগিনী হয়ে একে নিয়ে সাগর-পারে পালিয়ে যাই। ভুবন মাঝে এ যেন নতুন এক রত্ন! ইচ্ছে জাগে চাঁপা ফুলময় একে খোঁপায় পরি।' স্নান সেরে ঘরে ফিরছে সুন্দরী কামিনীরা আর লুব্ধ চোখে দেখছে সুন্দরকে।

সূর্য গেল অস্তাচলে। আঁধার ঘনাল। এমন সময় সেখানে এল হীরা মালিনী। হাসি-খুশী। গালভরা তার পান। সাদা শাড়ি পরেছে। ফুলের চুপড়ি কাঁখে সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। খুব ঝগড়া করতে পারে সে। প্রতিবেশীরা তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। সুন্দরকে দেখে মালিনী ভাবে এ যুবক নিশ্চয় বিদেশী। না জানি এর মা কত নিষ্ঠুর—একে ছেড়ে থাকে কেমন করে! পুঁথি দেখে মনে হয় এ পড়ুয়া।

একগাল হেসে মুখ উজ্জ্বল করে সুন্দরকে শুধায় সে, 'বাছা, কে তুমি? কোথায় যাবে? কোনখানে বাসা?

—'আমার নাম সুন্দর। আমি বিদ্যাব্যবসায়ী। এখানে এসে হন্যে হয়ে বাসা খুঁজছি। কিন্তু বাসস্থান মিলছে না। ভালো ঠাঁই পেলে যাব সেখানে।'

—'আমি দুখিনী হীরা মালিনী। ফুল ফেরি করে বেড়াই, রাজবাড়িতে যোগাই ফুল। বাড়ী আমার ঘেরা কিন্তু থাকি একা।'

সুন্দর ভাবে, 'মালিনীর বাড়ি গেলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা।

কিন্তু একা থাকে সে—যদি হিতে বিপরীত হয়।'

সে তাই মালিনীকে বলে, আমি পুত্রসম, তুমি মার সম মাসী।'

অতঃপর সুন্দর মালিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিল। সুউচ্চ প্রাচীরে তার

বাড়ির চারিদিক ঘেরা। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে বাগানে। শুরু হয়েছে মৌমাছির আনাগোনা। অবিরত কুহুতান চিত্তে জাগায় ব্যাকুলতা। দখিনা বাতাস মুনির মনেও রঙ লাগায়—সুন্দর তো কোন ছার। দক্ষিণদ্বারী ঘরে রইল সে। অতিথি আপ্যায়নের জন্য হীরা মালিনী নানা আয়োজন করতে থাকে। নৈশাহার সেরে সুন্দর শুয়ে পড়ে।

সকাল হলে দুর্গাকে স্মরণ করে নিকটবর্তী দামোদর নদে স্নান করে পূজায় বসে। ওদিকে রাজারানীকে সম্ভাষণ জানিয়ে বিদ্যাকে ফুল দিয়ে হীরা শীঘ্র বাড়ি ফেরে।

সুন্দর বলে, মাসী, দাসদাসী সঙ্গে আনিনি. বাজার করবে কে ?''

হীরা বলে, 'টাকা ছাড়, সবকিছু মিলবে। এ পৃথিবী অর্থের বশীভূত। কড়ির মতো বন্ধু আর নেই। টাকায় বাঘের দুধ মেলে, বুড়োরও বিয়ে হয়। আর কোন কিছুই আমার অসাধ্য নয়। বাতাসে ফাঁদ পেতে আমি চাঁদকে ধরে দিতে পারি, ভুলিয়ে-ভালিয়ে কুল-কামিনীকেও আমি এনে দিতে পারি।'

সুন্দর তুষ্ট হয়ে হীরাকে দশ 'তঙ্কা' দিল। 'পরধন হরা' হীরা বুঝল সুন্দর একেবারেই অবুঝ. নির্বোধ। দশ টাকা ঝাঁপিতে ভরে রাঙা তামা বার করে বেসাতির জন্য হীরা যায় হাটে। তাকে দোকানীরা হাড়ে হাড়ে চিনত তার সাড়া পেয়ে 'দোকানী দোকান ঢাকে ডরে।'

সন্দেশ, চিনি, চন্দন, চুয়া লবঙ্গ, জায়ফল. ঘৃত, পান, গুবাক, দুধ নিয়ে বাড়ি ফেরে হীরা। বলে, 'আমি বলেই কত ঘুরে কত কষ্টে এসব জিনিসপত্র যোগাড় করেছি। এখন লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি, শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল খড়ি।'

রন্ধন সেরে ভোজনান্তে সুন্দর হীরার পাশে এসে বসে। তার কাছে রাজবাড়ির খবর জানতে চায়, 'রাজার বয়স কত ? কয়জন রাণী ? রাজার কয়টি ছেলে ? কয়টি মেয়ে ?' হীরা বলে, 'আগে তোমার পরিচয় দাও বাছা।'

—'দক্ষিণ দেশে কাঞ্চীপুরে আমার নিবাস। আমি সেখানে রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র। বিদ্যার আশে এসেছি হেথায়।'

চমকে ওঠে হীরা। সুন্দরকে প্রণাম করে বলে সে, অপরাধ মার্জনা করবেন। দাসীকে মাসী সম্বোধন করে আপনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যে কয়দিন আমার বাড়িতে থাকবেন নিজগুণে আমার দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

এখন রাজা আর রাজ পরিবারের সম্বন্ধে যা যা জানতে চাইছিলেন বলি। অর্ধেক বয়স রাজার এক পাটরাণী, পাঁচপুত্র সবে যুব জানি, আই বুড়ো একটা মেয়ে আছে তার নাম বিদ্যা। বিদ্যার রূপগুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। বয়স তার পনের-ষোল। অপূর্ব তার বেণীর শোভা। মুখশ্রী শরতের মেঘমুক্ত চাঁদকেও হার মানায়। নখে যেন তার পদ্ম ফুটে আছে। বিদ্যা সুদতী—ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার। পয়োধর শিবলিঙ্গের মতো—

কুচ হৈতে কত উচচ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥

তার কটি ডমরু মধ্য কিংবা সিংহের কটি অপেক্ষাও কৃশ। নিতম্ব দেখে মেদিনী মাটি হলো—আজও তাই থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। বিদ্যার উরুদেশ কদলী তরুর মতো।

এ পর্যন্ত কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এল কিন্তু বিদুষী-রূপসী বিদ্যাকে বিচারে-তর্কে হারাতে না পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।'

সুন্দর বলে, 'দেখা যাবে বিদ্যার, বিদ্যার দৌড়! মাসী তুমি তো নিয়মিত তাকে ফুলমালা জোগাও, এবার আমি কৌশলে একটা মালা গেঁথে তার মাঝে চিঠি গুঁজে দেব।' পরিকল্পনাটি ভালো লাগল হীরার।

অতসী, অশোক, অপরাজিতা, কমল, কুমুদ, কুরচি, কিংশুক গন্ধরাজ, গোলাপ, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, টগর, নাগকেশর, বান্ধুলি কোন ফুলই বাদ পড়ল না। সাজি ভর্তি ফুলে মালা গাঁথা হলো। চিত্রকাব্যে কেয়ার পাতায় একটি মাত্র শ্লোকে আত্মপরিচয় দেয় সুন্দর। ফুল আর মালা নিয়ে হীরা রাজভবনে যায়। বিদ্যা তখন পূজার আসনে বসেছে। হীরার বিলম্বের জন্য বিদ্যা তাকে ভর্ৎসনা করে। হীরা মালিনী ভয়ে কাঁপছে—এই বুঝি প্রাণ যায়। সে বলে, 'ক্ষমা কর রাজকুমারী। চিকন মালা গাঁথতে বেলা হলো।'

বিদ্যার ক্রোধ প্রশমিত হলো। রুচির পুষ্পমাল্য দেখে বিস্ময় জাগে বিদ্যার। সে বলল, 'হীরা, এ মালা তুই গাঁথিস নি। হ্যাঁ রে তোর দেহে কি পুনরায় যৌবন এসেছে। নাকি কোন বঁধু তোকে এই চিকন মালা গাঁথতে শিখিয়েছে?'

—'জীবন থেকে যৌবন চলে গেলে আর কি তাকে ফিরিয়ে আনা যায়। আমার মাজা ক্ষীণ নয়। স্তন দুটিও যৌবন সুলভ কাঠিন্য হারিয়ে ঝুলে পড়েছে। বঁধু আসবে কিসের লোভে? কৌটা খুলে দেখ, বুঝবে সব কিছু।

বিদ্যা কৌটা খোলে। 'শর হেন ফুল শর ছুটিল।' শ্লোক পড়ে রাজকুমারীর তনু রসে ভরে ওঠে। সুযোগ বুঝে হীরা বলতে শুরু করে, তোমার এই রঙ রূপ রস সবই বিফলে যাচ্ছে কেননা আজ পর্যন্ত তোমার বিয়ে হলো না। যৌবনই তো রমণীর প্রশস্ত কাল। তাই তোমার কষ্টে, তোমার ভাবনায় আমার অন্নজল রুচে না। কাঞ্চীপুরের রাজপুত্র সুন্দর একলা দিগ্‌বিজয় করে বেড়াচ্ছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে আটকে রেখেছি আমার বাড়িতে। তোমার জন্যে নাগরকে আটকে রাখলাম আর তুমি আমায় গাল দিলে। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। বেশ আমি চললাম।'

বিদ্যা হীরার আঁচল ধরে টানে। বলে, 'আহা রাগ করছ কেন? থাক বঁধু লয়ে—একথা কয়ে কি এমন অপরাধ করেছি। আমি না তোমার নাতনীর মতো। আমার শরীরে কামনার আগুন জেলে দিয়ে চলে যাচ্ছ—বেশ তো। লক্ষ্মীটি হীরা বল না, কেমন সে।'

—'রূপের নাগর, গুণের সাগর সে। চাঁদের মতো নির্মল তার মুখ। সবে মাত্র গোঁফ উঠেছে। আজানুলম্বিত তার বাহুদ্বয়। কি আর বলব তোমায়—

'যুবতীর মন সফরী-জীবন
নাভি সরোবর তার।
ত্রিবলী বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর।'

—'হীরা, আবার আমায় তার কথা বল। আমার তনু রসে ডগমগ করছে, মন টলটল করছে। লোকলজ্জা দূরে থাক আমায় তার কাছে নিয়ে চল। আর আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছিনে। অনেক আদরে, অনেক যত্নে আমার কাছে রাখব তাকে। আমি আর তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানবে না। কতদিন ভেবেছি কার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত রাজপুত্র এল গেল—সকলেই রাজবেশে চাষা। ভগবতীর কৃপায় আমার বিয়ের ফুল ফুটতে চলেছে। এখন বলো কি ভাবে গোপনে আমাদের মিলন হতে পারে।'

বিদ্যাও চিত্রকাব্য লিখে পাঠায় তারপর পূজায় বসে। কিন্তু পূজায় মন বসে না। এমন সময় আকাশবাণী এল কানে—'আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে।'

সুন্দরও ভেবে পায়না কি ভাবে সে বিদ্যার ঘরে যাবে। দ্বারে দ্বারে প্রহরারত যমদূতের মতো ভয়ংকর কোটাল। পাখী প্রবেশ করতে পারে না মানুষ তো কোন ছার। আকাশ-পাতাল ভেবেও উপায় খুঁজে পায় না সুন্দর। পূজায় বসে সে। তার স্তবে প্রসন্ন হলেন ভগবতী। তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র লিখে দিলেন তিনি, শূন্য থেকে সিঁদকাঠি ফেলে দিলেন। বিদ্যার শয়ন মন্দির আর হীরার ঘরে মাটি কেটে সুন্দর একটা পথ তৈরি হলো অন্নদার বরে।

সুন্দর, সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে বিদ্যার আবাসে যায়। আবেশ-রসে হৃদয় তার দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। ওদিকে সহচরী সঙ্গে সুন্দরী বিদ্যা আকুল হয়ে ভাবছে কিভাবে মিলন হবে সুন্দরের সঙ্গে। কর্পূর, তাম্বূল, নাচ, গান সব কিছুই অসহ্য লাগছে। এই ভাবে কাটছে রাত। সহসা সুড়ঙ্গ ভেদ করে সুন্দরের আবির্ভাব। ভয় পেল বিদ্যা। বিদ্যার আজ্ঞায় তার সখী সুলোচনা প্রশ্ন করে, 'দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, নর—কে তুমি? সত্য পরিচয় দাও।' সুন্দর বলে. কেন মিছে ভয় পাচ্ছ? আমি সুন্দর। কাঞ্চী-পুরের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র। হীরা মালিনীর ঘরে থাকি। ভাটের মুখে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে এসেছি নাটক দেখতে। বিচার হবে কি, প্রথমেই, তো অবিচার। আহূত অতিথি এলে বসার জায়গাটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

সুন্দরের উপবেশনের জন্য বিদ্যা সিংহাসন দিতে বলে। সুন্দর বলে, বিদ্যা দেবীর দরবার বড় সুন্দর। সুন্দরী! কাপড়ের ফাঁদে ধরে রেখেছ তুমি বিদ্যুৎ আর আঁচলে ঢাকতে চাও পদ্মের গন্ধ। মাণিকের ছটা কি কাপড় দিয়ে ঢাকা যায়? রতির সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বোঝা যাবে কে হারে, কেইবা জেতে।' বিদ্যা লজ্জায় অধোমুখী।

সখী বলে, 'তুমি কবিবর। তোমার কথার উত্তর দেব—সে সাধ্য আমার নেই।'

বিদ্যা সখীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ওকে বলে দে আমার ঘরে সিঁদ কেটে ও আমার মন চুরি করেছে। চোরের সঙ্গে সাধুজন বিচারে রত হয়না।'

বিয়ে না হলে হয় কেমনে বিহার। তাই গান্ধর্ব বিবাহ সম্পাদিত হলো।

কন্যাকর্তা হলো কন্যা স্বয়ং, বরকর্তা হলো বর। পঞ্চশর হলো পুরোহিত, কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয়জন। পালঙ্কে বসে আছে সুন্দর আর বিদ্যা—দেখে মনে হচ্ছে মদন আর রতি। সখী বাটিভর্তি করে গোলাপ, আতর, চুয়া, কস্তুরি, চন্দন রেখেছে। সোনার থালায় রয়েছে মল্লিকা, মালতী আর চাঁপা ফুলের মালা। ক্ষীর, চিনি, মিছরি, নানা রকম সন্দেশ ইত্যাদির আয়োজনও করা হয়েছে। কর্পূর সুবাসিত শীতল গঙ্গাজল, চামরের বাতাস, মিঠাপানের খিলি, লবঙ্গ, এলাচী কোন কিছুরই অভাব নেই। মুখে মুখে মধুকর মধুকর বধু, গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু। বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচারীরা গান গায়, বাজনা বাজায়। বীণা বাজিয়ে সুন্দর গান গায়। সুর মিলিয়ে বিদ্যাও গাইতে লাগল। দুজনের গানে দুজনে মোহিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। প্রেমরসে এবং কামমদে বিদ্যা-সুন্দরকে মত্ত দেখে সখীরা শরমে-ত্রাসে শয়ন মন্দির পরিত্যাগ করে চলে যায়।

'কামরসে রসিয়া' সুন্দরের 'পরিধানধুতি পড়িছে খসিয়া।' বিদ্যাকে চুম্বন করে সুন্দর, তার কুচপদ্মকলি স্পর্শ করতেই পুলকে শিউরে ওঠে বিদ্যা। সুন্দর তার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করে তাকে নগ্ন করলে বিদ্যা তার প্রিয়ের হাত ধরে বলে, 'নব-যৌবন জোরের যোগ্য নয়। আজ আমায় ক্ষমা কর, কালকে হবে। কামরণে রণ-পণ্ডিত, আমি পীড়িত 'আমায় করুণা কর। তোমার পায়ে পড়ি, আজ আমায় ছাড়। তুমি জোর করছ, আমি লজ্জায় মরে যাই। পুরো ফুল ফুটে উঠলেই পুরো রস পাওয়া যায়—কলিকার দলনে কি লাভ। একান্তই যদি থাকতে না পার—পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু। দেখ আমার স্তনে কি ভাবে তুমি নখের আঁচড় কেটেছ। জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে আর জ্বালা করছে।

সুন্দর বলে, কন্দর্পের পুষ্পশরে আমার সারাদেহে জ্বালা ধরেছে। তুমি পদ্ম আর আমি সূর্য। মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ। তোমার স্তনরূপ শিবলিঙ্গের শিরে আমার নখের আঁচড় চন্দ্রকলার মতো শোভা পাচ্ছে।'

অতঃপর বিদ্যা আর সুন্দর নিবিড় মিলনের স্বর্গসুখ অনুভব করে। হৃদয় মিলে যায় হৃদয়ের সনে। রোমাঞ্চ জাগে নিতম্ব আর জঘনের উরু-কোমল ছোঁয়ায়। 'দংশই দশন দশন মধুরাধর দুই তনু দুহু অবলম্বে।' মিলনের সোনালী আনন্দে সিক্ত হয় উভয়ের দেহ—চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ কোকিল কুহরে গলায়ে।' অবশেষে অলস অবশ হলো

তাদের দেহ। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর অচেতন অঙ্গ চেতনা ফিরে পায়। রসবতী বিদ্যা তার পরিধেয় বস্ত্র পরে অনেক পাওয়ার আনন্দ নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এল। সখীরা সামনে এলে বিদ্যা খুব লজ্জা পেল। লাজে অবনতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।।

বাজার বেসাতি করে হীরা। রন্ধন ভোজন করে কিছুক্ষণ শুয়ে, নানারূপে নানাবেশে সুন্দর নগর ভ্রমণ করে। সন্ন্যাসীর বেশে রাজদর্শনও করে সুন্দর। আর প্রতিরাতে বিদ্যা এবং সুন্দর পারস্পরিক সান্নিধ্য উপভোগ করে—অনুভব করে সঙ্গমের অনির্বচনীয় পুলক। একদিন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে (কামোত্তেজিত নায়ক যখন নায়িকাকে আঘাত করে শ্রান্ত হয়ে পড়ে অথচ তার কামোদ্দীপনা থাকে পুরো মাত্রায় তখন নায়কের ইচ্ছায় বা অনেক সময় নিজের সুতীব্র দেহকামনা চরিতার্থ করার জন্য নায়ককে নীচে রেখে নায়িকা তার ওপরে উঠে সঙ্গমরত হয়—কামশাস্ত্রে একে বলে বিপরীত রতি) মাতল। তার কবরী খসে গেল। 'ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।' কামরস-জলধি উথলে উঠল। অধীর হয়ে সে অধর চাপে। রতিশ্রমে বিদ্যার নরম দেহটা ঘামে ভিজে ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছে সে। মুখে তার শীৎকার ধ্বনি (উদগ্র যৌনসম্ভোগ বাসনায় পীড়িত নায়ক যখন নায়িকাকে আঘাত করে তখন নায়কের আঘাতের প্রত্যুত্তরে নায়িকার রমণকালীন অস্ফুট ধ্বনি)। 'কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে।' অবশেষে রস ক্ষরণ হলো—দেহ তার নেতিয়ে পড়ে। সুন্দর তখন শয্যা ছেড়ে ওঠে। 'আহা মরি' বলে প্রেয়সীর অধর চুম্বন করে।

প্রত্যহ সম্ভোগহেতু তাকে রাত জাগতে হয় সেজন্য নিঝুম দুপুরে দ্বার রুদ্ধ করে বিদ্যা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সখীরা বাইরে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে সুন্দর বিদ্যার শয়ন মন্দিরে উপনীত হলো। প্রমত্ত সুন্দর নিদ্রিতা বিদ্যার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় রত হলো। অলি পদ্মিনী পেলে কি আর ফিরে যেতে চায়। বিদ্যার নিদ্রার ঘোর কাটেনা। 'কামরসে হয়ে ভোর স্বপনবোধে বাড়ে অনুরাগ। নিদ্রার মাঝে যে সুখ পাওয়া যায়, জাগ্রত অবস্থায় কি ততটা সুখ মেলে। রতিরঙ্গ সাঙ্গ হলে সুপ্তোত্থিতা বিদ্যা বাইরে এসে দেখে আকাশে তখনও দপদপ করছে মধ্যাহ্ন সূর্য। ভাবে দিবসে এ কি হলো। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অবশেষে ঘরে সুন্দরকে দেখতে পেয়ে তার খুব রাগ হলো। বলে সে, 'দিনে নিদ্রার ঘোরে আমাকে আলুথালু পেয়ে এই যে

কুকর্মটি করলে এর জন্যে আমি অপমানিত বোধ করছি। নিদারুণ পুরুষের মন। ঘৃণা লজ্জা-দয়া-ধর্মবোধ কিছুই তার নেই।' অতঃপর মান ভাঙানোর চেষ্টা করে সুন্দর।

দিবাসম্ভোগেয় ক্রোধ ছিল বিদ্যার। একদিন সে ভাবে এর শোধ নিতে হবে। দিনের বেলা সুন্দর তার বাসায় ঘুমিয়ে ছিল। বিদ্যা সুড়ঙ্গ পথে তার প্রিয়তমের ঘরে এলো। নিদ্রায় অবশ সুন্দরের কপালে সিঁদুর আর চন্দনের চিহ্ন রেখে চোখে চুমু দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল বিদ্যা। নারীর নরম ছোঁয়ায় সুন্দরের দিবানিদ্রা টুটে গেল, শিহরিত হলো তার শরীর। অতঃপর সে বিদ্যার ঘরে গিয়ে দেখে যে সে খাটে বসে দর্পনে মুখ দেখছে। সুন্দরকে দেখে সস্মিত বিদ্যা বলে, 'প্রিয়তম এস, তোমার কপালে কে আবার সিঁদুর-চন্দন দিল। চোখেতেই বা কে দিল পানের পিক। বিশ্বাস না হয় আরশিতে মুখটি একবার দেখ।' আয়নায় নিজের মুখ দেখে বিস্মিত হলো সুন্দর। বিদ্যা পুনরায় বলে, 'হীরা মালিনীর বাড়ি বুঝি দিনের বেলাতেই আজকাল রাসের অনুষ্ঠান হয়। আমার বুঝি মধু ফুরিয়েছে, আমি এখন বাসি হয়ে গেছি? যে পরনারীর মুখেমুখ দেয়, পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার রুচি হয় তাকে যে স্পর্শ করে সে হয় অশুচি।

সুন্দর বলল, 'প্রিয়ে, কেন আমায় ভৎর্সনা করছ। তোমার সিঁদুর, তোমার চন্দন, তোমার পানের পিকের দাগ লেগেছে আমার। যতদিন বাঁচব ততদিন এ দাগ আর উঠবে না। অবশেষে কলহান্তে উভয় সঙ্গমরত হলো।

প্রভাতে হীরার ঘরে চলে যায় সুন্দর। এইভাবে প্রতি রাতে চলে মিলনানুষ্ঠান। সখীরা জানল বিদ্যা ঋতুমতী হয়েছে।

একদিন বিদ্যা সখীকে বলে, 'আমার একি হলো। লুকিয়ে প্রেম করে কুলকলঙ্কিনী হলাম।' বিদ্যা গর্ভবতী হলো—তার উদররূপ আকাশে সুতরূপ চন্দ্রোদয় হয়েছে। পদ্ম মুখ-মুদলে রজ দূর হয়। 'ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিন দিন উঁচু হচ্ছে, স্তনবৃন্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। বিদ্যার অমন স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রঙ পান্ডুর হলো। সব সময়েই মুখ দিয়ে জল উঠতে লাগল, সুস্বাদু অম্বল খেতে সাধ হয়, ইচ্ছে করে পোড়ামাটি খেতে। বসলে পরে উঠতে আলস্য জাগে। বিদ্যাকে গর্ভবতী দেখে সখীরা কানাকানি করে। পাপ কাজ করলে বেশি দিন তো তা লুকিয়ে রাখা যায় না। দাসীরা স্থির করে রাণীমাকে সব জানানো দরকার।

রাণীমা সব কিছু শুনে বিদ্যার মহলে এলেন। লজ্জায় পেটের দায়ে

কাপড় ঢেকে সে বসে বসে তার মাকে প্রণাম করে। গর্ভের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে রাণী মেয়েকে তিরস্কার করেন। বলেন, 'নিঃশঙ্কিত কুল-কলঙ্কিনী লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এ হেন পাপ কাজ করলি, কলসী-দাঁড় কিনে মরতে পারলি না। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে তোর কলঙ্ক। ছি ছি কত রাজপুত্র এলো তুই বিয়ে করলি না, শেষে চোরের সঙ্গে মিলনে তোর গর্ভ হলো। কত ইচ্ছে ছিল রূপবান, গুণবান এক রাজপুত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে আর আমি রাজার শাশুড়ি হব।'

বিদ্যা বলে, 'মিথ্যেই আমায় গঞ্জনা করছ মা। আমার পেটে গুল্ম হয়েছে, মুখে তাই অবিরত জল উঠছে, দেহে বল নেই। আমার মতো হতভাগিনী রাজনন্দিনী আর কেই বা আছে! বাপ-মায়ে আমার খোঁজ নেবে না, ভালো-বাসবে না তাহলে বেঁচে থাকব কি করে!

ক্রোধান্ধ রাণী চললেন রাজার শয়ন-মন্দিরে। সহচরী চামর দোলাচ্ছিল। বীরসিংহ রায় তখন বৈকালিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করছিলেন। নূপুরের নিক্বনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তিনি দেখলেন রাণী এসেছেন। রাণী বলেন, 'মহারাজ বলতে লজ্জা হচ্ছে—সারা রাজ্য কলংকে ভরে গেল। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে, তার বিয়ের কথা ভাবলে না একবারও। ভালোই হলো। এখন অনায়াসেই নাতির মুখ দেখতে পাবে। কেমন করেই বা এই কুলটা মেয়ের বিয়ে হবে। লোক ধর্মই বা কিভাবে রক্ষিত হবে। সর্বগর্ব আজ খর্ব হলো, মাথা হেঁট হলো। বিদ্যা গর্ভবতী হয়েছে। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিয়ে হলে তার কত ছেলেপিলে হ'তো। ভরা যৌবনের তীব্র কামের জ্বালা আর কত দিনই বা সহ্য করবে সে।'

রাগে কেঁপে ওঠেন রাজা। চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, 'কে আছে রে, আনত কোটালে।' কিল, লাথি আর লাঠির আঘাতে উকীল-কোটালের অবস্থা হলো শোচনীয়। কোটাল' বলল, 'সাত দিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে।'

বিদ্যা সখীদের সঙ্গে রাণীর ঘরে গেল। কোন পথে চোর আসে যায় তার সন্ধানে কোটাল বিদ্যার ঘরে গেল।

শেষে চন্দ্রকেতু আর তার বারোজন সঙ্গীর হাতে ধরা পড়ল সুন্দর।

আনন্দে মেতে উঠল কোটাল আর আক্ষেপ করে সুন্দর। অতঃপর কোটাল সুড়ঙ্গ দর্শন করে।

মালিনীকে সুড়ঙ্গের কাছে নিয়ে আসে কোটাল। হীরা তো অবাক! বুঝল এ সমস্তই সুন্দরের কাজ!

সুন্দর ধরা পড়েছে শুনে দ্বিগুণ হলো বিদ্যার মনোদুঃখ। চোখ তার জলে ভরে ওঠে।

পাত্র-মিত্র-সভাসদ বেষ্টিত রাজা বীরসিংহ বসেছেন সিংহাসনে। সুন্দরকে রাজ সভায় আনা হলো। সুন্দরকে দেখিয়ে হীরাকে প্রশ্ন করা হলো, 'এ কে সত্যি করে বল।' হীরা বলল, 'দক্ষিন দেশে ঘর এর। পড়ো বেশে এসেছিল হেথায়। কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র। ছেলেটি অশেষ গুণ সম্পন্ন, বিচারে পণ্ডিত। বিদ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমাকে মাসী বলে ডাকত, আমিও তাকে নিজের ছেলের মতো দেখতাম। আর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম। দুখিনী মালিনী আমি—কুটিনী পনা জানিনে। কেবল চোরকে আশ্রয় দিয়ে আমি হলাম কুটিনী। রাজামশাই, আপনি ধর্মাবতার। বুঝিয়া বিচার কর উচিত যা হয়।'

সুন্দর বলল, 'বিদ্যালাভের জন্য আমি ঘর ছেড়েছি সন্ন্যাসী হয়ে। তাকে না পেলে মরণই আমার কাম্য। স্বীকার করছি সুড়ঙ্গ কেটে আমি বিদ্যার কাছে যেতাম।' অতঃপর কোটাল সুন্দরকে কেটে ফেলতে গেলে চোখ টিপে রাজা তাকে নিবৃত করেন। সুন্দর পঞ্চাশটি শ্লোক পাঠ করে—

সদ্যসুপ্তোত্থিতা কনক চাঁপার মতো গৌরবর্ণা বিকশিত পদ্মের মতো মুখশ্রী-যুক্তা সুক্ষ্ম রোমরাজি শোভিতা, মদন বিহ্বলা, অলস মন্থরা সেই সুন্দরীকে আজও মনে পড়ছে—যেন সে প্রমাদগুণিত বিদ্যার মতো।

বার বার মনে পড়ছে সে রাতে আমি হাঁচলে অক্ষয়-ক্ষুন্ধা আমার প্রেয়সী জীব জীব—এই মঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করেনি ঠিকই কিন্তু আমার যাতে অমঙ্গল না হয় সেজন্য মঙ্গল পল্লব স্বর্ণালঙ্কারটি কানে পড়েছিল।

শিব আজও কালকূট ত্যাগ করেননি, কূর্ম তার পৃষ্ঠে আজও ধরণীকে ধারণ করে আছে, আজও সাগর সিন্ধুখোটকে মুখনিঃসৃত দুঃসহ বাড়বাগ্নি বহন করছে, ধর্মচারীরা আজও প্রতিপালনে বিরত হন না।

—একে একে সুন্দর স্বরচিত পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করে। কবিতা শুনে পারিষদবর্গ চমৎকৃত হলেন। লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ মুখ নীচু করেন।

মশানে সুন্দর কালীর স্তুতি করে। দেবী তুষ্ট হয়ে সুন্দরকে আশ্বাস দেন—

'তোর রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।'

অবশেষে বীরসিংহ সুন্দরকে নিজপুরে নিয়ে গিয়ে বসন-ভূষণ দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে বিদ্যাকে তার হাতে সমর্পন করলেন।

ধীরে ধীরে অতিবাহিত হলো দশ মাস। শুভ দিনে বিদ্যা পুত্র প্রসব করল। অতঃপর সুন্দর নিজ নিকেতনে যেতে চায়। বিদ্যা বলে, 'আরও দিন কয়েক এখানে কাটিয়ে তারপরে যাব। শুনেছি তোমার দেশের রাইমাই কথা। আর হায় বিধি সে কি দেশ, যে দেশে গঙ্গা নেই!' সুন্দর বলে, 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।' বিদ্যা অনেক করে সুন্দরকে বোঝায় —'কেন যেতে চাইছ প্রিয়তম। এখানেই থেকে যাওনা কেন। এ বড় সুখের জায়গা। বৈশাখে নানা ফুলের গন্ধ বয়ে বাতাস বয়। জ্যৈষ্ঠে অগরু-মল্লিকার ঘ্রাণে হৃদয় নেচে ওঠে। এ সময় আম পাকে। সুধা ফেলে আম খেতে ইচ্ছে হয়। আষাঢ়ের জলভারনত নবীন মেঘ গভীর গর্জন করে। এই বর্ষা বিয়োগীর যম, সংযোগীর প্রাণধন। মেঘের ডাকে প্রণয় কুপিতা প্রিয়তমা ক্রোধ ভুলে প্রিয়তমকে জড়িয়ে ধরে। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণে কোনটা দিন, কোনটা রাত বোঝা যায় না। বিদ্যুতের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ছড়িয়ে পড়ে কুমদ কমলের গন্ধ। ভাদ্রতে দেখবে জলের পরিপাটী। আশ্বিনে অম্বিকা পুজোয় আনন্দের স্রোত বইবে। কার্তিকে কালীপুজা হয়। ক্রমে ক্রমে হিমের প্রকাশ ঘটবে। সে দেশে কি রাস আছে, এ দেশে রাস—উৎসব হয়। অঘ্রাণে নীহার বড় উগ্র। শীতে নতুন সুরস অন্ন দেব, সেই সঙ্গে দেব ঘি আর দৈ। পৌষে দিন ছোট, রাত বড় হয়। বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী। শিশিরে পদ্মবনের দুর্গতি দেখে কষ্ট হয়। এ সময় মুলো ফুলের পুষ্পশর কামী জনের হৃদয় বিদ্ধ করে। বার মাসের মধ্যে ফাল্গুনই হলো বিষম মাস। কোকিলের কুজন, ভ্রমরের গুন্‌গুন আর দখিনা বাতাস কামের আগুন জ্বালে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়ে ওঠে মধুর সময় বড় চৈত্র মধু-মাস। মদন বিলাসে তোমার মনোহরণ করব। আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘরে অনেক তফাত।'

সুন্দর বলে, নিঃসন্দেহেই তোমার যুক্তিগুলো মনোহর কিন্তু শ্বশুরের ঘরেই চল।' রাজা-রাণীর কাছে বিদায় নিয়ে প্রভূত সামগ্রী, দাসদাসী, অগনিত সৈন্য এবং বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর স্বদেশের পথে পাড়ি দেয়। সুন্দরের মোহে অশ্রুনীরে হীরা মালিনীর বসন ভেজে।

স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে সুন্দর গৃহে ফিরে তার বাবা-মাকে প্রণাম করে। রাজা-রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে মহোৎসবে মেতে উঠলেন। রাজা গুণসিন্ধু রায় সুন্দরকে রাজ্যভার সমর্পন করলেন। মহাসমারোহে কালীপুজা করা হলো। সুন্দরের পুজা নিয়ে কালী মূর্তিমতী হয়ে

বললেন 'ওরে তোরা আমার দাসদাসী। শাপভ্রষ্ট হয়ে ভূতলে এসেছিলি ব্রত হেলে পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস।' দেবীকৃপায় বিদ্যা-সুন্দর জ্ঞান চক্ষুতে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। কালীর চরণ ধরে উভয়ে কত কাঁদল। আসলে ওরা মর্ত্যলোকে থাকতে চায় কিন্তু যেতে তাদের হবেই। অবশেষে বাবা মাকে বুঝিয়ে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে দুজনে দেবীর সঙ্গে স্বর্গযাত্রা করেন।

॥ পরিচিতি ॥

ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের (১১১৯-১২৬৭ বঙ্গাব্দ) পিতার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। বর্ধমানের পেঁড়ো গ্রামের জমিদার ছিলেন তিনি।

ভারত চন্দ্রের কৈশোর অতিবাহিত হয় গাজীপুরে তার মাতুলালয়ে। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে কবি স্বনির্বাচিতা পাত্রীকে বিবাহ করায় বাড়ির সকলের বিরাগ ভাজন হন। অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে অবস্থান কালে কবি পারসী ভাষায় নৈপুন্য অর্জন করেন। শব্দকুশলী ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, আর হিন্দী ভাষাও জানতেন।

কবি কিছুকাল বর্ধমানে জমি জমার তত্ত্বাবধান-কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নীলাচলেও ছিলেন তিনি। চন্দননগরে ফরাসীদের রাজত্বকালে দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ন চৌধুরীর বাড়িতেও তিনি বেশ কয়েকদিন ছিলেন। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে কাজ করার সময় ভারত চন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখেছিলেন। ভারত চন্দ্রের অসাধারণ কবিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই 'অন্নদা-মঙ্গলে, বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংযোজিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জলতা তেমনি তাহার কারুকার্য। বীরবলের মতে 'বিদ্যাসুন্দর রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তার অলংকার।,

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে ভারত চন্দ্র যুগরুচির তৃপ্তি সাধনে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। এই কাব্য রূপ যৌবন নিয়ে আদিরসের যে বাড়াবাড়ি সেই সঙ্গে তির্যক বাক চাতুর্য আর অসঙ্গতি জনিত হাস্যরসের ছড়াছড়ি—সে যুগের রাজসভার রুচিবিকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে পাপের ক্ষমা আছে

অনরে দ্য বালজাক

মেসিয়ের ব্রুইন যৌবনকালে ছিলেন উদ্ধত স্বভাবের। লয়ার নদীর তীরে রোসে-করবোঁ-লে-ভুভরয় দুর্গ তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। বাল্যকালে

তিনি যুবতী নারীদের স্তন মর্দন কোরে সুখানুভব কোরতেন। অকারণে গোলমাল সৃষ্টি কোরে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে সকলকে অতিষ্ঠ কোরে তুলতেন। তারপর যখন তিনি সম্পত্তি ও উপাধির অধিকারী হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর উচ্ছৃংখলতার মাত্রাও গেল বেড়ে। সমাজের সজ্জন ব্যক্তিরা এড়িয়ে চলতেন তাঁকে। বন্ধু বোলতে একদল দুর্ধর্ষ উচ্ছৃংখল যুবক। ক্রমেই ফুরিয়ে এল তাঁর সম্পদ। পাওনাদারের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। রোসে-করবোঁ ছাড়া আর কোন স্থাবর সম্পত্তি রইল না তাঁর, তখন ব্রুইন পরিণত হোলেন ঝগড়াটে গুণ্ডায়। তাঁর প্রতিবেশী মারমোস-তিয়ের পাদরী এসব দেখে তাঁকে উপদেশ দিলেন, ত্রানকর্ত্তার জন্মস্থান মুসলমান শত্রুরা অপবিত্র কোরছে, সেই স্থানের পবিত্রতা রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োগ কোরলে ব্রুইন ভালো কোরবেন। কারণ তাতে তাঁর জন্যে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে আর তিনি নিজেও অনেক সম্পদ আহরণ কোরে ধনী হয়ে উঠতে পারবেন।

উপদেশটা ভালো লাগলো ব্রুইনের। তিনি পাদরীর আশীর্বাদ মাথায় কোরে সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা কোরলেন শত্রু নিধনের উদ্দেশ্যে। পাড়া প্রতি-বাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এশিয়া আফ্রিকায় অবিশ্বাসীদের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পযুর্দস্ত কোরে, নিধন কোরে অনেক যশ অর্জন কোরলেন তিনি। প্রকৃত বিশ্বাসী খ্রিস্টান এবং অনুগত যোদ্ধা বোলে তারাও তাঁকে মেনে নিলেন। বিদেশে যথেচ্ছ স্ত্রী সংসর্গ কোরতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। অনেকদিন বাদে ব্রুইন দেশে ফিরলেন সোনা, মণিমুক্তো আর মূল্যবান পাথরের বোঝা নিয়ে। বেশীর ভাগ ক্রুসেডাররা যখন কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় মলিন বেশে ক্রুসেড থেকে বাড়ী ফেরেন সেখানে ব্রুইন-ই একমাত্র ব্যতিক্রম। টিউনিস থেকে ফেরার পর ব্রুইনকে রাজা ফিলিপ কাউন্ট উপাধিতে ভূষিত কোরলেন। দেশের সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল তাঁকে, কারণ মুসলমান শত্রু নিধন করা ছাড়াও যৌবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিজ অর্থ ব্যয় কোরে তিনি কারমে দেসলুজ গীর্জাটি নির্মাণ করিয়ে দেন। পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকে তাঁর ওপর। যৌবনে দুষ্ট প্রকৃতির উচ্ছৃংখল ব্যক্তিটি হয়ে উঠলেন সৎ, সংযমী ও জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে। অবশ্য একথাও সত্যি যে এখন শুধুমাত্র প্রকাশ করা মাত্রই তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়। কারণ তিনি ধনী, একটা বৃহৎ দুর্গাধিপতি এবং রাজসম্মানে বিভূষিত। তা ছাড়াও তাঁর

জমিদারীতে কোন প্রজার কোন রকম অভাব-অভিযোগ ছিল না। শুধুমাত্র কুসীদজীবি ইহুদীদের ওপর তাঁর রাগ ছিল একটু বেশী এবং অজুহাত পেলে তাদের হত্যা করতে তিনি দ্বিধা কোরতেন না।

ব্রুইন তাঁর বর্তমান আচরণের জন্যে সকলেরই প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। লেভান্ড থেকে আনা একটা বিরাটাকৃতি সাদা ঘোড়ায় চেপে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তাঁর জমিদারীতে। প্রয়োজনবোধে দুষ্টের শাসন কোরতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ভয় পেত না তাঁকে।

তাঁর জমিদারীতে ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। এমনকি যে বার লয়ার নদীর বানে দেশ ভেসে গেল সেবারেও মাত্র বাইশ জন ডাকাতের ফাঁসি হয়, আর একজন মাত্র ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়। ইহুদী ভদ্রলোক খুব ধনী ছিলেন বলেই শাস্তি ভোগ কোরতে হয়েছিল তাঁকে।

পরের বছর ফসল কাটার সময় একদল মিশরীয় ভবঘুরে ত্যুরেনে এসে উপস্থিত হোল। এই বেদেরা চুরিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। সেন্ট মার্টিনের গীর্জার বিস্তর ধন সম্পদ চুরি কোরে ওরা মা মেরীর জায়গায় একটা ছোট খুব দুষ্ট. মিশরীয় মেয়েকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। সকলেই এক বাক্যে বোলল মেয়েটাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক। ব্রুইন কিন্তু প্রতিবাদ কোরলেন। তিনি বোললেন পুড়িয়ে না মেরে যদি এই সুযোগে মেয়েটিকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় তাহলেই ঈশ্বর সবচেয়ে খুসী হবেন। এই দীক্ষা দানের অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন এবং ত্যুরেণের একজন কুমারী থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

মিশরীয় মেয়েটি জ্বলন্ত আগুনের থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে কোরল এবং সারাটা জীবন সন্ন্যাসিনী. হয়ে কাটাবার প্রস্তাবেও আপত্তি কোরল না। ব্রুইন তার কুমারী সহকারীনি হিসেবে বেছে নিল আর একজন ক্রুসেডার এ্যাজ-লে-রিডেলের লর্ড সারাসীনদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি কোরে সেই অর্থ মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ্যাজির লেডী তাই এখন নিঃস্ব এবং কপর্দকহীন। এই দুর্দিনে তাঁকে সাহায্য করার জন্যেই ব্রুইন তাঁর কন্যা ব্ল্যান্সের নাম কোরেছিলেন। ব্ল্যান্স সুন্দরী, নিষ্পাপ কুমারী, তাছাড়া সে ভালো নাচতেও পারে।

ব্রুইনের খুব ভালো লেগেছিল এই সতের বছর বয়স্কা কুমারীকে। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী তাঁর দেহে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নিজস্ব

জমিদারী আর দুর্গ আছে, কিন্তু গৃহস্বামিনীর প্রয়োজনে সে স্থির কোরল ব্ল্যান্সকে বিয়ে কোরবে।

ব্ল্যান্স শুধু কুমারীই নয়, তার মনটাও নিষ্পাপ এবং প্রেম সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। মাকে কাঁদিয়ে তাকে যেতে হোল ব্রুইনের সঙ্গে সেণ্ট গ্যাতিয়েনের গীর্জায়। রাস্তার দুধারে অসংখ্য লোক দেখল দামী হীরা মানিক খচিত পোষাক পরা দেবীর মতো এই সুন্দরী কন্যাকে। সেই বিবাহে সর্ব্বআদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর।

মেসিয়ের ব্রুইন জাঁকজমক সহকারে নববধূকে নিয়ে গেলেন নিজের দুর্গে। বৃদ্ধ ব্রুইন সারা দেহে আতর মেখে প্রথানুযায়ী কিশোরী বধূর কপালে চুমু খেলেন, তারপর সুন্দর ধবধবে সাদা বুকে। ব্রুইনের আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ়। তাঁর ধারণা ছিল রতিক্রীড়ায় তিনি দক্ষতা দেখাতে পারবেন। কিন্তু ইন্দ্রিয় শৈথিল্যের জন্য তিনি যখন দেখলেন আর বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় তখন পেছিয়ে গেলেন তিনি। ব্ল্যান্সের এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিবাহ বোলতে তার ধারণায় ছিল জাঁকজমক পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রচুর আহার্য্যের আয়োজন, নাচ গান ইত্যাদি। ব্রুইন অতি সহজেই বুঝে নিলেন তাঁর প্রেমিকা স্ত্রী বিবাহের যথার্থ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তখন তিনি কাজের পরিবর্ত্তে কথায় তাকে বশীভূত কোরতে সুরু কোরলেন। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন তিনি। একই শয্যায় শয়ন কোরে তিনি ভাবলেন মেয়েটি তার অক্ষমতার সুযোগে অন্য উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোরতে পারে, তাই চুম্বন ইত্যাদি দিয়ে তার সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে না তোলার সিদ্ধান্তই নিলেন তিনি। ব্ল্যান্সকে জানিয়েও দিলেন এখন সে জমিদারের স্ত্রী, অতএব সেইরকম গম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা রক্ষা কোরে চলাই তার উচিত।

'তা কেন?' সে বোলল।

'কেন নয়!' মনে মনে ভয় পেয়ে তিনি বোললেন, 'তুমি কি আমার স্ত্রী নও?'

'না', সে উত্তর দিল। 'একটা সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নয়।'

'পথে আসার সময় বিস্তীর্ণ ক্ষেতগুলো দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো সবই তোমার।'

'বাঃ তাহলে আমি ওখানে প্রজাপতি ধরে মজা কোরব।'

'এইতো ভালো মেয়ের মতো কথা। আর জঙ্গলগুলো দেখেছ ?'

'আমি একা জঙ্গলে যেতে পারব না, তোমার সঙ্গে যাব। আচ্ছা, লা পানিউজ অনেক কষ্ট কোরে আমাদের জন্যে যে মদ তৈরী কোরে দিয়েছেন তার একটু দাও না আমাকে।'

'কেন প্রিয়তমা ? ওতে যে তোমার দেহে আগুন জ্বলে উঠবে।

'আমি তো তাই চাই।' বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ে বোলল স্ন্যান্স। 'আমি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি একটা সন্তান উপহার দিতে চাই। মদটা নাকি সেই জন্যেই তৈরী।'

জমিদার মশায় বুঝলেন মেয়েটি আপাদমস্তকে কুমারী। বোললেন, 'আমার ছোট প্রিয়তমা, সে জন্যে যে ঈশ্বরের আশীর্বাদেরও প্রয়োজন। ফসল ফলার উপযুক্ত ভূমিটাই যে প্রথমে তৈরী কোরতে হবে।'

হাসতে হাসতে মেয়েটি বোলল, 'সে রকম ভূমি কখন হবে ?'

'প্রকৃতির যখন ইচ্ছা হবে। হাসতে চেষ্টা কোরে ব্রুইন উত্তর দিলেন।

'আচ্ছা, সে জন্যে আমাদের কি করা দরকার ?'

চিকিৎসা শাস্ত্রে যে বিধান আছে তা খুব বিপদজনক।

'কিন্তু মা যে বললেন কাজটা সহজ।'

'সেটা নির্ভর করে বয়সের ওপর। আচ্ছা, তুমি কি আমার আস্তাবলে খুব বড় সাদা ঘোড়াটাকে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, ঘোড়াটা খুব সুন্দর আর শান্ত।'

'ঘোড়াটা আমি তোমায় দিলাম। যখন খুসী ওটাতে চড়তে পারো তুমি।'

'তুমি খুবভালো লোক। আমাকে সবাই ঐ কথা বোলেছিল।'

এইভাবে কথাবার্তা বলার মধ্যে আর একবার স্ন্যান্স প্রশ্ন কোরল, আচ্ছা তুমি যে বিপদজনক চিকিৎসার কথা বোললে সেটা তাড়াতাড়ি করা যায় না ?

'না' যায় না। তার জন্য প্রথমে আমাদের উভয়কেই ঈশ্বরের করুণা লাভ কোরতে হবে, না হলে যে সন্তান জন্মাবে সে হবে পঙ্গু আর বদ। বেশীর ভাগ বাপ মাই এসব চিন্তা করে না বোলেই পৃথিবীতে এত বাজে লোক জন্মায়।'

'কিন্ত আমি তো জীবনে কোন পাপ করিনি।'

'না, তুমি অবশ্যই নিষ্পাপ, কিন্তু আমি অনেক পাপ কোরেছি জীবনে।'

তারপর তিনি ওর হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে এসে অজস্র চুম্বন এঁকে

দিলেন, আর বিড়বিড় কোরে অনেক ভালোবাসার কথা বোলতে সুরু কোরলেন। ফ্ল্যান্স খুশী হোল।

নাচ গান শেষ হ'তে ফ্ল্যান্স যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তার অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখে কামনার আগুনে জ্বলতে লাগল ব্রুইন। কিন্তু ভগবান তাকে বাদাম খেতে দিয়েছেন তখনই যখন তার দাঁতগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ধরে ফ্ল্যান্সকে নানা অজুহাতে দূরে রাখার চেষ্টা কোরতে লাগল। তিনি ওকে বোঝালেন তাঁর মতো অভিজাত ব্যক্তির ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো হওয়া উচিত নয়। নিজেকে তিনি ব্যস্ত রাখতেন নানা কাজে। ওকেও বোঝাতেন ফেব্রুয়ারী মাসে সন্তান ধারণ কোরতে নেই। মার্চ্চ মাসটায় বড় বেশী কাজ, এপ্রিল মাসটা খুবই খারাপ মাস, সুন্দর ছেলের জন্যে মে মাসটা উপযুক্ত বটে কিন্তু লেডি অফ এ্যাজি ফিরে না এলে তখনও কিছু হওয়া সম্ভব নয় ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ভুল কোরে ওকে একটা বদমাসের ছেলের কথা বোলতে গিয়ে বোলে ফেললেন মা বাপের পাপের ফলেই এরকম ছেলে জন্মায়।

সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যান্স বোলল, আহা তুমি যদি আমাকে একটা বদমায়েস ছেলেও দাও আমি তাকে নিশ্চয় ভালো কোরে তুলতে পারব। দেখবে, তুমিও খুশী হবে তাতে।

কাউন্ট দেখলেন, তাঁর স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। এই সময়ই একবার চেষ্টা কোরে দেখতে হয়! সম্ভব না হলে ওর উত্তেজনা যাতে স্তিমিত হয় তাই কোরতে হবে।

'তুমি কি সত্যিই মা হতে চাও প্রিয়তমা?' তিনি বোললেন, 'তুমি এখনও স্ত্রীর কাজই তো শিখতে পারোনি, এই দুর্গের প্রকৃত গৃহস্বামিনী হয়েও উঠতে পারোনি।'

'গর্ভে সন্তান এলেই সবকিছু শিখে নেব আমি।

অতঃপর ফ্ল্যান্স কয়েকদিন ধরে মাঠে ঘুরে বেড়াল, দৌড়ঝাঁপ কোরল হরিণ আর পাখীর সঙ্গম লক্ষ্য কোরল এবং এইভাবে নিজেকে মা হবার উপযুক্ত কোরে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হলো। এতে তার উত্তেজনা প্রশমিত না হয়ে বেড়েই চোলল দ্রুত গতিতে।

ব্রুইন দেখলেন তিনি নিজেই মস্ত একটা ভুল কোরেছেন। এইবার কি ভাবে চলতে হবে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছুতেই। তিনি ওর

পেছনে দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে পড়তেন, দম বন্ধ হয়ে আসতো তাঁর, কিন্তু কামেন্দ্রিয় থাকতো সেই রকম শিথিল হয়েই।

ব্ল্যান্স তার আকাঙ্খিত সন্তান না পাওয়ার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, সে দ্যাখে পৃথিবীতে সকলেরই সন্তান হয় অথচ তার হয় না যে কেন? মনে মনে ভাবে সন্তান হলে আমি তাকে আদর কোরব, চুমু খাব মানুষ কোরে তুলব। আমাদের বংশ রক্ষা হবে।

এই সব কথা সে বলে কাউন্ট কে। কাউন্ট বলেন, 'তুমি যে এখন খুব ছোট। সন্তান প্রসব করার সময় তোমার মৃত্যু হতে পারে। আচ্ছা এরকম একটা সন্তান কিনে নিলে কেমন হয়? তোমার কোন কষ্ট, কোন যন্ত্রণা হবে না।

আমি তো যন্ত্রণাই চাই। তা না হলে সে তো আর আমাদের নিজস্ব হবে না। আমার নিজের দেহের ফলই চাই আমি। গীর্জায় শুনেছি জ্ঞানকর্ত্তা যীশু মা মেরীর গর্ভের ফল।

তাহলে ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই জানাও।

সেই দিনই ওরা চোলল নরেদাম গীর্জায়। রাজরানীর মতো সুসজ্জিত হয়ে শোভা যাত্রা কোরে মহা সমারোহে ওরা যাচ্ছিল।

একটা চাষীর মেয়ে তখন চলেছিল সেই রাস্তায়। শোভাযাত্রার এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সে জিজ্ঞাসা কোরল, রানী যাচ্ছেন নাকি?

'না, বৃদ্ধাটি উত্তর দিল, ইনি হচ্ছেন রকেরবের গৃহস্বামিনী পোয়াতু এবং তুরেনের জমিদারের স্ত্রী। সন্তান কামনায় ইনি যাচ্ছেন গীর্জায়।

যুবতীটি হাসতে হাসতে বোলল কেন শোভাযাত্রায় প্রথম সারিতেই সুন্দর ঐ পুরুষটি ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন, উনিই তো ওকে একটা সন্তান উপহার দিতে পারেন। তাতে মোমবাতি জ্বালার খরচটা বাঁচবে।

বৃদ্ধাটি উত্তর দিল, ওহে খুকী, নরেদাম গীর্জার সুপুরুষ যুবক পুরোহিতরা যদি সেই সুযোগ নেয় তাতে আমি বিস্মিত হব না। ফলটা খুব শীঘ্রই ফলবে। এই পুরোহিতদের ক্ষমতাও অনেক বেশী।

রাস্তার একটি নবযুবা মন্তব্য কোরল, 'সন্ন্যাসিনীর দিব্যি দ্যাখো, ঐ মসতের কাউন্ট কে, কেমন সুন্দর চেহারা। উনি খুব সহজেই মেয়েদের মন জয় কোরতে পারেন।

সকলেই হাসতে শুরু কোরল, কাউন্ট অফ মসতের ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের ফাঁসিতে লটকে দেন। ব্ল্যান্স বাধা দিল।

স্যার, ওদের শাস্তি দেবেন না। ওটা ওদের মনের কথানয় ; তাছাড়া ফেরার পথে দেখা যাবে ওদের।

সায়ার দ্য মসরত আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখলেন ব্র্যান্সের দিকে, সত্যিই প্রাণবন্ত মেয়ে ; একটুতেই আগুন জ্বালানো যায়।

ব্র্যান্সও দেখলো তাঁকে। সত্যিই সুপুরুষ। বয়স বছর তেইশ হবে। ওকে খুব ভালো লাগলো ব্র্যান্সের। মনে মনে সে ভালোবেসে ফেলল যুবক-টিকে।

নরেদামে পৌঁছে ওরা গেল সেই জায়গাটায় যেখানে সন্তান কামনা কোরে প্রার্থনা জানানো হয়। প্রথানুসারে একাই গেল সে, ব্রুইন এবং অন্য সকলে রইল বাইরে। কাউন্টের যখন পুরোহিতের দেখা পেল সে জিজ্ঞাসা কোরল, সন্তান-হীনা মেয়ে এখানে কিরকম আছে? পুরোহিত মশায় উত্তর দিলেন; এর জন্য দুঃখ করো না মেয়ে, সন্তান জন্মালেই তো গীর্জার আয় হয়।

'আচ্ছা, আমার মতো যুবতী মেয়ে এরকম বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে আসে এখানে?

'খুব কম।'

'তাদের সন্তান হয়?'

পুরোহিত হাসতে হাসতে বোললেন, 'অবশ্যই'।।

'আর যাদের স্বামীরা এরকম বৃদ্ধ নন?'

'কখনও সখনও'।

'ওঃ বুঝেছি, তাহলে জমিদার মশায়ের মতো লোক হলে সন্তান লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে, তাই না?

'নিশ্চয়ই' পুরোহিত মশায় জোর দিয়ে বললেন।

'কেন'?

'মাদাম' 'গম্ভীর হয়ে বোললেন পুরোহিত. 'বয়স কম হলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, আর বেশী হলে মানুষকেই চেষ্টা কোরতে হয়।' ব্র্যান্স দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করার অঙ্গীকার কোরল।

ফেরার পথে ব্রুইন বোললেন, 'তোমাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে'।

'হ্যাঁ, তাই!' সে উত্তর দিল। আমি অবিলম্বেই সন্তান লাভ কোরব ; কারণ যে কেউ আমাকে সাহায্য কোরতে পারে, পুরোহিত মশায় বোলেছেন, গীতিয়ের কে গ্রহণ করতো।

ব্রুইনের ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই ফিরে গিয়ে পুরোহিত কে হত্যা করে. কিন্তু

নিজেকে সংযত কোরল সে এই ভেবে যে তাতে ভয়ানক রকম ক্ষতি হতে পারে, তাই সে ঠিক কোরল আর্চবিশপের সহায়তায় সে জব্দ কোরবে পুরোহিতকে। রোস করবোর প্রাসাদ চুড়া যখন দূরে থেকে দেখা গেল সে সায়ার দ্য মসরতকে আদেশ কোরল সেই খানেই বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে। গতিয়ের কে সরিয়ে দিয়ে ব্রুইন রেনে নামের একটি চোদ্দ বছরের ছোট ছেলে আর একজন পঙ্গু বৃদ্ধকে নিয়োগ কোরলেন ব্র্যান্সকে দেখা শোনা করার কাজে। তাঁর মনে হোল এই ভাবেই তিনি তাঁর পত্নীর পবিত্রতা রক্ষা কোরতে পারবেন।

রোসে করবোর খামার বাড়ীতে আসার পরের রবিবার ব্র্যান্স ব্রুইনকে সঙ্গে না নিয়েই শিকারে বেরিয়ে পোড়ল। লে কারনুজের জঙ্গলের কাছে তার চোখে পোড়ল একজন পুরোহিত একটি মেয়েকে জোর কোরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সে সেখানে পেঁছে তার সঙ্গের লোকদের বোলল, 'দেখো যেন ও মেয়েটিকে মেরে না ফ্যালে।' আরও কাছে এসে সে যা দেখল তাতে তার শিকার করার শখ উবে গেল। মনের অজ্ঞানতার অন্ধকার কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল বুদ্ধির আলো। কুমারীদের কাছে এই জ্ঞান গোপন কোরে রাখা কি ঠিক? ভাবল সে।

রাতে শয্যায় শুয়ে সে বোলল, 'ব্রুইন-তুমি এতদিন আমাকে প্রতারণা কোরেছ। কারনুজের পুরোহিত মেয়েটিকে নিয়ে যা কোরল তোমারও সেইরকম করা উচিত।

বৃদ্ধ ব্রুইন এইরকমই সন্দেহ কোরেছিলেন। তিনি বুঝলেন, এবার দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। ব্র্যান্সের দুচোখ তখন কামনার উত্তাপে জ্বলছে।

শান্ত স্বরে ব্রুইন বোললেন, 'প্রিয়তমা তোমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার সময় আমার ক্ষমতার থেকেও যেটা বেশী ছিল তা হচ্ছে আমার প্রেম। সবচেয়ে দুঃখের কথা আমার যত বল তা আমার হৃদয়ে, এই দুঃখই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যু মুখে। খুব শীগগিরই তুমি মুক্তি পাবে। অন্ততঃ আমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কারো। আমার এই সাদা চুলের সম্মান রাখো তুমি। বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। এই রকম অবস্থায় অনেক লর্ডই তাঁদের স্ত্রীদের হত্যা কোরেছেন।'

'তুমি আমাকে ক্ষমা কোরবে না?'

'নাঃ, তোমাকে আমি অনেক কাছে পেয়েছি। তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সের ফুল, আমার আত্মার আনন্দ। তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না।' বৃদ্ধের চোখে জল এসে গেল।

ব্র্যান্স অভিভূত হয়ে পড়েছিল। থাক্, থাক্, কেঁদোনা। আমি অপেক্ষাই কোরব।

লর্ড ওকে আদর কোরলেন, চুমু খেলেন, অনেক মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিলেন তাকে।

'তুমি আমাকে এত আদর করো কিন্তু তাতে আমার মনে কোন প্রভাব পড়ে না।

ব্রুইন উঠলেন, টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট ছোরা তুলে নিয়ে সেটা ব্র্যান্সের হাতে দিয়ে আবেগভরে বোললেন, প্রিয়তমা আমাকে হয় তুমি হত্যা করো, না হয় আমাকে বিশ্বাস কোরতে দাও যে আমাকে তুমি অন্ততঃ একটুখানি ভালোবাসো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভয় পেয়ে সে বোললে, 'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসতে চেষ্টা কোরব।

বুঝুন, যুবতী মেয়েটি কিভাবে তার বৃদ্ধ দুর্ধর্ষ প্রভুর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার কোরল। রতি দেবীর কি অপার মহিমা। ব্রুইনকে সে প্রায় একটা পোষা গাধায় রূপান্তরিত কোরে ফেলল। তার মুখ থেকে একটা কথা বেরুতেই ব্রুইন তা পালন কোরতো ক্রীতদাসের মতো।

একদিন ব্র্যান্স বোলল, 'প্রিয়তমা ব্রুইন আমার মাথায় মাঝে মাঝে আজেবাজে চিন্তা ভীড় করে আমাকে যেন পুড়িয়ে খাক্ কোরে দেয় সেই চিন্তাগুলো। প্রায়ই আমি কারনুজের সেই সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে দেখি।

ব্রুইন উত্তর দিলেন, 'এগুলো সব শয়তানের খেলা। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা জানেন কিভাবে এরকম প্রলোভনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তুমি ইচ্ছে কোরলে মারমুসতিয়ের পাদরীর কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি কোরতে পারো। তিনি তোমাকে জানিয়ে দেবেন কিভাবে পবিত্র জীবন যাপন কোরতে হয়।

'আমি কালই যাব।'

পরদিনই ব্র্যান্স হাজির সেই মহৎ ব্যক্তিটির কাছে।

'ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন মাদাম। মৃত্যু পথযাত্রী এই বৃদ্ধের কাছে তোমার আসার কারণ?

'সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে সে বোলল, 'আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্যে এসেছি প্রভু। আমি আপনার কাছে পাপ স্বীকার কোরতে চাই।

ব্রুইনের সঙ্গে এই যাজকের একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল। ভণ্ডপাদরী ওকে বোললেন, 'একশটা শীত এই মাথার ওপর দিয়ে কেটে গিয়েছে, তাই

তোমার পাপের কথা শুনতে আমি আপত্তি কোরব না। বল, তোমার স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করার ব্যবস্থা আমি কোরে দেব।

ব্র্যান্স বোলতে সুরু কোরল, সব কথা বলা হলে বোলল, বাবা, আমার যদি একটা সন্তান লাভের ইচ্ছে হয় সেটা কি অন্যায়।

'না' যাজক বোললেন। 'তুমি মনে ধর্ম্মভাব আনার চেষ্টা কোরবে, অন্যায় কাজ কিছু কোরবে না। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সংসর্গে সন্তান সৃষ্টি করা মহাপাপ। তাদের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কোরতে হয় নরকে।

ব্র্যান্স কানটা একটু চুলকে নিয়ে বোলল, তাহলে কুমারী মেরী কি কোরে-ছিলেন ?

'আহা, সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপার।'

'রহস্য আবার কি জিনিষ ?'

'সে জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না। আর যা অসঙ্কোচে বিশ্বাস কোরে নিতে হয়।'

'তাহলে আমার পক্ষে কি এরকম একটা রহস্যের কাজ করা সম্ভব ?'

'এরকম ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছিল। কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।'

'বাবা, তাহলে আমি মারা যাই এইটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যে কিছু নড়াচড়া কোরছে, উত্তেজিত হয়ে পড়ছি আমি, আমার মাথার ঠিক থাকছে না। এমন এক জনকে পেতে চাই আমি যার জন্যে আমি আমার লাজ-লজ্জা সব কিছু বিসর্জন দিতে পারি, দিতে পারি আমার দেহ, মন, প্রাণ।'

'মা, ঈশ্বর আমাদের অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক কোরে সৃষ্টি কোরেছেন, আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়েছেন, স্বর্গ রাজ্যের সৃষ্টি কোরেছেন আমাদের জন্যে। সেই জন্যেই আমাদের কামনা-বাসনাকে জয় কোরতে হবে, উপেক্ষা কোরতে হ'বে ঝড়-ঝাপটাকে। মা মেরীর কাছে প্রার্থনা করো, তিনিই তোমাকে রক্ষা কোরবেন। তুমি সব সময়ে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে চেষ্টা কোরো, কখনও অলস হয়ে কাল কাটাবে না।'

'বাবা, গীর্জায় এলে আমি একমাত্র শিশু যীশুকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।'

'যদি তাই হয় তাহলে তুমি তো সন্ত লিদোয়ারের মতো অনেক উঁচুতে

উঠে গিয়েছ। দারুণ গরমে তিনি একদিন স্বল্প বাসে আবৃত হয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সেই সময় একটা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁকে একটি সন্তান উপহার দেয়। তিনি কিছুই বুঝতেন না, ভাবতেন তাঁর পেট বড় হওয়াটা রোগ। তার জন্যে তিনি প্রায়শ্চিত্ত কোরেছিলেন, এবং লোকটিকে যখন শাস্তি দেওয়া হয় তিনি একটুও বিচলিত হন নি।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমিও বিচলিত হব না।'

তাহলে এটা একটা তুচ্ছ পাপ। আচ্ছা কিভাবে এরকম পাপ করা যায়, ভাবতে ভাবতে ফিরল ব্ল্যান্স। আহা, যদি চাকরটার বয়স বছর পনেরও হোত তা'হলে ওকে নিয়েই আমি শুতে পারতাম।

যাবার সময় সে বার বার তাকিয়ে দেখল রেনের দিকে। ছেলেটা শিশু হ'লেও ওর দেহে উত্তাপ আছে।

রাত্রে যখন আগুনের সামনে বোসে ঐ সব কথা চিন্তা কোরছিল তখন বৃদ্ধ ব্রুইন তাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, 'কিসের কষ্ট তোমার?'

'আমি ভাবছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই খুব অল্প বয়স থেকেই প্রেমের যুদ্ধে মেতে উঠেছিলে তাই এখন একেবারে অকর্মন্য হয়ে পড়েছ তাই না -'

'বৃদ্ধ কাউন্টের পুরনো দিনের কথা মনে পড়তে মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, মাত্র সাড়ে তের বছর বয়সে আমি আমার মার পরিচারিকার লজ্জা ভেঙে দিয়েছিলাম।'

ব্লান্সের আর কিছু শোনার ধৈর্য্য ছিল না। তার যা জানার প্রয়োজন ছিল তা জানা হয়ে গিয়েছে। আনন্দে ভরে উঠল ওর মনটা।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক পরিচারকটির মনে কিভাবে প্রেম জাগিয়ে তুলবে সে সেই চিন্তাতেই মগ্ন রইল কিছুক্ষণ। দুপুরবেলা লর্ড ব্রুইস অভিজাত ব্যক্তিদের অণুকরনে দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকেন। সেই সময়ে ব্লান্স সাধারণতঃ মাঠে একা একা ঘুরে বেড়ায়, দেখে অন্যেরা কি কোরছে। এখন সে স্থির কোরল সেও ঘরে থাকবে আর রেণেকে ডাকবে তাকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়ে শোনাবার জন্য। কথা মাত্রই কাজ। লর্ডের আরামদায়ক কেদারায় হেলান দিয়ে ঝুলন্ত পা দুটো তুলে দিলে একটু অপেক্ষাকৃত নীচু টেবিলের ওপর। পাতলা পরিচ্ছদে আবৃত তার দেহ। যৌবন উছলে পড়ছে সেই দেহে; তার সঙ্গে কামনার আগুন মিশে তাকে কোরে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। রেণেকে এবার ডাকল সে। ছুটে এল ছেলেটি। 'আমাকে কুমারী মেরীর কাহিনী পড়ে শোনাও। আদেশ পালন কোরতে সুরু কোরল রেণে, মাদাম তখন

ঘুমের ভান কোরে চোখের ওপর হাত দিয়ে শুয়ে রয়েছেন। পড়া শেষ কোরে তাকিয়ে দেখল রেণে। ছোট ছোট দুটি সুন্দর পা, নীল রঙের ভেলভেটের জুতোয় ঢাকা। রেণের ইচ্ছে হো'ল সুন্দর পা দুটোতে একটা চুমু খায়; কিন্তু ভয়ে নিজেকে সংযত কোরল সে। ব্ল্যান্স অধীর হ'য়ে উঠল, কিন্তু না রেণে তখন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। পরদিন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। এদিন ব্ল্যান্স আর একটু উঁচু টেবিলে পা দুটো তুলে রেখেছে পরিচ্ছদটা ঝুলে রয়েছে একটু যাতে পায়ের উপরাংশটাও দেখা যায়। রেণে পড়া শুরু কোরল, কিন্তু একটু না পড়তে পড়তেই দেখল মাদাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুন্দর সুগঠিত পা দুটো দেখে তার লোভ হোল। আলতো কোরে চুমু খেল সেই পায়ে। মাদাম জাগলেন না। হাত থেকে বইটা ইচ্ছে কোরেই ফেলল রেণে যদি ঐ শব্দে মাদামের ঘুম ভাঙে। একটু নড়লেন না তিনি। রেণে ভাবল ও'র ঘুমটা খুবই গভীর। এবার সাহস সঞ্চয় কোরে হাঁটুতে একটা চুমু খেল রেণে, তারপর উরুদেশে। একবার উল্লাসে একটু জোরেই বোলে উঠল সে, 'স্বর্গের স্বাদ', কিন্তু ব্ল্যান্সের ঘুম ভাঙল না। আর অগ্রসর না হয়ে সেদিন রেণে থামলো সেখানেই। ব্ল্যান্স একান্ত হতাশ হয়েই ভাবল এই বোকা বাচ্চা ছেলেটিকে কিভাবে সুখের খেলা শেখানো যায়।

পরদিন ভোজের আসরে পরিচারকটি ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ালো। ব্রুইন ও উপস্থিত ছিল সেখানে। রেণে বারকয়েক তাকিয়ে দেখলো মাদামের মুখের দিকে সেখানে রাগ বা বিরক্তির কোন চিহ্নই নেই। বরং তাঁর চোখে আমন্ত্রণের আভাষ। এবার সাহস ফিরে পেলো সে। সেদিন সন্ধ্যায় ব্রুইন অন্যদিন অপেক্ষা বেশীক্ষণ ধরেই তার নিজের ঘরে ছিলেন। রেণে ব্ল্যান্সকে খুঁজতে গিয়ে দেখলো শয়ন কক্ষে ব্ল্যান্স একা ঘুমিয়ে রয়েছে। সেই মধুর সন্ধ্যায় ব্ল্যান্সকে সে তার আকাঙ্খিত মধুর স্বপ্ন দেখাল।

মনের সাধ মিটিয়ে এমনভাবে তারা উপভোগ কোরল সন্ধ্যাটা এবং প্রেমের রস এত প্রচুর পরিমাণে ঢালল রেনে যা একজন কেন কয়েকজন মেয়েই তাতে সন্তান লাভ কোরতে সক্ষম হোত। এই ভাবেই চোলল বেশ কয়েকদিন। রেনে যে শুধু বই পড়তে পারতো তাই নয়, মেয়েদের চোখের ভাষাও সে পড়তে পারতো নিপুণ প্রেমিকের মতো। তাই সব সময়ে ব্ল্যান্সের উত্তেজনা প্রশমিত হোত ঘুমের মধ্যেই।

একদিন রেনেকে ডেকে বোলল ব্র্যান্স, 'জান আমি যে পাপ অর্জন কো:রছি

সেটা মার্জ্জনার যোগ্য কারণ আমি ঘুমিয়ে থাকি, কিন্তু তোমার পাপ মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

'মাদাম' এটা যদি পাপ হয় তাহলে ঈশ্বর এত লোকের পাপ রাখবেন কোথায়?'

ব্ল্যান্স হেসে ফেলল, ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে বোলল, 'চুপ কর্ দুষ্টু ছেলে, ওটা স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার, সেখানে তুই যদি আমার সঙ্গে থাকিস তো আমিও সবসময় থাকব তোর সঙ্গে।'

'আহা, আমার স্বর্গ এইখানেই।'

'এখন যা এখান থেকে। আমার গর্ভে সন্তান এসেছে; আর তা লুকিয়ে রাখা যাবে না।' এখন পুরোহিত মশায় কি বোলবেন' আমার স্বামীই বা কি বোলবেন? রাগের মাথায় উনি তোমায় খুন কোরেও ফেলতে পারেন। আমি বলি কি তুই মারমুসতিয়ের যাজকের কাছে গিয়ে পাপ স্বীকার কোরে আয়।

'আমি যদি আমাদের আনন্দের কথা ওঁকে বলি, তাহলে উনি আমাদের প্রেম একেবারে ঘুচিয়ে দেবেন।'

ঠিক তাই। কিন্তু অন্যজগতে তোর সুখ সে আমার কাছে অনেক মূল্যবান।'

'তোমার কি তাই ইচ্ছা প্রিয়তমা?'

'হ্যাঁ' উত্তর দিলে ব্ল্যান্স।

'বেশ, তাই যাব। কিন্তু তুমি একটু ঘুমাও যাতে আমি তোমাকে বিদায় জানিয়ে যেতে পারি।'

আর একবার স্বর্গসুখ ভোগ কোরে নেবে ওরা।

মারমুসতিয়ের যাজক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তোমার পাপটা ক্ষমার অযোগ্য। তুমি তোমার প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরেছ। এর জন্যে অনন্তকাল ধরে তোমাকে নরক্ ভোগ কোরতে হবে। এখন যাও, তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে ক্রুসেডে যাও, সেখানে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার জন্মভূমি যারা অপবিত্র কোরছে সেই সব অবিশ্বাসীদের হত্যা কোরে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। সেখানে পনের বছর যুদ্ধ কোরলেই স্বর্গরাজ্যের দ্বার আবার উন্মুক্ত হবে তোমার জন্যে।

'কিন্তু প্রভু, মাত্র পনের বছরেই কি যত আনন্দ আমি পেয়েছি তার অবসান হবে?'

'ঈশ্বর দয়াবান। যাও, আর পাপ কোরো না।'

হতভাগ্য রেনে আবার ফিরে এলো রোসে করাবীর দুর্গে। ওর প্রভু পুরোনো অস্ত্রশস্ত্রে শান্ দিচ্ছিলেন। রেনে ওর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বোসল।

'কি ব্যাপার ?'

'প্রভু, আপনার অনুচরদের চলে যেতে বলুন।' অনুচররা বিদায় হলে রেনে সব কথা খুলে বোলল ওকে, কিভাবে সে তার ঘুমন্ত প্রভুপত্নীকে উপভোগ কোরেছে, যার ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে, এবং যাজক তাঁকে যা উপদেশ দিয়েছেন, সব কথাই বোলল সে।

ব্রুইন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তখনই তিনি হত্যা কোরতে যাচ্ছিলেন তাকে, কিন্তু রেনে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি।

এবার ব্ল্যান্স এর সঙ্গে বোঝা পড়ার জন্যে চললেন লর্ড। অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন কোরলেন, কিন্তু ব্ল্যান্সের সঙ্গে তর্কে হেরে গেলেন তিনি।

'গর্ভের মধ্যেই মৃত্যু হোক তোমার অবৈধ সন্তানের আমি অভিশাপ দিচ্ছি—'

'থাম, থাম, আর অভিশাপ দিও না। তুমিই তো বোলেছ আমার কাছ থেকে যা তুমি পাবে তার সব কিছুকেই তুমি ভালোবাসবে।'

ঝগড়া, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ চোখের জল সব কিছুই হোল। লর্ড বোললেন, তিনি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন রাজাকে। কপাল চাপড়ালেন বারবার, কিন্তু ব্ল্যাস নির্বিকার।

'চাকরটা এখন কোথায় ?'

'শয়তান নিয়ে গ্যাছে তাকে।'

'তার মানে, তুমি হত্যা কোরেছ ওকে ?' ব্ল্যান্সের মুখটা কাগজের মতো সাদা হ'য়ে গেল। মূর্চ্ছা গেল সে।

ব্রুইন বুঝতে পারলেন এবার তিনি কি কোরবেন। রেনের সন্ধান করার জন্য লোক পাঠালেন তিনি। রেনে তখন অনেক দূরে। কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তার। ব্রুইন সত্যিই ভালোবেসেছিলেন ব্ল্যান্সকে, তাই তিনি হার মানলেন।

সকলেই জানলো ব্রুইন বৃদ্ধ হ'লেও এখনও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আছে তাঁর। সন্তান যথাসময়ে ভুমিষ্ঠ হোল। সুন্দর মন কেড়ে নেওয়া শিশু। ব্রুইনের সন্তান বোলেই সকলে মেনে নিল তাকে। এর কিছুদিন বাদেই ব্রুইনের মৃত্যু হয়। হঠাৎই।

ব্ল্যান্স এখন একা ছেলেকে নিয়ে দিন কাটাতে থাকে। বিষয় সম্পত্তি

দেখা শোনা করার কাজেও যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করে সে।

পনের বছর পর একদিন এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হো'ল দুর্গে।

ব্র্যান্স তখন ব্যস্ত ছিল অন্য কাজে। সন্ন্যাসীটি ওর ছেলেটিকে উঠোনে দেখে এগিয়ে আসে এবং ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদর কোরে চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ব্র্যান্স যখন ওর কথা শুনলো তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কোরল, কে এসেছিল? সে কোথায় এখন?

অন্যান্য মেয়েরা উত্তর দিল, রাজাটিকে আদর কোরেই তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছেন তিনি।

'আরে সেই তো ওর জন্মদাতা পিতা।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্যান্স ঢলে পোড়ল। সকলেই দেখল প্রাণপাখী ওর দেহের খাঁচাটা ছেড়ে উড়ে গিয়েছে।

দেশময় ধন্য ধন্য পড়ে গেলে এরকম সতীর মহাপ্রয়াণে।

লেখকের জীবনী লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে পড়ুন।

যে প্যা পে র ক মা আ ছে
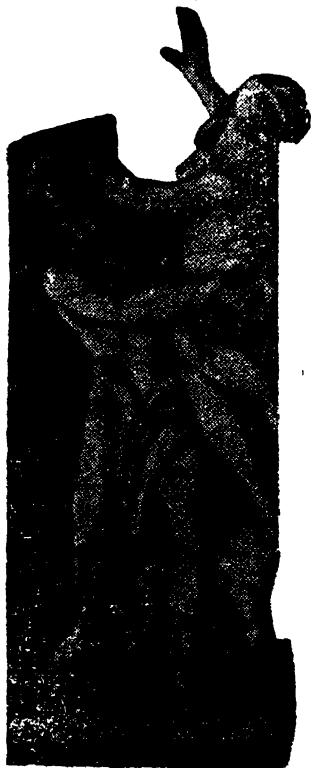
ব্রাজিনার রতিদেবী

গী স্থ মঁপা সা

বেশ কয়েক বছর আগে ব্রাজিনাতে একজন ইহুদি বাস কোরতেন। পাণ্ডিত্য জ্ঞান এবং ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি বোলে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল তেমনই
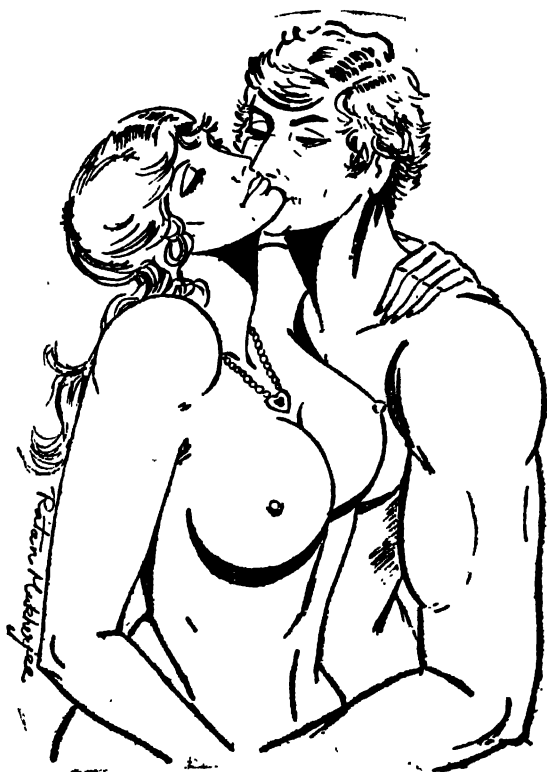
খ্যাতি ছিল তিনি একজন অসাধারণ সুন্দরী মহিলার স্বামী বোলে। ভদ্র-

মহিলাকে সকলে বোলতো ব্রাজিনার ভেনাস। নামের উপযুক্ত সৌন্দর্য্য তাঁর অবশ্যই ছিল, আর তা ছাড়াও তিনি ছিলেন এমন একজন বিখ্যাত দার্শনিকের সহধর্মিনী যিনি ছিলেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণতঃ এইরকম ইহুদী দার্শনিকদের পত্নীরা কুৎসিৎই হয়ে থাকেন।

দার্শনিক প্রবর তাঁর পত্নীভাগ্যের ব্যাখ্যা কোরতেন এই ভাবে যে বিবাহ স্বর্গের সৃষ্টি। কোন বালক যখনই প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে এক স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর কথা জানিয়ে দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অর্থাৎ তারা শুনতে পায় তাদের স্বামীর নাম। কিন্তু যেমন একজন মহৎ পিতা ছেলেদের ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্যে ভালো ভালো জিনিসগুলো বাড়ী থেকে সরিয়ে দিয়ে খারাপ জিনিসগুলোই ছেলেদের ব্যবহারের জন্য রাখেন ঈশ্বরও সেই রকম দার্শনিকদের জন্য এমন স্ত্রী সৃষ্টি কোরে পাঠান যাদের সাধারণ লোক সহজে গ্রহণ কোরতে চাইবে না।

ঈশ্বর কিন্তু আমাদের এই দার্শনিকের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ছিলেন এবং তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোরে দিয়ে ছিলেন এই সৌন্দর্য্যের দেবী ভেনাসকে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে তাঁর প্রবর্তিত নিয়মেরও যে ব্যতিক্রম হয় এবং তিনি তা কোরতে পারেন এই যুক্তটা প্রমাণ করার জন্য ওদের বিবাহের পাত্র পাত্রী নির্বাচিত কোরে ছিলেন।

দার্শনিকের স্ত্রী রাজরানী হয়ে সিংহাসনে বোসলেও বা প্রস্তর মূর্তি হয়ে মিউজিয়ামে থাকলেও বেমানান হোত না। দীর্ঘাঙ্গী, নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্না এই মহিলা সত্যিকারের সুন্দরী বোলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন। তাঁর কালো কালো চোখের দ্যুতি মুগ্ধ কোরতো সকলকেই। সুন্দর হাত দুটি ছিলো যেন হাতির দাঁত থেকে খোদাই করা।

এই মহিমাময়ী ভদ্রমহিলা যেন সকলের ওপর প্রভুত্ব করার পদতলে ক্রীতদাসের মতো মানুষ রাখার চিত্রকরের তুলিতে অঙ্কিত হবার ভাস্করের ছেনিতে রূপ পরিগ্রহ করার এবং কবির কলমে ছন্দবদ্ধ হবার জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেন সযত্নে রক্ষিত একটা বিরল তাজাফুল, সারাটা দিন তিনি দামী লোমের তৈরী পোষাকে আচ্ছাদিত হ'য়ে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে থাকতেন রাস্তার দিকে।

তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। দার্শনিক স্বামী সারাদিন পড়াশোনা আর ঈশ্বর চিন্তা নিয়েই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অবগুণ্ঠিতা সৌন্দর্য্য যাকে ইহুদী দার্শনিকেরা বোলে থাকেন 'কাবালা'। বাড়ীর কোন কাজ কর্ম

তাঁকে কোরতে হোত না কারণ অর্থের অভাব ছিল না তাঁর বাড়ীর সব কিছুই চোলতো দমদেওয়া ঘড়ির মতো। তিনি কখনও বাইরে বেরোতেন না বা কেউ কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা কোরতেও আসতো না। তিনি শুধু বোসে বোসেই স্বপ্ন দেখতেন।

একদিন প্রচণ্ড ঝড়জলের তাণ্ডব লীলার মধ্যে এই ইহুদী ভেনাস যথারীতি লোমের পোষাকে আবৃত হয়ে বোসেছিলেন একটা আরাম কেদারায়। বাড়ীর জানালা দরজাগুলো খোলা ছিল যাতে মেশায়ার প্রবেশে কোন বাধা না ঘটে। গরম পোশাকে আবৃত থাকা সত্ত্বেও উনি কাঁপছিলেন শীতে আর মনে মনে কি একটা চিন্তা কোরছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পোড়ল দার্শনিক প্রবরের ওপর। দার্শনিক তখন দুলে দুলে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ কোরছিলেন।

"আচ্ছা ডেভিডের পুত্র মেশায়া কখন আসবেন বোলতে পারো?"

দার্শনিক উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আসবেন, যখন ইহুদীরা হয় ধর্মপ্রবণ না হয় একেবারে অধার্মিক হয়ে উঠবে, তখন। শাস্ত্রে লেখা আছে তাই।

ভেনাস বোললেন, "তুমি কি বিশ্বাস করো সব ইহুদীই একদিন ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠবে?"

"আমি কি কোরে বোলবো?"

"তাহ'লে, সকলে যেদিন অধার্মিক হয়ে উঠবে সেদিনই মেশায়া আসবেন, কেমন?"

দার্শনিক কাঁধ ঝাঁকালেন তারপর আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন শাস্ত্র পাঠে। সুন্দরী মহিলাটি কথা বন্ধ কোরে আবার স্বপ্নালু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন রাস্তার দিকে। বাইরে তখন প্রচণ্ড বর্ষণ।

একদিন সেই ইহুদি দার্শনিক ধর্মাচরণ সম্পর্কে একটা বিতর্কের সমাধান কোরতে পাশের সহরে গিয়েছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্যাটার সমাধান কোরে ফেললেন তিনি। তাঁর বাড়ী ফেরার কথা ছিল পরদিন সকালে। কিন্তু তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে সেই দিনই সন্ধ্যায় ফিরলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ফিরলেন তাঁরই মতো আর একজন জ্ঞানী বন্ধু। বন্ধুর বাড়ীর কাছে গাড়ী থেকে নেমে বাকী পথটা হেঁটেই চোললেন তিনি। বাড়ীর সামনে এসে তিনি চমকে উঠলেন। জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলোর আভা রাস্তায় ঠিকরে পড়ছে, দরজার সামনে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পরিচারক আরাম কোরে তামাক খাচ্ছে।

"এখানে কি কোরছেন আপনি? বন্ধুর মতোই প্রশ্ন কোরলেন তিনি।" ওঁর কণ্ঠস্বরে অবশ্য কৌতুহলও ছিল।

"ঐ সুন্দরী ইহুদি ভদ্রমহিলার স্বামী হঠাৎ এসে পড়েন কিনা দেখার জন্য আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি।"

"ও তাই। তাহলে ভালো কোরে পাহারা দিন ভাই।"

কথাটা বোলে দার্শনিক ভদ্রলোক চলে যাবার ভান কোরলেন। কিন্তু চলে না গিয়ে বাগানের পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরলেন বাড়ীর ভেতরে। বাইরেকার ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন একটা টেবিলে দুজনের একত্রে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্ভবতঃ আহার সমাধা কোরে ওরা মাত্র কিছুক্ষণ আগেই উঠেছে। শোবার ঘরের জানালার পাশে ওঁর স্ত্রী যথারীতি লোমের পোষাকে আবৃত হয়ে রাস্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ বোসে ছিলেন। ওঁর দিকে তাকাতে তিনি দেখলেন সে চোখে পূর্ণ তৃপ্তি আর ব্যাধের দৃষ্টি। সেই মুহূর্তে ওঁর পাটা মেঝেয় কি একটা জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সেটা তুলে নিয়ে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা কোরে দেখলেন তিনি। একজোড়া অশ্বারোহীর জুতোর কাঁটা।

"তোমার সঙ্গে কে ছিল এখানে? শাস্ত্রবিদ দার্শনিক জিজ্ঞাসা কোরলেন।

ইহুদি রতিদেবী ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকালেন কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে কোরলেন না।

"তাহলে আমিই বলি। হুসারসএর সেনাপতি ছিলেন তোমার কাছে।"

"কেন তাঁর থাকাতে কি হয়েছে? থাকবে নাই বা কেন?" পরিচ্ছদের লোমগুলোয় তাঁর ধবধবে সাদা হাত বুলোতে বুলোতে বোললেন 'তিনি'।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?"

"আমি সচেতনই আছি, জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়নি আমার। উত্তর দিলেন তিনি, তার সারা মুখটা ছেয়ে গেল একটা উদগ্রকামনার হাসিতে। "আমি কি অন্যায় কোরেছি? হতভাগ্য ইহুদিদের মুক্তিদাতা মেশায়া যাতে আসতে পারেন তার জন্য একাজ করাটা আমার কর্তব্য নয় কি?"

VENUS OF BRANIZA : Guy de Maupassant

পরিচিতি

মঁপাসাঃ জন্ম ১৮৫০ মৃত্যু ১৮৯২। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষার সাহিত্যে আজ যে ছোটগল্পের প্রসার ও প্রচার তা অনেক অংশে মঁপাসার অবদান। ছোট গল্পের ছোট ছোট কথা, ব্যাথা ও বেদনা মণ্ডিত আলেখ্য রচনার যে রেওয়াজ বিংশ শতাব্দীতে বহবান তার ফল্গুধারা সৃষ্টিতে যে কয়জন বিশ্ববন্দিত লেখকের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য তার মধ্যে মঁপাসা, চেখভ, কিপলিং, পো ও গোগল অন্যতম। ফরাসী লেখক মঁপাসার জীবনধর্মী সার্থক গল্পগুলি একদা ইউরোপীয় সাহিত্যের নবচেতনার দিগ্‌দর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে শ্লীল ও অশ্লীলের প্রশ্নে মঁপাসার অনেক গল্পই নিঃসন্দেহে বিতর্কিত।

মঁপাসাকে আধুনিক ছোট গল্পের জনক বলা হয়। টুর্গেনিভ, জোলা, ফ্লবার্ট, দোঁদে প্রভৃতির সাহচর্য ও ইংরেজ মেরিমির পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেই তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার ভাস্বর আলোয় ছোটগল্পের দিগন্তকে বিস্তৃত করেন এক স্বকীয় ধারার প্রবর্তনায়।

গঙ্গাফড়িং | এণ্টন চেকভ

অলগা আইভানোভ্‌নার যেখান যতো পরিচিত বন্ধু বান্ধব ছিল সকলেই উপস্থিত হয়েছিল বিয়েতে।

কোন দিক দিয়েই কেউকেটা নয় এই রকম একটা অতি সাধারণ লোককে সে যে কেন বিয়ে কোরতে রাজী হোল সেটা সকলকে বোঝাবার জন্যে সে

বোল্লো, "ওরদিকে তাকিয়ে দ্যাখ, বেহারার পাদব কায়দায় বেশ একটা বিশেষত্ব আছে, তাই না?" স্বামীর দিকে ফিরে তাকালো সে।

ওসিপ ষ্টেপানোভিচ ডিমভ্, মানে, অলগার স্বামী একজন অতি সাধারণ ডাক্তার। দু'দুটো হাসপাতালে কাজ কোরতে হয় তাকে। একটাতে রোগী দেখার কাজ আর একটায় মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের কাজ। সকাল নটা থেকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত আউটডোরে রোগী দ্যাখে সে, মাঝে মাঝে ওয়ার্ডে গিয়েও দেখতে হয় আর বিকেল বেলায় টানা ট্রামে চেপে যেতে হয় আর একটা হাসপাতালে। সেখানে সে, যে সব রোগী মারা গিয়েছে, তাদের পোষ্ট মার্টম করে। প্রাইভেট প্র্যাকটিশে তার আয় হয় বছরে প্রায় পাঁচশ রুবলের মতো। আর তার পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে যাঁরা আছেন সেই বন্ধু বান্ধবদের কেউই সাধারণ লোক নন্। ওঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যাপারে বিশিষ্ট বোলে খ্যাত। যাঁরা এখনো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি তারাও নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে এগিয়ে চোলেছেন। ওঁদের মধ্যে একজন অভিনেতা, যিনি এর মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন কোরেছেন। তাঁর চেহারায় আছে আভিজাত্য, বেশ চালাক এবং প্রত্যুৎপন্নমতি। সুন্দর আবৃত্তি কোরতে পারেন। অলগা আইভানোভ্না কে উনি (শব্দের) উচ্চারণ পদ্ধতি দেখান। আর একজন, সঙ্গীতজ্ঞ, মোটাসোটা কিন্তু রসিক। উনি অলগা আইভানোভ্নাকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাবধান কোরে দিয়েছিলেন যদি অলস না হয়ে একটু পরিশ্রম কোরতো সে, তাহলে একজন নামকরা গায়িকা হবার সম্ভবনা ছিল তার। কিন্তু ঐ অলসতাই সর্বনাশ ডেকে আনছে তার। সেখানে আরও অনেক শিল্পীও ছিলেন। ওদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রিয়াবোভ্স্কি যিনি দুর্বোধ্য ছবি আঁকেন, আস্ত জানোয়ার আর নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবিও আঁকেন ওঁর বয়স মাত্র পঁচিশ, দেখতেও সুন্দর এক কথায় সুপুরুষ বলা চলে। একবার একটা প্রদর্শনীতে ওর ছবিগুলো খুব প্রশংসাপেয়েছিল। সম্প্রতি একটা ছবি পঁচিশ রুবলে বিক্রি হয়েছে। অলগা আইভানোভ্নার একটা ছবিও আঁকছিলেন তিনি, এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। উনি বলেন এই ছবি তাকে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি এনে দেবে। তাছাড়া ওখানে একজন সেলো বাদক ছিলেন যিনি ছড়ি দিয়ে তাঁর বাজনায় কান্নার সুর তুলতে পারতেন। তিনি খোলাখুলিই বোলতেন তাঁর পরিচিত মেয়েদের মধ্যে একমাত্র অলগা আইভানোভ্নাই তাঁর স্ত্রী হবার উপযুক্ত। ওখানে ছিলেন একজন সাহিত্যিক, বয়স অল্প কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ কোরেছেন। উপন্যাস, নাটক ছোট গল্প সবই

লিখছেন তিনি। আর কে ছিলেন' হ্যাঁ, ছিলেন ভ্যাগিলিয়েভিচ। উনি হচ্ছেন একজন ছোটখাটো জমিদার। সখ কোরে বইয়ের ছবি আঁকেন, ছোট ছোট গল্প লেখেন। প্রাচীন রুশ পদ্ধতি আর মহাকাব্যের প্রতি ওঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। কাগজ, চীনামাটির বাসন আর থালা নিয়ে তিনি অনেক রকম কৌশল আর খেলা দেখাতে পারতেন। এই সব সমাজের মধ্যমণি ভাগ্যবান লোকেরা ডাক্তারদের তখনই স্মরণ কোরতেন যখন অসুখ বিসুখ কোরতো তাঁদের। ওঁদের কাছে ডিমভ নামটা আর পাঁচটা সাধারণ নামের-ডিমভকে মনে হচ্ছিল, অতি সাধারণ অপরিচিত এক ক্ষুদ্রব্যক্তি, যদিও সে বেশ ঢেঙা, চওড়া কাঁধওয়ালা সুপুরুষ। তাঁর পরিচ্ছদটা মনে হচ্ছিল যেন অপর কারও জন্যে তৈরী, নিজের কিছু না থাকাতে অপরের কাছে চেয়ে এনে সেটা পরেছে সে। ওর দাড়িটাও, দোকানদারের দাড়ির মতো। অবশ্য যদি সে লেখক বা শিল্পী হোত তাহলে সকলেই এক বাক্যে বোলতো ওর দাড়িটা এমিল জোলার মতো।

অভিনেতা ভদ্রলোক অলগাকে শুনিয়ে বোলল যে তার সুন্দর চুলে আর বিয়ের পোষাকে তাকে যেন বসন্তকালে সুন্দর ফুলে আচ্ছাদিত সুন্দরী চেরী গাছের মতো দেখাচ্ছে।

"না, কিন্তু শোন"। অলগা আইভানোভ্না ওর হাতটা চেপে ধরে বোলল! "ব্যাপারটা ঘটল কি কোরে? আমার কথা শোন, আমার বাবা আর ডিমভ একই হাসপাতালে চাকরী করেন। যখন বাবার খুব অসুখ হয় তখন ডিমভ দিন রাত ধরে বাবার সেবা কোরেছিল। কি রকম আত্মত্যাগ! শোন রিয়াবোভস্কি! আর লেখক তুমিও শোন, শুনতে ভালো লাগবে তোমার। কাছে এস। এই রকম আত্মত্যাগ, এই রকম সহানুভূতি। আমিও রাতে ঘুমোতাম না, বাবার পাশে বোসে থাকতাম আর হঠাৎই একদিন আমি ওর হৃদয় জয় কোরলাম হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার ডিমভ তখন আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ভাগ্যের কি বিচিত্র খেলা। বাবা মারা যাবার পর ডিমভ মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসতো, আমিও মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বাইরে যেতাম তারপর এল প্রস্তাবটা-যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সারাটা রাত ধরে আমি কাঁদলাম। আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তাই আমাদের বিয়ে হোল। ও বেশ বলবান, দেহের গড়নও সুন্দর। এখন ওর মুখটা পুরো দেখা যাচ্ছে না, এদিকে যখন ফিরবে দেখো ওর মুখটা, বিশেষ কোরে

কপালটা। এ রকম কপাল সম্বন্ধে তোমার কি বলার আছে রিয়াবোভস্কি?
ডিমভ এই যে, তোমার সম্বন্ধেই আলোচনা কোরছিলাম আমরা। এখানে এস
রিয়াবোভস্কির দিকে তোমার হাত বাড়াও বন্ধুর মতো—হ্যাঁ, ঠিক হোয়েছে।
এখন তোমরা বন্ধু হলে কেমন?"

ডিমভ্ মুখে হাসি নিয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল,

"আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, "সে বোলল, কলেজে
আমার সঙ্গে একজন রিয়াবোভ্স্কি পোড়তো তার সঙ্গে বোধ হয় আপনার
আত্মীয়তা নেই?"

(২)

অলগা আইভানোভ্না্র বয়স বাইশ, ডিমভের একত্রিশ। বিয়ের পর
ওদের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। অলগা বৈঠকখানার দেওয়ালগুলো
নিজের আর বন্ধুদের আঁকা ছবি দিয়ে ভর্তি কোরে যেন বিশাল পিয়ানোটার
চারদিকে সাজিয়ে রাখল চীনে ছাতা, ইজেল, নানা রং-এর পর্দা, ছোট ছোট
আবক্ষ মূর্ত্তি, ফটো ইত্যাদি। খাবার ঘরটা সাজানো সস্তা রঙিন ছিট দিয়ে।
শোবার ঘরের ছাদ ও দেওয়ালগুলো সে ঢাকানো গাঢ় রং এর কাপড় দিয়ে
যাতে সেটাকে দেখতে মনে হয় একটা গুহার মতো, বিছানার ওপর একটা
রঙীন লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল আর দরজার সামনে স্থাপন কোরল কোট হাতে
একটা মূর্ত্তি, সকলেই বোলতো ওরা স্বামী স্ত্রীতে একটা ভালো আরামদায়ক
বাসা বেঁধেছে।

অলগা আইভানোভ্না রোজ এগারোটায় উঠতো, পিয়ানো বাজাতো আর
যদি দিনটায় রোজ থাকতো তো, তেল রং-এর ছবি আঁকতো। বারটার পর
সে যেতো পোষাক তৈরীর দোকানে। তার অভিমতের অর্থসংস্থান বিশেষ
ছিল না, কায়ক্লেশে দিন চোলতো ওদের আর তাকে নিত্য নতুন পোষাকে
লোকের সঙ্গে দেখা কোরতে হতো ও যাতে তাকে কেউ হতভাগী বোলে ভাবতে
না পারে। সেই পোষাকের দোকানের মালিক আর সে দুজনে মিলে নানা
রকম চতুর উপায় বার কোরতো। প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন পোষাক তৈরী
হতো আশ্চর্য উপায়ে। কখনো পুরোনো রং-করা নতুন ফ্রক থেকে, কখনও
বা টুকরো কাপড় আর লেস থেকে। পোষাকের দোকান থেকে অলগা

আইভানোভ্‌না সাধারণতঃ যেতো তার এক অভিনেত্রী বন্ধুর কাছে। অথবা সে চেষ্টা কোরতো অভিনয়ের প্রথম রাতের টিকিট যোগাড় কোরতে, অথবা কারও সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ কোরতে। অভিনেত্রীর কাছে কি দেয় নিয়ে সে যেতো একজন চিত্রকরের স্টুডিয়োতে অথবা কোন ছবির প্রদর্শনীতে। তারপর সে কোন একজন সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ কোরতে না হয় নিমন্ত্রন জানাতে যেতো। কখনও কখনও শুধু গল্প কোরে সময় কাটাবার জন্যও এই রকম লোকের বাড়ীতে যেতো সে। সর্ব্বত্রই সে সমাদর পেতো, সকলেই একবাক্যে বোলতো অলগা একটি সাধারণ মেয়ে। সমাজের বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা তাকে নিজেদের সমকক্ষ বোলেই মনে কোরতো; আর বোলতো তার গুণের জন্যে সে একদিন না একদিন মহিয়সী মহিলা হয়ে উঠবে, সমাজে তার স্থান হবে অনেক ওপরে। অবশ্য যদি সে নানা কাজে নিজেকে নিযুক্ত কোরে এইভাবে নিজের প্রতিভা নষ্ট না কোরে ফ্যালে! যে কাজই সে কোরতো তা সে লণ্ঠন তৈরী করা হোক, পোষাক পরাই হোক বা কারো টাই বেঁধে দেওয়া হোক, সব তাতেই যেন দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া থেকে থাকতো। সে গান গাইতো, পিয়ানো বাজাতো, ছবি আঁকতো, মাটির পুতুল গড়তো, অপেশাদার অভিনেত্রী হয়ে অভিনয় কোরতো। আর যাই করুক না কেন, তাতে থাকতো নিজস্ব প্রতিভার ছাপ। কিন্তু সব কিছুর থেকে বেশী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেতো যে কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ক্ষমতায়। যে মুহূর্ত্তে কোন ব্যক্তি একটু খ্যাতি লাভ কোরতেন সে এগিয়ে যেতো তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরতে। দেখা যেতো খ্যাতিমান ব্যক্তিটি তার আমন্ত্রন গ্রহণ কোরেছেন। খ্যাতির উপাসক ছিল সে, সেই জন্যই দেখা যেতো পুরোনো বন্ধুরা যারা যাচ্ছেন, তার জায়গায় আসছেন নতুন নতুন ব্যক্তি আবার তাঁরাও যখন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছেন তখন আসছেন আর একজন নতুন। কিন্তু কেন?

বেলা চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে স্বামীর সঙ্গে একত্রে বোসে তার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন কোরতো। ডিমভের সরলতা, সাধারণ বুদ্ধি এবং সুরসিকের ভদ্র রসিকতার স্বামীর প্রতি তার অনুরাগ ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল। প্রায়ই সে লাফিয়ে উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধরে মুখে চুম্বন বর্ষণ কোরতো।

"ডিমভ সত্যিই তুমি একটা জ্ঞানী উঁচুমনওয়ালা লোক; সে আস্তে আস্তে বোলতো।" কিন্তু তোমার একটা দোষও আছে, শিল্পের প্রতি কোন

অনুরাগ নেই তোমার। গান বাজনা আর ছবি আঁকায় তোমার একটুও উৎসাহ নেই।

"সত্যি, আমি বুঝি না ওসব। সারাজীবন ধরেই আমি বিজ্ঞান আর ওষুধ পত্র নিয়েই আছি, শিল্পের দিকে মন দেবার মতো সময়ই পাই নি আমি।"

"কিন্তু সেটা যে মারাত্মক ডিমভ।"

"কেন?" তোমার বন্ধুরা তো কেউ প্রকৃতি বিজ্ঞান বা ওষুধের কিছুই জানে না, তাতে কি কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? আমিও তেমনি নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি বা অভিনয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। জিনিসটাকে আমি দেখি এই ভাবে বুদ্ধিমান লোক তাদের সারাজীবনটা উৎসর্গ কোরবে সে কাজে অন্য বুদ্ধিমান লোক প্রচুর অর্থব্যয় কোরবে সেগুলোর জন্যে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি অবজ্ঞা করি তাদের।"

"তোমার সাধু হাতটা আমাকে একটু চেপে ধরতে দাও।"

মধ্যাহ্ন ভোজের পর অলগা আইভানোভ্না বেরুতো। কখনও কখনও সে যেতো থিয়েটার দেখতে বা গান শুনতে, মধ্যরাত্রের আগে বাড়ী ফিরতো না। এইভাবেই চোলতা প্রতিদিন দিন।

বুধবার সন্ধ্যায় সে বাড়ীতেই ব্যস্ত থাকতো অতিথিদের সঙ্গে! বুধবার সন্ধ্যায় সাধারণতঃ তাস খেলা বা নাচ থাকতো না। সবাই শিল্প বিষয়ক আলোচনায় ব্যস্ত থাকতো। খ্যাতিমান অভিনেতা আবৃত্তি কোরতেন, গায়ক গান কোরতেন, শিল্পীরা অলগার অসংখ্য এ্যালবামে ছবি এঁকে দিতেন, সেখো বাদক মেলো বাজাতেন, আর বিনয়ী গৃহস্বামিনী ছবি আঁকতেন, পুতুল তৈরী কোরতেন, গাইতেন আবার কখনও কখনও পিয়ানো বাজাতেন। ওরই মধ্যে তাঁরা সাহিত্য শিল্প, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তর্কবিতর্ক জুড়তেন। অলগা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত থাকতেন না কারণ অলগার বিশ্বাস একমাত্র অভিনেত্রী আর পোষাকের ডিজাইন যারা তৈরী করেন তাঁরা ছাড়া বাকী সব মেয়েই একেবারে একঘেয়ে। এমন একটাও বুধবার যেতো না যেদিন গৃহস্বামিনী প্রত্যেকবার দরজায় ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে না বোলতেন, "এই যে উনি এসে গ্যাছেন!" এই সর্ট নামটার ব্যবহার নতুন পরিচিত কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি সম্পর্কে। ডিমভ্ কখনও বৈঠকখানায় থাকতেন না, কেউ ভাবতোও না তাঁর কথা। কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার ঘরের দরজাটা খুলে যেতো

আর ডিমভ্ হাসিমুখে হাত ঘষতে ঘষতে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বোলতো, "আসুন আপনারা খাবেন আসুন!"

প্রত্যেকেই সারিবদ্ধ হয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ কোরতেন, আর লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন খাদ্যদ্রব্যগুলো। ঝিনুক, শুয়োরের মাংস, বাছুরের মাংস, সার্ডিন, চীজ্, ক্যাডিয়ের, দুব্রাক, ভদকা ছাড়াও আরও কয়েক রকম মদ, লোভনীয় খাদ্য পানীয়ের আয়োজন।

অলগা আইভানোভ্না, আনন্দে উপস্থিত হয়ে বোলত, তুমি সত্যিই অপূর্ব ডিমভ্! দেখেছেন আপনারা কতো আয়োজন করেছেন উনি, ওঁর কপালটার দিকেও তাকিয়ে দেখুন। ডিমভ্ এদিকে মুখটা ফেরাও তুমি! দেখুন মুখটা কেমন সুন্দর বাঘের মতো, অথচ ভাবটা একেবারে নিরীহ হরিণের মতো মিষ্টি!"

অতিথিরা আহার কোরতেন আর ডিমভ্কে দেখে ভাবতেন — "কি সুন্দর মানুষ!" তাঁদের গান বাজনা শিল্প, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাও চোলতো খাবার সময়।

এই অল্পবয়সী দম্পতির জীবন কাটতো বেশ সুখেই। অবশ্য ওদের হনিমুনের তৃতীয় সপ্তাহটা ভালো কাটেনি কারণ তখন ডিমভ্ ইরিসিপ্রাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং পুরো দুটোদিন তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল, চুলগুলো কাটতে হয়েছিল ছোট ছোট কোরে। অলগা কান্নাভেজা চোখে অবশ্য বরাবরই থাকতো তার শয্যার পাশে। যখন একটু ভালো হ'য়ে উঠল সে তখন অলগার মাথায় একটা রুমাল বেঁধে দিয়ে ওর ছবি আঁকলো। ছবিটা ঠিক একজন বেদুইনের মতো। দুজনেই খুব হাসাহাসি কোরেছিল ছবিটা নিয়ে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার তিনদিন পর থেকে সে আবার যথারীতি হাসপাতালে বেরুতে সুরু কোরছিল। এবার একটা নতুন দুর্ভাগ্যের সূচনা হোল ওদের জীবনে।

খেতে বোসে একদিন বোলল সে, "আমার ভাগ্যটাই খারাপ প্রিয়া। আজ চারটে পোস্টমর্টেম কেস ছিল, আমার নিজের দুটো আঙ্গুল যে কেটে গেছে তা বাড়ী ফেরার আগে বুঝতে পারিনি আমি।"

অলগা আইভানোভনা ভয় পেয়ে গেল। অবশ্য সে ওকে সান্তনা দেবার জন্যে বোলল, ওটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। পোস্টমর্টেম করবার সময় সে তো প্রায় আঙ্গুল কেটে বসে।

"আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম। চিন্তাটা আমাকে একেবারে অভিভূত

কোরে ফেলেছিল।"

অলগা আইভানোভ্না রক্ত দূষিত হয় কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রত্যেক দিন রাত্রে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতো যাতে কোন ক্ষতি না হয়। ক্ষতি সত্যিই হোলনা, ক্ষতটা শুকিয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যেই। ওরা ফিরে পেলো ওদের সুখী জীবন। সময়টা এখন খুব ভালো। অল্পদিনের মধ্যেই আসছে বসন্ত, সুখের দিন। এপ্রিল, মে আর জুন মাসটা ওরা কাটাবে মস্কো থেকে অনেক দূরে একটা গ্রামে। সেখানে ওরা বেড়িয়ে বেড়াবে, ছবি আঁকবে, মাছ ধরবে, আরও কত কিছু কোরবে। জুলাই থেকে শরতের শেষ পর্যন্ত ওরা ভল্‌গা নদীর তীরে আনন্দের হাট বসাবে। অলগা আইভানোভ্না ওদের স্থায়ী সভ্য সুতরাং ওকে অংশ গ্রহণ কোরতেই হ'বে। ইতি মধ্যেই ও দুটো বেড়াবার পোষাক বানিয়ে নিয়েছে, রং তুলি, ক্যানভাস ইত্যাদি ছবি আঁকার সরঞ্জামও কিনে ফেলেছে। রিয়াবোভ্‌স্কি নিয়মিত এসে দেখে যায় ওর ছবি আঁকা। বলে "বেশ ভালোই হ'য়েছে, মেঘগুলো যেন চিৎকার কোরে কাঁদছে, হ্যাঁ ওটা ঠিক গোধূলির আলো হয়নি। এর পশ্চাদপটটা ঠিক হয়নি! এদিকটা, একটু গাঢ় রং দাও। মোটামুটি ভালোই হয়েছে। সত্যিই খুসী হয়েছি আমি।

ওর কথাবার্ত্তাগুলো ধোয়াটে হলেও অলগা বোঝে ও কি বোলতে চায়।

(৩)

সোমবার বিকালে ডিমভ্ অনেক কেক এবং আরও অনেক রকম সুখাদ্য নিয়ে ফিরলো। ওগুলো সে গ্রামে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে। এক পক্ষেরও বেশী ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, খুব খারাপ লাগছিল তার। রেলগাড়ীতে বোসে এবং তার পরও গ্রামের বাড়ীটা খুঁজতে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর খুব ক্ষিদে পাচ্ছিল। ও তখন মনে মনে স্বপ্ন দেখছে স্ত্রীর সঙ্গে বোসে অলস ভঙ্গীতে ওরা একত্রে যাচ্ছে, তারপর খাওয়া শেষে ওরা বিছানায় শুতে যাচ্ছে। হাতের খাবারের প্যাকেটটা ওর মনে আনন্দের সঞ্চার কোরল। ওতে ছিল ক্যাভিয়ার চীজ আর রান্না করা মাছ।

বাড়ীটা যখন খুঁজে বার কোরল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। বয়স্ক পরিচারকটি জানাল যে গৃহকর্ত্রী এখন বাড়ী নেই, তবে সম্ভবতঃ অল্প ক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। কুটীরটা অতি সাধারণ, ছাদটা নীচু, দেওয়াল-গুলোয় আজে বাজে কাগজ আঁটা, মেঝেটা অসমান মাঝে মাঝে গর্ত্ত হয়ে

গিয়েছে, ঘর মোট মাট তিনটে। একটা ঘরে বিছানা পাতা, পরের ঘরটায় ছবি আঁকার সাজ সরঞ্জাম, পুরুষের জামাও টুপি, ছড়ানো রয়েছে চেয়ারে জানালার তাকে আরও এদিক ওদিকে। তৃতীয় ঘরটায় ডিমভ দেখল তিনজন অপরিচিত ব্যাক্তি বোসে রয়েছেন। দুজনের গায়ের রং বেশ ময়লা দাড়ি আছে, তৃতীয় জনের দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো চেহারাটাও বেশ মোটা-সোটা, দেখে মনে হয় অভিনেতা। টেবিলের ওপর রাখা সামোভারটায় চা ফুটছে।

ডিমভের দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভিনেতা ভদ্রলোক বোললেন, "কি চাই? অলগা আইভানোভ্নার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছেন? একটু অপেক্ষা করুন, সে এখনই এসে পড়বে।"

ডিমভ বোসল। অপেক্ষা কোরতে লাগল। ময়লা লোক দুটির মধ্যে একজন যেন ঝিমুতে ঝিমুতে খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে বোললেন, "চা চলবে?"

ডিমভের ক্ষিদে পেয়েছিল যেমন তেমনি তৃষ্ণার্ত্তও হয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু পাছে ক্ষিদে মরে যায় সেই জন্য চা-টা প্রত্যাখ্যান কোরলো সে। অল্প-ক্ষণ পরেই পায়ের আর পরিচিত হাসির শব্দটা শোনা গেল। দরজাটা শব্দ কোরে খুলে গেল আর একটা বাক্স হাতে নিয়ে চওড়া কানওয়ালা টুপি পরে অলগা আইভানোভ্না ঘরে ঢুকলো। ওর পেছনে পেছনে একটা বড় ছাতা, একটা ভাঁজ করা টুল হাতে, হাসিমুখে ঢুকলো রিয়াবোভ্স্কি।

"ডিমভ!" অলগা আইভানোভ্না আনন্দে অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওর বুকে মাথা রেখে অলগা এবার একটু মৃদুকণ্ঠে বোলল, "ডিমভ্ তুমি। এতদিন তুমি আসোনি কেন? কেন? কেন?

"সময় কোথায় পেলাম প্রিয়া? আমি তো সব সময়ই ব্যস্ত। যখন একটু সময় কোরতে পারি দেখি ট্রেন নেই।"

"ও, তোমাকে পেয়ে কি আনন্দই না হচ্ছে। সারা রাত ধরে আমি শুধু তোমাকে স্বপ্ন দেখি। তোমার অসুখ বিসুখ কিছু হ'য়েছে ভেবে খুব দুর্ভাবনা হয়েছিল। তুমি যদি জানতে আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি। তুমি যে এসে গ্যাছ তাতে যে কি আনন্দ হচেছ আমার। তুমি আমার ত্রাণ-কর্ত্তা। একমাত্র তুমিই আমাকে রক্ষা কোরতে পারো। এখানে একটা দারুণ বিয়ে আছে কাল হাসতে হাসতে স্বামীর গলার টাইটা আবার ভালো কোরে বেঁধে দিয়ে সে বোলে চোলল, "ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটারের বিয়ে, ওর

নাম হচ্ছে সিকেলডিয়েভ। বেশ সুন্দর দেখতে ছেলেটিকে, একটুও বোকা নয়, বেশ মজবুদ শরীর, মুখের ভাবটা ভালুকের মতো দৃঢ়। যৌবনের প্রতীক হিসাবে ওর ছবি যা হবে, তা তোমাকে বুঝিয়ে বোলতে পারব না। সারাটা গ্রীষ্মকাল ওকে নিয়ে কাটিয়েছি আমরা! কথা দিয়েছি ওর বিয়েতে আমরা সকলেই যাব। ও অবশ্য খুবই গরীব আর লাজুক, কিন্তু তাই বোলে আমরা তো ওকে অবহেলা কোরতে পারি না। মনে হয় গীর্জায় উপাসনার পরই ওদের বিয়ে হবে, তাহলে আমরা গীর্জা থেকে সোজা কনের বাড়ী যেতে পারব…। ঘন কুঞ্জবন, পাখীর গান, ঘাসের ওপর পড়া সূর্য্যের আলো আর পেছনে সবুজ পশ্চাৎপট একেবারে ফরাসী চিত্রকরের আঁকা ছবির মতো। কিন্তু ডিমভ্ গীর্জায় আমি কি পোষাক পরে যাব?' অলগা আইভানোভ্না পুতুলের মতো মুখ কোরে বোলল। "এখানে আমার কিছুই নেই, সত্যিই! পোষাক নেই, ফুল নেই, দস্তানা নেই। তোমাকে এ যাত্রায় আমার সম্মান রাখতেই হবে। আমার চাবিটা নিয়ে তুমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে এস প্রিয়তম। আলমারী থেকে আমার লাল পোষাকটা নিয়ে এস গিয়ে। তুমি তো দেখেছো ওটা একেবারে সামনেই ঝোলানো আছে আর আমাদের ছবি আঁকার ঘরে দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্স দেখতে পাবে। ওপরকার বাক্সটায় দেখবে শুধু আছে বাজে-কাগজ পত্র আর নীচে আছে ফুল। ফুলগুলো খুব সাবধানে নিয়ে আসবে কিন্তু। ওগুলো থেকে আমি দু' একটা বেছে নেব। আর আমার জন্যে এক জোড়া দস্তানা কিনে এনো।'

"বেশ তাই হবে। আমি কাল ফিরে গিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দেব!' ডিমভ্ বোল্‌ল।

,'কাল?" অলগা আইভানোভ্না কঠোর দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। "কাল নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে পেঁছতে পারবে না তুমি, প্রথম ট্রেনটা কাল সকাল নটায় ছাড়বে, আর বিয়ে হচ্ছে এগারটায়। না, প্রিয়, তোমাকে আজই যেতে হবে হ্যাঁ আজই। যদি কাল তুমি নিজে আসতে না পারো তাহলে কাউকে দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিও। এখন তাড়াতাড়ি যাও… ট্রেনের সময় হয়ে এল। দেরী কোরো না প্রিয়।"

"ঠিক আছে।"

"তোমাকে যেতে দিতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।" অলগা আইভানোভ্না চোখে জল এনে বোল্‌ল। "টেলিগ্রাফ অপারেটারকে কথা দিয়ে কি বোকামিই না কোরেছি আমি।"

ডিমভ্ এক গ্লাস চা আর একটা বিস্কুট খেয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালো। তার আনা ক্যাভিয়ের চীজ আর রান্না করা মাছ, ভোগে লাগলো ঐ ময়লা লোক দুটো আর মোটা অভিনেতার।

(৪)

জুলাই মাসের রাত। চাঁদের আলোয় ফুটফুট কোরছে চারিদিক। অলগা আইভানোভ্না ভলগা নদীতে একটা চলমান স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়েছিল। একবার সে দেখছে জলের দিকে আর একবার নদী তীরের সুন্দর দৃশ্যটার দিকে। ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল রিয়াবোভ্স্কি। ওকে বোঝাচ্ছিল জলের ওপর কালো ছায়াটা ছায়া নয়, একটা স্বপ্ন। এই মধুর স্বপ্নের মধ্যে মৃত্যু হ'লে অনন্ত সুখ। অতীতটাতো তুচ্ছ, ভবিষ্যৎটা ফাঁকা এমন কি এই মধুর রাত্রিটারও অবসান ঘটবে একসময়, অনন্ত কালের একটা অংশ মাত্র হয়ে থাকবে এটা—তা'হলে কি চাইবে? বাঁচতে?

অলগা আইভানোভ্না একবার রিয়াবোভ্স্কির কথা শুনছে আর একবার নিস্তব্ধ রাতের ভাষা শোনার চেষ্টা কোরছে। মনে মনে সে ভাবছে সে অমর, কখনই মরবে না। নদীর স্বচ্ছ জল, আকাশ, নদীর তীর, কালো ছায়া সবকিছুই মুগ্ধ কোরে তুলছে তাকে, তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্ছে। সবকিছুই যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সে একদিন একজন বিরাট শিল্পী হয়ে উঠবে, সকলের ভালোবাসা অর্জন কোরবে সে। সে ভাবল, তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে সে একজন মহান পুরুষ, একজন প্রকৃত প্রতিভাবান ঈশ্বর নির্ব্বাচিত ব্যক্তি। এযাবৎ যা কোরেছে সে তা সত্যিই বিস্ময়কর, অসাধারণ, আর ভবিষ্যতে আরও অনক বিস্ময়কর জিনিস সৃষ্টি কোরবে সে। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় তা। ওকে দেখতেও সুপুরুষ, কোন বন্ধন নেই ওর, পাখীর মতো মুক্ত জীবন।

"বেশ ঠান্ডা লাগছে।" আইভানোভ্না কাঁপতে কাঁপতে বোল্‌ল।

রিয়াবোভ্স্কি ওর গায়ে তার নিজের কোটটা চাপিয়ে দিয়ে বোল্‌ল:

"আমি এখন তোমার ক্রীতদাস। আজকে তোমাকে এত ভাল লাগছে কেন বোলতে পার?"

সারাক্ষণই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। তার চোখের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি দেখে ওর দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল অলগা।

"আমি তোমার প্রেমে পাগল হ'য়ে উঠেছি..." রিয়াবোভস্কি ফিস ফিস

কোরে বোলল। অলগার গালে ওর গরম নিশ্বাসের স্পর্শ পেল। তুমি একবার বল কথাটা, আমি আর বাঁচতেও চাইব না। চুলোয় যাক তোমার শিল্প, শুধু বলো 'তুমি আমায় ভালোবাসো।"

অলগা আইভানোভনা চোখ বন্ধ কোরে বোলল, "ওকথা বোলনা। বড় ভয়ানক কথা। ডিমভের কি হবে?"

"ডিমভ্? তাতে কি এসে বয়ে যায়? ডিমভের সঙ্গে আমাদের প্রেমের কি সম্পর্ক? এই অলগা, এই চাঁদনি রাত, সৌন্দর্য্য, আমার প্রেম, আবেগ, না, ডিমভ্ নয়··না, ও কিছু নয়—আমার অতীতের কথা, ভাবার কোন দরকার নেই, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্যে তুমি আমার হও শুধু আমার!"

অলগা আইভানোভনার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কোরতে লাগলো। তার স্বামীর কথা চিন্তা কোরতে চেষ্টা কোরল সে, ওদের বিয়ের কথা, ডিমভের কথা, বুধবারের সন্ধ্যাগুলোর কথা। সবই মনে হোল অনেক দূরের, কোন্ ফেলে আসা অতীতের কাহিনী। ডিমভ্ বোললে সত্যি কেউ আছে, না সবই স্বপ্ন।

"সে যে সুখ পেয়েছে তার মতো সাধারণ লোকের পক্ষে তা যথেষ্ট।" দুহাতে মুখ ঢেকে বিড়বিড় কেরে বোল্‌ল সে। ওরা আমায় বিচার করুক, আমাকে অভিসম্পাত দিক, আমার নিজের ধ্বংসের পথেই আমি এগিয়ে যাব, হ্যাঁ, ধ্বংসের পথেই। হে ভগবান কি ভয়ানক, কিন্তু কি সুন্দর!"

"আচ্ছা? আচ্ছা?" শিল্পী ওকে জড়িয়ে ধরে বোলছেন, "তুমি আমাকে ভালোবাসো? সত্যিই ভালোবাসো? ওহ্ কি সুন্দর রাত, স্বর্গীয় রাত!"

"হ্যাঁ, কি সুন্দর রাত! ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সে চুপিচুপি বোলল, ওর চোখে জল। তারপর নিবিড় কোরে ওকে জড়িয়ে ধরে সে ওর ঠোঁটে আবেগভরা চুম্বন এঁকে দিল।

"আমরা একমিনিটের মধ্যেই কিগেসমাতে পোঁছে যাচ্ছি," ডেকের অপর প্রান্ত থেকে কে যেন বোলল, ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। লোকটি স্টীমারের খাবার ঘরে কাজ করে।

অলগা আইভানোভ্‌না আনন্দে অধীর হ'য়ে হাসতে হাসতে বোলল, "শোনো, আমাদের একটু মদ এনে দাও।"

শিল্পী উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে বোসে পোড়ল একটা বেঞ্চের ওপর। অলগা আইভানোভ্‌নার মুখের ওপর সপ্রেম কৃতজ্ঞ দৃষ্টি

নিবদ্ধ কোরে সে একটু ম্লান হেসে বোলল, "আমি সত্যিই ক্লান্ত।" তারপর মাথাটা রেলিংএর ওপর রাখল সে।

(৫)

সেপ্টেম্বর মাসের দু'তারিখটায় তখনও সন্ধ্যা নামেনি, বেশ গরম কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন। সকাল থেকেই ভলগার ওপর একটা হালকা কুয়াশা ঝুলেছিল, সকাল নটার পর থেকে টিপটিপ কোরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে রিয়াবোভ্স্কি অলগা আইভানোভ্নাকে বোলেছিল ছবি আঁকাটা একটা অতি বাজে শিল্প। সত্যিকারের শিল্পী সে নয়। আর যারা তাকে প্রতিভাবান বলে, তারা বোকা। কথাটা বোলতে বোলতে সে একটা ছুরি নিয়ে তার একটা ভালো ছবিকে ফালাফালা কোরে কেটে ফেলেছিল। প্রাতঃরাশের পর সে জানলার ধারে বোসে নদীর দৃশ্য দেখছিল। ভলগা এখন অতি সাধারণ একটা নদী, কোন আকর্ষণ নেই তার। কন্‌কনে ঠাণ্ডা শরৎটা যে এগিয়ে আসছে তা বেশ কষ্টেই বোঝা যাচ্ছিল। আগামী বসন্তের আগে ভলগা যে তার নিজস্ব সৌন্দর্য ফিরে পাবে না সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারও। রিয়াবোভ্স্কি মনে মনে ভাবছিল এতদিন ধরে সে ছবি এঁকে তার প্রতিভার অবক্ষয় ঘটিয়েছে। এই জগতে সবকিছুই ধরাবাঁধা, আপেক্ষিক আর বোকামীতে ভরা। তার পক্ষে এই মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়াটা একান্ত অনুচিত হয়েছে। এখন সে ভগ্ন হৃদয়, অবসাদগ্রস্ত।

অলগা আইভানোভ্না পার্টিশানের অপর দিকে বিছানায় বোসে তার নরম চুলগুলোয় আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে ভাবছিল তার স্বামীর কথা। কল্পনায় সে দেখছিল নিজের বৈঠকখানা, শোবার ঘর আর তার স্বামীর পড়ার ঘরটা। কল্পনা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল থিয়েটারে। পোষাক নির্মাতার দোকানে আর খ্যাতিমান বন্ধুদের বাড়ীতে। এখন কি কোরছে ওরা? ওর কথা কি একবারও ভাবে ওরা? বুধের সন্ধ্যার কথাও মনে পোড়ল তার। আর ডিমভ্? প্রিয় ডিমভ্! কত অনুনয় কোরে শিশুর মতো সরল ভাষায় সে তাকে ঘরে ফিরতে বেশ কয়েকখানা চিঠি দিয়েছিল। প্রত্যেক মাসেই সে তাকে পঁচাত্তর রুবল পাঠায় আর যখন সে জানিয়েছিল যে শিল্পীদের কাছে সে একশ রুবল ধার কোরে ফেলেছে তখন আরও একশ রুবল পাঠাতে দ্বিধা

করেনি সে। এই ভ্রমনটা ক্লান্ত কোরে তুলেছে অলগা আইভানোভ্নাকে, বিরক্ত লাগছে তার, এই চাষীদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে সে, স্যাৎসেতে ভিজে আবহাওয়া আর সহ্য কোরতে পারছে না, সহ্য কোরতে পারছে না তার শারীরিক অপবিত্রতা।

"হায় ভগবান, কখন সূর্য্যের মুখ দেখতে পাবো ? সূর্য্য না থাকলে আমার ছবিতে যে আমি আলোর রং ফুটিয়ে তুলতে পারছি না!" রিয়াবোভ্স্কি কাতর কণ্ঠে বোলল।

পার্টিশানের ওধার থেকে বেরিয়ে এসে অলগা আইভানোভ্না বোলল, 'তোমার তো মেঘলা আকাশেরও একখানা ছবির কাজ বাকী রয়েছে। কেন মনে পড়ছে না—ডানদিকে বনভূমি আর একপাল গরু চরে বেড়াচ্ছে সেখানে বাঁদিকে হাঁসের দল। সেইটেই এখন শেষ কোরে ফ্যালো না।"

শিল্পীর কণ্ঠে বিরক্তির সুর ফুটে উঠ্ল, "দোহাই তোমার! চুপ করো। আমি কি কোরবো না কোরবো সেটা কি তোমার কাছে জেনে নিতে হবে আমায় ?"

অলগা আইভানোভ্না বোলল, "সত্যিই কিরকম বদলে গিয়েছ তুমি!"

"ভালোই হয়েছে।"

অলগার শরীরটা কেঁপে উঠ্ল। সরে গিয়ে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে সে কাঁদতে লাগল।

"আবার চোখের জল—এর কি শেষ নেই। বন্ধ করো! আমারও অনুতাপ করার, কাঁদার হাজারটা কারণ রয়েছে, কিন্তু আমি কাঁদছি না।"

"কারণ! হ্যাঁ, তা আছে বই কি! প্রধান কারণটা হচ্ছে আমাকে আর ভালো লাগছে না তোমার। হ্যাঁ, তাই!" ফোঁপানোটা বাড়তেই থাকল। "সহজ সরল সত্যটা হোল এই যে আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাচ্ছ। তোমার ভয় পাছে অন্য শিল্পীরা দেখে ফেলে। কিন্তু ব্যাপারটা তো আর গোপন নেই। বহুকাল আগে থেকেই ওরা জানে সব।"

নিজের বুকে একটা হাত রেখে শিল্পী বোলল, "অলগা একটা কথাই শুধু বোলতে চাই আমি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

"শপথ কোরে বলো, আমাকে ভালোবাসো তুমি।"

শিল্পী দাঁতে দাঁত চেপে লাফিয়ে উঠল। "নিছক অত্যাচার! এর ফল হ'বে হয় আমাকে ভলগায় ডুবে মরতে হবে না হয় আমি পাগল হ'য়ে যাব। যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।"

"তাহলে আমাকে মেরে ফ্যালো! মারো!" অলগা আইভানোভ্না চিৎকার কোরে বোলল।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে চলে গেলো পার্টিশানের অপর দিকে। খড়ের চালের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দটা কানে বাজছিলো। রিয়াবোভস্কি দু'হাতে জোর করে নিজের মাথাটা চেপে ধরে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরময় পায়চারি কোরে বেড়াতে লাগল, তারপর যেন কোন একটা সংকল্প নিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পোড়ল।

ও চলে যাবার পর অলগা অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে রইলো বিছানায়-কান্না থামেনি তার। প্রথমটায় সে ভাবলো বিষ খেলে কেমন হয়। রিয়াবোভ্স্কি ফিরে এসে দেখবে সে মরে পড়ে আছে। কিন্তু তার চিন্তাটা ঘুরে গেল। তার নিজের বৈঠকখানা ঘরের দিকে মনে পোড়ল তার স্বামীর পড়ার ঘরের কথা। মনঃশ্চক্ষে ও যেন দেখলো ডিমভের পাশে বোসে আছে সে। শান্তি আর শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ফিরে পেয়েছে সে। সভ্য জগতের নাগরিক কোলাহলের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ কোরতে লাগলো তার। একজন গ্রাম্য মহিলা এই সময়ে এসে উনুন ধরিয়ে রান্নার আয়োজন কোরতে সুরু কোরল। গন্ধ উঠল কাঠ পোড়ার, বাতাসটা ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে উঠল। শিল্পীরা এইবার কাদামেখে ভূত হয়ে ফিরলেন। ও'রা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি কোরছিলেন, এই খারাপ আবহাওয়াতেও অলগার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। দেওয়ালে টাঙানো সস্তার ঘড়িটা বেজে চলল টিক টিক কোরে।

রিয়াবোভ্স্কি ফিরলো ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়। টুপিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে অবসন্ন দেহটাকে সে এলিয়ে দিল বেঞ্চের ওপর। তার জুতো কাদামাখা, চোখ দুটো বন্ধ।

"আমি বড় ক্লান্ত," জোর কোরে চোখের পাতা দুটো খোলার চেষ্টা কোরতে কোরতে বলল সে।

অলগা আইভানোভ্না দেখাতে চাইলো সে একটুও রাগ করেনি, এগিয়ে গিয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে চিরুনী দিয়ে ওর এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দিল সে।

যেন কোন নোংরা জিনিস ওকে স্পর্শ কোরছে এমন ভাব দেখিয়ে চমকে উঠে চোখ খুললো সে, "এটা আবার কি হ'চ্ছে? আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও দয়া কোরে।"

ওকে ঠেলে দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল সে। অলগা দেখলো ওর চোখে বিরক্ত আর ঘৃণার দৃষ্টি। রাঁধুনী মেয়েটি সেই সময়ে দু'হাতে ধরে একথালা বাঁধাকপির ঝোল নিয়ে এল। অলগা আইভানোভ্না দেখলো ওর মোটা মোটা বুড়ো আঙ্গুল দুটো ঝোলে ডোবানো। অপরিচ্ছন্ন স্ত্রীলোকটির নিয়ে আসা খাদ্যবস্তুটার ওপর রিয়াবোভ্স্কি যেন ঝাঁপিয়ে পোড়লো। এই কুঁড়েঘর, এই সরল জীবনযাপন, শিল্পীসুলভ অগোছালো ভাব যা আগে অলগার খুব ভালো লাগতো এখন সেটাই তার কাছে অসহ্য বোলে মনে হোল। মর্মাহত হয়ে ঠাণ্ডাস্বরে বোলল সে।

"আমাদের কিছুদিনের জন্য আলাদা থাকার দরকার, না হলে হয়তো এই একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আমরা কুৎসিৎভাবে ঝগড়া-ঝাঁটি সুরু কোরতে পারি। এসব আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। কালই চলে যাচ্ছি আমি।"

"কি কোরে? ঝাঁটায় চেপে?"

আজ বৃহস্পতিবার, স্টীমারটা আজই সাড়ে নটার সময় আসার কথা।"

"আসবে কি? ও, হ্যাঁ, আচ্ছা বেশ তাই যেও।" রিয়াবোভ্স্কি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বোলল। "এখানে তোমার খারাপই লাগবে আর আমিও তোমাকে আটকে রাখতে চাই না। যাও, কুড়ি তারিখের পর আবার দেখা হ'বে আমাদের।"

অলগা জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে নিল। তাহলে শীগ্‌গিরই ও তার নিজের বৈঠকখানায় বোসতে পারবে, শোবারঘরে শুতে পারবে, ছবি আঁকতে পারবে, আর ভদ্রভাবে খাবার টেবিলে বোসে খেতে পারবে! ওর—মনে এখন আর কোন রাগ নেই, কাঁধ থেকে যেন একটা ভারী দুর্বহ বোঝা নেমে গেছে।

"রিয়াবুসা, আমি আমার রং আর তুলিগুলো তোমার জন্যে রেখে যাবো। যদি কিছু বাঁচে তো পরে তুমি আমাকে ফেরৎ দিতে পারবে। শুধু একটা কথা তোমায় বলার আছে আমার আমি চলে গেলে যেন অলস হয়ে বোসে থেকো না, কাজ কোরে যেও। তোমার প্রতিভা আছে রিয়াবুসা!"

নটার সময় বিদায় নিল সে। স্টীমারটা উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে।

আড়াই দিন পরে বাড়ী ফিরলো সে। মাথা থেকে টুপিটা বা গা থেকে ওয়াটার প্রুফটা না খুলেই সে ঢুকলো বৈঠকখানায়। ডিমভ্ তখন সবে খেতে বোসেছে। তার পোষাকটা অগোছালো, জামার বোতামগুলো খোলা, হাতা দুটোয় বোতাম নেই। অলগা আইভানোভ্না বাড়ী ঢোকার আগে

ঠিক কোরে নিয়েছিল স্বামীর কাছে সে সবকিছুই গোপন কোরবে। কিন্তু ওর মুখের আকর্ণবিস্তৃত হাসি আর উজ্জ্বল চোখে উপচে পড়া খুশীর দৃষ্টি দেখে তার মনে হো'ল এই রকম একজন পুরুষকে ঠকানো, বোকা বানানো তাকে হত্যা করার মতোই ঘৃণ্য কাজ। সে মনস্থ করল সবকিছুই খুলে বোলবে ওকে। ডিমভ্ যখন উঠে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তখনও তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বোসে দুহাতে মুখ ঢাকলো।

"কি ব্যাপার? কি হয়েছে প্রিয়া?" কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস কোরলো সে। "আমাকে এতদিন কাছে পাওনি বোলে কষ্ট হয়েছে?"

অলগা মুখ তুলল, লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে ওর মুখটা, চোখে কাতর অনুনয়ের দৃষ্টি। লজ্জা এবং ভয়ে সত্যি কথাটা বোলতে পারল না সে।

"না, কিছু নয়..." সে বোলল, 'আমি শুধু.....'

তার হাত ধরে তুলে ডিমভ্ বোল্‌ল, "এস বসা যাক। এইতো ঠিক হয়েছে, আমরা এখন একসঙ্গে খেতে আরম্ভ করি কেমন? তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।"

বুক ভরে নিশ্বাস নিল অলগা, নিজের বাড়ীর তাজা হাওয়া। তারপর খেতে সুরু কোরল। ডিমভ্ আনন্দে, মুখে ঝলমল হাসি নিয়ে স্নেহভরা দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ওকে।

৬

শীতের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিমভ্ বুঝতে সুরু কোরল যে সে প্রতারিত হচ্ছে। স্ত্রীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারতো না সে। নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হো'ত তার। যাতে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎটা এড়িয়ে চলা যায় সেইজন্যে সে প্রায়ই তার এক মাথামোটা বন্ধু ডাক্তারকে নৈশ ভোজে ডেকে আনতো। ভদ্রলোকের নাম কোরোসটেলেভ্। অলগা আইভানোভ্‌নার সামনে ভদ্রলোক নিজেকে খুব বিব্রত বোধ কোরতেন। খাবার টেবিলে ওঁরা দু'জন নিজেদের ডাক্তারী বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা কোরতেন এবং আলোচনাটা এমনভাবে কোরতেন যেন অলগা আইভানোভ্‌না কথা বলার কোন সুযোগ না পায়। খাবার পর কোরোসটেলেভ্ পিয়ানোয় গিয়ে বোসতো। ডিমভ্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোলতো—"নাও হে সুরু করো! দেরী কোরছো কেন? একটা ভালো কিছু শোনাও।"

কোরোসটেলেভ্ সুরু কোরতো, পিয়ানোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিহি গলায় গান ধরতো সে।

অলগা আইভানোভ্না এখন লুকিয়ে চুরিয়ে সাবধানে কিছু করার প্রয়োজন মনে করে না। রোজ সকালে সে খিঁচড়ে ওঠা মন নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে। ওর মনে হয় রিয়াবোভ্স্কিকে সে আর মোটেই ভালোবাসে না। কিন্তু এক কাপ গরম কফি পেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে এই রিয়াবোভ্স্কিই তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে শোনে রিয়াবোভ্স্কি খান কয়েক খুব সুন্দর ছবি এঁকেছে। যারা সে সব ছবি দেখেছে তারাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তখন সে নিজে যায় ওর স্টুডিওতে। ছবিগুলোর সামনে ও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রতিটি ছবি নিরীক্ষণ কোরে দ্যাখে। ভাবে এসব ছবির প্রেরণা ও নিজেই। ওর সান্নিধ্য, ওর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বোলেই না এমন ছবি আঁকতে পেরেছে রিয়াবোভ্স্কি। ছবিগুলোর প্রশংসাও কোরতো সে, তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়।

এরপর ও অনুনয় সুরু কোরতো যেন রিয়াবোভ্স্কি ওকে আগের মতোই ভালোবাসে, ছুঁড়ে ফেলে না দেয়। নিজেকে দীন প্রতিপন্ন কোরে সে প্রেম ভিক্ষা করে। এতে আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে বোলে মনে হয় না তার। ওখান থেকে বেরিয়ে সে যায় তার অভিনেত্রী বন্ধুর বাড়ী।

কখনও কখনও স্টুডিওতে সে দেখা পায় না রিয়াবোভ্স্কির। তখন সে চিঠি লিখে রেখে আসে যে যদি সেদিনই রিয়াবোভ্স্কি ওর সঙ্গে দেখা কোরতে না আসে তাহলে সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কোরবে। রিয়াবোভ্স্কি আসে ওর স্বামীর উপস্থিতিতেই সে অবমাননাকর মন্তব্য করে, অলগাও উত্তর দেয় একই রকম ভাষায়। ওরা দু'জনেই বুঝতে পারে যে ওদের শত্রুতা বেড়েই চলেছে। এমন কি মাথামোটা কোরোসটেলেভেরও বুঝতে বাকী থাকে না কিছু। খাওয়া-দাওয়ার পর রিয়াবোভ্স্কি তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়।

"কোথায় যাবে এখন?" অলগা চোখে ঘৃণা ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করে ওকে।

ভ্রূকুঁচকে রিয়াবোভ্স্কি এমন একজন মেয়ের কথা বলে যাকে ওরা উভয়েই চেনে। বলার উদ্দেশ্য হোল অলগার মনে অসূয়া সৃষ্টি করা। ফল হয় তাতে। কাঁদতে কাঁদতে শোবার ঘরে ছোটে অলগা।

ডিমভ্ লজ্জিত হয়। কোরোসটেলেভকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে সে

যায় স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে।

"কেঁদোনা প্রিয়া। কি লাভ এতে। তোমার উচিত চুপ কোরে থাকা। লোকে দেখলে কি বোলবে? যা হ'বার তাতো হয়েই গেছে।"

অসূয়া সম্বরণ কোরতে না পেরে অলগা গাড়ীভাড়া কোরে ছুটতো ওর উল্লেখ করা মেয়েটির বাড়ী। সেখানে দেখতে না পেয়ে ওর জানা সব মেয়ের বাড়ীই ঘুরতো সে কিন্তু রিয়াবোভ্‌স্কিকে দেখতে পেতো না কোথাও। ওর মনে হোত এবার সে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে পারবে। মুখধুয়ে খানিকটা পাউডার বুলিয়ে সে রিয়াবোভ্‌স্কির সঙ্গে দেখা কোরতে যেতো!

রিয়াবোভ্‌স্কির কাছে একদিন সে তার স্বামীর সম্পর্কে বোলল:

"ওই লোকটার মহত্ত্ব আমাকে পীড়া দেয়।"

কথাটা সে অন্য শিল্পীদের কাছেও বোলতো।

আগের বছরের মতো দিনগুলো একইভাবে কাটতে থাকে। বুধবার সন্ধ্যায় সবাই মিলিত হয়, গান, বাজনা, আলোচনা সবই হয়। ডিমভ্‌ও আগের মতোই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানায় অতিথিদের, "আসুন আপনারা, খাবার দেওয়া হোয়েছে।"

অলগা আইভানোভ্‌না যথারীতি বিখ্যাত ব্যক্তির সন্ধান করে। রোজই রাতে দেরী কোরে সে। ডিমভ্‌ও আগের মতোই তার ফেরা পর্যন্ত জেগে বসে থাকে, পড়াশোনা করে। রাত তিনটের সময় ঘুমুতে যায় সে। আর ওঠে সকাল আটটায়।

একদিন অলগা যখন থিয়েটারে যাবার আগে প্রসাধন পরিচর্যায় ব্যস্ত, ডিমভ্ শোবার ঘরে হাসিহাসি মুখ নিয়ে ঢুকলো। তার গায়ে চাপানো ফ্রককোট আর গলায় বাঁধা সাদা টাই। অলগার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বোল্‌ল "জান আমার গবেষণাপত্রটা আজ পেশ কোরলাম।"

"তুমি সফল হতে পারবে?"

"সে কি বোলছ! এত পরিশ্রম কি বিফল হয়?"

"কিন্তু লাভ কি হবে, তাতে?"

"কেন আমি ডক্টরেট হব।"

ডিমভের মুখটা খুশী আর আনন্দে উজ্জ্বল। সে ভাবলো অলগা যদি ওর আনন্দের একটুও ভাগীদার হতো। কিন্তু অলগার কাছে ওসব একেবারেই অর্থহীন। কোন মন্তব্য কোরল না সে, চুপচাপ বেরিয়ে গেল থিয়েটার দেখতে।

ডিমভ্ একটু অপেক্ষা কোরল তারপর উঠে গেল ম্লান মুখে।

(৭)

দিনটা ছিল খুব অস্বস্তিকর।

ডিমভের প্রচন্ড মাথা ধরেছিল। সকালে প্রাতঃরাশ খায়নি সে, হাসপাতালেও যেতে পারেনি, সারাটা দিন সে চুপচাপ কোচে শুয়েছিল তার পড়ার ঘরে। অলগা আইভানোভ্না যথারীতি বারোটার সময় তার নিজের আঁকা একখানা ছবি নিয়ে গিয়েছিল রিয়াবোভ্স্কির কাছে। ছবিটা একটা ছুতো, আসল উদ্দেশ্য হো'ল ওর সঙ্গে দেখা করা।

দরজার ঘণ্টা না বাজিয়েই সে প্রবেশ কোরল বাড়ীতে। হল ঘরটায় যখন সে তার টুপি খুলছে তখনই স্টুডিওর ভেতর থেকে মেয়েদের পোষাক পরার একটা খস্‌খস্ আওয়াজ এল তার কানে। তাড়াতাড়ি ওদিকে চোখ ফিরিয়ে সে বাদামী স্কার্টের একটুখানি দেখতে পেল। যেন সেটা তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকিয়ে পোড়ল ইজেলের ওপর রাখা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা ক্যানভাসের পিছনে। ও জায়গায় সে নিজেই কতবার লুকিয়েছে অতএব তার ভুল হবার কথা নয়। রিয়াবোভ্স্কি স্বাভাবিক ভাবেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরল ওর দিকে।

"কি ব্যাপার? খবর কি? তোমাকে দেখে খুশী হ'লাম।"

অলগা আইভানোভ্নার চোখে জল এসে গিয়েছিল। নিজেরই লজ্জা হো'ল তার। অন্য একজন স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে নিজের মনোভাব প্রকাশ কোরতে দ্বিধা বোধ কোরল সে। হয়তো লুকিয়ে থাকা মেয়েটা হাসবে ওর কথা শুনে।

"আমি একটা ছবি এঁকেছি, সেটা দেখতে নিয়ে এসেছিলাম।"

"কই দেখি।" ছবিটা হাতে নিল রিয়াবোভ্স্কি। "বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে তো!" বোলতে বোলতে সে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। অলগাও চোলল ওর পেছনে।

"ভারী সুন্দর হ'য়েছে। কিন্তু এরকম ছবি তো তুমি অনেক এঁকেছ। দ্যাখো সত্যি কথা বোলতে কি তুমি সত্যিকারের শিল্পী নও। তোমার গলায় গান তো বেশ ভালোই আসে। গানই ধরনা কেন। তাতে বেশ নাম কোরতে পারবে। হ্যাঁ, এখন আমি বড় ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের দরকার। চা খাবে?"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। অলগা আইভানোভ্‌না শুনল ও একজন পরিচারককে কি যেন বলছে। পাছে এর পর ধৈর্য্য রাখতে না পেরে সে কেঁদে ফ্যালে এই ভয়ে, আর আরও অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

সেখান থেকে সে গেল পোষাকের দোকানে, তারপর বাজনার দোকানে, আরও দু' এক জায়গায়। চলতে চলতে সে চিন্তা কোরতে লাগল একটা কড়া কোরে চিঠি সে লিখবে রিয়াবোভ্‌স্কিকে, তারপর বসন্ত বা গরমের সময় সে ডিমভের সঙ্গে চলে যাবে ক্রিমিয়াতে। অতীতকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সুরু কোরবে নতুন জীবন।

অনেক দেরীতে বাড়ী ফিরল সে। সোজা শোবার ঘরে না গিয়ে সে ঢুকলো বৈঠকখানায় চিঠি লেখার জন্যে।

"প্রিয়া," দরজাটা না খুলে পড়ার ঘর থেকে ডাকলো ডিমভ্‌ "প্রিয়া।"

"কি চাই তোমার?"

"আমার কাছে এস না প্রিয়া, দরজার কাছটায় একটু এস একবার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হাসপাতালে কাজ করার সময় দু'একদিন আগে আমি ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়েছি—বড্ড খারাপ লাগছে আমার একবার কোরোসটেলেভ্‌কে খবর দেবে।

অলগা আইভানোভ্‌না বরাবর তার স্বামীর পদবী ধরেই ডাকতো। যেমন সে তার সব পুরুষ বন্ধুদের ডাকে। ওর আসল নাম অসিপ ডিমভ্‌। অসিপ নামটা ওর ভালো লাগতো না। কিন্তু এখন সে আঁতকে উঠে সেই নাম ধরেই ডাকল, "কি বলছ অসিপ, কখনোই হতে পারে না!"

"ওকে ডেকে পাঠাও। আমার খারাপ লাগছে।" ডিমভ্‌ ঘরের ভেতর থেকে বোলল। পর গলার স্বরটা যেন বড্ড বেশী ভারী মনে হোল অলগার।

"একি সত্যি?" ভয়ে অলগার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। "এ যে ভয়ানক!"

কি কোরে সে বাতি জ্বালাল, শোবার ঘরে গেল, কিছুই মনে নেই তার। সব সময়েই মনে মনে ভাবছিল ডিমভের কথা, তার হাসি, স্নেহ, শান্ত ব্যবহার সর্বোপরি তার ভালোবাসা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে, আর অনেক অনুনয় জানিয়ে কোরোসটেলেভ্‌কে চিঠি লিখে পাঠাল একটা। তখন রাত দুটো।

পরদিন সকালে অলগা আইভানোভ্না যখন শোবার ঘর থেকে বেরুল তখন সকাল সাতটা। সারারাত ঘুম হয়নি তার। চুলগুলো উস্কোখুস্কো মুখে একটা অপরাধীর ছাপ। একজন ভদ্রলোক, মুখটা আচ্ছন্ন কালো দাড়িতে ওকে পাশ কাটিয়ে হল ঘরের দিকে চলে গেলেন। দেখে মনে হো'ল ডাক্তার। বাড়ীটার সর্বত্রই ওষুধের গন্ধ। কোরোসটেলেভ্ পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, ডান হাত দিয়ে বাঁদিকের গোঁফের ডগাটা পাকাচ্ছিল সে।

"দুঃখিত, আপনাকে ভেতরে যেতে দেওয়া যাবে না। রোগটা বড্ড ছোঁয়াচে। তাছাড়া গিয়েও লাভ নেই উনি এখন প্রলাপ বোকছেন।

"সত্যিই কি ডিপথিরিয়া হয়েছে ওঁর? অলগা আইভানোভ্না ফিস ফিস কোরে বোলল।

"যারা নিজেরা স্বেচ্ছায় এ রোগ ডেকে আনে তাদের জেলে পাঠানো উচিত। জানেন, কিভাবে রোগটা হয়েছে ওঁর। উনি একটা ছোট ছেলের গলা থেকে মুখ দিয়ে চুষে পুঁজ বার কোরে নিয়ে ছিলেন। ছেলেটির ডিপথিরিয়া হয়েছিল। কিসের জন্যে? বোকামী, নিছক বোকামী!"

"সত্যিই বিপদের আশঙ্কা আছে?" অলগা আইভানোভ্না জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, সকলেই বোলছেন কেসটা খুবই খারাপ। আমাদের উচিৎ এখন ডাক্তার শ্রেককে ডেকে পাঠানো।"

একজন লাল চুলওয়ালা ডাক্তার এলেন, নাকটা বেশ লম্বা আর উচ্চারণটা ইহুদীদের মতো। তারপর এলেন একজন অল্প বয়স্ক মোটাসোটা ভদ্রলোক চোখে চশমা। ওঁরা সবাই ডাক্তার একের পর এক আসছেন আর যাচ্ছেন, ওঁদের সহকর্মীর রোগে চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন ওঁরা। সর্ব্বত্রই সকলে চুপচাপ কাজ কোরে চলেছেন।

অলগা আইভানোভ্না শোবার ঘরে বসে বসে ভাবছিল, ঈশ্বর তার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন, স্বামীকে বঞ্চনা কোরেছে সে। সামান্য ক্ষনিক সুখের জন্যে সে তার এই মহান স্বামীর সঙ্গেও প্রতারণা কোরছে। এ পাপ কোন কিছুতেই মুছবে না, এমন কি রক্ত দিয়েও ধুয়ে ফেলা যাবে না।

নিজেকে শুনিয়ে নিজেই বোলল সে, "ওঃ কি মিথ্যাচরণই না কোরেছি

—আমি, নির্লজ্জ ভাবে প্রেম কোরেছি রিয়াবোভ্স্কির সঙ্গে, স্বেচ্ছায় দেহদান কোরেছি তাকে কি অভিশপ্ত জীবন আমার !"

বেলা চারটের সময় কোরোসটেলেভে্র সঙ্গে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন কোরলো সে। কোরোসটেলেভ্ কিছুই খেলো না, শুধু একটুখানি মদ খেলো সে। অলগাও খেতে পারলো না বিশেষ কিছু। নীরবে প্রার্থনা জানতে লাগলো সে ঈশ্বরের কাছে, যাতে ডিমভ্ আরোগ্য লভে করে। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিল সে, রোগ শয্যায় স্বামীর পাশে দাঁড়াবার অধিকার-টুকুও হারিয়ে ফেলেছে সে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অন্ধকার নেমে এল। অলগা আইভানোভ্না বসার ঘরে গিয়ে দেখলো কোরোসটেলেভ্ একটা শোফায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তাররা একের পর এক আসছেন আর যাচ্ছেন। অদ্ভুত লোকটি বৈঠকখানায় নাক ডাকাচ্ছে, দেওয়ালে ঝুলছে ছবিগুলো, গৃহকর্ত্রী উস্কখুস্ক চুলে বাড়ীর এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও কৌতূহল জাগছে না ওকে দেখে। আশ্চর্য্য পরিবেশ।

অলগা আবার বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরে দেখলো কোরোসটেলেভ্ জেগে উঠে ধূমপান কোরছেন।

"ডিপথিরিয়াটা এখন নাকে পেঁছে গ্যাছে। হার্টটাও ভালো ঠেকছে না। অবস্থা এখন খুবই খারাপ।"

"আপনারা শ্রেককে ডেকে পাঠাচ্ছেন না কেন ?"

"উনি এসেছিলেন। উনিই দেখছেন ওর নাকটাও আক্রান্ত হয়েছে।"

সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। অলগা আইভানোভ্না পোষাক পরে বিছানায় বোসে ঢুলতে লাগল। সারা বাড়ীটাই মনে হচ্ছিল যেন একতাল লোহা। সেই রকমই নিথর, ঠাণ্ডা আর ভারী, কিছুতেই নড়ানো যায় না। অলগা বুঝল লোহার তাল নয় ওটা ডিমভের অসুস্থতা।

মনে মনে আবোল তাবোল অনেক কিছু আওড়াতে থাকলো সে। ঝাকরানীটা এই সময়ে একটা খালি গ্যাস ট্রের ওপর বসিয়ে এল ওর কাছে। আপনার বিছানাটা ঠিক কোরে দেবো ম্যাম ? জিজ্ঞেস কোরল সে।

কোন উত্তর না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। নীচের ঘড়িতে ঢং ঢং কোরে চারটে বাজল। অলগা স্বপ্ন দেখছিল এখন ভলগার ওপর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পরমুহূর্তেই আর একজন কে ঘরে ঢুকলো। অলগা তাকিয়ে

দেখলো, কোরোসটেলেভ্। বিছানায় উঠে বসল সে।

"কটা বাজল?" জিজ্ঞেস কোরল সে।

"প্রায় তিনটে।"

"উনি কেমন আছেন?"

"সেই কথাই বোলতে এলাম। উনি মারা যাচ্ছেন।"

ওঁর গলাটা কান্না ভেজা। চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে। আপনার পাশে বিছানায় বোসলেন উনি। জামার হাতা দিয়ে মুছে নিলেন চোখের জলটা। তারপর হঠাৎ নিজের বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন।

"মারা যাচ্ছেন," এবার কাঁদতে কাঁদতে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বললেন উনি, মারা যাচ্ছেন, কারণ উনি নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। বিজ্ঞান জগতের যে কি ক্ষতি হোল। অন্যদের তুলনায় উনি এক মহান পুরুষ, মহাপ্রাণ। কি প্রতিভা! সবাইকে কতো উৎসাহিত কোরতেন উনি। ভগবান! এই রকম একজন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী বৈজ্ঞানিককে কেড়ে নিলে তুমি? অসিপ ডিমভ্, অসিপ ডিমভ্ একি করলেন আপনি। হায় ভগবান!"

"কি অসাধারণ নীতিজ্ঞান!" যেন কারও ওপর রেগে গিয়ে মন্তব্য কোরলেন কোরোসটেলেভ, "দয়ালু, পবিত্র হৃদয়, স্নেহশীল, আর, কি না! চিরকাল উনি বিজ্ঞানের সেবা কোরেছেন, আর বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেই মৃত্যুবরণ করলেন। ঘোড়ার মতো অক্লান্ত পরিশ্রম কোরতেন উনি, কিন্তু কেউই ওঁকে প্রতারনা কোরতে ছাড়েনি। সারারাত ধরে অনুবাদকের কাজ কোরতেন, কেন, না কতকগুলো হতভাগাদের সন্তুষ্ট করতে!"

কোরোসটেলেভ্ অলগা আইভানোভ্নার মুখের দিকে একটা ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে দুহাত দিয়ে বিছানায় চাদরটা মোচড়াতে লাগল যেন ঐ চাদরটাই ডিমভের মৃত্যুর কারণ।

বৈঠকখানা থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যাঁ, সত্যিই উনি ছিলেন এক মহান পুরুষ।"

অলগা আইভানোভ্নার তার নিজের সারাজীবনের কীর্তি কলাপের কথা মনে পড়তে থাকলো একে একে। নিজেকে শুনিয়েই সে বলল, "তোমার অধিকার হারিয়েছ তুমি নিজেই!" কাঁদতে কাঁদতে শোবার ঘর থেকে সে ছুটল বসার ঘরে, সেখান থেকে পড়ার ঘরে। ডিমভের প্রাণহীন দেহটা শায়িত রয়েছে কৌচে, কোমর পর্য্যন্ত ঢাকা একটা কম্বলে। ওর মুখটা

এখন অনেক রোগা, হলদেটে কিন্তু কালো চক্ষু যুগল যেন হাসছে তখনও।

"ডিমভ্।" চেঁচিয়ে উঠল অলগা। "ডিমভ্!"

সে বোঝাতে চাইছিল যে অন্যায় কোরেছে, ভুল কোরেছে, এখনও সব কিছু হারায়নি, জীবনকে আবার সুখী কোরে তোলা যায়। এখন থেকে সে সারাজীবন ওকে ধরে পুজো কোরবে, ভালোবাসবে, ওর কাছে বিনয়ী হয়ে থাকবে। মৃত ডিমভের কাঁধ দুটো ধরে ও ঝাকানি দিয়ে আর্ত্তস্বরে আবার ডাকলো, "ডিমভ্, ডিমভ্ শুনছ!"

বৈঠকখানা ঘরে তখন কোরোসটেলেভ চাকরানীকে ডেকে বোলছে, "জিজ্ঞেস করার তো কিছু নেই, যাও গীর্জায় গিয়ে খবর দাও। ওরাই কোরবে সবকিছু।"

পরিচিতি

THE GRASSHOPER : Anton Chekov

চেকভ:—(ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বিশ্ব-সাহিত্যে ছোট গল্পের উদ্ভব ও বিকাশে রুশলেখক চেকভের দান অসামান্য।)
ফরাসী দেশে মঁপাসা, ইংলণ্ডে কিপলিং ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এডগার অ্যালেন পো প্রায় সমকালে নিজ নিজ দেশে ছোট গল্পের বিকাশে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। চেকভের এই "গঙ্গাফড়িং" The Grasshoper নামক গল্পে আমরা লেখকের ছোটগল্পের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের ছোট গল্পের বিকাশে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকগণ যাঁদের দ্বারা সবথেকে বেশী প্রভাবিত হন তারা হচ্ছেন ফরাসী লেখক মঁপাসা ও রুশ লেখক চেকভ।

দি উয়িণ্ডো | গী দ্য মঁপাসাঁ

এবারের শীতে মাদাম দ্য জাদেল নামে এক মৃতভর্তৃকা মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হয়েছিলাম। তিনি অশেষ গুণের আকর—নম্র,

সংস্কারমুক্ত, দুঃসাহসী—এক কথায় তিনি অসামান্য মহিলা। দোষের ভেতর সামান্য ত্রুটিতে অসন্তুষ্ট হতেন তিনি, একটুতেই রেগে যেতেন। তিনি

স্পর্শকাতর, রোমাণ্টিক, অফুরন্ত তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস।

আমি দীর্ঘসূত্রী। বিধবাদের ওপর আমার বেশ একটা দুর্বলতা ছিল। মাদাম দ্য জাদেলের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়লাম। স্থির করলাম তাঁকে বিয়ে করব। বিয়ের আগে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ভালোবেসে ফেলে তাহলে তার মতো নির্বোধ পৃথিবীতে আর দুটো নেই, আর পরিণয়োত্তর প্রথম রজনীতে যদি কোন পুরুষ তার যৌন কামনার বেগকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারে তাহলে পরবর্তীকালে তাকে অশেষ লাঞ্ছনা পোয়াতে হয়।

একদিন আমি মাদাম দ্য জাদেলের বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করলাম। জাদেল বললেন, 'মানুষ হিসাবে তোমাকে ভালো বলেই মনে হয়। কিন্তু বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়। বিয়ে করতে হলে তোমায় পরীক্ষা করে নেব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহোত্তর জীবনে যে ব্যর্থতা আসে তার একমাত্র কারণ বিয়ের আগে পরস্পর পরস্পরকে ঠিক মতো যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পায়না। সেজন্য বিয়ের পর তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরোধ-বিসংবাদ লেগেই থাকে। অসন্তোষের আগুন জ্বলে—যার অনিবার্য পরিণতি বিবাহ বিচ্ছেদ। তুমি তো জানো ল্যাভিলে আমার জমিদারী রয়েছে। দশ-ই মে আমার সঙ্গে বেশ কিছু দিন সেখানে থাকবে তুমি। কাছ থেকে তোমায় দেখার সুযোগ মিলবে। অধিকাংশ পুরুষ ভালোবাসা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তা জানি। আর এ ধরণের ভালোবাসাকে আমি অবজ্ঞার চোখে দেখি। কি রাজী? মাদাম দ্য জাদেলের প্রস্তাবে রাজী হলাম। তাঁর কোমল করে চুম্বন করলাম।

মাস খানেক পরে জাদেলের প্রাসাদে হাজির হলাম। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল আমাদের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি। বনে-বনান্তরে ঘোড়ায় চেপে আমরা বেড়াতাম। কিন্তু এক দিন বুঝতে পারলাম পাশের ঘরে মাদাম তার পরিচারিকা সিজারীকে আমার প্রহরার জন্যে রেখেছেন, সে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আমার ওপর—নিদ্রার মাঝে আমার নাসিকার গর্জন শোনা যায় কিনা, স্বপ্ন দেখে প্রলাপ বকি কিনা! বিরক্তিতে ভরে ওঠে সারা মন।

সিজারীকে পাঁচ ফ্রাঁ ঘুষ দিয়ে তাকে জানালাম আমার মনোবেদনার ইতিবৃত্ত। তাকে বললাম, 'আমার সম্পর্কে সবকিছু জানবেন জাদেল আর আমি তার সম্পর্কে জানবনা কিছুই—চমৎকার ব্যবস্থা! এদিকে দুদিন পরেই তাঁকে আমি বিয়ে করব! তুমিই বল, এটা কি ঠিক? আচ্ছা তুমি তো মাদামকে সাজিয়ে

দাও, পোষাক পরিয়ে দাও। তার দেহের খবর তো তোমার অজানা নয়! বাইরে থেকে তাঁকে তো বেশ গোলগাল দেখায়—বলতে পার, স্তন আর নিতম্বকে লোভনীয় করার জন্যে তিনি কি প্যাড ব্যবহার করেন?'

সিজারী ছুঁড়িটা সুশ্রী আর বেশ রসিক। কথায় কথায় খিলখিল করে হাসে। বললে, 'মঁসিয়ে, কি কি জানবার আছে বলুন আমি একসঙ্গে উত্তর দেব।' প্রশ্ন করি, 'তাঁর হাঁটু দুটি কেমন? বাঁকা নয় তো? স্তন দুটি কেমন? দেখে লোভ হয় তো? নারীর শরীর বড় বিচিত্র। কারো শরীরটা ছিপছিপে কিন্তু সে তুলনায় বাহুযুগল বেশ স্ফীত। কারোকে আবার সামনে দিক থেকে বেশ সুন্দর লাগে, কিন্তু পেছনটা বড় অসুন্দর। তা তোমার মাদাম কেমন এবার বল।'

হাসতে হাসতে সিজারী বলে, 'মাদামের শরীরটা হুবহু আমারই মতন, শুধু রঙটা একটু অন্যরকম।'

নিশীথ রাতে সিজারী যখন আমার হাল চাল লক্ষ্য করার জন্য ঘরে ঢুকল আমি আলতো করে তার মুখ টিপে ধরে বললাম, 'তাহলে তোমার মাদাম সত্যি সত্যিই খুব সুন্দরী, কি বল! একেবারে তোমার মতো, তাই না?' আমি তন্নতন্ন করে তার শরীর দেখলাম, স্পর্শ করলাম তার তপ্ত-মধুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। একটুও বাধা দিল না সে। হ্যাঁ, সত্যই রূপসী সে। খুশীর আতিশয্যে এক শিশি ল্যাভেন্ডার দিলাম তাকে।

এদিকে মাদাম দ্যজাদেলকে দেখে ইদানীং মনে হচ্ছে আমার ওপর তিনি তুষ্ট হয়েছেন—অর্থাৎ কিনা পরীক্ষায় জয়ী হয়েছি আমি। আর এরপরেই একটা অঘটন ঘটে গেল। এখানে এসে সকালে ছাদে দাঁড়িয়ে ধূমপান করাটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সেদিনও আমি ছাদে উঠেছিলাম। ওপরে গিয়ে দেখি সাদা রঙের একটা খাট সায়া পরে একতলার জানালা দিয়ে কিছুটা ঝুঁকে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সিজারী। চুপিসারে এগিয়ে নতজানু হয়ে বসে অতিসন্তর্পণে তার সায়াটি তুলে ধরলাম। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার মাংসল উরুর উজ্জ্বল সৌন্দর্যে। সাহসে ভর করে যেই না সেখানে চুমু দিয়েছি, ল্যাভেন্ডার নয়! ভার্বেনার মিষ্টি গন্ধে মদির হয়ে উঠল মন আর সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি এসে লাগল মুখে। সিজারী নয়—মহিলাটি মাদাম দ্য জাদেল।

কিছুক্ষণ পরে সিজারী এসে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দেয়—মাদাম দ্য জাদেল আমায় নির্দেশ দিয়েছেন পত্রপাঠ আমি যেন এখান থেকে চলে যাই। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম গুরুকে, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে শান্ত করতে

পারলাম না। এখনও আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ভার্বেনার মধুর সৌরভ।

*   *   *

THE WINDOW : Henri Rene Albert Guy De Maupassant

॥ পরিচিতি ॥

লেখকের জীবনী লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।
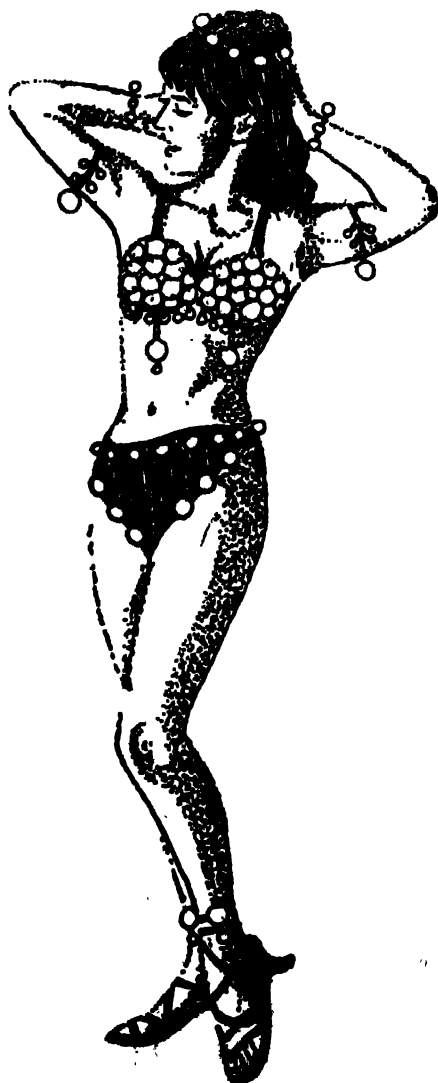
সিদ্ধার্থ

হেরমান হেস

রাতে মাঝির পর্ণকুটীরে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল সিদ্ধার্থ। পীতবসন পরিহিত প্রিয়বয়স্য গোবিন্দ তাকে প্রশ্ন করছে, 'আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কেন, সিদ্ধার্থ?'

গোবিন্দকে বুকে চেপে ধরে সিদ্ধার্থ তাকে চুম্বন করল। আশ্চর্য। গোবিন্দ কোথায়? মিলিয়ে গেছে সে। আলিঙ্গনাবদ্ধ এ যে এক ভরা যৌবনা রমণী। রমণীর ঢিলে ঝলমলে ওপরের পোশাকের অভ্যন্তর হতে আত্মপ্রকাশ করছে তার পুরন্ত স্তন দু'টি। স্তন থেকে নিঃসৃত হচ্ছে

নারী-পুরুষ, সূর্য-অরণ্য, প্রাণী-কুসুম, সকল ফল আর সকল আনন্দের মদির অমৃত ধারা। সিদ্ধার্থ সেই পীযূষ-ধারা পান করে। সহসা ঘুম ভেঙে গেল তার, স্বপ্ন গেল টুটে। সে বাইরে তাকাল—দেখল বয়ে চলেছে নিষ্প্রভ সেই নদীর ক্ষীণ ধারা। কানে এলো তার একটি পেচকের তীক্ষ্ন আর্তনাদ।

সূচনা হলো নতুন একটা দিনের। মাঝিকে নদী পার করে দিতে বলল সিদ্ধার্থ। নবোদিত সূর্যের রক্তিম আলো মেখে ঝলমল করছে নদীর জল।

'নদীটা কী সুন্দর!'—সিদ্ধার্থ বলে।

মাঝি বললে, 'সত্যিই নদীটা খুব চমৎকার। আমি এই নদীকে বড় ভালোবেসে ফেলেছি। প্রায়ই আমি নদীটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কল্লোল ধ্বনি। এই নদীর কাছেই শিখেছি অনেক কিছু।

ওপারে পেঁছে সিদ্ধার্থ বলে, 'পারাণি দেবার মতো পয়সাও নেই আমার কাছে। আমি যে ঘরছাড়া, যাযাবর, সন্ন্যাসী।'

মাঝি বলল, 'আপনি যে সহায় সম্বলহীন সন্ন্যাসী তা তো দেখছি। পরে কোন একদিন আমার পাওনা মিটিয়ে দেবেন। নদী আমায় শিখিয়েছে, সব কিছুই পুনরায় ফিরে আসে।'

মাঝির কাছে বিদায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুপুরবেলা সিদ্ধার্থ এলো এক গ্রামে। কুঁড়ে ঘরের সামনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচছিল—খেলছিল কড়ি আর নুড়ি নিয়ে। সিদ্ধার্থকে দেখে তারা ছুটে পালাল। গ্রামের শেষে নদীর পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে বেঁকে। হাঁটু গেড়ে বসে একজন যুবতী কাপড়-জামা কাচছিল। সিদ্ধার্থ তাকে সম্ভাষণ জানালে তরুণীটি সিদ্ধার্থের দিকে তাকাল। স্মিত হাসিতে তার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চপল চোখ দুটি ঝকঝক করছিল। সিদ্ধার্থ তার কাছে নগরের পথ জানতে চাইল। যুবতী কাপড় কাচা ফেলে রেখে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়াল। তার রমণীয় অধরোষ্ঠে অদ্ভুত একটা মাদকতা রয়েছে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হলো। সিদ্ধার্থ কি অনাহারে রয়েছে, না কি কিছু খেয়েছে—মেয়েটি জানতে চাইল। সে প্রশ্ন করে, সন্ন্যাসীদের কি নারীর সান্নিধ্য এড়িয়ে রাত কাটাতে হয়? যুবতী তার কোমল যৌবনোজ্জ্বল বাঁ পাটি সিদ্ধার্থের ডান পায়ের ওপর স্থাপন করে কামসূত্রে বর্ণিত বৃক্ষারোহন পদ্ধতিতে দাঁড়াল। দেহ-কামনায় ব্যাকুল নারী এভাবে পুরুষকে যৌন মিলনের নিমন্ত্রণ জানায়। সিদ্ধার্থের সারা শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কামনার আগুন, নিশীথ রাতের স্বপ্নের কথাও তার মনে হলো। এর আগে নারীর ললিত যৌবনের স্পর্শটুকুও সে পায়নি। 'আর একটুও এগিয়ো না'—অন্তরাত্মা নির্দেশ দেয়। কামতপ্ত যুবতীকে ফেলে সিদ্ধার্থ চলে গেল।

চলতে চলতে এক সময় দিনের আলো নিভে আসে নগরে পেঁছাল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ উন্মুখ হয়ে উঠেছে মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে। নগরের উপান্তে এক উপবনের প্রতি সিদ্ধার্থের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মণি-মাণিক্য খচিত এক চতুর্দোলায় বসে আছে রূপসী এক রমণী—কেশবতী, সুন্দর তার

মুখ, তার অধর-ওষ্ঠে রঙীন মাদকতা। কোন শিল্পী যেন সযতনে এঁকেছে মেয়েটির আয়ত চোখের ভ্রূদুটি, চঞ্চল রুচির তার অপাঙ্গ দৃষ্টি। সে সোনালী পাড় সবুজ রঙের শাড়ি পড়েছে। সবুজ শাড়ির পটভূমিকায় অপরূপ হয়ে উঠেছে তার গ্রীবাখানি। দীর্ঘ কোমল তার বাহু দুটি। স্বর্ণবলয়ে নয়ন লোভন হয়ে উঠেছে তার মণিবন্ধ। এত সুন্দর রূপ এর আগে আর সিদ্ধার্থের চোখে পড়েনি। পথচারীদের প্রশ্ন করে সে জানতে পারে রূপসী ঐ যুবতী রূপাজীবা, নাম কমলা।

পরদিন সকালে সিদ্ধার্থ তার সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করল। ক্ষৌরকারের কাছে গিয়ে পরিষ্কার করে দাড়ি কামাল, মাথায় দিল গন্ধ তেল। স্নান করল সে নদীতে। তারপর ভর দুপুরের নির্জনতায় কমলার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কমলা শুয়েছিল পালংকে। সিদ্ধার্থকে প্রশ্ন করে সে, 'তুমিই তো কাল আমায় সাদর সম্ভাষণ করেছিলে? তোমার মাথায় ছিল জটা আর গাল ভর্তি ছিল দাড়ি, তাই না?

—'কমলা, কাল তুমি দেখেছিলে সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে আর আজ আমি অন্য মানুষ। প্রেমের পাঠ নিতে এসেছি নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কমলার কাছে।'

সিদ্ধার্থের কথায় হো হো করে হেসে ওঠে কমলা। বলে, 'রমণীয় পোষাক, শোভন পাদুকা, অঢেল বিত্ত, মূল্যবান উপহার সামগ্রী—এ সব না হলে কি কমলাকে পাওয়া যায়?'

—'সদ্য দ্বিখণ্ডিত ডুমুরের মতো সরস তোমার ওষ্ঠ। আমার ঠোঁট দুটিও রক্তিম আর তরতাজা। তোমায় চুমু দিলে খুব ভালো লাগবে তোমার। আচ্ছা কমলা, তুমি কি আমায় ভয় কর?'

—'অরণ্যচারী সন্ন্যাসী তুমি, তোমায় ভয় করবে কমলা?'

—'প্রিয়ে, এতকাল সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছি আমি। আমি নির্ভীক, সবল। ইচ্ছে করলে আমি তোমায় বলাৎকার করতে পারি, তোমার টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতে পারি—বুঝলে?

—'না সন্ন্যাসী, আমি ভীত নই। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি তার জ্ঞান, ভক্তি, চিন্তাশীলতা চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় করে? ঠিক তেমনি আমিও ভয় করিনা। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক কণা ভালবাসা, আমার রসপুষ্ট টসটসে ঠোঁটের এক বিন্দু মধুও কেউ হরণ করতে পারবে না।'

—'কিন্তু কমলা, তোমাকে পাবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি পাব কিভাবে?

—'অধীত বিদ্যার সাহায্যে তোমার উপার্জন করতে হবে।'

—'আমি চিন্তা করতে পারি, প্রতীক্ষা করতে পারি, ত্যাগ করতে সক্ষম।'

—'আর কিছু জান না ?'

—'কবিতা লিখতে পারি। কবিতার বদলে আমি কি একটা চুমু পেতে পারি ?'

—'কবিতা আমার ভালো লাগলে তোমায় চুমু দেব।'

একটু চিন্তা করল সিদ্ধার্থ। তারপর আবৃত্তি করে—

চলেছে চপলা
সুন্দরী কমলা
পথে তার দাঁড়ায়ে শ্রমন—
তারে দেখি অনুরাগে অবনত শিরে
জানায় অভিবাদন
নোয়ায় মাথা স্মিতা কমলা (ধীরে ধীরে)
মনে ভাবে সন্ন্যাসী
মিথ্যা দেবার্চনা (আমি যে উপবাসী)
সবকিছু দেব আহুতি
(কমলার পাদমূলে)
জ্বালিয়া যজ্ঞদীপ ॥

কবিতা শুনে খুশী হলো কমলা। সিম্ধার্থকে কাছে ডাকল সে। সিম্ধার্থ কমলাকে চুম্বন করল। কমলাও প্রতিদানে বিমুখ হলো না। সেও চুমু দিল—নিবিড় এবং গভীর। চুম্বনের সুধাসাগরে ভাসছে সিম্ধার্থ আর কমলা।

কমলা আবার বলে, 'সত্যিই তুমি সুন্দর কবিতা লেখ সিম্ধার্থ। আমার যদি অনেক টাকা থাকত, তোমার কবিতার জন্য তোমায় আমি অনেক টাকা দিতাম। কমলার বন্ধুত্ব পেতে হলে তোমায় যে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। কবিতা বেচে ক'টা টাকাই বা তুমি পাবে।'

—'কি সুন্দর চুমু দিতে পার তুমি, কমলা,' সিম্ধার্থ বলে।

—'এই সুন্দর উষ্ণ চুম্বনের জন্যই তো সব কিছুই আমার করায়ত্ত। আচ্ছা সিম্ধার্থ, তুমি আর কি পার?

—'যজ্ঞীয় সঙ্গীত জানি আর জানি লেখা-পড়া।'

কমলার দাক্ষিণ্যে শ্রেষ্ঠী কামস্বামীর সঙ্গে দেখা করে কাজ মিলল সিম্ধার্থের। প্রভূতে বিত্ত-প্রতিপত্তি-ইন্দ্রিয় সুখ সব কিছুই পেল সিম্ধার্থ। কিন্তু আনন্দের অভাবও পেয়ে বসল তাকে—প্রমোদে মন ঢেলে দিয়েও প্রাণ কাঁদতে থাকে, আকর্ষণের মাঝে অনুভূত হয় বিকর্ষণের তীক্ষ্ম জবালা।

একদিন রূপসী কমলার আয়ত চোখের নীচে, রঞ্জিত ওষ্ঠের পাশে সিম্ধার্থ বার্ধক্যের কুঞ্চনরেখা দেখতে পেল। বুঝতে পারল এগিয়ে আসছে বার্ধক্য। চল্লিশ বছরে সিম্ধার্থও আজ কত শ্রান্ত, অবসন্ন। জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে বসন্ত—আসছে শীত।

রাতে বাড়ি ফিরে মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করল সিম্ধার্থ। মাঝ রাতে ক্লান্ত দেহে শয্যায় শুয়ে মিছেই সে ঘুমের জন্যে সাধ্য সাধনা করলো—ঘুম এল না। অসন্তোষের আগুন জবলে উঠেছে তার মনে—সে আর সইতে পারছে না। বিস্বাদ মদ, আপাতঃ মিষ্টি কিন্তু লঘু তরল সঙ্গীত, নটীর কৃত্রিম হাসি এবং তাদের চুল আর সুগন্ধি লিপ্ত তাদের ভারি স্তনের একটানা উগ্র গন্ধে যেমন এক সময় গা ঘিনঘিন করে ওঠে সিম্ধার্থেরও তেমনি তীব্র বিবমিষা জেগেছে। গন্ধ তেলের ঘ্রাণ, মদের গন্ধ, যৌন মিলনের সুখ

সব কিছুই আজ তার অসহ্য লাগে। সমস্ত কিছু ছেড়ে যাওয়ার আগিদ অনুভব করে সে। আম গাছের নীচে বসে সিদ্ধার্থের একদিন মনে পড়ল তার বাবার কথা, গোবিন্দ আর গৌতমের কথা। সে তো কামস্বামী হতে চায়নি!

সিদ্ধার্থ নগর ছেড়ে চলে গেল। কামস্বামী তাকে অনেক খুঁজে ছিল। একটুকুও অবাক হয়নি কমলা। কমলার সোনার খাঁচায় মূল্যবান একটা পাখী ছিল। সুন্দর গান গাইত সে। কমলা মুক্তি দিল তাকে। ক্রমে ক্রমে আকাশের অসীম নীলের মাঝে হারিয়ে গেল সেই পাখী। কমলা তার দ্বার রুদ্ধ করল—আর কেউ পাবে না প্রবেশের অধিকার। একদিন কমলা অনুভব করে সে আর একা নয়, সিদ্ধার্থের সঙ্গে নিভৃত মিলনে আজ সে অন্তঃসত্ত্বা।

SIDDHARTHA : Hermann Hesse

॥ পরিচিতি ॥

দক্ষিণ জার্মানীর প্রথিতযশা সাহিত্যিক হেরমান হেস (১৮৭৭-১৯৬২) কর্মজীবনের সূচনায় ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা। একুশ বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখেন। পরে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাস আটখানি, তিন হাজারেরও বেশি কবিতা লিখেছিলেন তিনি। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। হেস ছবি আঁকতে পারতেন, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

নাৎসী বাহিনী তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রচার রোধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হেস সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সুইজারল্যান্ডে তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রিতে ভূষিত হন আর ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। হেরমান হেস ভারতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাদ্রী—ভারতবর্ষে এসেছিলেন। হেসের মা-র জন্ম আমাদের দেশে। আর হেসও ভারতে এসেছিলেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

ভারতীয় আলোকধর্মীতার (mysticism) পটভূমিকায় রচিত 'সিদ্ধার্থ' একটি কাব্যোপন্যাস—নৈতিক রূপক কাহিনী। গল্পের নায়ক অশেষ গুণে অলংকৃত আত্মানুসন্ধানী সিদ্ধার্থ নিঃসঙ্গতা ও অসন্তোষ দূরীকরণে প্রয়াসী হয়েছে। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রকমারি অভিজ্ঞতার পথ মাড়িয়ে অবশেষে সে অনন্ত শান্তি আর অপরিচ্ছিন্ন পুণ্যের রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। এই রাজ্যে প্রবেশের পূর্বে সে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, গণিকার প্রেমিকা, ধনী ব্যবসায়ীর জীবন যাপন করে। অবশেষে নম্র এক দার্শনিক মাঝির সঙ্গী হয়েছিল। আর সেই মাঝি নদীর অশ্রান্ত জল কল্লোল শুনে চিরায়িত জ্ঞান আহরণ করেছিল। 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের দর্শন হেরমান হেসের ভাষায়, 'there is only one true vocation for everyone—to find one self.' এখানে 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত 'কমলা', 'জনপদ' এবং 'সংসার' এই তিনটি পরিচ্ছেদের শৃঙ্গাররসাত্মক অংশের ভাবানুবাদ সংযোজিত হলো।

আণ্ডার দি উড | গী দ্য মঁপাসা

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়র একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সহসা ঝড়ের বেগে প্রহরীর আগমন। জানায় সে—ধরা পড়েছে প্রৌঢ় এক দম্পতি। টাউন-হলে তাদের বসিয়ে রেখে সে খবর দিতে এসেছে।

বেচারা মেয়রের আর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। ছুটলেন তিনি টাউন-হলে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন পুরুষটি বেশ মোটা-সোটা, নাকটি

তার গোলাপী, চুলে পাক ধরেছে। মহিলাটি বেঁটে-খাটো, রঙ ফর্সা, বেশ রঙ চঙে পোষাক পরেছে সে। পুরুষটিকে দেখে মনে হলো কৃতকর্মের জন্য সে বেশ বিব্রত। স্পর্ধিত মহিলাটি মোটেই অনুতপ্ত নয়।

মেয়র প্রশ্ন করেন, 'ব্যাপার কি? কি হয়েছিল?'

প্রহরী বলে প্রতিদিনের মতো আজও সে শ্যামাপিয়ক্কার সুনীল-সবুজ

বনে পাহারা দিচ্ছিল। এ অরণ্যের মাঝে রয়েছে গমের খেত। আঙুরের বনে কাজ করছিল মালী। মালীই প্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'ভায়া, একবার গিয়ে দেখে এস লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এক বুড়ো আর এক বুড়ি বনের মাঝে কী সব কেলোর কীর্তি করছে।' অমনি কর্তব্য-সচেতন প্রহরী ছুটল অরণ্যের গভীরে। প্রণয়ালাপের ফিসফিস শব্দ এল তার কানে। ঝোপের দিকে তাকাতেই মোটা থলথলে এই বুড়োটিকে বুড়িটার সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখল সে আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেপ্তার করল।

প্রহরীর বর্ণনায় অতিরঞ্জনের স্পর্শটুকুও ছিল না। সে যা দেখেছে আর যা করেছে সব কিছুর নিখুঁত বিবরণ দিল সে। মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে হতবাক হলেন মেয়র। অবাক হওয়ারই তো কথা! পুরুষটির বয়স কম-পক্ষেও ষাট আর মহিলাটির বয়স পঞ্চান্নর কম নয়। দেহ কামনায় উন্মাদ হয়ে বনের মাঝে তারা যৌন সংসর্গে লিপ্ত—এ যে ভাবাই যায় না! পরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি লোকটিকে প্রশ্ন করেন, 'কি নাম তোমার ?'

—নিকোলাস ব্যুরেন।'

—'কিভাবে জীবিকা নির্বাহ কর ?'

—'প্যারীতে আমার কাপড়ের দোকান আছে।'

—'বনের ভেতর ঢুকেছিলে কেন ? কি করছিলে ? প্রহরী যা বলল তা কি সত্যি ?'

পুরুষটি মিনমিনে স্বভাবের। একটু চুপ করে থাকার পর ক্ষীণকণ্ঠে বলে সে,

—'প্রহরী ঠিকই বলেছে মঁসিয়ে। আমি অপরাধ স্বীকার করছি।'

—'ভাল, কিন্তু মাগীটাকে জোটালে কোথা থেকে ?'

—'সে আমার স্ত্রী।'

—'বনে কেন বাবা, একসঙ্গে থাক না তোমরা ?'

—'একসঙ্গেই থাকি মঁসিয়ে।'

—'তাহলে ধরা পড়বার জন্যেই কি তোমরা বনে-বাদাড়ে পশুর মতো ঐ অপকর্মটি করছিলে ? তোমরা দুজন দেখছি বদ্ধ উন্মাদ !'

থলথলে বুড়োটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বললে সে,

—'হুজুর, কোন দোষ নাই আমার। আমার মেয়ে মানুষটির ইচ্ছাপূরণের জন্যেই আমার ঐ অপকর্মটি করতে হয়েছিল। সকলেই জানে নারীরা যেনতেন-প্রকারেণ তাদের কাজ হাসিল করে।'

ব্যরেন একটু উত্তেজিত হয়ে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে, এবার হলো তো ? তোমার জন্যেই আজ আমায় এই ফ্যাসাদে পড়তে হলো। আদালতে যেতে হবে আমাদের। বুড়ো বয়সে কি ঝামেলাই না পোয়াতে হবে !'

মহিলাটি কিন্তু স্থির, নির্বিকার। সে বলে 'ধর্মাবতার, আমি সামান্য নারী। কিন্তু আমিও কিছু বলতে চাই—অনুগ্রহ করে আমায় অনুমতি দিন। আমার স্থির বিশ্বাস সবকিছু শুনে আপনার সহানুভূতি জাগবে, আমরাও মুক্তি পাব।'

মহিলাটি বলতে শুরু করে, 'সে আজ কতকাল আগের কথা। কৈশোরের স্বপ্নময় রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি তখন। আমার চোখে সবকিছুই তখন রঙীন। ব্যরেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখনই। এই ব্যরেন তখন কত সুন্দর ছিল। নির্জন রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিনে বেজনসে প্রিয়তম ব্যরেনের সঙ্গে মিলিত হলাম। মধুর একটা ঔদাসীন্য আচ্ছন্ন করেছিল আমায়। অকারণে জল আসছিল চোখে। কী উদার, কী উন্মুক্ত এই বিশ্বপ্রকৃতি ! পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের ঘন আস্তরণ, বাতাস বইছে বনের গন্ধ বয়ে, রঙ-বেরঙের কত শত ফুল ফুটেছে, পাখীরা গান গাইছে, মাথার ওপর বিরাট একটা সূর্য। পরিচ্ছন্ন রোদ্দুরে পাশাপাশি হাঁটছিলাম আমি আর ব্যরেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ রোজ আর সিঁমের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি আসছিল কানে। দেখলাম তারা পরস্পর পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে—অনুভব করছে মিলনের উত্তাপ। আমরা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম নিজেদের। বসলাম ঘাসের নরম গদিতে। ব্যরেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি করে সে। সে বলেছিল এক কাপড়ের দোকানের কর্মচারী সে। সে সময় কত শোভন ছিল এই ব্যরেন। এরপর প্রতি রবিবারে আমাদের দেখা হতো। স্বপ্নসম্মোহনে চলাফেরা করতাম আমরা। সেপ্টেম্বরে ব্যরেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। বিয়ের পর সে নিজেই একটা কাপড়ের দোকান খুলল। সে সময় আমরা দুজনে দাম্পত্য জীবনের মিলন মদির মুহূর্তকে অবহেলা করে দোকানের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। আর্থিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনাই ছিল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আর তপস্যা। আমাদের মনে হয়েছিল মধুচন্দ্রিমার রসোপভোগ, উচ্ছল আনন্দে সদ্য ফোটা গোলাপের ঘ্রাণ নেওয়া—এসব আমাদের জন্যে নয় কারণ আমরা গরীব। তাই ব্যবসার মাঝে নিশেঃষিত হলো আমাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য। আমরা বুড়িয়ে গেলাম। আমাদের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কোলাব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকত—না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের। কিন্তু

আমাদের অবস্থা ফিরল। এদিকে আমার মনটা ছিল বেশ রোমাণ্টিক। রঙীন স্বপ্নে বন্দি হয়ে থাকতে ভালোবাসতাম। মনে হতো এখনও আমাদের মাথার ওপর রয়েছে বিরাট সেই আকাশ, সুনীল বিস্তৃতির মাঝে আজও তো গান-গাওয়া পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। পুরানো দিনের হিসেব মেলাতে গেলে বিষাদে ভরে ওঠে মন। কত সহজেই হারিয়ে গেল আমার জীবনের কুড়িটা বছর, শিহরিত যৌবন। আমিও তো উপভোগ করতে পারতাম অরণ্যের নিঃসীম নির্জনতার মাঝে যৌন সম্ভোগের নিবিড় আনন্দ! বয়সের ভার বয়ে হা হুতাশ করে কি লাভ! আজও তো নতুন করে আরও একবার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করতে পারি! দেহ মিলনের মদির নেশা আমায় পেয়ে বসল। কিন্তু ব্যারেনকে রাজী করাব কিভাবে! সে তো ঠাট্টা করবে। নিশ্চয়ই বলবে সে, 'তুমি কি পাগল হলে?' আর সে ছাড়া আর কে আছে আমার। যৌবনের তাপ আর দ্যুতি ঝরে গেছে আমার শরীর থেকে। অন্য কোন প্রেমিক জোটাব সে গুড়েও বালি। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ব্যারেনকে একদিন বললাম—বনের গভীরে আমরা বিয়ের আগে যেখানে মিলতাম, চল না একদিন সেখানে যাই। জায়গাটা কী সুন্দর!

ভাগ্য ভালো এক কথায় রাজী হলো ব্যারেন। কতদিন আগের সেই পরিবেশ ফিরে পেলাম কত সহজে। বর্তমানকে মাড়িয়ে উপনীত হলাম অতীতের স্বর্গরাজ্যে। মায়ামন্ত্রবলে ফিরে এল নাকি সেইসব দিন। তারুণ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল আমার সারা শরীর। আমার চোখে অপরূপ হয়ে ধরা দিল ব্যারেন। তাকে জড়িয়ে ধরে একের পর এক চুমু দিলাম থতমত খেয়ে ব্যারেন বলে—কি হলো তোমার? কি করছ তুমি?

একটা ঝোপের আড়ালে গেলাম আমরা। তারপর যৌন মিলনের মধুর ক্ষণে ধরা পড়লাম আপনার পাহারাদারের হাতে।

মেয়র খুব রসিক লোক। সবকিছু শুনে সুন্দর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে তিনি বললেন, 'ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের। কিন্তু ভবিষ্যতে ঐসব কাজকর্ম বনে বাদাড়ে নয়—বাড়িতেই করবে। বুঝলে?'

UNDER THE WOOD —**Henri Rene Albert Guy de Maupassant**

পরিচিতি

প্রখিতযশা ছোটগল্পকার গী দ্য মঁপাসার জন্ম ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তেতাল্লিশ বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ অনুকরণীয় তিনশটি ছোটগল্প রচনা করে তিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মঁপাসা তীক্ষ্ন বাস্তব-নির্ভর ছয়টি উপন্যাস আর কয়েকটি অভিনব নাটকও রচনা করেন। গল্পে-উপন্যাসে মপাসাঁ মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধকে ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন। অবাধ দেহমিলন এবং অসংযমের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। মঁপাসার কলাগুরু ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের দিকপাল গুস্তভ ফ্লোবেয়ার।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চা এবং কঠোর শ্রমে মঁপাসার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে—তিনি পক্ষাঘাত আর উম্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মঁপাসার মৃত্যু হয়।

মেমোয়ারস | জিয়াকোমো ক্যাসানোভা

॥ এক ॥

পাদুয়াতে ডাঃ গাৎসির তত্ত্বাবধানে আমি বিদ্যাভাস করছিলাম। ডাঃ গাৎসির ছোট মেয়ে পঞ্চদশী বোটিনা আমায় সাজিয়ে দিত, চুল আঁচড়ে দিত, আদর করত। আর কি মিষ্টি চুমুই না দিত সে! আমার বয়স তখন বারো। নিতান্ত সেই কাঁচা বয়সেই ভালোবেসেছিলাম তাকে। আমার কিশোর মনে জেগেছিল সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, প্রেমের নেশা। বোটিনা যেন আপন মানুষের দূতী—অচেনা মহল থেকে এসেছিল সে হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে
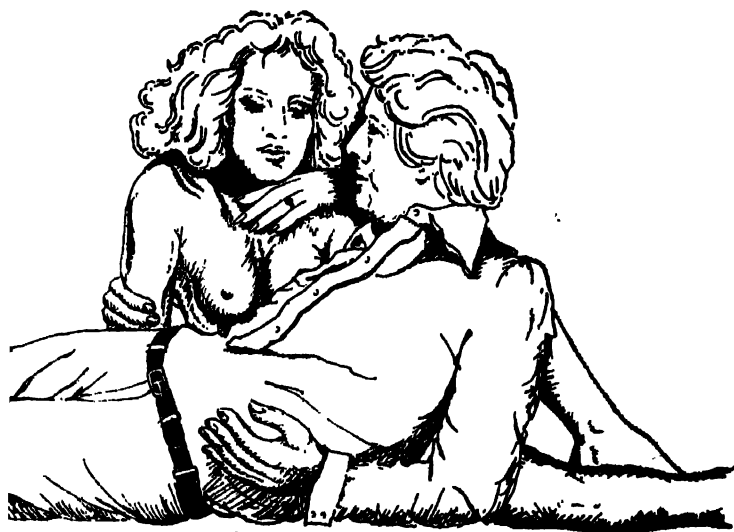
দিতে। এই সময় আরেকটি ছাত্র এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। নাম তার কার্ডিয়ানী। সে ছিল বোটিনার সমবয়সী। বোটিনা তাকেই ভালোবাসল। দারুণ আঘাত পেলাম।

মনে পড়ছে বিনিদ্র সেই রাতের কথা, প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনার সেই ইতিবৃত্ত। ডাঃ গাৎসি কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। দরজা ভেজিয়ে রেখে শুয়েছিলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বোটিনার আসার কথা। স্বপ্ন দেখেছিলাম, মনে মনে কত ছবি এঁকেছিলাম—সে আসবে, আমরা মিলব। বোটিনার অনাবৃত শরীর দেখব, স্পর্শ করব তাকে, তাকে চুমু দেব—খেলব তাকে নিয়ে। অদ্ভুত একটা আবেশ ঘিরে রেখেছিল আমাকে।

ক্রমে ক্রমে কেটে এলো রাত। বোটিনা এল না। রাগে-উত্তেজনায় কাঁপছিলাম আমি। অবশেষে এসে দাঁড়াই বোটিনার দ্বারে। দরজা ঠেলে বাইরে আসে কার্ডিয়ানী। চোখে মুখে তার ঝরে পড়েছে অনেক পাওয়ার সেই আনন্দ, মিলন-মধুর সোনালি ক্লান্তি। আচমকা আমায় প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি মারল কার্ডিয়ানী। আঘাত-বিষাদ আর পরাজিতের গ্লানি বয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। দোষ নেই বোটিনার, আমি যে তার চেয়ে বয়সে ছোট। আমায় নিয়ে সে কি তৃপ্তি পায়! কেমন করে মেটাব তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! কিন্তু এ কথা মিথ্যে নয়, তাকে আমি ভালোবেসেছিলাম।

॥ দুই ॥

করফুতে পরিচিত হয়েছিলাম ধনী, সহৃদয় বিদগ্ধ এক দার্শনিকের সঙ্গে। তিনি হলেন জশুফে আলি। তাঁর রূপবতী আর গুণবতী মেয়ে জেলমার সঙ্গে তিনি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জশুফে আলীর অনুপস্থিতিতে একদিন তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। অবগুণ্ঠিতা অপরূপা এক নারীকে দেখলাম সেখানে। রেশমী বহির্বাস ভেদ করে ফুটে উঠেছে তার উগ্র যৌবনের উত্তেজক বৃত্ত আর রেখা। কামনা-মদির তার অঙ্গসৌরভ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। 'ঘোমটা সরিয়ে তোমার সুন্দর মুখ আমি দেখবই'—দৃঢ় সংকল্প করে বসলাম।

মোহিনী সে যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুতেই সংযত করতে পারিনি নিজেকে। বুকে চেপে ধরেছিলাম সে ফুল্ল তনু। অত্যন্ত কুপিত হয়ে বলেছিল সে, 'ছাড়ুন আমাকে। আমি আলির স্ত্রী। কামনার তাড়নায় আপনি কাজ যা করলেন তা ক্ষমার অযোগ্য।' নতজানু হয়ে আমি তার পা জড়িয়ে ধরে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলাম।

জশুফ আলি বাড়ি ফিরলে তার তরুণী ভার্যা আমার দিকে চেয়ে মৃদু

হেসেছিল। আমার অসভ্যতার জন্যে কোন অভিযোগই করেনি সে আলির কাছে।

॥ তিন ॥

নেপল্‌সে অবস্থানকালে আমার জীবনে এলো হেনরিয়েটা। তাকে বলা যায় ক্ষণিকা—সহসা এসেছিল সে, এক নিমেষেই যেন হারিয়ে গেল। 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতিটুকু রয়ে গেল শুধু। অনির্বচনীয় তার রূপের জলুস, সুন্দর হাসিতে উজ্জ্বল তার মুখশ্রী, নয়ন লোভন তার পয়োভার, মনোরম তার পেলব জঘন, মনোহর তার গৌরবরণ জঙ্ঘা। তার পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করেছিলাম। প্রমোদে ঢেলে দিয়েছিলাম মন। মিলনের আনন্দে হু হু করে কেটে গিয়েছিল দিন, অতিবাহিত হয়েছিল রাত। কাঁচের ওপর হীরে ঘষে লিখেছিল সে, 'এমন একদিন আসবে, হেনরিয়েটাকে যেদিন আর মনে পড়বে না।'

॥ চার ॥

প্যারী প্রিয়বয়স্যকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলাম সেন্ট-লোরেন্টোর মেলায়। সাদা-মাটা এক ভোজসভায় অভিনেত্রী মরফির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আর সে রাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তারই বাড়িতে। অন্য কোন কারণে নয়—বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, হন্যে হয়ে কোথায় খুঁজব বাসস্থান।

মরফির তের বছরের ছোট বোন হেলেনের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হলাম। টাকার বিনিময়ে কিশোরী মেয়েটি তার শয্যা আমায় ছেড়ে দিতে চাইল। তার বিছানা দেখে অবাক হলাম আমি। রং চটা, ছেঁড়া একটা মাদুর মেঝেতে পেতে শুয়ে থাকে সে! বললাম, 'এই তোমার বিছানা? শীতের হাত থেকে বাঁচ কি ভাবে? নিশ্চই পোষাক পরে শুতে হয়?'

—'না।'

—'তবে? আমায় দেখাবে কি করে তুমি শুয়ে থাক? এর জন্যে টাকা দেব আর ভয় নেই, আমি শুধু দেখব।'

'যদি আমার কোন ক্ষতি কর।'

—'না কোন ক্ষতিই করব না। বললাম তো, তোমায় দেখব শুধু।'

নিরাবরণ দেহটিকে একফালি পাতলা কাপড় ঢেকে শুয়ে পড়ে সে। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল তার বয়ঃসন্ধির চিত্তহারী ঐশ্বর্য। বললাম, 'আরও টাকা দেব যদি তুমি তোমার নগ্ন দেহটি দেখাও।' রাজী হলো সে। মেয়েটি সুন্দরী। সদ্য ফোটা ফুলের মতো রঙীন তার সৌন্দর্য। তার নবীন মুখে ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য। উদার একটা বিস্তৃতি ছিল তার চোখে। সদ্য প্রস্ফুটিত স্তনদু'টিতে ঝরে পড়ছে স্বর্গীয় সুষমা। অবিস্মরণীয় তার অঙ্গের শোভা। অঙ্গ থেকে উত্থিত হচ্ছিল কৈশোরের মধুর উত্তাপ। কিন্তু নিঃসীম দারিদ্র্যে দেহের যত্ন নিতে পারেনি সে। অপরিচ্ছন্নতার অভিজ্ঞান ছড়িয়ে রয়েছে তার শরীরের যত্রতত্র। নিজের হাতে তার ময়লা ধুয়ে সুন্দর করে তাকে সাজিয়ে দিলাম। নিমেষ হারা চোখে তাকে দেখতে লাগলাম। তৃষ্ণা যেন আর মেটে না। প্রখ্যাত এক শিল্পীকে দিয়ে নিরাভরণ সেই কিশোরীর নগ্ন রূপের অনবদ্য একটি ছবি আঁকিয়েছিলাম।

॥ পাঁচ ॥

অতঃপর ভিয়েনায় উপনীত হলাম। অতিক্রান্ত হয়েছে সাতাশটি বসন্ত। পুনরায় এলো অকৃত্রিম সারল্যের প্রতিমূর্তি এক কিশোরী মাদমোয়াজেল সিসি —বয়স তার চোদ্দ। সে যেন সুগন্ধী একটি ফুলের কুঁড়ি। সিসি-র দাদা দারুণ ধান্ধাবাজ—বোনকে দিয়ে রোজগার করাতে চায় সে।

সিসি-কে সত্যই আমি ভালোবেসেছিলাম। কতবার তার কবোষ্ণ বুকের স্পন্দন অনুভব করেছি নিজের বুকে। চুমুতে ভিজিয়ে দিয়েছি তার গোলাপী ঠোঁট! গণ্ডোলায় চড়ে ঘুরেছি এখানে-সেখানে। কুঞ্জবনে মিলিত হয়েছি আমরা। সিসি যেন প্রাণচঞ্চল একটা প্রজাপতি—চিত্রিত পাখা মেলে আকর্ষণ করত আমাকে। খাটো ফ্রকে চমৎকার লাগত তাকে। গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল তার পা দু'টি।

একদিন আংটিটা লুকিয়ে রেখে সিসি আমায় খুঁজে বের করতে বলল। আসলে আমার স্পর্শ পেতে চেয়েছিল সে। আমিও তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আংটির খোঁজ করলাম। অবশেষে প্রেয়সীর তপ্ত কাঁচুলী থেকে আংটি বের করলাম। কত উষ্ণ, কত রম্য তার কৈশোরের স্তন দুটি। লজ্জায় মুখ নীচু করেছিল সে। আসঙ্গলিপ্সায় আমার তখন দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হচ্ছিল; তার উরুর স্পর্শে রোমাঞ্চ জেগেছিল।

জীবন সঙ্গিনীরূপে পেতে চেয়েছিলাম তাকে। ভেবেছিলাম আমার ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনে বুঝি ছেদ পড়বে। কিন্তু সিসির বাবা বাধ সাধলেন। বললেন তিনি, 'মেয়ের বিয়ের কথা ভাবব আরও বছর চারেক পরে।'

একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তাদের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে তারা চলে গেছে। জানিনা কোথায়!

॥ ছয় ॥

পুনশ্চ প্যারী। মাদাম লাম্বার্তিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় তিরোত্তার। এ সময় আর এক নারী শুভস্মিতা মাদময়াসেল মিউরের রূপের বনে হারিয়ে গিয়েছিল আমার মন। জীবন জুড়ে আবার পরশ লাগে, ভুবন ব্যেপে জাগল হরষ। দুরন্ত যৌবনের অশান্ত বন্যায় ভাসতে লাগলাম আমরা।

॥ সাত ॥

আবার এলাম জেনিভাতে। আমার আর হেনরিয়েটার স্মৃতি বিজড়িত সেই হোটেল-দ্য-বালাসে এসে হাহাকার করে ওঠে মন। সেইসব আলোছায়া আলপনা এঁকে যায় আমার চিন্তারাজ্যে। সহসা চোখে পড়ে কাঁচের ওপর অক্ষয় হয়ে রয়েছে হেনরিয়েটাকে সেই লেখা—'এমন একদিন আসবে হেনরিয়েটাকে যেদিন আর মনে পড়বে না।'

॥ আট ॥

ফোরেন্স অপেরায় অভিনেত্রী টেরিসাকে দেখলাম সতের বছর পরে। আশ্চর্য! কিভাবে জয় করল সে বয়সের জীর্ণতাকে? আরও সজীব, আরও লোভনীয় হয়েছে সে। আর আমি কী বোকা! নির্বোধের মত তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে বসলাম টেরিসার বাড়ির ঠিকানা। মাত্র দশ মাস আগে টেরিসার বিয়ে হয়েছে পালেসির সঙ্গে।

টেরিসার ফ্ল্যাটে গেলাম। পালেসির সামনেই আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। বহুদিনের অদেখার পর তাকে দেখে নিজেকে সংযত করতে পারিনি। আমাদের দু'জনের চোখই জলে ভরে উঠেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল

বেচারা পালোসি। টেরিসা তার স্বামীকে বলে, 'জান, ম'সিয়ে ক্যানালোভা আমার পিতৃতুল্য। চলার পথে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অকুণ্ঠ স্নেহ আর ভালোবাসা।'

পালোসি আমার জন্যে এক কাপ চকোলেট আনতে গেল। ইত্যবসরে টেরিসা আমায় জড়িয়ে ধরল। বলে, 'একদিন আমার যৌবনকে জাগিয়ে তুলেছিলে তুমি। সাংসারিক সুখের সেইসব স্নিগ্ধ মুহূর্ত আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে আমার মনে। আমার প্রতিটি লোমকূপে আজও লেগে আছে কামনা-মদির তোমার স্পর্শ।'

কতদিন পরে দেখা, গল্প কি আর শেষ হতে চায়! সহসা সজীব সতেজ এক কিশোর ঘরে ঢোকে। আমার সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল। আমি, টেরিসা আর পালোসি ছাড়া আরও কয়েকজন ছিল ঘরে। সকলেই একবার আমার দিকে, একবার ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছিল। টেরিসা বলে, 'সিজারিনো, আমার ভাই। গান নিয়েই মেতে থাকে।'

সকলে চলে গেলে টেরিসা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, 'মশাই, সিজারিনো তোমার ছেলে—বুঝলে?' সিজারিনোকে চাইলাম অনেক করে। টেরিসা কিছুতেই রাজী হলো না। বললে, 'সোনার খাঁচায় আমাদের সেইসব দিন, তোমার-আমার অবাধ মিলনের কথা মনে হয় সিজারিনোকে দেখে। ওকে ছাড়তে পারবনা কিছুতেই।'

আবার আমার যাত্রা হলো শুরু। রোমে দু'টো দিন কাটিয়ে ট্যুরিন যাত্রা করলাম।

॥ নয় ॥

লণ্ডন, জেনোয়া, ত্রিয়েস্ত, কনস্তান্তিনোপেল, মাদ্রিদ, পিটার্সবার্গ, বার্লিন ভিয়েনা, ওয়ারশ—যেখানেই যখন গিয়েছি বিচিত্ররূপিনী নারীদের মধুর সান্নিধ্য লাভ করেছি। ভালবেসেছি তাদের, পেয়েছি তাদের ভালোবাসা। কখনও বা তাদের নগ্ন শরীর নিয়ে খেলা করেছি। আমার স্মৃতিকথা এক অবিবাহিত মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলেখ্য যার জীবনের মূল লক্ষ্য হলো ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং সুখ সম্ভোগ।

ভেবেছিলাম এড়িয়ে যাব কিন্তু পারলাম না। কাউণ্টের স্পেনীয় স্ত্রীকে দেখার ইচ্ছে জাগল। কিন্তু কী গম্ভীর, কী নীরস সেই মহিলা! তিরিক্ষি তার মেজাজ। আর একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এ সময়! কমনীয়া

জেনোরিয়া—লম্বা-চওড়া, হাসি-খুশি। তার নরম হাতে চুমু দিতে গেলে সে আমার নিবৃত্ত করে। বলে, 'মঁসিয়ে, একজনের আমি বাগদত্তা।'

॥ দশ ॥

অতঃপর লণ্ডন। রূপীয়সী মার্কোলিনাকে পেয়ে জীবনের মূল্য গেল বেড়ে। তাকে পৌঁছে দিতে হবে ভেনিসে। ভারি সুন্দর ছিল তার অবিন্যস্ত কেশরাশি আর অনুপম তার দেহসৌষ্ঠব। পর্তুগালের মেয়ে মিস পালিনের নরম হাত চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম অমৃতোপম চুম্বন। বলেছিল সে, 'যতদিন আমরা একসঙ্গে থাকব, নবদম্পতির মতো প্রতি রাতে আমরা মিলিত হব।

রাশিয়ার তরুণী নর্তকী নিনা স্বতপ্রণোদিত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় যেতাম তার ঘরে। কাউন্ট রিকলারের রক্ষিতা ছিল সে। তার কলংকিত জীবনের কাহিনী অকপটে বিবৃত করেছিল সে! তার মন ছাড়া দেহ উপভোগ করেছিল অনেকে।

বার্সিলোনার আর্মেলিনা ছিল বড় সরল। তাকে বলেছিলাম, 'আমায় একটা চুমু দেবে।' লজ্জায় মুখ নীচু করেছিল সে। পরে অযাচিতভাবে অনেক চুমু পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে। স্কোলাস্তিকাকেও ভালো লেগেছিল।

স্পার্সাতে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আমার জীবনে এসেছিল আরেকটি রমনী। প্রতি রাতে আমায় দেহ দান করেছিল সে।

MEMOIRS : Jacques Casanova

॥ পরিচিতি ॥

জন্ম যাযাবর, অক্লান্ত পথিক জিয়াকোমো ক্যাসানোভার জন্ম ইতালীতে —১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে আর তিয়াত্তর বছর বয়সে বোহিমিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা অবলম্বনে তিনি একটি অসামান্য স্মৃতিকথা রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা য়ুরোপ জুড়ে সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। অনেকেই মন্তব্য করলেন স্মৃতিকথায় পরিবেশিত কাহিনী-গুলি অলীক, নিছক গালগল্প। বিদগ্ধ আর এক দল সমালোচক নিরলস গবেষণায় ব্রতী হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সত্যের শুদ্ধিতে ঋদ্ধ অবিস্মরণীয় এই আত্মজীবনী। অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস এবং সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন ক্যাসানোভা। চলার পথে নানা দেশের বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। সেইসব রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রেম-প্রীতি-সঙ্গ সাহচর্যের শৃঙ্গার রসাত্মক অধ্যায়গুলির ভাবানুবাদ পরিবেশিত হয়েছে এখানে।

ডেনজার

গী দ্য মঁপাসাঁ

অন্ত ঘর। টেবিলে টি-পট, পেয়ালা-পিরিচ—চা তৈরীর যাবতীয় উপকরণ। কাউন্ট একে একে শীত বস্ত্র ছাড়ছে। কাউন্টেস মার্গারেত একটু

আগে শীতের পোষাক খুলেছে। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে সে কেশ বিন্যাসে

ব্যস্ত। আয়নাতে উদ্ভাসিত হচ্ছে মার্গারেতের রূপ, যৌবন, দেহসৌষ্ঠব। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। লুব্ধ দৃষ্টিতে কাউন্ট তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। বলি বলি করেও শরমে-শংকায় কথাটা বলতে পারছে না কাউন্ট। শেষে বরাত ঠুকে বলে ফেলে, কি কাণ্ডটাই না করলে আজ!' জয়ের উল্লাসে গোরবিনী মার্গারেত বলে, 'তাই নাকি?'

মার্গারেত দু'কাপ চা ঢালল। চা পান করতে করতে কাউন্ট বলে, 'আজকে তুমি যা খেলা দেখালে, তাতে আমার মাথা হে'ট হয়ে গেছে।' ফোঁস করে ওঠে মার্গারেত। ক্রোধে-বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে বলে সে, 'কেন, কী করেছি আমি? আমি কি খুবই বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম?'—অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি কামুক ব্যারেলের কুদৃষ্টি পড়ছে তোমার ওপরে। আমার যে হাত-পা বাঁধা, নইলে হারামজাদাটাকে একবার দেখে নিতাম।'—"আহা আমার বীর পুরুষরে! কই বছর খানেক আগেও তো এসব নিয়ে তোমায় ভাবতে দেখিনি! আর মাদাম সারভিকে নিয়ে নির্লজ্জের মতো তুমি যখন বাড়াবাড়ি করতে তখন আমিও তোমায় কতবার বলেছি, তোমার জন্যে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারিনা। মনে আছে তুমি বলে ছিলে, 'বিয়েটা একটা সামাজিক বাঁধন মাত্র। নীতি মেনে চলা, নিয়ন্ত্রিত জীবন, চর্চা—এসবের প্রশ্নই ওঠে না। আমিও আজ স্বাধীন, স্বাধীন তুমিও।' আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা এক ঘরে বাস করেও পরস্পর পরস্পরের কাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। আমরা আমাদের একমাত্র সন্তানের দিকে চেয়ে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করছি। আমি স্বেচ্ছাচারিণী হলেও তোমার কিছু আসে যায়না এ কথাও বলেছ তুমি। আসল কথা কি জান, মাদাম সারভির সঙ্গে তোমার যে জোর পিরিত চলছে। তার সঙ্গে রগড়া-রগড়ি চলছে, আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে তাই। বাইরের লোকজন সুখী স্বামী-স্ত্রী বলে ভাবে আমাদের আর বাড়িতে আমরা পরস্পরের অজ্ঞাত, অপরিচিত। মাস দুই হলো আর একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—আমায় তুমি রীতিমত হিংসে করছ!"

—'হিংসে করব কেন? আসল কথা কি জান তোমার ঐ রগরগে রসাল শরীর, শাঁসাল যৌবন, উচ্ছলতা আর আবেগ প্রবণতার জন্য শীঘ্রই দশ জনের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে—সেজন্যই তোমায় সাবধান করে দিয়েছি মাত্র।'

—'আর তুমি? তুমি কি সমালোচনার বাইরে? আমাকে জ্ঞান দেওয়ার আগে নিজেকে সংযত কর।'

—'অনেক কিছু দেখে, অনেক ভেবে-চিন্তে আজ তোমায় সংযত হতে বলছি মার্গারেত। আমায় ভুল বুঝ না, লক্ষ্মীটি।'

—'মাদাম সারভির সঙ্গে তোমার মাখামাখির ব্যাপারটা জানার পর থেকে আমারও অমন এক অবৈধ প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ পর্যন্ত আমার কোন প্রেমিক জুটল না।'

—'ইয়ারকি মেরো না।'

—'ইয়ার্কি করব কেন! আমার মনের কথাটাই আজ তোমায় বললাম। আর এটাও জেনে রেখ, প্রেমলীলা আর যৌন চর্চায় তোমার নৈপুণ্যও কম নয়।'

—'মার্গারেত, দোহাই তোমার এসব কথা আর আমায় বলো না। কেন তুমি এত নির্মম হলে প্রিয়তমা? কেন তোমার এত পরিবর্তন হলো?'

—'অকপটেই স্বীকার করা ভালো যে আজ আমার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছে এর জন্যে কে দায়ী? কেন আমি বদলে গেলাম? কেন আমার সুকুমার বৃত্তিগুলির অপমৃত্যু হলো?'

—'রাগ করোনা সোনামনি, তোমায় ভালোর জন্যই ব্যুরেলকে এড়িয়ে যেতে বলেছি। থাক ওসব কথা। এস, নতুন করে আবার আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি, আবাব আমরা এক হয়ে যাই।'

—'কেন হিংসে হচ্ছে বুঝি? হিংসুটে কোথাকার।'

—'না, আমি তোমায় হিংসে করছি না। কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি, অনুকম্পা কিংবা করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকাটাকে আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি আমি। ব্যুরেল ফের যদি কোন দিন তোমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

—'আর তাহালেই সব ঝামেলা চুকে যাবে আর তুমিও আমায় ভালবাসবে, তাই না?' আহা, আমার বীরপুরুষ রে!'

—'হ্যাঁ। তোমায় আমি ভালোবাসব। তোমার জন্যে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত।'

—'চমৎকার! কিন্তু বাধ্য হয়েই তোমাকে আজ জানাতে হচ্ছে, আমি তোমায় ভালোবাসি না।'

চায়ের টেবিলের চারপাশে ঘুরছিল কাউন্ট। তার মনে হলো মার্গারেত সত্যই রূপসী—যৌবনের জোয়ারে টলমল করছে তার সারা শরীর। কাউন্ট সহসা তার স্ত্রী মার্গারেতের কোমল গ্রীবায় চুমু দেয়। ক্রোধে অভিভূত

মার্গারেত বলে 'যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চুকে গেছে, তাকে চুমু খাচ্ছ—স্পর্ধা তোমার কম নয় !'

—'অমন কথা বলো না লক্ষ্মীটি। তুমি জাননা তোমাকে আজ কত সুন্দর লাগছে।'

—'আমার শরীরে বেশ চেকনাই হয়েছে, কি বল ?

—'সত্যই তুমি নিখুঁত সুন্দরী। কোমল বাহুলতা, পেলব শরীর, নরম ঘাড়ে—তোমায় দেখলে দেহটা গরম হয়ে ওঠে।'

'তাহলে আমার গরম গরম সম্পত্তি দেখে ব্যুরেলের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে কি বল ?'

—'ফের নোংরা কথা বলছ ! বিশ্বাস কর তোমার মতো এত রঙ, এত রূপ, এত যৌবন আর কোন মেয়ের মাঝে দেখিনি আমি।'

—'এত ছুক ছুক করছ যে ! কি ব্যাপার ? মনে হচ্ছে অনেক দিন উপোস করে আছ ? নারীদেহ জুটছে না বুঝি ? আজ তাই আমাকে দেখে এত খাই খাই করছ ?'

—'মার্গারেত, তোমার আজ কি হয়েছে বলতো ? আগে তো তুমি কোন দিন এমন অশ্লীল কথা বলতে না ! এসব নোংরা কথাবার্তা শিখলে কোথা থেকে ?'

—'কেন তোমার কাছ থেকে শিখেছি। আমি সব জানি—তোমার চারজন মেয়েমানুষ আছে। সারভি, এক অভিনেত্রী, এক জন বেশ্যা, আর একজন কে নিশ্চই বুঝেছ ! থাক সে কথা ! বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই না ?

—'অমন করো না মার্গারেত। আমি নতুন করে আর একবার ভালো বেসেছি তোমায়।'

—'আহা রে ! খবরদার। আর এক পাও এগুবে না। আমায় স্পর্শ করার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছ তুমি। আমরা দুজনেই আজ স্বাধীন। তোমার চেয়ে সবদিকে থেকে শতগুণে সেরা একটা পুরুষ আমি খুঁজে বের করব। আচ্ছা অমন হ্যাংলামি করছ কেন আমায় দেখে ? রাতারাতি আমি কি তোমার প্রেমিকাদের চেয়ে সুন্দরী হয়ে গেলাম ?'

—'হ্যাঁ সোনামণি। বলছি তো তোমার মত সুন্দরী আর আমার চোখে পড়েনি।

—'আর তুমি তোমার মেয়েমানুষদের পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করেছ ! তুমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাস তাকে প্রতি মাসে কত করে দিয়েছে—

পাঁচ হাজার ফ্রাঁ, কি বল ?'

—'তা হবে।'

'আমাকেও ঐ পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে। তাহলে আমার শরীর নিয়ে যেমন খুশী খেলতে পারবে।'

—'তুমি কি পাগল হলে, মার্গারেত ?'

—'আমি ঠিকই বলেছি। পাঁচ হাজার ফ্রাঁ না পেলে আমি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকব।

মার্গারেত নিজের ঘরে ঢুকতে যায়। কামনাতপ্ত কাউণ্টের নাকে এসে লাগে মার্গারেতের অঙ্গসৌরভ, কামনা-মদির এসেন্সে গন্ধ।

—'সর এখান থেকে। আমায় শুতে দাও।'

—'মার্গারেত, দয়া কর। আমার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

—'যখন ঠিক করেছ সরবে না, তাহলে তোমার সামনেই রাতের পোষাক পরি।'

মার্গারেত একে একে তার বাইরের পোষাক ছেড়ে নগ্ন হলো। লোভনীয় তার বাহুমূল, নরম হাত, রমণীয় গ্রীবা। । চুল খোলার সময় মার্গারেতের পীনোন্নত স্তন দু'টি দেখে কাউণ্ট আর নিজেকে সামলাতে পারল না। গুটি গুটি সে এগুতে থাকে।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মার্গারেত, 'অসভ্য শয়তান। আর একটি পাও এগিয়ো না।'

কাউণ্ট মার্গারেতের নরম হাত দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে মার্গারেত। এসেন্সের শিশি ছুড়ে মারে কাউণ্টের দিকে। কাউণ্ট চিৎকার করে ওঠে, 'তোমার অনেক ছিনালী সহ্য করেছি, আর নয়।' অবিচলিত, অকম্পিতা মার্গারেত বলে, পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে রাজী আছ। তাহলে আমার শরীর পাবে।'

—'না টাকা পাবে না।'

—'কেন ?'

—'বেশ্যাদের পায়ে টাকা ঢালছ আর টাকা না দিয়ে স্ত্রীর নগ্ন শরীর পেতে চাইছ—এটা বুঝি খুব রুচিসঙ্গত কাজ হলো ? নোংরা মেয়েদের দেহ নিয়ে খেলাটা বুঝি তোমার সভ্যতার অঙ্গ ?'

—'আমি স্বীকার করছি কাজটি নিঃসন্দেহেই অশোভন কিন্তু অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের চেয়ে নোংরা আর কিছু হতে পারে না।"

মার্গারেত তার নরম শয্যায় বসে মোজা খুলল। মাখনের মতো নরম ফর্সা সুচারু দু'টি নগ্ন পা, রমনীয় জানু, সুরম্য পায়ের ডিম।

কাউণ্ট বললে, 'মার্গারেত তুমি প্রকৃতিস্থ হও, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অযৌক্তিক ঐ আবদার করো না।'

—'অযৌক্তিক? আমি তো অযৌক্তিক আবদার করিনি। খিদে পেয়েছে আজ তাই আমার দেহটাকে ভোগ করতে চাইছ, এই পর্যন্ত। এদিকে আমাদের দাম্পত্য প্রেমে ফাটল ধরেছে। বাজারের মেয়েগুলোর পেছনে তুমি যদি টাকা খরচ করতে পার, তাহলে আমার পেছনে খরচ করতে সংকুচিত হচ্ছ কেন? যাক ওসব তর্কাতর্কি ছাড়। আমার টাকা চাই।'

কাউণ্ট এক তাড়া নোট ছুড়ে দিল মার্গারেতের দিকে। প্রীতি মার্গারেত টাকা গুণল। কাউণ্ট বলে, 'মনে রেখ খরচের জন্যে কিন্তু টাকাটা দিইনি।'

মার্গারেত বলল, 'এখন থেকে আমায় মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে। টাকা না পেলে যতই তোমার খিদে পাক না কেন, আমার দেহ পাবে না। আর আমার নিরাবরণ দেহটা যদি তোমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে তাহলে আমার মাসহারা বাড়াতে হবে। আর সে সময় বেশি টাকা না দিতে চাইলে বেশ্যাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

* * *

লেখকের জীবনী লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে প্রকাশিত।

নাইটিঙ্গেল পাখীর গান

গিয়োভানি বোকাসিও

বেশীদিনের কথা নয়। রোমানা বলে এক জায়গায় মেসের লিজিও দ্য ভ্যালবোনা নামে এক অতি সম্মানীয় ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাস করতেন। যখন তিনি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে পৌঁছেচেন, ভাগ্যক্রমে তাঁর স্ত্রী ম্যাডোনা গীয়াকোমিনা তাঁকে একটি কন্যারত্ন উপহার দিলেন। বয়স বাড়তেই সেই মেয়েটি ওই অঞ্চলের সব মেয়েকে তার সৌন্দর্য ও লাবণ্যে ছাড়িয়ে গেলো। বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে। তাঁরা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার উপর নজর রাখতেন। তাঁদের উচ্চাশা, কোন উচ্চ বংশজাত ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন।

এদিকে, মেসের লিজিওর গৃহে একটি সুদর্শন চটপটে যুবকের যাতায়াত ছিলো। নাম রিসিয়ার্ডো ডে ম্যানারডি দ্য ব্রিটিনোরো। মেসের লিজিও তার সঙ্গে অনেকটা সময় গল্প গুজব করে কাটাতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তার উপর নজরদারির কথা মনেও ভাবতেন না! কারণ তাঁরা তাকে আপন ছেলের মতো দেখতেন।

মেয়েটির উপর যখন নজর পড়লো, রিসিয়ার্ডো তার অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলো। মেয়েটির আভিজাত্যপূর্ণ চালচলন, মধুর সরলতাপূর্ণ ব্যবহার, তার উপর তার বিয়ের বয়স হয়েছে দেখে, সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মেয়েটিকে ভালবেসে ফেললো। তার এই মনোভাব লুকোতে অনেক কষ্ট পেতে হলো। ছেলেটি যে তার প্রেমে পড়েছে, এটা কিন্তু মেয়েটি ঠিক ধরতে পেরেছিলো। রিসিয়ার্ডোর ভাগ্য ভালো, মেয়েটি এতে ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং একই প্রকার আগ্রহ নিয়ে তাকে ভালবাসতে লাগলো। যদিও মেয়েটির

সঙ্গে ভালবাসার কথা বলার জন্য ছোকরাটি হাপিত্যেশ করে থাকতো, কিন্তু মেয়েটির কাছে এলেই সে কেমন যেন চুপসে যেতো।

অবশেষে একদিন এক শুভ মুহূর্তে সে সাহস সঞ্চয় করে মেয়েটিকে বললো, ক্যাটেরিণা, তোমাকে ভালবাসার জন্য, আমাকে আগে মরতে দিও না।

মেয়েটি উত্তরে বললো, ভগবান জানেন, তোমাকে ভালবাসার জন্য, তুমি আমাকে আগে মরতে দিও না।

রিসিয়ার্ডো মেয়েটির মুখে একই উত্তর শুনে পরম আহ্লাদিত হলো। উৎসাহিত হয়ে, সে তাকে বললো, তুমি যা চাও বল, আমি তাই-ই করবো। অবশ্য যাতে আমরা দুজনেই বাঁচি তুমি সে উপায় বের করবে বল।

একথার উত্তরে মেয়েটি বললো, রিসিয়ার্ডো, তুমি তো জানো আমাকে কীভাবে চোখে চোখে রাখা হয়। আর এজন্যেই আমি ভাবতে পারিনে তুমি কীভাবে আমার কাছে আসবে। তবে তুমি যদি কোন বুদ্ধি বাৎলাও, আমার উপর কোন কলঙ্ক না নিয়ে, আমি তা করতে পারি। বল আমাকে কী করতে হবে, আমি তা করবো।

রিসিয়ার্ডো অনেক রকম পরিকল্পনার কথা মনে মনে ভাবলো। তারপর হঠাৎ বললো, আমার মিষ্টি ক্যাটেরিনা তোমার জন্য একটি মাত্র পথই আমি বাৎলাতে পারি। আর তা হচ্ছে, রাতে তুমি তোমার বাবার, বাগানের—দিকে ঝুঁকে পড়া ঝুল বারান্দায় এসো। অথবা তার চেয়ে ভালো হয়, যদি তুমি ওখানে শোও। যদিও ঝুলবারান্দাটা খুব উঁচুতে, কিন্তু আমি যদি জানি তুমি ওখানে রাত কাটাচ্ছো, আমি নির্দ্বিধায় তোমার কাছে পেঁছুতে চেষ্টা করবো।

ক্যাটেরিণা উত্তর করলো, ঝুলবারান্দায় উঠতে যদি তুমি সাহস পাও, তাহলে আমি নিশ্চিত সেখানে শোবার ব্যবস্থা করবো।

রিসিয়ার্ডো তাকে প্রতিশ্রুতি দিলো, ঠিক আছে।

তারপর তারা দ্রুত একটা চুমু খেয়ে, আলাদা আলাদা পথে নিষ্ক্রান্ত হলো।

সেটা ছিলো মে মাসের শেষ দিক। রিসিয়ার্ডোর সঙ্গে কথোপকথনের পর-দিন সকালে, মেয়েটি তার মায়ের কাছে অভিযোগ করতে আরম্ভ করলো, আগের রাতে সে গরমের জন্য ঘুমোতে পারেনি।

মা বললেন, তুমি এ কথা বলছো বাছা। কাল রাতে এক কোটা

গরম ছিলো না তো। মায়ের কথা শুনে ক্যাটেরিণা বললো, মা, তুমি যদি 'আমার মতে' কথাটা যোগ করতে তাহলে ঠিক হতো। তোমার মনে রাখা উচিত উঠতি বয়সের মেয়েরা, বয়স্কা মহিলাদের চেয়ে বেশী গরম বোধ করে।

মা বললেন, তা ঠিক বলেছো বাছা। কিন্তু আমাকে তুমি কী করতে বল? আমি তোমার জন্যে তাকে গরম বা ঠাণ্ডা করতে পারিনে। ঋতু অনুসারে, যখন যে রকম আবহাওয়া, তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে। মনে হয় আজ রাতে ঠাণ্ডা পড়বে; তুমি ভালভাবেই ঘুমুতে পাবে।

ভগবান করুন, তোমার কথা যেন সত্য হয়। বললো ক্যাটেরিনা। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এগিয়ে আসচে, এখন রাতে ঠাণ্ডা পড়ার কথা নয়।

তাহলে, তুমি আমাদের কী করতে বল? মা জানতে চাইলেন।

যদি তুমি আর বাবা মত কর, আমি বাবার ঘরের সামনের ঝুলবারান্দায় একটা ছোট বিছানা পাততে পারি আর নাইটিঙ্গেল পাখীর গান শুনতে শুনতে ঘুমুতে পারি। ওখানে বেশ ঠাণ্ডা। আমি ঘরের চেয়ে বাইরে ভালই থাকবো।

তার মা বললেন, ঠিক আছে বাছা, আমি তোমার বাবার সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলবো। তোমার বাবা যা ঠিক করবেন, তাই করা যাবে।

মহিলাটি তাদের আলোচনা মেসের লিজিওকে জানালেন। আর বাবা মশায়, তাঁর বয়সের জন্যই হোক, একটু খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠেছেন।

অ্যাঁ, নাইটিঙ্গেল পাখী গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে! তিনি ঝাঁকিয়ে উঠে বললেন। এরকম বাজে আব্দার যেন আর না শুনি, বলে দিও তাকে।

একথা শুনে পরদিন রাত্রে, বাবাকে আরও উত্যক্ত করার জন্য (যেন সে খুব গরম বোধ করছে) ক্যাটেরিণা নিজেই শুধু জেগে রইলো না, অনবরত গরম লাগার নালিশ করে, তার মাকেও এক ফোঁটা ঘুমুতে দিলো না।

সুতরাং পরদিন সকালে তার মা সোজা মেসের লিজিওর কাছে হাজির হয়ে বললেন, দ্যাখো কর্তা, তুমি নিশ্চয়ই তোমার মেয়েকে তেমন ভালোবাসো না। সে ঝুল বারান্দায় ঘুমুক বা না ঘুমুক, কী আসে যায় তোমার! তোমার মেয়েটা গরমের জন্য এক মুহূর্তে দু' চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তাছাড়া, যদি একটা সোমত্ত বয়সের মেয়ে নাইটিঙ্গেল পাখীর গানে আনন্দ পায়, তাতে বিস্মিত হবার কী আছে? এ বয়সের মেয়েরা সাধারণত ঐ সব জিনিসেই আকৃষ্ট হয়। ওসবই তাদের স্বভাবে প্রতিফলিত হয়।

[illegible]

[illegible]

"বাপ মত দিয়েছেন" শ্বনে মেয়েটি তাড়াতাড়ি ঝ্বল বারান্দায় বিছানা নিয়ে পাতলো। আর ওখানে শোয়াই যখন তার মনোগত বাসনা, সে রিসিয়ার্ডোর আসার প্রতীক্ষায় রইলো। তারপর আগের সাট মতো, তাকে সঙ্কেতে সব জানালো।

মেসের লিজিও যখন শ্বনতে পেলেন যে মেয়ে শ্বয়ে পড়েছে তিনি তাঁর ঘর থেকে ঝ্বলবারান্দায় যাবার পথের দরজায় তালা লাগালেন। তারপর নিজের বিছানায় যেয়ে শ্বয়ে পড়লেন।

যখন আর কোন শব্দ শোনা গেলোনা, রিসিয়ার্ডো একটা মইয়ের সাহায্যে পাঁচিলের উপর উঠলো। তারপর সেখানে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে অনেক কষ্টে ঝ্বল বারান্দা পর্যন্ত পেঁছিলো। প্রতি ম্বহ্বর্তে পড়ে যাওয়ার একটা গ্বর্বতর বিপদের সম্ভাবনা ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অক্ষত অবস্থায় ঝ্বল বারন্দায় উঠলো। সেখানে মেয়েটি নিঃশব্দে তাকে পরম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলো। অনেক অনেক চুম্বন বিনিময়ের পর তারা দ্বজনে জড়াজড়ি করে শ্বয়ে পড়লো। সত্য বলতে কি, সারাটি রাত তারা আনন্দ ও স্ফুর্তিতে কাটালো। কিছ্বক্ষণ বিরতির পর পর নাইটিঙ্গেল পাখীর ডাক ডাকলো।

তাদের স্ফুর্তি অফুরন্ত। কিন্তু রাত্রি ছোট। যদিও তাদের হ্বঁশ ছিলো না, যখন ঘ্বমিয়ে পড়লো, তখন প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিলো। আর তাদের গায়ে এক টুকরো স্বতো পর্যন্ত ছিলো না। আমোদ স্ফুর্তি করে ও লৈশজপে তারা তখন ক্লান্ত। ক্যাটেরিণা তার ডান হাতই ভাঁজ করে রিসিয়ার্ডোর গলা জড়িয়ে শ্বয়েছিলো। আর বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটির শরীরের যে অংশটির ধরে ছিলো, তা মহিলা ও প্বর্ষদের সম্মিলিত সমাবেশে উল্লেখ করা যায় না।

ভোর হলো। কিন্তু তাদের জাগাতে পারলো না। যখন মেসের লিজিও শয্যাত্যাগ করে উঠলেন, তখনও তারা একই ভঙ্গীতে ঘ্বমিয়ে। মেসের লিজিওর মনে পড়লো তাঁর কন্যাটি ঝ্বল বারান্দায় ঘ্বমিয়েছিলো। তিনি নিঃশব্দে দরজা খ্বলে আপন মনে বললেন, যাই দেখি, মেয়েটা নাইটিঙ্গেল পাখীটা

সাহায্যে ভালো করে ঘুমুতে পেরেছি কিনা!

প্যাসেজটুকু পেরিয়ে এসে, তিনি আলতো ভাবে পর্দাটা তুললেন। দেখলেন রিসিয়ার্ডো আর ক্যাটেরিণা নগ্ন দেহে, নিবারণ অবস্থায় একে অন্যের বাহুবন্ধনে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আর ভঙ্গীটি, আগে যেমনটি বলা হয়েছে। তেমনটি।

সুস্পষ্টভাবে রিসিয়ার্ডোকে চেনার পর, তিনি সেখান থেকে দ্রুত তাঁর স্ত্রীর কক্ষে চলে এলেন। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, গিন্নি, শীগগির উঠে এসে দ্যাখো, তোমার কন্যারত্ন কেমন নাইটিঙ্গেল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, ওৎ পেতে তাকে ধরে ফেলেছে। আর তাকে এখনও হাতে ধরে রেখেছে।

কী বলছো তুমি? ভদ্রমহিলা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন।

যদি দেখতে চাও, শীগগির এসো। মেসের লিজিও বললেন।

মহিলাটি তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিঃশব্দে মেসের লিজিওর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন, যতক্ষণ না কন্যার শয্যার পাশে গিয়ে পৌঁছলেন। মশারীর পর্দা তোলা হলো। আর ম্যাডোনা গীয়াকোমিনা স্বচক্ষে দেখলেন, ঠিক যেমনটা তার মেয়ে নাইটিঙ্গেলকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আছে, যে নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে সে আকাঙ্ক্ষা করেছিলো।

ভদ্রমহিলার বুঝতে বাকি রইলো না, রিসিয়ার্ডো তাকে কী সাংঘাতিকভাবে প্রতারণা করেছে। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে গাল দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেসের লিজিও তাকে বাধা দিয়ে বললেন, গিন্নি, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে জিহ্বা সংযত কর। আমাদের মেয়ে যখন ওকে গ্রহণ করেছে, সে ওকে রাখবেই। রিসিয়ার্ডো একটা পয়সাওয়ালা ছোকরা এবং একটা বনেদী ঘরের সন্তান। আমরা তার যতটা ক্ষতি করতে পারি, তার চেয়ে তাকে জামাই করে নেওয়া অনেক বেশী লাভজনক। যদি সে এ বাড়ী থেকে অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরতে চায়, তবে সর্বপ্রথম আমাদের মেয়েকে তার বিয়ে করতে হবে। তাতে সে তার নাইটিঙ্গেল পাখীকে তার নিজের খাঁচায় রাখতে পারবে।

অন্যের খাঁচায় নয়।

গিন্নি বুঝলেন যা ঘটেছে তাতে তাঁর স্বামী অযথা বিরক্ত হন নি। আরও বুঝলেন তাঁর মেয়ে একটি মধুর রাত্রি যাপন করে যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছে এবং নাইটিঙ্গেলকে করায়ত্ত করে শান্ত হয়েছে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, রিসিয়ার্ডো জেগে উঠলো। আর

সকাল হয়ে গেছে দেখে, সে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লো। ক্যাটেরিণাকে ডেকে বললো, হায় আমার সোনা, সকাল হয়ে গেছে। আমরা ধরা পড়ে গেছি। এখন আমাদের কী উপায় হবে?

এ কথার উত্তরে মেসের লিজিও এগিয়ে এসে, পর্দা তুলে বললেন, তুমি কী প্রত্যাশা কর?

মেসের লিজিওকে দেখে রিসিয়ার্ডোর আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়ার উপক্রম। বিছানার সঙ্গে সেঁটে যেয়ে সে বললো, দোহাই কর্তা, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমাকে দয়া করুন। আমি জানি মৃত্যুই আমার প্রাপ্য, কারণ আমি অবিশ্বাসী বদমাস, কাজেই আপনার যা খুশী আমাকে নিয়ে করতে পারেন। কিন্তু আমি আমার প্রাণভিক্ষা চাইছি, যদি সম্ভব হয়। আমাকে যেন খুন করবেন না, এই আমার একান্ত মিনতি।

মেসের লিজিও বললেন, রিসিয়ার্ডো, তোমার উপর আমার যে স্নেহ ও বিশ্বাস ছিলো, সে ক্ষেত্রে এ কাজ সম্পূর্ণ আপত্তিকর। কিন্তু যা হবার হয়েছে, তার আর ক্ষমা নেই। তোমার উচিত বয়সই তোমাকে এই মারাত্মক ভুলের পথে নিয়ে গেছে। কাজেই তোমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার জন্য, আমার কিছু করার আগে, তোমাকে অব্যশই কিছু করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে, সারা-জীবনের জন্য ক্যাটেরিণাকে তোমার আইনগ্রাহ্য পত্নী করে নিতে হবে। এর ফলে, সে শুধু আজকের রাতের জন্যই তোমার হবে না, যতদিন সে বেঁচে থাকবে, একান্তভাবে তোমারই থাকবে। আর এই উপায়েই কেবল তোমার মুক্তি পেতে পারো, আমার ক্ষমা পেতে পারো। অন্যথায় তুমি তোমার সৃষ্টি-কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হও।

যখন এই সব কথাবার্তা চলছিলো, ক্যাটেরিণা জেগে উঠে নাইটিঙ্গেলকে ছেড়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় দিয়ে কোন রকমে নিজেকে ঢাকলো। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে, রিসিয়ার্ডোকে ক্ষমা করতে বাবাকে অনুরোধ করলো। এবং যাতে তারা দীর্ঘদিন নিরাপদে ও পরম সুখে রাত্রি যাপন করতে পারে, সেজন্য বাবা যা করতে বলছেন, সেই মত করতে রিসিয়ার্ডোকে অনুরোধ করলো।

এ সব যুক্তি অবশ্য বাহুল্য মাত্র। কারণ একদিকে নীতি ভঙ্গের লজ্জা এবং প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছে, অন্য দিকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে (এই গভীর প্রেমের বস্তু লাভ করার আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ না করে) এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে রিসিয়ার্ডো সঙ্গে সঙ্গে মেসের লিজিও যা বলেছেন সেই মত কাজ

পরতে রাজী হলো।

সুতরাং মেসের লিজিও ম্যাডোনা গীরাকোমিনার কাছ থেকে বাগদান কার্যের জন্য একটা আংটি ধার করলেন এবং রিসিয়ার্ডো ক্যাটেরিণাকে বিয়ে করলো। আর সেখানে উপস্থিত থেকে বাপ মা দুজনেই এই বিয়ের সাক্ষী রইলেন।

তারপর মেসের লিজিও এবং তাঁর স্ত্রী সেখান থেকে সরে গেলেন। যাবার আগে বললন, যাও এবার ঘুমুও গে, তোমাদের এখন জেগে থাকার চেয়ে বিশ্রামের প্রয়োজন বেশী।

বাপ মা চলে যেতেই, দুই ছোকরা ছুকরী আবার একে অন্যের বাহু বন্ধনে ধরা দিলো। বলতে কি সারা রাতে তারা আধডজন বার সীমানা অতিক্রম করেছিলো। সকালে বিছানা ছাড়ার আগে তার সঙ্গে আরও দুবার যুক্ত হলো। প্রথম রাতে এটুকুতেই তারা ক্ষান্তি দিলো।

শয্যাত্যাগের পর রিসিয়ার্ডো মেসের লিজিওর সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলো। কয়েকদিন পর সে এবং ক্যাটেরিণা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সামনে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়েটা পাকা করলো। তার পর তুমুল আনন্দোল্লাসের মধ্যে নববধূকে ঘরে নিয়ে এলো। সেখানে বিপুল আড়ম্বর ও মর্যাদার সঙ্গে বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

তারপর বহু বছর ধরে নাইটিঙ্গেলকে দিনরাত্তির খাঁচায় পুরে দীর্ঘদিন তারা দুজনে সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করেছিলো।

॥ পরিচীত ॥

গিয়েভানি বোকাসিও ॥ গিওভানি বোকাসিওর জন্ম ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ফ্লোরেন্সে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার। ১৩২৫ থেকে ১৩২৮ সালের মধ্যে বাবা ছেলেকে ব্যাঙ্ক ব্যবসা শিখতে নেপলস্-এ পাঠান। কিন্তু বোকাসিওর তাতে আগ্রহ ছিলো না। তাই তাকে

আইন পড়তে পাঠান হলো। না, তাতেও মন বসলো না তার। কিন্তু সাহিত্য—চর্চায় তার অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলো।

সে সময় নেপলস্ ছিলো পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির লীলা ক্ষেত্র। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বোকাসিও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। সেখানে শীঘ্রই তিনি বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন।

১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোকাসিও দেহত্যাগ করেন। বোকাসিওর ডেকামেরণ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। এই বই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলো। আলোচ্য গল্পটি ডেকামেরণ থেকে নেওয়া। নামকরণ অবশ্য অনুবাদকের। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'এলজিয়া ডি ম্যাডানা ফীয়ামেণ্টা, প্রথম আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে পরিচিত।—

নৈশভিশার | গিয়োভানি বোকাসিও

বেশী দিনের কথা নয়। উপত্যকায় একটি সাচ্চা লোক বাস করতো। পথ চলতি লোকদের খাদ্য-পানীয় যুগিয়ে সে সৎভাবে পয়সা রোজগার করতো। লোকটি গরীব। তার কুটিরটিও ছোট। কিন্তু তবু বিপদে আপদে পড়লে রাতের মতো লোকেদের থাকার জায়গা দিতো। তবে তারা তার পরিচিত হওয়া চাই। এই লোকটির বউটি পরমাসুন্দরী। দুটো মাত্র সন্তানের জননী। বড় মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই আকর্ষণীয়। বয়স পনেরো কি ষোল। আর কোলেরটির বয়স বছর পুরেনি। মায়ের দুধ খায় এখনও।

কন্যাটি ফ্লোরেন্সের এক সুন্দর ছোকরার দৃষ্টি কেড়েছে। সে ছোকরাটি মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কন্যাটিরও সেই দশা। সে প্রেমের স্বীকৃতি দিতেও দুজনে প্রস্তুত, কিন্তু হলে কি হবে পিনুসিও (ছোকরাটির নাম তাই বটে) মেয়েটি বা নিজেকে ধরা দিয়ে, বকুনি খেতে চায় না।

অবশেষে, প্রেমের স্রোত যখন বাঁধ মানে না, পিনুসিও যখন মেয়েটির সঙ্গ-লাভের জন্য লালায়িত, ভাবলো যা ঘটে ঘটুক, যে ভাবেই হোক একটা রাত মেয়েটির বাপের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। আর তাহলে মেয়েটির সঙ্গ-সুখ সে পেতে পারবে। আর যেই নাকি এই চিন্তা তার মাথায় ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে পরিণত করার জন্য তৎপর হলো সে।

একদিন বিকেলে, সে আর তার বিশ্বাসী সঙ্গী অ্যাড্রিয়ানো যে নাকি মেয়েটির সঙ্গে ভাব ভালবাসার কথা জানতো, এক জোড়া ঘোড়া ভাড়া করলো। তাতে থলেতে মাল চাপালো (মাল বলতে সম্ভবত খড় দিয়ে ভর্তি থলে) যেন

আইন পড়তে পাঠান হলো। না, তাতেও মন বসলো না তার। কিন্তু সাহিত্য—চর্চায় তার অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলো।

সে সময় নেপলস্ ছিলো পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির লীলা ক্ষেত্র। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বোকাসিও ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। সেখানে শীঘ্রই তিনি বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন।

১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোকাসিও দেহত্যাগ করেন। বোকাসিওর ডেকামেরণ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। এই বই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলো। আলোচ্য গল্পটি ডেকামেরণ থেকে নেওয়া। নামকরণ অবশ্য অনুবাদকের। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'এলজিয়া ডি ম্যাডানা ফীয়ামেণ্টা, প্রথম আধুনিক মনস্তাত্বিক উপন্যাস বলে পরিচিত।—

নৈশভিশার | গিয়োভানি বোকাসিও

বেশী দিনের কথা নয়। উপত্যকায় একটি সাচচা লোক বাস করতো। পথ চলতি লোকদের খাদ্য-পানীয় যুগিয়ে সে সৎভাবে পয়সা রোজগার করতো। লোকটি গরীব। তার কুটিরটিও ছোট। কিন্তু তবু বিপদে আপদে পড়লে রাতের মতো লোকেদের থাকার জায়গা দিতো। তবে তারা তার পরিচিত হওয়া চাই। এই লোকটির বউটি পরমাসুন্দরী। দুটো মাত্র সন্তানের জননী। বড় মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই আকর্ষণীয়। বয়স পনেরো কি ষোল। আর কোলেরটির বয়স বছর পুরেনি। মায়ের দুধ খায় এখনও!

কন্যাটি ফ্লোরেন্সের এক সুন্দর ছোকরার দৃষ্টি কেড়েছে। সে ছোকরাটি মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কন্যাটিরও সেই দশা। সে প্রেমের স্বীকৃতি দিতেও দুজনে প্রস্তুত, কিন্তু হলে কি হবে পিনুসিও (ছোকরাটির নাম তাই বটে) মেয়েটি বা নিজেকে ধরা দিয়ে, বকুনি খেতে চায় না।

অবশেষে, প্রেমের স্রোত যখন বাঁধ মানে না, পিনুসিও যখন মেয়েটির সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত, ভাবলো যা ঘটে ঘটুক, যে ভাবেই হোক একটা রাত মেয়েটির বাপের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। আর তাহলে মেয়েটির সঙ্গসুখ সে পেতে পারবে। আর যেই নাকি এই চিন্তা তার মাথায় ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে পরিণত করার জন্য তৎপর হলো সে।

একদিন বিকেলে, সে আর তার বিশ্বাসী সঙ্গী অ্যাড্রিয়ানো যে নাকি মেয়েটির সঙ্গে ভাব ভালবাসার কথা জানতো, এক জোড়া ঘোড়া ভাড়া করলো। তাতে থলেতে মাল চাপালো (মাল বলতে সম্ভবত খড় দিয়ে ভর্তি থলে) যেন

ফ্লোরেন্সে থেকে আসচে এমন ভান করে মাগনান উপত্যকায় এসে হাজির হলো। আর তা এমন সময় যে সময়ে রাত নেমেছে। এসে কড়া নাড়লো দুজনে। আর যে হেতু পিনুসিও এবং অ্যাড্রিয়ানো দুজনেই পরিচিত, কাজেই দরজা খুলে বাইরে এলো বাড়ীওয়ালা। পিনুসির বললো, রাতের মতো আমাদের একটু আশ্রয় দিতে হবে। আমরা আঁধার নামার আগেই ফোরেন্সে পেঁছবো আশা করেছিলাম, কিন্তু দেখছেনই তো, আমরা এ পর্যন্ত আসতেই রাত হয়ে গেলো। এখন সহরে ঢোকার পক্ষে খুব দেরী হয়ে গেছে।

গৃহকর্তা বললেন, প্রিয় পিনুসিও, তুমি তো জানই, আমি তোমাদের রাজসিক থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো না। কিন্তু কি আসে যায়. রাত যখন হয়েছেই, আর তোমাদের যখন কোথাও থাকার জায়গা নেই, আমি খুশী মনে যতটা পারি তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করবো।

কাজেই দুই ছোকরাই ঘোড়া থেকে নামলো। যখন দেখলো তাদের ঘোড়া দুটো ভালভাবেই আস্তাবলে ঢুকেছে, তারা নিজেরাও ঘরে ঢুকলো। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো ভালোই। বাড়ীওয়ালার সঙ্গেই তারা নৈশভোজন সারলো। এবার শোবার পালা। একটি মাত্র ছোট ঘর। তার মধ্যে তিনটি ছোট ছোট শোবার ব্যবস্থা। ফলে স্থান এত সংকীর্ণ যে ঘরে চলাফেরা করা মুশকিল। দুটো বিছানা একদিকের দেওয়ালের দিকে। তৃতীয়টি তার উল্টো দিকে। তৃতীয় শয্যাটিই অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক বলে গৃহকর্তা অতিথিদের সেটায় শুতে অনুরোধ করলো। তারা ঘুমুলে (আসলে মোটেই তারা ঘুমোইনি কিন্তু) মেয়েকে অন্য একটি শয্যায় শুতে দিয়ে নিজে তার বউকে নিয়ে অন্য আর একটিতে শুয়ে পড়লো। বউয়ের পাশে বাচ্চার ছোট্ট খাটটা।

মনে মনে এসবের ছক মাথায় নিয়ে পিনুসিও অপেক্ষা করতে লাগলো যতক্ষণ না সে না নিশ্চিত হলো যে প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর চুপিসারে বিছানা ছেড়ে তার প্রেমিকার বিছানার দিকে এগিয়ে যেয়ে তারপাশে শুয়ে পড়লো। মেয়েটি আগেই এই অভিসন্ধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলো। ফলে চরম আশ্লেষে দুহাত দিয়ে তাকে টেনে নিলো নিজের দিকে। তারপর তারা এতদিন ধরে যে সুখের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো, তা সুরু করলো।

এদিকে পিনুসি ও মেয়েটি যখন ঐ কাজে লিপ্ত, একটা বেড়াল কোথাও কি যেন ফেলে দিয়ে বসেচে। শব্দ পেয়ে গিন্নি চমকে উঠলো। কী ঘটেছে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো। তারপর যেদিক থেকে শব্দটা আসছিলো অন্ধকারে সেই দিকে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেলো।

এর মধ্যে আবার আরেক কাণ্ড। অ্যাড্রিয়ানো উঠে বসেছে। না, ওজন্য নয়। বাইরে যাবে বলে। অন্ধকারে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ঠেকলো বাচ্চার খাটটি। তা সরিয়ে সে বাইরে গেলো। কিন্তু ফেরার সময় ছোট্ট খাটটি সরিয়ে রেখে আসতে ভুলে গেলো।

এদিকে মহিলাটি বেড়ালের খোঁজে বেরিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হলো না, তেমন কিছু পড়ে যায় নি, তখন তার নিজের বিছানার দিকে ফিরতে লাগলো। বাতি জ্বালাবার ঝামেলায় গেলনা সে। অন্ধকারের মধ্যেই সতর্কভাবে এগুতে লাগলো যে বিছানায় তার স্বামী শুয়ে আছে। কিন্তু বাচ্চার দোলনার খাটটির নাগাল না পেয়ে নিজের মনেই বললো, আমি কী বোকা, আমি বিনা ভুল করে আমাদের রাতের অতিথিদের বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম।

সুতরাং সে আরও একটু এগিয়ে গেলো। খাটটাও হাতে ঠেকলো। নিশ্চিন্ত হয়ে সে অ্যাড্রিয়ানোর পাশে যেয়ে শুয়ে পড়লো। ভাবলো স্বামীই শুয়ে আছে।

অ্যাড্রিয়ানো জেগেই ছিলো। ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরী হলো না। কাজেই অভ্যর্থনাটা খুব আন্তরিকই হলো। কোন শব্দ না করে সে ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গনে তাকে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করতে লাগলো। এদিকে ঘটনা দাঁড়ালো পিনুসিও তার এতদিনের সাধ মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কে জানে যদি প্রেমিকার বাহুবন্ধন সে ঘুমিয়ে পড়ে! সুতরাং নিজের বিছানার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো সে। কিন্তু শয্যার কাছে যেতেই দোলনা খাটটা ঠেকলো। ভাবলো, তবে তো এটা কর্তার খাট। কাজেই সে এগিয়ে যেয়ে যে বিছানা পেলো সেটায় শুয়ে পড়লো। আসলে শুলো সে কর্তার পাশে। আর তাকে অ্যাড্রিয়ানো ভেবে, অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলো, আমি তোমাকে শপথ করে বলিনি, নিককোলোসা মতো এমন সুস্বাদু বস্তু আর কোথাও নেই। ঈশ্বরের নামে বলছি। কোন লোক কোন মেয়েকে ভোগ করে এমন আনন্দ পায়নি যা নাকি আমি তার সঙ্গে পেলাম এতক্ষণ ধরে। তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি কমপক্ষে ছ'বার আমি সে স্বাদ পেয়েছি।

সত্যি বলতে কি, পিনুসিওর কথায় কর্তার খুশী হবার কথা নয়। প্রথমে সে ভাবলো, ছোকরা কী করছিলো তার বিছানায়। তারপর রাগ সামলাতে না পেরে বলে উঠলো এই পিনুসিও, এ কোন ধরণের শয়তানী হে? আমার সঙ্গে চালাকী খেলবে ভাবিনি। দাঁড়াও, তোমাকে আমি উচিত

জবাব দেবো।

এখন হয়েছে কি, পিনুসিও বুদ্ধিমান ছোকরা নয় মোটেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কোথায় সে তার ভুল শুধরাবে. তার বদলে সে বলে উঠলো, আমাকে ফেরৎ জবাব দেবে? কিভাবে? তুমি আমার কি করতে পারবো?

অন্যদিকে গৃহকর্তার স্ত্রী, যে নাকি ভেবেছে স্বামীর সঙ্গেই শুয়ে আছে, অ্যাড্রিয়ানোকে বললো, হায় ভগবান, দ্যাখো আমাদের অতিথিরা দুজনে কেমন তর্ক জুড়েছে।

অ্যাড্রিয়ানো হেসে উত্তর দিলো, করতে দাও। জাহান্নামে যাক। দুজনে কালরাতে বেশ টেনেছে।

মহিলাটি কিন্তু এতক্ষণে তার স্বামীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ধরতে পেরেছে। অ্যাড্রিয়ানোর গলা শুনে সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো কার বিছানায় শুয়ে আছে। কিছু বুদ্ধি সুদ্ধি রাখে মলিাটি, আর একটিও কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো সে। ছেলের দোলনা খাটটি সরিয়ে বড় মেয়ের খাটের পাশে রাখলো। তারপর অন্ধকারেই বড় মেয়ের পাশে যেয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর, যেন স্বামীর চোঁচামেচিতেই ঘুম ভাঙলো এই ভাণ করে, স্বামীকে ডেকে বললো, কী হয়েছে? পিনুসিওর সঙ্গে ঝগড়া করছো কেন? তার স্বামী উত্তর কয়লো। শুনছো, না, ও বলছে, রাতে ও নিকোলোসার সঙ্গে কী করেছে?

আরে, ও এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলছে। মহিলাটি উত্তর দিলো। ও নিকোলোসার ধারে কাছে ছিলো না। আমি নিজেই তো সারাক্ষণ নিকেকোলোসার পাশে শুয়ে। এক চিমটি ঘুম আসেনি আমার। তুমি একটা বোকা তাই ওর কথায় গুরুত্ব দিচ্ছো। তোমরা পুরুষেরা সন্ধ্যায় এতো মদ গেলো যে সারারাত স্বপ্ন দেখো আর ঘুমের মধ্যে সারা ঘর ঘুরে বেড়াও। কল্পনা কর যে সব অলৌকিক কর্মই তোমরা করে ফেলেছো। হাজার গুণ ভাগ্য যে তোমরা উল্টে পড়ে নাক ভাঙো না। তা পিনুসিও ওখানে কী কাণ্ড করছে? সে তার নিজের বিছানায় নেই কেন?

দেখুন, কী কায়দায় মহিলাটি নিজের এবং মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচালো।

অ্যাড্রিয়ানোও তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে যেয়ে বললো, আমি তোমাকে আর কতবার বলবো পিনুসিও যে রাত দুপুর হেঁটে বেড়িও না! একদিন দেখো কী বিপদে পড়বে, এই তোমার ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলার জন্যে আর ঐ যে তুমি যা উদ্ভট কান্ড করছো বলে স্বপ্ন দেখো!

তার স্ত্রীর কথায় অ্যাড্রিয়ানোকে সায় দিতে শুনে, গৃহকর্তা ভাবতে লাগলেন, হ্যাঁ ঠিকই, পিনুসিও স্বপ্নই দেখছিলো। তার কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে কর্তা বললো, এই পিনুসিও জেগে ওঠো! তোমার বিছানায় ফিরে যাও।

সব যখন ঠিক ঠাক, তখন পিনুসিও আবার ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতেই গৃহকর্তা হো হো করে হেসে ওঠলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত. অনেক ঝাঁকুনি খেয়ে সে জেগে ওঠার ভাণ করলো। তারপর অ্যাড্রিয়ানোকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাকে জাগালে কেন? সকাল হয়েছে?

উত্তর দিলো অ্যাড্রিয়ানো, আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে চলে এসো।

পিনুসিও তার ভণিতা বজায় রাখলো। দেহে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার প্রতিটি চিহ্ন ফুটিয়ে তুললো। অবশেষে গৃহকর্তার পাশ থেকে উঠে, নিজেদের বিছানায় ফিরে এলো। পরদিন ভোরে যখন তারা শয্যা ত্যাগ করলো তখন পিনুসিও ও তার স্বপ্নের কথা নিয়ে কর্তার কী হাসাহাসি।

সেই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দুটি তরুণ ঘোড়ায় জিন পরালো, মাল চাপালো, তারপর পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করে, পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে ফ্লোরেন্সের দিকে রওনা দিলো। রাতের কাণ্ড কারখানার জন্য কম আনন্দ হয়নি তাদের।

তখন থেকে পিনুসিও তার ফিয়াঁসীর সঙ্গ মেলার জন্য অন্য উপায় বাৎলাতে লাগলো। আর কন্যাটি মাকে নিশ্চিত করলো এই বলে, যে সে রাতে পিনুসিও নির্ঘাৎ স্বপ্ন দেখছিলো।

ফলে মহিলাটি, যে নাকি অ্যাড্রিয়ানোর সুখ আলিঙ্গনের প্রতিটি স্মৃতি মনে রেখেছে, সেই শুধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকলো, যাক্ সেই শুধু সে রাতে জেগেছিলো তাহলে।

* * *

লেখকের জীবনী লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে প্রকাশিত

মঠের সন্ন্যাসিনী ও বোবা চাকর

গিয়োভানি বোকাসিও

আমাদের এই মফঃস্বল অঞ্চলেই একটা মঠ ছিলো। ছিলো কি, এখনও আছে। পবিত্রতার জন্য সেটির খ্যাতিও যথেষ্ট। আর পাছে সেটির সুনামের কোন ক্ষতি হয়, সেজন্য আমি তার নামটা বলতে চাইনে।

বেশী দিনের কথা নয়, এক সময় এই মঠে জনা আটেক সন্ন্যাসিনী আর একজন মঠাধ্যক্ষা ছিলেন। সব ক'জনই যুবতী। তাদের মঠ সংলগ্ন সুন্দর বাগানটির পরিচর্যার জন্য একটি ছোট্ট খাট্টো মানুষ নিযুক্ত ছিলো। একদিন মাইনে কড়ি নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে মঠের তত্ত্বাবধায়ক বুড়োর মত নিয়ে সে তার গাঁ ল্যাম্পোরেসিওতে ফিরে গেলো।

গাঁয়ে ফিরতেই গাঁয়ের অনেকে তাকে স্বাগত জানালো। তাদের মধ্যে গাট্টা-গোট্টা ম্যাসেত্তোও ছিলো। বেশ শক্তসামর্থ সুদর্শন চেহারার ছোকরা। চাষি ঘরের ছেলে। জনমজুর খেটে খায়।

ভাল মানুষ নুটো দীর্ঘদিন গাঁয়ে ছিলো না। ম্যাসেত্তো শুনেছে সে একটা মঠে চাকুরী করতো। তাই নুটোকে জিজ্ঞেস করলো, সেখানে তাকে কী কী কাজ করতে হতো। নুটো (মঠের সেই চাকরটি) বললো, কাজ তো ভালোই ছিলো। একটা সুন্দর বাগানের দেখাশোনা করতাম। কোন কোন সময় আগুনের জন্য কাঠ যোগাড় করতে হতো, জল তুলতে হতো, এমনি নানা ধরণের টুকিটাকি কাজ আর কি! কিন্তু নানরা (সন্ন্যাসিনী) যা মাইনে দিতেন তা দিয়ে আমার জুতোর ফিতে কেনার পয়সা হতো না। এছাড়া, বয়সে সব ছুকরী। আমার কাছে তারা এক একটি যেন মূর্তিমতী শয়তানী। কারণ তুমি যত কিছুই করোনা কেন, তাদের খুসী করতে

পারবে না। ধর, বাগানে কাজ করছি, একজন এসে হুকুম করলেন, এটা কর। পরক্ষণেই আর একজন এসে বললেন, না, ওটা কর। আবার অন্য একজন এসে হয়তো আমার হাত থেকে হাত কোদালিটাই কেড়ে নিলেন। হয়তো বললেন, বললেন, তুমি ভুলভাবে কাজ করছো।

বলবো কি, ও'রা আমাকে এতো জ্বালাতেন যে আমি আমার হাতের যন্ত্র-পাতি নামিয়ে রেখে, সোজা বাগানের বাইরে চলে যেতুম। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম, ঢের হয়েছে, আর নয়, এবার চাকুরী ছেড়ে দেই বাবা। তত্ত্বাবধায়ক শুনে বললো, যাচ্ছো যাও, কিন্তু কথা দিয়ে যাও একজন তোমার মতো কাজের লোক জোগাড় করে দেবে!

আমি বাপু শপথ করলাম। কিন্তু এমন লোক আমি পাই কোথায় বল, যার শক্তি সামর্থ আছে, আর আছে ষাঁড়ের মতো ধৈর্য্য।

একথা শুনে ম্যাসেত্তো ঠিক করলো, হ্যাঁ, সে যা এতদিন চাইছিলো, এতো ঠিক তেমন ধরণের কাজই। সে অবশ্য মনের কথা নুটোকে খুলে বললো না। বরং মুখে বললো, তুমি ওখান থেকে চলে এসে ভালই করেছো। একগাদা মেয়েছেলের মধ্যে কাজ করা কি একটা জীবন? সে তো একদল শয়তানের সঙ্গে বাস করা হে। সাতবারের মধ্যে ছ'বার যাদের মতিস্থির নেই।

কিন্তু যখন তাদের কথাবার্তা শেষ হলো, ম্যাসেত্তো ভাবতে লাগলো, সে সেখানেই যাবে। তাদের মধ্যেই থাকবে। আর নুটো যা বলেছে, সে সব কাজ-কর্ম নিয়ে তার কোন ভাবনাই নেই। ওজন্যে তার চাকুরী যাবে না। যদি যায় তা তার ডবকা বয়স আর সুন্দর চেহারার জন্য যাবে। অবশ্য ওখানে এতদূরে কেইবা তাকে চিনবে। যদি সে বোবা সাজে, তাহলে তাঁরা হয়তো তাকে চাকুরী দিতে দ্বিধা করবে না।

মন স্থির করে সে করলো কি, একটা জীর্ণ কম্বল গায়ে চড়ালো, আর কাঁধে নিলো একটা কুড়োল। তারপর কোথায় যাচ্ছে একথা কাউকে কিছু না বলে সে মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

সেখানে পেঁাছে সে মঠের চত্বরে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। ভাগ্য ভাল তার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের দেখা হয়ে গেলো। তারপর, একজন বোবা লোক যেমন করে ভাব-ভঙ্গীতে জানায়, সেইভাবে জানালো যে সে দুটো খেতে চায়, আর তার বদলে সে কাঠ কেটে দিতে রাজী আছে।

তত্ত্বাবধায়ক খুসী হয়ে তাকে কিছু খেতে দিলো, তারপর তাকে কতক

গুলো কাঠের গুড়ি দেখিয়ে দিলো। নুটো কিন্তু তা চিরত পারে নি। অল্পক্ষণেই ম্যাসেত্তো তার কাজ শেষ করলো। তত্বাবধায়ক তাকে জঙ্গলে যাবার পথে সঙ্গে নিয়ে গেলো এবং কতকগুলো গাছের ডাল কাটতে বললো। তাকে একটা গাধাও যোগাড় করে দিয়ে ইসারায় জানালো কাঠগুলো মঠে নিয়ে যেতে হবে।

ছোকরা ম্যাসেত্তো এমন দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ শেষ করলো যে তত্বাবধায়ক আরও কয়েকদিন তাকে কাজে নিলো।

একদিন ম্যাসেত্তো মঠাধ্যক্ষার নজরে পড়ে গেলো। তিনি তত্বাবধায়কে জিজ্ঞেস করলেন, ওটি কে?

তত্বাবধায়ক উত্তর দিলো, আজ্ঞে ম্যাডাম, এটি একটা হাবাবোবা লোক। একদিন ভিক্ষে মাগতে এসেছিলো। আমি ওকে খেতে দিলাম। তারপর অনেক কাজ করিয়ে নিলাম। যদি ও বাগানের কাজ বোঝে, আর এখানে থাকতে চায়, আমার মনে হয় আমরা লাভবান হবো ম্যাডাম। কারণ একজন মালী আমাদের অবশ্যই দরকার, আর এই শক্ত-সামর্থ্য ছোকরা যা বলবো তা করতে পারবে। তাছাড়া আপনার ঐ কাঁচা বয়সের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়েও কোন চিন্তা করতে হবে না।

ম্যাডাম বললেন, আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিকই বলেছো। দ্যাখো ও কি কি কাজ জানে, আর চেষ্টা করো যাতে তোমার কাছে থেকে যায়। ওকে একজোড়া জুতো, একটা পুরোনো শিরস্ত্রাণ দাও, একটু মিষ্টি কথা, একটু আধটু প্রশংসা করো, আর পেটভরে খেতে দাও।

তত্বাবধায়ক তাঁর নির্দেশ পালন করতে রাজী হলো। কিন্তু ম্যাসেত্তো বেশী দূরে ছিলো না। চত্বরটা ঝাঁট দেওয়ার ভাণ করে সে ওদের কথাবার্তা সবই শুনলো। উল্লাস ভরা মনে নিজে নিজে আওড়ালো, একবার আমাকে তোমাদের বাগানে ঢুকতে দাও, তারপর দেখবে আমি এমন যত্ন করবো যা নাকি কেউ কোন-দিন করেনি।

তত্বাবধায়ক শীগগিরই আবিষ্কার করলো ম্যাসেত্তো একজন অপূর্ব মালী। সে তাকে ইঙ্গিতে শুধালো, তুমি এখানে থাকবে?

ম্যাসেত্তোও ইসারা করে জানালো, তত্বাবধায়ক যা বলবে, সে তাতেই রাজী।

তত্বাবধায়ক তাকে নিয়ে বাগানের কাজ কী কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলো। তারপর মঠের অন্য কাজ করতে চলে গেলো। ম্যাসাত্তো একাই

রইলো সেখানে।

ক্রমশঃ, দিন যেতে লাগলো। ম্যাসেত্তোও ঠিক মতো কাজ করতে লাগলো। এদিকে সন্ন্যাসিনীরা তাকে যথারীতি জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলো। যেমনটা সাধারণত লোকেরা বোবার সঙ্গে করে। তারা তাকে অকল্পনীয় অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতো। তাদের ধারণা ও কানেও শুনতে পায় না। তার উপর মঠাধ্যক্ষাও সব ব্যাপার দেখেও দেখতেন না। কারণ তাঁর ধারণা, ও যখন জিহ্বা হারিয়েছে, ওর কোন জ্ঞান গম্যিই নেই।

একদিন ম্যাসেত্তো খুব খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, এমন সময় দুই যুবতী সন্ন্যাসিনী তার দিকে এগিয়ে এলো। ওরা বাগানেই বেড়াচ্ছিলো। ম্যাসেত্তো এমন ভাব দেখালো যেন সে ঘুমিয়ে আছে। ওরা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালো। তাদের মধ্যে যেটি অধিকতর বলিষ্ঠা সেটি তার সঙ্গিনীকে বললো, যদি ফাঁস না করো তাহলে আমি একটা মতলবের কথা বলতে পারি যা মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে খেলে যায়। আর আমাদের দুজনের পক্ষেই লাভ জনক।

অপরা বললো, তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো, আমি কাউকে বলবো না।

তুমি কি ভেবে দেখেছো আমারা এখানে কী কঠোর জীবন যাপন করি! পুরুষ বলতে এখানে কেবল ঐ তত্ত্বাবধায়ক, যেটা একটা বুড়ো আর একটি বোবা মালী। অথচ যে সব বাইরের মহিলা আমাদের এখানে বেড়াতে আসেন, তাদের কাছে শুনেছি, জগতে যত সুখ আছে তা পুরুষের সঙ্গসুখের কাছে অকিঞ্চিৎকর। আমি ভাবি কি জান, হাতের কাছে যখন তেমন কোন পুরুষ মানুষ নেই এই বোবাটাকে দিয়ে সেটা পরীক্ষা করি। দেখি সেই মহিলারা সত্য বলেছেন কিনা। আর যদি তা করতে হয় তাহলে বোবাটার চেয়ে ভাল লোক পাবো না, কারণ ও যদি কোনদিন ঝোলা থেকে বেড়াল বের করতে চায় পারবে না। ও কোনদিন তা বুঝতেও পারবে না। এবার বল মতলবটা তোমার কেমন লাগে।

অপরা বললো, বল কি, তোমার কি মনে নেই, আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছি আমাদের কৌমার্য বজায় রাখবো।

'ফুঃ, আমরা ঈশ্বরের কাছে কতই না প্রতিজ্ঞা করি, তার কয়টা রাখি। কি যায় আসে যদি এই একটাও আমরা রাখতে না পারি? তিনি অন্য মেয়েদের

'কৌমার্য' খুঁজুন গে।

কিন্তু যদি আমাদের গর্ভ সঞ্চার হয়? তখন কী হবে।

প্রথমা বললো, তুমি দেখছি যা ঘটেনি তাই নিয়ে ভয় পাচ্ছো! আরে আমরা বীজের কাছে গেলে তবে তো তা পার হওয়ার প্রশ্ন। দ্যাখো আমরা যদি ফাঁস না করি তবেই এটা গোপন থাকবে।

আপরা বললো, ঠিক আছে। আসলে সে-ই এ ব্যাপারে বেশী উৎসুক হয়ে উঠলো! পুরুষ মানুষ কি বস্তু তা আবিস্কার করার নেশা তাকে পেয়ে বসলো।

বললো, কিন্তু এটা কেমন করে করবে?

প্রথমা বললো, দ্যাখো, মনে হয় সবাই এখন ঘুমুচ্ছে! আমাদের আরও নিশ্চিত হতে হবে কেউ বাগানে আছে কিনা। যদি দেখা যায়, রাস্তা পরিস্কার তখন ওকে হাত ধরে ঐ কুঁড়ে ঘরটায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে বৃষ্টি এলে ও আশ্রয় নেয়। তারপর একজন ওকে নিয়ে ভেতরে যাবো, একজন বাইরে নজর রাখবো। ওটা যা বুদ্ধু, ওকে যা বলবো তাই করবে।

ম্যাসেত্তো কিন্তু সব কথাই শুনতে পেলো। সে তো ওদের কথা মানতে এক পায় খাড়া। এখন ওদের কেউ এসে ওকে ভেতরে নিয়ে গেলেই হয়।

দুই সন্ন্যাসিনী চারদিক ভালো করে দেখলো। যখন বুঝলো কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না, তখন দুয়ের মধ্যে এতক্ষণ যে বেশী কথা বলছিলো, সে ম্যাসেত্তোর কাছে এগিয়ে গেলো। তারপর তাকে জাগিয়ে ইসয়ারায় প্রলুব্ধ করলো। ম্যাসেত্তোও তাতে সাড়া দিলো। মেয়েটি তাকে কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেলো। আর সেখানে ম্যাসেত্তোকে বেশী খোসামোদ করতে হলো না।

মেয়েটি যা চেয়েছিলো তা পরিপূর্ণ ভাবে পেলো। তারপর তার সঙ্গিনীকে সুযোগ দিলো। ম্যাসেত্তোকে এ মেয়েটিও যা যা করতে বললো, তাই সে করলো। ঘরে ফেরার আগে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো কয়েকবার। তারা বুঝলো মহিলাদের মুখে শোনা কথার চেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তিকর এই বোবাটার যৌন আলিঙ্গন। এবং তখন থেকে সুযোগ পেলেই তারা এই বোবা লোকটার বাহুবন্ধনে ধরা দিতো।

একদিন, এই ঘটনা তাদের এক সঙ্গিনীর নজরে পড়ে গেলো। সে তার

ঘরের জানালা থেকে তাদের এই রীতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে তার অপর দুই সঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রথমে সবাই ঠিক করলো, মঠাধ্যক্ষাকে বিষয়টি জানান যাক। কিন্তু পরে তারা মত পাল্টালো। অনু দুজনের সঙ্গে যুক্তি করে তারা ম্যাসেত্তোর উপর তাদের অধিকার বর্তালো। তারপর এই পাঁচজন একই চুক্তিতে বাকী তিনজনকে আবদ্ধ করলো।

মঠাধ্যক্ষা তখনও এ ঘটনার কিছু জানতেন না। একদিন গ্রীষ্মকালে বাগানে একা একা বেড়াচ্ছিলেন তিনি। দ্যাখেন ম্যাসেত্তো একটা বাদাম গাছের নিচে হাত পা জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। রাত্তিরের অতিরিক্ত নারী সম্ভোগে তার আর কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না। বাতাসে তার সামনের কাপড় চোপড় এলোমেলো হয়ে তাকে উলঙ্গ করে ফেলেছিল। আর কেউ নেই দেখে মহিলাটি স্থানুর মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আর তার মনেও সেই মেয়েদের মতো একটা তীব্র আকাঙ্খা অনুভব করতে লাগলেন। ফলে ম্যাসাত্তোকে জাগালের তিনি। তারপর তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন তাকে। কয়েকদিন নিজের ঘরেই রাখলেন তাকে। ফলে অন্য মেয়েরা তাঁর মুখের উপরই বলতে লাগলো, লোকটা কেন বাগানের কাজ বন্ধ করেছে আমরা জানি। তাকে তার কোয়ার্টারে ফেরৎ পাঠাবার আগে তিনি বার বার তাকে দিয়ে আনন্দ লাভ করিয়ে নিলেন। পরিণতিতে, ম্যাসাত্তো সবার দাবী মেটাতে অক্ষম হয়ে ভেবে ঠিক করলো। এরপর বোবা সেজে থাকলে সে মারা পড়বে। সুতরাং, একদিন রাতে যখন সে মঠাধ্যক্ষার সঙ্গে শুয়ে, তখন তার জিহ্বা লাগাম ছিঁড়ে কথা বলে উঠলো।

ম্যাডাম, অ্যাদ্দিন আমি বুঝতে দিয়েছি একটা মোরগ দশটা মুরগীর পক্ষে যথেষ্ট। দশটা পুরুষ একটা মেয়েকে তৃপ্ত করতে পারে না। অথচ আমি আমার থালায় নয়টি মুরগীকে খেতে দিয়েছি। কিন্তু এটা আমি বেশী দিন চলতে দিতে পারিনে। না কোন টাকার বিনিময়েও নয়। এর ফলে আমি আর ভাল কাজ দেখাতে পারবো না। সুতরাং হয় আমাকে বিদায় দিন, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থায় আসুন।

ওকে কথা বলতে দেখে মঠাধ্যক্ষাতো চমকে উঠলেন, কারণ তাঁর ধারণা ও বোবা।

তিনি বললেন, এসব কি আমি ভেবেছিলাম তুমি বোবা।

ঠিকই ম্যাডাম, আমি তাই ছিলাম। কিন্তু বোবা হয়ে তো আমি জন্মাইনি। একটা অসুখে আমি কথা কইবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ,

আজ রত্রেই আমি আবার কথা বলতে পারলাম।

মহিলাটি তার কথা বিশ্বাস করলেন। বললেন, তোমার শ্লেটে নরজন বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলে?

ম্যাসাত্তো সব খুলে বললো। তিনি বুঝলেন, এ ব্যাপারে তার সঙ্গিনীরা কম চতুর নন। তিনি ভেবে দেখলেন, ম্যাসাত্তোকে ছেড়ে দিলে সে মঠের এই গল্প বাইরে ছড়াবে। তিনি তখন অবশ্য সঙ্গিনীদের সংগে একটা চুক্তিতে এলেন।

কিছুদিন আগে বৃদ্ধ স্টুয়ার্ডের মৃত্যু ঘটেছিলো। সুতরাং ম্যাসাত্তোর সম্মতি নিয়ে তারা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করলো (তারা তো জানে কে কি করে বেড়াচ্ছে (প্রতিবেশীদের বুঝাবে দীর্ঘদিন বাক্যহারা থাকার পর অলৌকিক ভাবে কথা কইবার শক্তি ফিরে এসেছে তার। সন্ন্যাসিনীদের প্রার্থনায় এবং এই মঠের প্রতিষ্ঠাতার পুণ্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন তারা তাকে নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। তারা এমন ভাবে তার কাজ ভাগ করে দিলো যাতে সবার উপর সুবিচার হয়। এবং কালক্রমে সে অনেক সন্ন্যাসী শিশুর পিতৃপদ লাভ করলো। আর যদ্দিন না মঠাধক্ষ্যার মৃত্যু ঘটলো একথা কেউ জানতে পারেনি। কালক্রমে ম্যাসাত্তোও বৃদ্ধ হলো। অবশেষে মোটা পেনসন নিয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে চলে যেতে মনস্থ করলো সে।

তার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করা হলো।

রতি রঙ্গিনী

টমাস মান

লিফট চালানো খুবই সহজ ব্যাপার। চেষ্টা করলে অল্প সময়েই শিখে নেওয়া যায়। আমার সুন্দর য়ুনিফর্মটা আমার খুবই পছন্দ এবং যে মহিলারা আমার লিফটে ওঠানামা করে, তাদের চাউনির ধরণ থেকে বুঝি,

তাদের পছন্দ। তাছাড়া নতুন নামটা আমার পছন্দ হয়েছিল। কাজের ধরণটাও মজার মনে হয়েছিল। কিন্তু যদিও ব্যাপারটা ছেলেখেলা, সামান্য বিরতির সময় বাদ দিয়ে সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা অবধি কাজ করা খুবই ক্লান্তিকর। এমন একটা দিনের শেষে লোকে দেহমনে ক্লান্ত হয়ে কোনমতে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে। একনাগাড়ে ষোল ঘন্টা। মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিরতি সময়। লিফটম্যানরা তখন পাল্লা করে রান্নাঘর ও ডাইনিং হলের মাঝামাঝি একটা খাওয়ার ঘরে ঢোকে। জঘন্য খাবার। বাসি, পচা, পাতকুড়োনো হাবিজাবি রান্না। জেল ছাড়া অন্য কোথাও এতো জঘন্য খাবার আমি খাইনি।

কাজের সময় তো ছোট বন্ধ ঘরের ভেতরে, যেখানে হাওয়া লিফটযাত্রিনীদের ব্যবহৃত সেন্টের গন্ধে ভারী, সেই বন্ধ আবহাওয়ায় কণ্ট্রোল চালু রাখতে হবে, ইনডিকেটর দেখতে হবে, নির্দেশমত থামতে হবে, তাদের জায়গামত নামিয়ে দিতে হবে। এরই মধ্যে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের নির্বোধ অসহিষ্ণুতা দেখে আমার অবাক লাগতো। যখন লবিতে ও'রা অনর্গল ঘণ্টি বাজাতেন, ও'রা খেয়ালও করতেন না যে আমি চারতলা থেকে একলাফে একতলায় নামতে পারিনা, আমাকে প্রত্যেক তলায় থামতে হবে, যাঁরা নামতে চান তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে হাসি মুখে যেতে দিতে হবে।

আমি একটু বেশী হাসতাম, বলতাম, 'মসিয়' ও মাদাম, সাবধানে পা ফেলবেন। যদিও ওসব বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রথম দিনেই শুধু লিফট থামাতে একটু ঝাঁকি দিয়েছি। তারপর আর কোন ভুল হয়নি। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাদের হাত ধরে সাহায্য করতাম। ভাবটা এমনই যেন লিফট থেকে বের হতে ও'দের কষ্ট হচ্ছে। বিনিময়ে পেতাম ঘাবড়ে-যাওয়া চাউনিতে ধন্যবাদের ইঙ্গিত কখনো বা বিষণ্ণতা মেশানো এক ধরণের ছেনালি, বয়স্কা মহিলাদের যুবকেরা ভদ্রতা দেখালে ও'রা যে রকম ভাব দেখান, সেই রকম আর কি কেউ কেউ আবার খুশী হয়েছেন বলে মনে হত না। তাঁদের হৃদয় শীতল ও শূন্য। শ্রেণীগত অহংকার ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। যুবতীদেরও আমি সাহায্য করতাম। তারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ধন্যবাদ জানালে আমার দৈনন্দিন কাজের একঘেঁয়েমি কেটে যেতো। আসলে আমার এইসব ভদ্রতার লক্ষ্য ছিল এমন একজন যুবতী, যার জুয়েল-কেসটা কিছুদিন আগে আমি চুরি করেছি এবং যার জুয়েলারী চোরাই মালের দোকানে বেচে সেই পয়সায় আমি কিনেছি আমার বোতাম লাগানো নতুন জুতোজোড়া, আমার ছাতা, আমার পোষাক। যুবতীর জন্যে আমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

দ্বিতীয় দিনে বিকেলে পাঁচটা নাগাদ আর একটা লিফটের লিফটম্যান ওর্স্টাশ-ও লিফট থামিয়েছে একতলায়, ঠিক তখনই মাথায় হ্যাট ও স্কার্ফ পরা সেই যুবতী এল। আমার সহকর্মীর চেহারাটা একেবারেই সাধারণ। তাই বড় বড় চোখে আমাকে দেখলো যুবতী, হাসলো, কোন্ লিফটে উঠবে তাই নিয়ে একটু দ্বিধা দেখালো এবং ওর্স্টাশ হাত নাড়ছে দেখে এবার ওর লিফটের পালা ভেবে ওর লিফটে চড়ার সময় আমার দিকে তাকালো, চোখ দুটো আবার বড় বড় হলো। পরে ওর্স্টাশের কাছে জানা গেল, মহিলা বিবাহিতা, ও'র নাম মাদাম হুপফেনহ্।

পরেরদিন একই সময়—অন্য দুটো লিফট ওপরে উঠে গেছে, নীচের তলায় লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। যুবতী এল। ওর পরনে লম্বাঝুল,

পশুলোমের তৈরী, দামী ও সুন্দর জ্যাকেট এবং একই রং এর পশুলোমের

ট্রাপ। আমাকে দেখে ও খুসী হয়ে মাথা নাড়লো। আমি অভিবাদন জানিয়ে এমন গলায় 'মাদাম' বললাম, যেন নাচের আসরে ওকে পার্টনার হতে বলছি! আমার সঙ্গে আলোজ্বলা বন্ধ ঝুলন্ত ঘরে ঢুকলো মাদাম। ইতিমধ্যে চারতলা থেকে ভেসে এল ঘণ্টির শব্দ।

'তুমি তো নতুন, নাম আর্মাদ, তাই না?

'আপনার সেবক, মাদাম।'

'তোমার গলার স্বরটা ভারী সুন্দর।'

চারতলার ঘণ্টি বেজেই চলেছে। আমরা দোতলায় উঠেছি। আমি বিনীত ভাবে মহিলার কনুই ধরে লিফট থেকে বের হতে সাহায্য করলাম, যদিও সত্যিই তার কোন দরকার ছিল না।

'মাদাম, আপনার অনুমতি পেলে প্যাকেটগুলো আপনার ঘরে বয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

লিফট ছেড়ে প্যাকেটগুলো বয়ে নিয়ে করিডর বেয়ে মহিলার পেছনে পেছনে বিশ কদম বাঁ দিকের তেইশ নম্বর স্যুইটে ঢুকলাম আমি। আমাকে বেডরুমে ঢুকতে বলা হয়। সাজানোগোছানোবেডরুম—হার্ড-উডের মেঝেতে পারস্যগালিচা, চেরীকাঠের ফার্নিচার, টয়লেট টেবিলে অনেক ঝকঝকে জিনিষ, সাটিনের চাদরে ঢাকা পেতলের তৈরী চওড়া খাট, সিল্কের পর্দা। কাঁচঢাকা টেবিলে প্যাকেটগুলো রাখলাম আমি। পশুলোমের তৈরী জ্যাকেট খুলে যুবতী বলে—

'আমার ঝি এখানে নেই। ও ওপর তলার ঘরে থাকে। তুমি আমার কোট খুলতে সাহায্য করবে?'

'আনন্দের সঙ্গে।'

আমি বললাম। রেশমের লাইনিং দেওয়া পশুলোমের কোটটা ওর কাঁধ থেকে খুলছি, যুবতী আমার দিকে তাকালো। ওর মাথার চুল পুরু, রং বাদামী, কিন্তু সামনে চুলের কোঁকড়ানো একটা বলয়ের রং সাদা। চোখ দুটো একবার বড় হল, আবার ছোট। যেন ও স্বপ্ন দেখছে। যেন ও জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বললো—

'সামান্য চাকর হয়ে তোমার এতো সাহস যে তুমি আমায় উলঙ্গ করছো?'

'মাদাম, আপনার বর্ণনামাফিক কাজটা সম্পূর্ণ করার সময় আমার থাকলে কতো ভালো হত, ঈশ্বর জানেন—'

'আমার সঙ্গে কাটাবার মত সময় তোমার নেই?'

'এই মুহূর্তে নেই, মাদাম। আমার লিফট অপেক্ষা করছে। ওপর-তলায় ও

নীচেরতলায় অনেক লোক লিফটের জন্যে ঘণ্টি বাজাচ্ছে। হয়তো নীচের তলায় ভীড় জমে গেছে। আর দেরী করলে আমার চাকরী যাবে ?'

'কিন্তু আমার সঙ্গে কাটাবার মত সময় তোমার হবে ?'

'অন্তহীন সময় মাদাম।'

'কখন সময় হবে ?'

কথা বলতে বলতে মহিলার চোখ বড় হয়, চোখের তারায় সেই স্বপ্নদেখা ভেসে-যাওয়া দৃষ্টি, নীচের ধূসর স্যুটপরা রমনী শরীর কাছে আসে :

'রাত এগারোটায় আমার ডিউটি শেষ হবে।'

'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, কথা দিলাম।'

'ও কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পারার আগেই আমার মাথাটা ওর হাতে বাঁধা পড়লো এবং আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেলো মহিলা। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ধরণটা একটু অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে।

ওর জ্যাকেটটা রেখে যখন আমি ওর ঘর ছেড়ে এলাম, আমাকে নিশ্চয়ই খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। লিফটের খোলা দরজার সামনে তিনজন লোক অবাক হয়ে অপেক্ষা করছে। অপ্রত্যাশিত একটা কাজে ডাক আসায় দেরী হয়েছে বলে ক্ষমা চাইলাম, ওদের নীচে নামাবার আগে চারতলায় লিফট তুলতে হল। কিন্তু চারতলায় যে ঘণ্টি বাজিয়েছিল তাকে পেলাম না। নীচে লিফট নামাতে কাজে গাফিলতির জন্যে কথা শুনতে হল। বললাম, একজন মহিলার মাথা ঘুরছিল বলে তাঁকে ঘর অবধি পেঁৗছে দিতে হয়েছে।

মাদাম দুপুরেও কি মাথা ঘুরবে ? কি সাহস মহিলার। আমার চেয়ে বয়স বেশী বলে এবং সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা বলে আমার থেকে বেশী সাহস।

'সামান্য চাকর হয়ে এতো সাহস...'

—কি সুন্দর কথাটা বললো, যেন আমার কবিতার—

তুমি আমায় উলঙ্গ করছো ?'

উত্তেজনাজাগানো কথাগুলো সারা সন্ধ্যে আমার মনে জেগে রইলো। দুঘণ্টা ধরে। যতোক্ষণ না আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। 'চাকর' কথাটা আমাকে একটু আঘাত দিল, 'কিন্তু উলঙ্গ করা' যে কথাটা ভাবিনি, আমার যে উদ্দেশ্য ছিল বলে মহিলা ভেবেছে, কথাটা ভেবেই আমার গর্ব হল। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বহরটা যেরকম—সন্ধ্যে সাতটায় আমার লিফটে চড়ে ডিনার খেতে নামলো মহিলা। তখন লিফটে অন্য লোকও ছিল। মহিলার পরণে এখন সাদা রেশমের অদ্ভুত সুন্দর পোষাক, লেস লাগানো, জামার এমব্রয়ডারী, কোমরে কালো

সার্টিনের বেল্ট এবং গলায় ঝকঝকে উজ্জ্বল দুধ-সাদা সাচ্চা মুক্তোর নেকলেস। (দুর্ভাগ্য, জুয়েল-কেসটা চুরি করার সময় মুক্তোর হারটা ওর মধ্যে পাইনি)। একটু আগে অতো জোরে চুমু খাওয়ার পর এখন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেই না মহিলা। আমার একটু খারাপ লাগলো! প্রতিশোধ হিসেবে আমি ওর বদলে এক বিচ্ছিরি চেহারার বুড়ীকে হাত ধরে লিফট থেকে বের হতে সাহায্য করি। ও হাসে।

ও কখন নিজের ঘরে ফিরেছে আমি জানি না। এগারোটার সময় আমার ছুটি হল। বাথরুমে ঢুকে সাফসুৎরো হয়ে নিলাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামলাম। করিডরের লাল কার্পেটে পায়ের শব্দ হয়না। ৩৫ নম্বরে বসবার ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে শব্দ না পেয়ে আমি ২৩ নম্বরের বাইরে দরজা খুলে ভেতরের দরজায় আলতো টোকা দিলাম। একটু যেন অবাক হয়ে ভেতর থেকে ও বললো—'এসো।' অবাক হওয়ার ধরণটাকে পাত্তা না দিয়ে আমি ঢুকি। সিল্কের শেড দেওয়া ল্যাম্প থেকে ম্লান লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকাণ্ড ঝকমকে পেতলের খাটে লাল সার্টিনের চাদরের নীচে সুন্দরী, হাত দুটো মাথার পেছনে জড়ো করা, পরণে খাটো ঝুল লেস-লাগানো ক্যাম্বিজের নাইটগাউন। রাতে শোবার আগে চুল খুলে মাথার চারপাশে টায়রার মত বেঁধেছে রূপসী। আমি ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়। বিছানা থেকে একটা তার টেনে দরজার ছিটকিণি খোলা বন্ধ করা যায়।

সোনালী চোখদুটো একটু বিস্ফারিত হয়। এক লহমার জন্যে। যেন একটু নার্ভাস হয়ে বলে মহিলা—

'একি, হোটেলের কর্মচারী, সাধারণ লোক আমি, শোয়ার পর আমার বেডরুমে ঢুকছে?'

'আপনি তাই চেয়েছিলেন, মাদাম। আপনার ইচ্ছেমতো—"

আমি খাটের কাছে যাই।

'আমার ইচ্ছে? মানে কোন মহিলা যেমন লিফটম্যানকে অর্ডার দেন? আসলে তুমি বলতে চাইছো আমার নির্লজ্জ প্রতীক্ষা, তপ্ত কামনা, মগ্ন বাসনার কথা। তুমি দেখতে সুন্দর, বয়সে যুবক, স্বভাবে উদ্ধত। আমার ইচ্ছে? বলতো, তোমার ইচ্ছে কি আমারই ইচ্ছের মতো?'

তারপর সে আমার হাত ধরে বিছানার ধারে বসায়। ব্যালান্স রাখার জন্যে আমাকে হাত বাড়িয়ে বিছানার মাথার দিকটা ধরতে হয়। ফলে আমি লিনেন ও লেসে হাল্কাভাবে ঢাকা তার নগ্ন শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ি। ও বারবার

আমার সামান্য জীবিকার কথা বলছে কেন আমি বুঝিনা। আমি ঝুঁকে পড়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট মেশাই, ওর দিক থেকে সহযোগিতার অভাব হয় না। ও আমার হাত ধরে হাতটা ওঁর পোষাকের ভেতর বুকের ওপরে নিয়ে যায়। স্তন, আমার হাত—চমৎকার মিশে যায়। ও আমার হাতটা মনিবন্ধের কাছ ধরে এমনভাবে নাড়ায় যে, পৌরুষ জেগে ওঠে। আমার পুরুষাঙ্গের দিকে তাকিয়ে খুসী হয়ে ও বলে—

সুন্দর যুবক, যে শরীর তোমার কামনা জাগিয়েছে, তার থেকে তুমি সুন্দর।'

তারপর সে দুহাতে আমার জ্যাকেটের কলার খোলে, আমার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে—

খুলে ফেলো। সব বাধা দূরে যাক। যেন আমি দেবতার শরীর দেখতে পারি। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে নগ্ন দেবতার বাহু আমি দেখতে চেয়েছি। এই তো! দেবতার মত বুক, কাঁধ, হাত। এবার প্যান্টটা খোলো। বীরের মতো। এবার আমার কাছে এসো—'

কোনো মহিলাকে এতো সুন্দর কথা বলতে আমি কখনো শুনিনি। ওর কথা কবিতার মত। এবং আমি যখন ওর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মেতেছি, তখন ও কথা বলে। এটা ওর স্বভাব। সব কিছু কথায় প্রকাশ করা।

'ওঃ, প্রিয়তম. প্রেমের দেবতা, বাসনার সন্তান, যুবক শয়তান, নগ্ন বালক, কাজটা তুমি কি সুন্দর করতে পারো! আমার স্বামী কিন্তু পারে না। ওঃ, আমি মরে যাবো! আনন্দে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তোমার ভালোবাসা আমায় মেরে ফেলছে।'

আমার কানে, আমার ঘাড়ে, আমার ঠোঁটের ওর কামনার দংশন, চরম পুলকের মুহূর্তে কাছে আসতে ও হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—

'আমাকে তুই বলো। আমাকে আপন করে নাও, আমাকে নীচে নামাও। আমাকে অপমান করো বোকা চাকর।

আমি আমার সুখ পেয়েছি, আমার যথাসাধ্য সুখ দিয়েছি। কিন্তু চরম সুখের মুহূর্তে 'নীচে নামানোর' কথাবার্তা বা আমাকে 'বোকা চাকর' বলা আমার ঠিক পছন্দ হয় না। আমার শরীরে চুমু খেয়ে নরম হাতে আলতো আদর করে ও বলে 'আমাকে তুই বলো। আমি এখানে শুয়ে সামান্য একটা চাকরকে আমার শরীর দিয়েছি। কি সুন্দরভাবে আমি নীচে নেমেছি। আমার নাম ডায়ানে। তুমি আমায় ও নামে ডেকো না। তুমি স্পষ্ট করে বলো— 'মিষ্টি বেশ্যা।...

'মিষ্টি ডায়ানে।'

'না, বেশ্যা বলো। আমি নীচে নেমেছি, সেটা কথায় শুনতে চাই।' 'না, ডায়ানে, ওসব খারাপ কথা আমি বলতে পারবো না। আমার ভালোবাসা তোমায় নীচে নামিয়েছে বলছো বলে আমার খারাপ লাগছে।'

'তোমার না, আমার। তুচ্ছ একটা ছেলে তুমি, নির্বোধ, সুন্দর, তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা নীচে নামিয়েছে। আমি লেখিকা, বুদ্ধিজীবি। আমার নাম ডায়ানে ফিলবার্ট। আমার স্বামীর নাম হুপফেহু। হাস্যকর নাম। আমি আমার কুমারী নামেই লিখি। উপন্যাস, মনস্তত্ত্বভিত্তিক, কামনাবাসনা নিয়ে... হ্যাঁ, ডালিং, ডায়ানে বুদ্ধিমতী। এবং কিভাবে তোমাকে বোঝাই যে বুদ্ধিমতী সব সময় কামনা করে নির্বোধের সঙ্গ। জীবন্ত, সুন্দর কিন্তু নির্বোধ তাকেই নির্বোধের মত ভালোবেসে আত্মনিগ্রহ এবং নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা। যে দেবতার মত সুন্দর কিন্তু বুদ্ধিহীন, তারই সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজেকে নীচে নামানোর, নিজেকে অপমান করার এই আনন্দে এমনই নেশা...'

কিন্তু দেখতে ভালো হওয়ার কথাটা বাদ দিলেও...ডীয়ার চাইল্ড, আমি ততোটা বোকা নই, অবশ্য আমি তোমার লেখা উপন্যাস বা কবিতা পড়িনি—'

'কি বললে? ডীয়ার চাইল্ড!'

ঝড়ের মতো আমায় আঁকড়ে ধরে চুমু খায় ডায়ানে।

পাগলের মত পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ মথিত করে।

কি সুন্দর! 'মিষ্টি বেশ্যা' বলার থেকেও ভালো। প্রেমের শিল্পী, তুমি যা কিছু করেছো তার থেকে তোমার এই কথাটা আমায় বেশী আনন্দ দিয়েছে। আমি ডায়ানে ফিলবার্ট, লেখিকা বুদ্ধিজীবি—আমার পাশে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে ছোট্ট একটা লিফটবয় বলছে, 'ডীয়ার চাইল্ড'। সুন্দর আশ্চর্য সুন্দর। তুমি বলছো, তুমি বোকা নও। তাই কখনও হয়। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানেই বুদ্ধির অভাব। কারণ মানুষের মনের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে উঠবে বলেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এসো, আমি তোমাকে দুচোখ ভরে দেখি। মসৃণ, পেশীবহুল বুক, সিল্ম্ হাত দুটো, সুন্দর পাঁজরাগুলো, সরু কোমর, পা দুটো হার্মিসের পায়ের মতো—'

'থামো, ডায়ানে। আমারই উচিত তোমার রূপের প্রশংসা করা—'

'ননসেন্স' পুরুষদের এই একটা ভুল ধারণা। আমাদের মানে মেয়েদের শরীরের বাঁকগুলো তোমাদের চোখে ভালো লাগে বলে আমরা খুসী হই। কিন্তু দেবতার মত সুন্দর, সৃষ্টির সুন্দরতম মাণ্টার পীস, সৌন্দর্যের আদর্শ হল

পুরুষের শরীর। তুমি, যুবক, হারমিসের মত পা। তুমি কি জানো, হারমিস কে?'

'সত্যি কথা বলতে কি—'

'সুন্দর! ডায়ানে ফিলবার্ট এমন একজনকে শরীর দিয়েছে যে গ্রীক উপকথার চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়। কতো নীচে নেমেছি আমি। হারমিস ছিল চোরেদের দেবতা।'

আমি লজ্জা পাই। আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। তবে কি ও বুঝতে পেরেছে—

'তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি শুধু তোমাকে অর্থাৎ তুমি নামের একটা আইডিয়াকে, একটা সুন্দর জীবন্ত আইডিয়াকে ভালোবেসেছি। তুমি এটাকে ব্যাভিচার বলতে পারো, যৌনবিকার বলতে পারো, অবক্ষয় বলতে পারো। কিন্তু আমি বয়স্ক, দাঁড়িওলা, বুকে-লোম-ওলা পুরুষ, যাদের গুরুত্ব আছে, সেই সব পুরুষকে ভালোবাসিনা। আমার নিজের গুরুত্ব আছে। সুতরাং ওইসব পুরুষের সঙ্গে শোয়াই হবে যৌনবিকারের চিহ্ন। প্রথম থেকেই আমি তোমার মত কমবয়সী ছেলেদের পছন্দ করি। যখন আমার তেরো বছর বয়স ছিল, তখন আমি চোদ্দ বা পনেরো বছরের ছেলেদের ভালোবাসতাম। আঠারোর চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের আমি ভালোবাসিনী। তোমার বয়স কত?

'কুড়ি।'

'তোমাকে আরও ছোট দেখায়। আমার পক্ষে তোমার বয়স বড্ড বেশী।'

'বড্ড বেশী?

'শোন, আমার এই ইচ্ছের সঙ্গে যে ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে, তা হ'ল, আমি মা হইনি, আমার ছেলে হয়নি। আমার ছেলে হলে, মানে মসিয়ঁ হুপফেনহু যদি ছেলের বাবা হতো, ছেলেটা সুন্দর হত কিনা সন্দেহ। তোমার জন্যে আমার কামনা আমার সন্তানকামনার একটা পরবর্তিত রূপ। যৌনবিকার? তুমি তো তাই বলবে? কিন্তু রমনীর স্তন তোমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, রমনীর গর্ভ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তুমি কি তোমার অবচেতনে মাতৃস্তনের কাছে মাতৃগর্ভের কাছে ফিরে যেতে চাওনা? কিন্তু কি তোমার স্ত্রীর মধ্যে তোমার মাকেই খোঁজনা। যৌনবিকার! প্রেম মানেই যৌনবিকার, খুঁজে দেখো, গভীরে যাও, প্রেমের আর কোন রূপ নেই! বয়স্কা রমণীর পক্ষে অল্পবয়সী ছেলেদের পছন্দ করার ব্যাপারটা ট্র্যাজিক, বেদনাদায়ক! বাস্তবে সম্ভব নয়, অন্ততঃ বিয়ে করা। আমি ধনী ব্যবসায়ী মসিয়ঁ হুপফেনহুকে বিয়ে করেছি। ওঁর ধনদৌলতের

আশ্রয়ে আমি নিশ্চিন্তে উপন্যাস লিখতে পারি। তুমি আমার সঙ্গে যা সব বললে, মঁসিয়ঁ হ্যুর্গাফিয়েহ্ ও সব পারেন না। অবশ্য থিয়েটারের একটা মেয়ের সঙ্গে ওসব করেন। ভালোমত পারেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। তবে ও ব্যাপাবে আমি উদাসীন। এই পৃথিবী, মেয়ে, পুরুষ, বিবাহ, ব্যাভিচার— এসব ব্যাপারে আমি উদাসীন। আমি থাকি আমার তথাকথিত যৌবনবিকারের জগতে। আমার এই ভালোবাসার সুখ, দুঃখ, অভিশাপ নিয়ে। এই দৃশ্য পৃথিবীতে অল্পবয়সী পুরুষের শরীরের মত সুন্দর আর কিছু নেই। তোমার সুন্দর শরীর আমার কামনা জাগায়। আমি আমার বুদ্ধি ও বিবেক ভুলে তোমাকে চুমু খাই। তোমার সাদা দাঁতের ওপরে উদ্ধৃত ঠোঁট দুটো হাসে। আমি চুমু খাই। তোমার পুরুষ-বুকের বৃন্ত তারার মত। সেখানে ঠোঁট রাখি। তোমার বগলের কালো চামড়ার ওপরে সোনালী লোম। সেখানে চুমু খাই। এসব কি করে হয়। নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল, তুমি কোথা থেকে পেলে চামড়ার এই ব্রোঞ্জ রং? এই নেশার শেষ নেই। আমি মরে যাবো কিন্তু আমার আত্মা তার পিপাসা নিয়ে চিরদিন তোমায় ভালোবাসবে। তুমিও বুড়ো হবে কিন্তু আমার মনে এই শান্তি থাকবে, তোমার প্রথম যৌবনের এই রূপ সৌন্দর্য্যের এই সংক্ষিপ্ত আনন্দ, এই সুন্দর চঞ্চলতা, এই চিরন্তন মুহূর্তে চিরদিন বেঁচে থাকবে।'

'তোমার কথাগুলো কি অদ্ভুত?'

'কেন? যাকে ভালোবেসে, তাকে কবিতার প্রশংসা করলে তোমার অবাক লাগে?'

আমি ছোট ছেলের মত মাথা নাড়ি। এতো প্রশংসা এতো আদর, এতো কবিতা—আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। যদিও প্রথম আলিঙ্গনে আমি আমার সবকিছু দিয়েছি. আমার পৌরুষ আবার জেগে ওঠে। আমরা আবার শরীরে শরীর মেশাই। কিন্তু তা বলে আমি যে হীন, নীচ, সামান্য এবং ডায়ানে যে নীচে নামছে, সে কথা ভোলেনা আমার প্রেমিকা।

আর্মাদ, আমাকে পিষে ফেলো। আমি তোমার দাসী। সামান্য একটা ঝিকে যেভাবে ব্যবহার করবে, সেইভাবে আমায় ব্যবহার করো। তাই আমার স্বর্গ।...আর্মাদ, আমাকে মারো খুব মারো, বেল্ট খোলো, চাবুক মারো, রক্ত ঝড়াও...'

'আমি সে রকম প্রেমিক নই, ডায়ানে—'

'কি লজ্জা! তুমি মহিলাকে সম্মান দেখাচ্ছো—'

'শোনো, ডায়ানে, একটি কথা স্বীকার করছি। তুমি যা চাইছো, তার বদলে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসেবে। তোমার ব্যাগে একটা জুয়েল কেস ছিল। কাসটমসে তুমি আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তোমার ব্যস্ততার সুযোগে তোমার জুয়েলারী চুরি করেছি।'

'তুমি চুরি করছো? তুমি চোর! কি আনন্দ. কি আনন্দ। আমি চোরের সঙ্গে শুয়ে আছি। শুধু সাধারণ একটা লিফটবয়ের সঙ্গে না, একটা চোরের সঙ্গে।'

'আমি জানতাম, তুমি খুসী হবে। কিন্তু তখন আমি এতটা জানতাম না। জানতাম না যে আমরা একদিন পরস্পরকে ভালবাসবো। নাহলে আমি তোমার টোপাজ-বসানো জুয়েলারীর হীরাগুলো চুরি করে তোমায় দুঃখ দিতাম না।'

'দুঃখ? আমার ঝি ওটা খুঁজেছিল বটে। আমি দুঃসেকেণ্ডের জন্যেও ওগুলোর কথা ভাবিনি। আমার স্বামী কাল আসছে। সে দারুণ বড়লোক। ওর কোম্পানী বাথপুলের টয়লেট তৈরী করে। সবারই দরকার হয় ওটা। হুপফেনহুর, টয়লেট, খুব চালু. সারা পৃথিবীতে রপ্তানী হয়। বিবেকের দংশন এড়াতে স্বামী আমাকে এইসব জুয়েলারী দেয়। তুমি যা চুরি করেছ, তার থেকে তিনগুণ সুন্দর জিনিষ ও আমার দেবে। ওগুলোর চেয়ে অনেক বেশী দামী সেই চোর যে চুরি করেছে। চোরের দেবতা হারমিস! আর্মাদ?

'বলো।'

'ভালো: একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। তুমি এই ঘরে আমার গয়না চুরি করবে। আমার আরও গয়না আছে। কাপবোর্ডের ডানদিকের ড্রয়ারে ব্যুরোর চাবি। আমার নাইটড্রেসের নীচে গয়না। টাকাও আছে। বেড়ালের মত চুপি চুপি পা ফেলে ইঁদুর ধরো। এইটুকু করবে না? তোমার ডায়ানের জন্যে?'

'ডীয়ার চাইল্ড কাজটা ঠিক ভদ্রলোকের মত হবে না। তোমার সঙ্গে এইসবের পর—'

'বোকা! এই হবে আমাদের ভালোবাসার অপূর্ব সমাপ্তি!'

'কাল যখন মসিঁয় হুপফেনহ্ আসবেন—'

আমার স্বামী? ও কি বলবে? আমি উদাসীন ভঙ্গীতে জানাবো, ওখানে আসার সময় রাস্তায় সব চুরি হয়ে গেছে। বড়লোকের বউরা অসাবধান হলে ওসব হয়।'

চোর তো সরে পড়েছে। স্বামীর ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও—'

'কিন্তু ডায়ানে, তোমার চোখের সামনে—'

'বেশ, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনতে পাবো চোরের আস্তে পা ফেলার শব্দ, চোরের নিঃশ্বাসের শব্দ, চোরের হাতে গয়নার ঝুনঝুন আওয়াজ। যাও, ওঠো, আস্তে আস্তে খুঁজে নাও চুরি করো। এই আমার ইচ্ছে।'

এবং আমি ওর আদেশই মানলাম।

সাবধানে উঠে আমি সব নিলাম। চুরির কাজটা খুবই সোজা হল। টেবিলের ওপর ছোট্ট ডিশে ওর আংটি এবং মুক্তোর নেকলেস। অন্ধকারেও কাপবোর্ডে ব্যুরোর চাবি খুঁজে পেতে কোন ঝামেলা হল না আমার।

আমি প্রায় নিঃশব্দে ড্রয়ার খুললাম।

কয়েকটা নাইটড্রেসের নীচে—

জুয়েলারী, পেনড্যাণ্ট, ব্রেসলেট, ব্রুচ, বেশ কিছু টাকা। সব নিয়ে আমি ওর বিছানার পাশে এলাম। যেন ভদ্রতার খাতিরে। যেন ওর জন্যেই এইসব এনেছি।

'বোকা, তুমি কি করছো? এই তোমার ভালোবাসা ও তোমার চুরির লাভ। সব পকেটে পোরো, পোষাক পোরে, পালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি পালাও, পালাও। আমি সব শুনেছি, চুরির সময় তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছি। এইবার আমি পুলিশে ফোন করবো। কিম্বা না করাই ভালো। তোমার কি মনে হয়? তুমি কতো দূরে? কাজ শেষ? প্রেমিক ও চোরের শরীর তখন লিফটবয়ের য়ুনিফর্ম, তাই না? তুমি আমার বাটন্-হুক চুরি করোনিতো?

না, এইতো রয়েছে। বিদায়, আর্মাদ। বিদায়, বিদায়, চিরদিনের জন্যে বিদায়। তোমার ডায়ানেকে ভুলো না। স্মৃতিতেই তুমি বেঁচে থাকবে। অনেক বছর পরে, যখন তুমি-আমি দুজনেই কবরের আড়ালে, তখনও জেগে থাকবে স্মৃতি...তোমার ঠোঁট আমায় চুমু খেয়েছিল, পৃথিবীর কেউ জানবে না...বিদায়, বিদায় প্রিয়তম...

মূল কাহিনী: কনফেসনস অফ-এ ক্যনফিডেন্ট ম্যান—Confession of a confident man: THOMAS MANN অবলম্বনে।

পরিচিতি

টমাস মান জন্ম ১৮৭৫, মৃত্যু ১৯৫৫। ১৯২৯-এ সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছিলেন জার্মান কথাসাহিত্যিক টমাস মান। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : দ্য ম্যাজিক মাউনটেন, ডেথ ইন ভেনিস, ডক্টর ফস্টাস এবং কনফেসনস অফ এ কনফিডেণ্ট ম্যান। 'জোসেফ' সিরিজের চারটি উপন্যাস এবং ভারতীয় উপকথার পটভূমিতে লেখা 'দ্য ট্র্যানসপোজড হেডস' অনন্য স্মরণীয় সৃষ্টি। প্রুস্ত ও জয়েসের মতই মানুষের অন্তর্লীন অচিন মানুষ ছিল তাঁর ভাবনার কেন্দ্র। কিন্তু চেতনা-তরঙ্গের বিশ্লেষণ বা স্মৃতিচারণে তাঁর আসক্তি ছিল না। যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ব্যক্তিমানুষকে কি ভাবে ঘিরে আছে এবং মানুষ কিভাবে মৃত্যু ও সময়কে জয় করে : এই ভাবনাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। হিটলারের আমলে জার্মানী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন মান, প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। অথচ অতীতে তিনিই 'রিফেলকশনস অফ অ্যান আনপলিটিক্যাল ম্যান' নামক গ্রন্থ জার্মান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিল্পীর সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের বিশ্লেষণে আঁদ্রে জিদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের বৃত্ত জিদের মত তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমান কাহিনীটি মানের হিউমারধর্মী প্রেম কাহিনী 'কন-ফেসনস অফ এ কনফিডেণ্ট ম্যান' থেকে গৃহীত।

মার্কিন নাগরিক মান বিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী লেখক তাঁর লেখায় ও আচরণে লেখকের ব্যক্তি সত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এক অনন্য সাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল। তিনি একদা মার্কিন দেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পুলিৎজার প্রত্যাখ্যান করেন যে কোন সাহিত্যিক পুরস্কারের অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করতে।

তাঁর স্ত্রী

এণ্টন চেকভ্

নিকোলাস রাগে ফেটে পড়েন—কতবার তোমাকে বারণ করেছি আমার টেবিল গোছাবে না। তুমি গোছগাছ করলেই জিনিসপত্তর আমি আর খুঁজে পাইনে। কাজান থেকে কাল যে আমাব টেলিগ্রাম এসেছিলো, সেটা কোথায় গেলো ?

পরিচারিকা মেয়েটি বেশ রোগা। বিষণ্নমুখ। নিরীহ নিরীহ ভাব। দেখলে মনে হবে ভিজে বেড়ালটি। কিছুই যেন জানে না। মুখে কথা নেই। টেবিলের নীচে বাজে কাগজের ঝুড়িটা হাতড়ে কয়েকটা টেলিগ্রাম

ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দেয় শুধু। কিন্তু আসল টেলিগ্রামটা ওর মধ্যে নেই। সবই স্থানীয় রোগীদের।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো পড়ার ঘরে, বসার ঘরে। কোথাও হদিস মিললো না। তখন ডাক্তার গেলেন তাঁর স্ত্রীর ঘরে।

সময়টা ছিল গভীর রাতের। ডাক্তার জানেন ওলগার ফিরতে এখনও বেশ কিছুটা দেরী। ভোর পাঁচটার আগে ফিরবে না। ডাক্তারের খুব অস্বস্তি। স্ত্রীকে তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না। রাতে যতক্ষণ ওলগা বাইরে থাকে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারেন না। স্ত্রীকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ঘৃণা করেন তাঁকে। তাঁর বিছানাকে, তার ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিস—আয়না, চকলেটের বাক্স পর্যন্ত। কে যেন রোজ ভালোবেসে ওলগাকে পাঠায় স্থলপদ্ম, রক্তাভ নীল হায়াসিন্থ। ঐ ফুলগুলো তার দুচক্ষের বিষ। ক্রমশঃই ডাক্তার রেগে যান, বিরক্ত বোধ করেন। তবুও তাঁর মনে হয় ভাইয়ের টেলিগ্রামটা খুঁজে পেলে তিনি যেন স্বস্তি পান, খুশী হন।

একটা টেলিগ্রাম অবশ্য পাওয়া গেলো ওলগার সাজসজ্জার টেবিলের প্যাডের তলায়। হাতে নিয়ে দেখলেন মন্টিকার্লো থেকে এসেছে শাশুড়ীর ঠিকানায় ওলগার নামে। মিচেলের পাঠানো এই টেলিগ্রামটা ইংরেজী ভাষায় লেখা। তাই কিছুই তাঁর বোধগম্য হলো না।

মিচেলই বা কে? মন্টি কার্লো থেকে শাশুড়ীর ঠিকানাতেই বা এলো কেন?

ডাক্তারী পেশা ছেড়ে দিয়ে বিবাহিত এই সাত বছর যদি তিনি স্ত্রীর পেছনে লেগে থাকতেন তাহলে অবশ্যই তিনি একজন উঁচুদরের সত্যান্বেষী হতে পারতেন।

ডাক্তার নানা সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকেন, আর ভাবতে থাকে— ঠিক তো, বছর দেড়েক আগে তিনি একবার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে গিয়েছিলেন। কিউবান রেস্তোরায় তাঁর এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে যখন তিনি খাচ্ছিলেন তখনই তো মিচেল রিস নামে বাইশ তেইশ বছরের এক তরুন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিলো। মাস দুয়েক পরেই কিন্তু ঐ মিচেল নামের ছেলেটির ছবি দেখেছিলো ওল্গার এ্যালবামে। ফরাসী ভাষায় ছবির নীচের লেখা ছিল—"স্মৃতিতে এখন এবং ভবিষ্যতের আশায়"। এর পরেও কিন্তু ছেলেটিকে শাশুড়ির বাড়ীতে ডাক্তার কয়েকবার দেখেছিলেন।

ঐ সময় থেকেই স্ত্রী বাহিরমুখী হয়ে পড়ে এবং অনেক রাত করে বাড়ী ফেরা যেন তার অভ্যেসে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে একটা ছাড়পত্রের জন্যে বায়নাও করতো ডাক্তারের কাছে। কিন্তু তিনি কান দিতেন না ঘর-সংসার দেখাশুনোর অসুবিধে হবে বলে।

ছ'মাস আগে ডাক্তারের বন্ধুরা সিদ্ধান্তে এলেন যে ডাক্তার নিকোলাস যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়েছেন। বন্ধুদের এই সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ক্রিমিয়ায় গিয়ে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে। স্ত্রী ওল্‌গাও বায়না ধরলো স্বামীর সঙ্গে যাবে বলে, অসুস্থ স্বামীর সেবা যত্নের জন্যে তাঁর যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে ক্রিমিয়ায় বড় ঠাণ্ডা। জায়গাটাও সাদামাঠা। তার চাইতে নিস জায়গাটা অনেক ভালো।

ডাক্তার বেশ বুঝতে পারলেন সেদিন কেন তার স্ত্রী তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলো। যেহেতু মিচেল সেখানে থাকে।

ইংরেজি রুশ অভিধান খুঁটিয়ে দেখে তর্জমা করে না বোঝা গেলো—

আমার আদরের প্রিয়তমার ছোট্ট পায়ের পাতায় চুম্বন। বারবার পৌঁছনোর আশায় উন্মুখ।

ভাবতে লাগলেন নিসে ওল্‌গাকে নিয়ে গেলে বিশ্রীভাবে নিজে ছোট হয়ে যেতেন। হতাশায় চোখে জল এসে যায় তার। এঘর ওঘর শুধু পায়চারি করতে থাকেন। বনেদী বংশের ছেলে তিনি। তাঁর আত্মমর্যাদায় ঘা লাগা খুবই স্বাভাবিক। পড়াশুনো গির্জার স্কুলে। সাধারণভাবে মানুষ হয়েছেন তিনি। গ্রাম্য যাচকের ছেলে হয়ে একজন নীচ, অসৎ লালসা কাতর মেয়ের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া খুবই আত্ম অবমাননাকর।

টেলিগ্রামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে বলতে থাকেন—"ছোট্ট পায়ের পাতাই বটে"।

প্রেম করে বিয়ে। সাত বছরের এই বিবাহিত জীবনে মনে পড়ে শুধু অতীত স্মৃতিকে। মাথায় এক ঢাল চুল। রেশমী ঝালরের একখানি মেঘ যেন। আর ছোট্ট দুটি পায়ের পাতা সত্যিই ভারি সুন্দর, চেয়ে দেখবার মত।

কত সুন্দর ছিল সে দিনগুলো। আলিঙ্গন আর চুম্বনের রসে মাদকতা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। এখন ভগ্ন স্বাস্থ্য। বিধ্বস্ত এই জীবনে সে সুখ স্বপ্ন আজ কল্পনাতীত। এখন জীবন ঘিরে শুধু হৈ হট্টগোল, মিথ্যাচার ও নরক যন্ত্রণার বিভৎসতা। বছরে হাজার রুবল রোজগার তাঁর। কিন্তু

মাত্র দশটা রুবলও মার কপালে জোটে না। উপরন্তু বাজার দেনাই প্রায় পনেরো হাজার রুবল। ডাক্তারের জীবনটাই বরবাদ হতে চলেছে। ঘরে স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে, আর বাইরে একদল অমানুষের খল চতুরতায়।

ভীষণ কাশি। হঠাৎ হঠাৎ। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় আর কি। এখন লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়াই তাঁর উচিত। কিন্তু পারেন না শুতে। শুধু পায়চারি আর পায়চারি। ক্লান্তিতে একসময় টেবিলের সামনে বসে পড়েন ডাক্তার। পেন্সিল নিয়ে আপন মনেই আঁকিবুঁকি কাটতে থাকেন—মণ্ট কার্লো···ছোট্ট পায়ের পাতা···"

ভোর পাঁচটা। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর মনে হয় দোষ তো তাঁর নিজের। ওল্‌গাকে বশে রাখতে পারে এমন কারও সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত। তাতে হয়তো পাল্টাতে পারে ওর স্বভাব। তাছাড়া নিজে তিনি একজন সাধারণ ডাক্তার। মেয়েদের হৃদয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই তাঁর। নিজে ভীষণভাবে অসুস্থ মুমূর্ষু। একজন যৌবন চঞ্চল প্রাণবন্ত মানুষের পথ আগলে বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই তাঁর। মুক্তি দেবো ওল্‌গাকে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে নিয়ে। দায় দায়ীত্ব সব আমার। চলে যেতে দেবো ওর প্রেমিকের সঙ্গে।

অবশেষে ওল্‌গা ফিরলো। বাইরের বেশভূষা না পাল্টেই ধপাস করে বসে পড়লো একটা আরাম কেদারায়।

ওল্‌গার চোখে জল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—শয়তান, বদমাইস, ছাড়বো না আমি ওকে।

—কি হয়েছে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন স্ত্রীর কাছে এসে।

আজার বেকভ। ছাত্র একজন। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসে আমার ব্যাগ নিয়ে সরে পড়েছে। বলে কিনা ব্যাগটা নাকি হারিয়ে গেছে। ওতে আমার মার দেওয়া পনেরো রুবল ছিল। নিজে সরিয়ে রেখে এখন বলছে হারিয়ে গেছে।

বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদতে থাকে ওল্‌গা। চোখের জলে রুমাল, এমন কি হাতের দস্তানা পর্যন্ত ভিজে যায়।

—যা হারিয়ে গেছে তাতো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ও নিয়ে আর ভেবো না। স্থির হও। কয়েকটা জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—ও বলেছে টাকাটা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু দেবে কোত্থেকে। ও যে ভীষণ

গরীব। আমার তো অঢেল টাকা নেই যে হারিয়ে গেলে কিছু মনে করবো না।

ডাক্তারের এই সান্ত্বনায় কোন কাজ হয় না। ওঁর বক্তব্যও শোনে না ওল্‌গা। শুধু কাঁদে আর বলে হারিয়ে যাওয়া ওর পনোরো রুবলের কথা।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে পড়েন—দেখো, কাল সকালে তোমাকে আমি পঁচিশ রুবল দেবো। এখন দোহাই একটু চুপ করো।

—দাঁড়াও, পোশাকটা পাল্টে আসি। চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় ওল্‌গা। কয়েক মিনিটের মধ্যে সাফ সুরৎ হয়ে বেরিয়ে আসে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তার। বসার পর ঢিলে বেশভূষায় সবই ঢেকে যায় তার। ডাক্তারের নজরে শুধু পড়ে—ঘন একরাশ কালো চুল, আর চপ্পলের মধ্যে ছোট্ট দুটি পায়ের পাতা।

—কি বলবে এবারে বলো তো?—চেয়ারে বসে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে ওল্‌গা।

টেলিগ্রামটা দেখালেন ডাক্তার—হঠাৎ নজরে পড়ে গেলো এটা।

চেয়ারটা দোলাতে দোলাতে ওল্‌গার উত্তর—এটা তো একটা নিছক অভিনন্দন বার্তা। নববর্ষের একটা অভিনন্দন বার্তার মধ্যেও রহস্যের সন্ধান পেলে নাকি?

—ইংরেজি না জানতে পারি, তাই বলে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না। সবটাই পড়েছি আমি। অবশ্য অভিধানের সাহায্য নিয়ে। এটা তো তার আদরের প্রিয়তমাকে পাঠানো মিচেলের অজস্র চুম্বন।

ওলগার অবাক হয়ে কিছু বলবার আগেই ডাক্তার বলে ওঠেন—আরে না—না, এর জন্যে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমাকে ভর্ৎসনা করে অবশ্যই আমি কোন নাটক সৃষ্টি করবো না। বকাবকি অনেক হয়েছে, আর নয়। এখন থেকে তুমি স্বাধীন। ইচ্ছেমত যেমন খুশি চলতে পারো।

একটু চুপচাপ। ধীরে ধীরে চোখ দু'টো মুছতে থাকে ওল্‌গা।

দেখো ওল্‌গা, তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এখন থেকে আর তোমাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হ'বে না। কোন ছল চাতুরিরও প্রয়োজন হ'বে না। মিচেলকে যদি পছন্দ করো, ভালবাসতে চাও, অনায়াসে তা' পারো। মিলনেও ক্ষতি নেই। বয়েসে তুমি নবীন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তোমার দেহ। আর আমি পঙ্গু অশক্ত, অসুস্থ। এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আশা করি কি বলতে চাইছি আমি তুমি তা' বুঝতে পারছো।

এক বুক কান্না নিয়ে ওল্‌গা স্বীকার করলো সত্যিই ও মিচেলকে ভালবাসে।

শুর হোটেলের ঘরে কয়েকবার গেছেও সে। শহরের বাইরে ভ্রমণ সঙ্গিনীও হয়েছে। যথার্থই এখন সে মিচেলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছো নিকোলাস তোমার কাছে কিছু না লুকিয়ে অকপটে সব স্বীকার করে নিলাম। এখন একটা ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দাও তুমি।

—বলছি তো তুমি স্বাধীন।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে ও যেন তাঁর মনের কথা বুঝে নিতে চায়। কেন না সে তাঁর স্বামীকে একটুও বিশ্বাস করে না।

স্বামীকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বিড়ালের নীলাভ চোখের মত উদ্দীপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে—ছাড়পত্রটা কবে নাগাৎ পাচ্ছি ?

অবশ্যই ডাক্তারের মনের কথা কোনদিনও না। কিন্তু সংযত শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন—যেদিন খুশি।

—শুধু একটি মাসের জন্যে ডাক্তার।

—মিস্ মিচেলের সঙ্গে তুমি চিরজীবনের মত থাকতে পারো। বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্ত ঝুঁকিই আমার। তুমি স্বচ্ছন্দে মিচেলকে বিয়ে করতে পারো।

—বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উঠছেই বা কেন ? আমি তো-তা চাইনি। আমি শুধু চেয়েছি কিছুদিনের জন্যে একটা ছাড়পত্র।

—আচ্ছা অদ্ভুত কথা তো। মিচেলকে ভালবাসো তুমি অথচ বিয়ে করতে চাওনা !—ধীরে ধীরে ডাক্তারের মেজাজ চড়তে থাকে।

—ও বুঝেছি, তুমি নিজেই আমার কাছ থেকে মুক্তি চাইছো, আমার ওপর বিরক্তি ধরে গেছে বলে। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যেই তোমাকে ছেড়ে কোথাও আমার যাওয়া চলবে না। বিবাহ বিচ্ছেদ আমি চাই না। তাছাড়া মিচেলের বয়স মাত্তর তেইশ। আমার সাতাশ। বছরখানেকের মধ্যেই আমাকে নিয়ে তোমারই মত ও বিরক্ত হয়ে উঠবে। আমাকে সহ্য করতে পারবে না। তখন আমার কি হবে ? না—না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

মাটিতে পদাঘাত করে ডাক্তার রাগে চীৎকার করে ওঠেন—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও তুমি। তোমার মত ভ্রষ্টা মেয়ে মানুষের মুখ দেখতে চাইনে আমি।

—বেশতো, দেখা যাবে—এই কথা বলে, ঘরের বাইরে চলে যায় ওল্‌গা।

বাইরে উষার আলো ফুটে ওঠে। ডাক্তার একইভাবে লেখার টেবিলে বসে

আকিবুকি কাটেন—"মণ্টি কার্লো···ছোট্ট পায়ের পাতা"। জলে ডোবা বিধ্বস্ত মানুষের মত তাঁর মনে হ'তে থাকে—না ভালবেসে হারিয়ে যাওয়ার চাইতে ভালবেসে হারিয়ে যাওয়া ঢের ভালো। ওর মত নীচ কুলটা পাপীয়সীর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অপমানকর।

প্রায় বেলা এগারোটার সময় ডাক্তার যখন হাসপাতালে বেরোবার জন্যে বেশ ভূষায় সজ্জিত হচ্ছেন ঠিক তখন পরিচারিকা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।

—কি চাই তোমার ?

মাদামের ঘুম ভেঙেছে। এইমাত্র উঠলেন। কাল যে পঁচিশ রুবল ওঁকে আপনি দিতে চেয়েছিলেন সেটা উনি চাইছেন।

HIS WIFE – Anton Chekov

লেখক পরিচিতি লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে প্রকাশিত

লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক

ডি, এইচ, লরেন্স

উনিশ শ সতেরো। সারা য়ুরোপ জুড়ে বাজছে রণদামামা, জ্বলছে আগুন বারুদের গন্ধ ভাসছে বাতাসে, মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে। ধ্বংসের মাঝে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করছে মানুষ। উত্তাল আর অশান্ত এই পরিবেশেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে মানুষ, বাঁধছে ঘর। কয়েক দিনের ছুটিতে স্বদেশে এসেছিল ক্লিফোর্ড। কনস্টান্স ভালোবেসে বিয়ে করল তাকে। রয়ে বসে সাংসর্গিক উষ্ণতা উপভোগের সুযোগ পেলনা বেচারা ক্লিফোর্ড। ফিরেযেতে হলো তাকে ফ্লান্ডার্সে—তার কর্মস্থলে। ছ'মাস পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিতান্তই আকস্মিকভাবে যখন সে ফিরে এল, তখন সে এক অন্য মানুষ—চেনাই যায়না তাকে। চিকিৎসকের একটানা দু' বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস-প্রযত্নে কোন রকমে বেঁচে গেল ক্লিফোর্ড কিন্তু জন্মের মতো শিথিল হয়ে গেল তার নিম্নাঙ্গ। সে সময় কনস্টান্স—সুন্দরী কোনি সবেমাত্র বাইশটি বসন্ত কাটিয়ে উপনীত হয়েছে তেইশ বছরের ভরা যৌবনে। আর হতভাগ্য ক্লিফোর্ডের বয়স তখন উনত্রিশ।

ক্লিফোর্ড স্থির করল এবার লণ্ডনের পাট চুকিয়ে কোনিকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে রাগবি হলে—তার দেশের বাড়িতে। ক্লিফোর্ডের দাদা হার্বার্ট প্রাণ হারিয়েছে

রণাঙ্গনে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্লিফোর্ডের এই শোচনীয় অবস্থা—শোকে-দুঃখে মারা গিয়েছিলেন ক্লিফোর্ডের বাবা। পিতার মৃত্যুর পর ক্লিফোর্ড উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার উপাধি পেল—সে হলো স্যর ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি আর কনস্টান্স বা কোণি হলো লেডি চ্যাটার্লি।

অনিঃশেষ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও দাম্পত্য জীবনের সুখ তারা পেল না। ক্লিফোর্ড পঙ্গু আর অসমর্থ কোনদিনই বাবা হতে পারবে না সে। নিজের অক্ষমতার জন্য প্রথম প্রথম দুঃখ হতো তার। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শোক হারায় তার গভীরতা। পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লিফোর্ডের মুখ তার নিষ্প্রভ নীল চোখ দুটি আবার ঝকঝকে হয়ে উঠল। আভিজাত্যমণ্ডিত সুন্দর দামী পোষাক পরত সে, বাঁধত শৌখিন টাই। মোটর বসানো একটা চেয়ারে বসে বাগানের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত সে।

কোণির গোলাপী দেহে স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে, উদ্দীপ্ত তার যৌবন। কী সুন্দর তার চোখ দু'টি। তার কণ্ঠস্বর কী মধুর! কিন্তু তার এত রূপ, এত তাপ—সবই মূল্যহীন, অর্থহীন হয়ে পড়ে—কোণির বাবা জীবনরসিক স্যার ম্যালকাম রীড স্বনামধন্য রয়েল আর্টিস্ট; তার মা শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক-প্রাপ্তা সুশ্রী মহিলা। খোলামেলা পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে কোণি আর তার দিদি হিলডা। বাবা-মার সঙ্গে ফ্লোরেন্স, প্যারিস, রোম, বার্লিন—যত্র-তত্র অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা। ড্রেসডেনে দু'বোন পাঁচ বছর গান শিখেছে। যেমন খুশী মেলামেশা করেছে তারা উঠতি বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে। প্রথমটা জৈবিক সম্ভোগস্পৃহার অতীত স্বর্গীয় প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে থাকত দুই বোন। কিন্তু ছেলেরা যে বড় বেশি লোভী, লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারা মেয়েদের যৌবনের দিকে। তাই খুশী করতে হয়েছে তাদের আর সেই সঙ্গে মিলেছে যৌনমিলনের নিবিড় আনন্দ। আশৈশবের অনির্বচনীয় এই শিহরণের মাঝে সহসা ছেদ পড়েছিল। একদিকে সর্বনাশা প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশ, অন্যদিকে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল তাদের। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিতে কোণি আর হিলডাকে ড্রেসডেন ছেড়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। কোণির বয়স তখন উনিশ, হিলডার একুশ।

কেনসিংটনে ফিরে দু'একটা দিন তাদের জীবনটা কেমন যেন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একঘেয়ে ভাবটা কেটে গেল কেমব্রিজের আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের সঙ্গে হৈচৈ করে। হিলডা বিয়ে করে বসল এমন এক যুবককে।

ছেলেটির মুখে রঙ-চঙে বুলি, সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখে, অবাধে ঢুকে যায় হোমরা চোমরাদের অন্তঃপুরে। আর অভিজাত পরিবারের বাইশ বছরের যুবক ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কোণির। ক্লিফোর্ড কয়লা সম্পর্কীয় ট্রেনিং নিয়েছিল বিদেশ থেকে। কিন্তু যোগ দিয়েছিল সে সামরিক বিভাগে।

ঊনিশ শ' কুড়ির এক শরতে সস্ত্রীক স্যর ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি ওক বনে ঘেরা পিতৃপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত, বাদামী পাথরের পুরোনো বাড়ি রাগবী হলে এল নতুন করে সংসার পাততে। ক্লিফোর্ডের বোন এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লণ্ডনে—থাকে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। টেভারসলের কয়লাখনি অধ্যুষিত এই এলাকাটি বস্তি, কয়লার ধোঁয়া, গন্ধকের ঘ্রাণ আর কুলি-কামিনে পরিপূর্ণ।

এখানে এসে পর্যন্ত ক্লিফোর্ডকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে কোণি। নিজের হাতেই সে তার অসমর্থ, পঙ্গু স্বামীর সেবা করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিতৃষ্ণা আর অস্থিরতা ঘিরে ধরল তাকে। তার মনে হলো অনন্ত প্রসারিত বিপুল কর্মচঞ্চল এই বিশ্বের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি যেন ছিন্ন হয়েছে। কি পেল সে? অক্ষম ক্লিফোর্ড আর তার সাহিত্য কীর্তির নিদর্শন কয়েকখানি বই—এদের নিয়ে কী কোন পূর্ণযুবতী সুখী হতে পারে! ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল কোণির দেহ। অবর্ণনীয় এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল সে। কয়েকবার তার বাবা এসেছিলেন রাগবী হলে। কোণির সহানুভূতিশীল পিতা বুঝেছিলেন এভাবে চলতে পারে না। তিনি কোণিকে ডেকে বললেন, 'বিয়ের পর যদি কুমারীর মতো জীবন কাটাতে হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখ আর কী হতে পারে! আর ঠিক এইজন্যেই তোর শরীর ভেঙে পড়ছে।' শুধু কোণিকেই নয় ক্লিফোর্ডকেও জানালেন তিনি মেয়ের শারীরিক অসুস্থতার মূলীভূত কারণটি। লজ্জায় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল ক্লিফোর্ড। ইদানীং ক্লিফোর্ডের হাবভাব দেখে কোণির মনে হয়েছে সে যেন বলতে চায় তার অলক্ষ্যে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে কোণি স্বচ্ছন্দে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

সুখ নেই কোণির মনে। ধূসর বাড়িটাকে ঘিরে আছে চোখ জুড়ানো সবুজ বন। শ্যামল শোভন সেই বনের মাঝে আশ্রয় নিয়ে কোণির শ্রান্ত মন দু'দণ্ডের শান্তি পায়। শীতে মাইকেলিস নামে তিরিশ বছরের সুদর্শন, সুসজ্জিত অবিবাহিত এক আইরিশ নাট্যকার নিমন্ত্রিত হয়ে এল রাগবী হলে। বিত্তবান স্বচ্ছল এই যুবকটির মনে কিন্তু বিষাদের ছোপ লেগেছে। কোণির মনে সে লাগায় ভালোবাসার নেশা।

প্রাতরাশ পর্ব চুকলে মাইকেলিস তার মোটর ছুটিয়ে শেফিল্ড যাওয়ার উদ্যোগ করছিল। হঠাৎ কি মনে হলো তার কোণির ভৃত্যকে কাছে ডেকে বলে আমি একটু শেফিল্ড যাচ্ছি। লেডি চ্যাটার্লিকে জিজ্ঞেস করে এস তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা।' একটু পরেই চাকরটি ফিরে এসে জানায় যে লেডি চ্যাটার্লি মাইকেলিসকে ডেকে পাঠিয়েছেন চারতলায় তাঁর ঘরে।

ঘরটি বড় সুন্দর। পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে জর্মন শিল্পীদের আঁকা ললিত চিত্র। ঘরটি শোভন সজ্জা লেডি চ্যাটার্লির সুরুচির পরিচায়ক বলে মনে হলো মাইকেলিসের। তারিফ করে সে বলে, 'বাঃ। ভারি চমৎকার আপনার ঘরটি!' অতঃপর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গল্প করে তারা। কোণির আত্যন্তিক আগ্রহে মাইকেলিসকে তার বাড়ির কথা—বাবা-মা ভাই-বোনের কথা বলতে হয়। প্রসঙ্গত সহায় সম্বলহীন অবস্থা থেকে কিভাবে সুখ্যাতির স্বর্ণচূড়ায় তার উত্তরণ ঘটল সে সম্বন্ধে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত বিবরণ পেশ করল মাইকেলিস।

কোণি বলে, 'আপনি একা একা থাকেন, কষ্ট হয় না?'

মাইকেলিস বলল, 'কেন আপনিও তো সঙ্গহীন।'

—'হ্যাঁ আমিও সঙ্গহীন, তবে আপনার মতো পুরোপুরি নিঃসঙ্গ নয়।'

ম্লান একটু হেসে মাইকেলিস বলে, 'আমার সঙ্গহীন, দুঃখময় জীবনের প্রতি আপনার মমত্ব বোধের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কি আপনার হাতটা একটু ধরতে পারি?'

মাইকেলিসের স্বচ্ছ চোখ দু'টিতে অদ্ভুত একটা আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে। কোণি ধরা দিল। মাইকেলিস নতজানু হয়ে বসে কোণির পেলব পা দু'টি জড়িয়ে ধরল। পরে কোণির উষ্ণ কোলে মুখ লুকিয়ে। চলচ্ছক্তিহীন হয়ে বসে থাকে কোণি। অতঃপর মাইকেলিস কোণির হাত-পা অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। প্রশ্ন করে, 'রাগ করনি তো?'

কোণি বলে, 'রাগ করব কেন, তুমি তো কোন অন্যায় করনি। তবে ক্লিফোর্ড এ সব জানতে পারলে দুঃখ পাবে।' অনেক আনন্দ নিয়ে মাইকেলিস শেফিল্ডে গেল। বিকেলে ফিরবে সে।

দুপুরে খেতে বসে ক্লিফোর্ড কোণিকে বলে, 'বাইরে থেকে যতই তাকে ভদ্র মনে হোক না কেন, মাইকেলিস লোকটা খুব একটা সুবিধের নয়।' কোণি ভাবে ক্লিফোর্ড ঠিকই বলেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় মাইকেলিস সংকোচহীন

নির্ভীক, নিঃশঙ্ক—অদ্ভুত তার আকর্ষণী শক্তি। এই অল্প বয়সেই অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে সে। অন্য কোন লোক হলে গর্বে তার মাটিতে পা পড়ত না।'

সন্ধ্যেবেলায় মাইকেলিস কোণিকে বলে, 'আমি কি তোমার ঘরে যাব?'

কোণি বলে, 'আমিই তোমার কাছে যাব।' অনেকক্ষণ ধরে কোণির আশায় বসে ছিল মাইকেলিস। অবশেষে কোণি এল। তাকে পেয়ে মাইকেলিসের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হলো। দপ করে জ্বলে উঠেছিল কামনার আগুন তার মুহূর্তেই নির্বাপিত হয়েছিল। তিন দিন ছিল মাইকেলিস। চলে যাওয়ার পর মাঝে মাঝেই সে কোণিকে চিঠি লিখত—নিরুত্তাপ প্রেমপত্র। কেমন যেন বিষণ্ণ আর উদাসীন এই মাইকেলিস। কোণি জানত এ প্রেম ধোপে টিকবে না।

ফেব্রুয়ারির কুয়াশাচ্ছন্ন এক সকালে ক্লিফোর্ড তার মোটর-চেয়ারে আর কোণি পায়ে হেঁটে ওক বনে বেড়াচ্ছিল। এই বনকে বড় ভালোবাসে ক্লিফোর্ড। এঁকে বেঁকে চলে গেছে একটা পায়ে চলা পথ। পাতায় ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ পড়ছে ক্লিফোর্ডের মুখে। সে বলে, 'জান কোণি এই বনকে ঘিরে কত দিনের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই বনভূমির ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। যেমন করেই হোক এ বনকে আমি বাঁচিয়ে রাখব। কিন্তু এখানে এলে উত্তরাধিকারীর অভাব বোধটা জেগে ওঠে।' কোণি বলে, 'সন্তানের অভাবটা আমার বুকেও বড় বেশি বাজে।'

নিষ্প্রভ নীল চোখ মেলে ক্লিফোর্ড তাকায় কোণির দিকে। সে বলে, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে তোমার যদি সন্তান হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমরা দু'জনে মিলে রাগবী-তেই তাকে বড় করে তুলব।'

চমকে ওঠে কোণি। বলে, 'কিন্তু অন্য কোন পুরুষ বলতে তুমি কাকে বোঝাতে চাইছ?'

—'সে যে কেউ হতে পারে। মনের মিলনই সত্যিকারের বিবাহ। তোমার আমার বিয়ে হয়েছে—এটাই আমার কাছে একমাত্র সত্য। তাছাড়া তোমার উন্নত রুচির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। দাঁতের যন্ত্রণায় ছটফট করে লোকে যেমন ডেন্টিস্টের কাছে ছোটে তুমিও তেমনি সন্তান কামনায় যদি পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হও তাতে কিছু আসে যায় না।'

—'যার ঔরসে আমি গর্ভবতী হব, তার বংশমর্যাদা নিয়েও তুমি মাথা ঘামাবে না?'

—'বললাম তো, আমার যথেষ্ট আস্থা আছে তোমার ওপর। আমি জানি এ ব্যাপারে তুমি কোন বাজে লোককে নির্বাচন করবে না।'

কোণি চুপ করে থাকে। তার মনে হয় ক্লিফোর্ড ঠিকই বলেছে। কিন্তু মানুষের মনের রঙ বদলাতে তো বেশি সময় লাগে না। পরে যদি ক্লিফোর্ডের মনের পরিবর্তন হয়। সহসা বনমলে বানওয়ালা বাদামী রঙের লোমশ একটা কুকুরের পেছনে ধাবমান বন্দুকধারী একটা লোককে দেখল কোণি। লোকটির সুন্দর গোঁফ রয়েছে আর মুখের রঙ গোলাপী। উদ্দাম তার জীবনী শক্তি। ক্লিফোর্ড বলে, 'লোকটি মেলর্স, আমাদের চৌকিদার।'

ক্লিফোর্ড তাকে ডাকল। সৈনিকের মতো দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে ক্লিফোর্ডকে অভিবাদন করে সে। ক্লিফোর্ড তাকে মোটর-চেয়ারটা একটু ঠেলে দিতে বলে আর প্রশ্ন করে, 'লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?'

'না, মশাই।'—উত্তর দেয় সে। একবারও তাকাল না সে লেডি চ্যাটার্লির দিকে।

মেলর্স সম্বন্ধে কোণির কৌতূহল জাগে। ক্লিফোর্ডকে প্রশ্ন করে সে জানতে পারে যে, মেলর্সের বাড়ি টেভারসলে। তার বাবা খনিতে কাজ করত। মেলর্স যুদ্ধে গিয়েছিল। আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর স্যার ক্লিফোর্ড তাকে চৌকিদার হিসাবে নিয়োগ করেছেন। বেচারা বিয়ে করেছিল কিন্তু তার বৌটা দুশ্চরিত্রা, ভ্রষ্টা। যার তার সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াত সে। পরে একজন মজুরের সঙ্গে স্ট্যাকস্‌গেটে ঘর বেঁধেছে সে। হ্যাঁ সে একরকম একাই। তবে শোনা যায় গ্রামের বাড়িতে তার মা আছে আর একটি ছেলেও আছে।

মাইকেলিস নতুন একটা নাটক লিখছে। সবেমাত্র প্রথম অংক শেষ করেছে। তার নাটকের নায়ক হলো ক্লিফোর্ড। একথা শুনে ক্লিফোর্ড আনন্দের আতিশয্যে মাইকেলিসকে নিমন্ত্রণ করে। গ্রীষ্মে পুনরায় মাইকেলিস এল রাগবী হলে। মহাসমারোহে সে তার নাটকের প্রথম অংকটি পড়ল। স্যার ক্লিফোর্ড অভিভূত হলো।

অতঃপর মাইকেলিস কোণির সেই সুসজ্জিত বসবার ঘরটিতে এল। কোণিকে শুধায় সে, 'কি, তুমি তো বললে না নাটকের প্রথম অংক কেমন লাগল তোমার?'

—'খুব ভালো লেগেছে, চমৎকার হয়েছে।' কোণির প্রশংসায় আনন্দে ভরে ওঠে মাইকেলিসের মন। সহসা সে কোণিকে বলে, 'শোনো। ঢাক ঢাক-গুড় গুড় করে কি লাভ? এস না আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

কোণি যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে, 'সে কি! আমি যে বিবাহিত। ক্লিফোর্ডকে আমি তো ছেড়ে যেতে পারব না।'

—'কেন পারবে না! লোকটি তো তোমার কোন প্রয়োজনেই লাগে না। সে তো নিজের মাঝেই সিঁধিয়ে আছে।'

—'কিন্তু সব পুরুষমানুষই তো নিজের মাঝে ডুবে থাকে।'

—'তীক্ষ্ম জীবন-সংগ্রামকে তো অস্বীকার কার যায় না। তাই পুরুষমানুষকে বড় বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তাই বলে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কটিকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে পুরুষ নারীকে সম্ভোগের সুখ দিতে পারে না সে অক্ষম—তাই নিঃসন্দেহেই বর্জনীয়। নিজের সম্বন্ধে এইটুকুই শুধু বলতে পারি, যে-কোন নারীকে ভোগের উপকরণ যোগাতে পারব আর সেই সঙ্গে তার প্রার্থিত আনন্দটুকুও দিতে পারব তাকে। পোষাক, অলংকার, দেশ ভ্রমণের আনন্দ, প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠা—সে যা চায় সবই দেব।'

—'আচ্ছা একটু ভেবে দেখি। আর ক্লিফোর্ডের কথাও যে ভাবতে হবে—আমি ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! সে যে অক্ষম, অসহায়!'

—'আর আমি! আমিও তো একা?'

সন্ধ্যেবেলা মাইকেলিস কোণিকে বলে, 'রাতে আমার ঘরে আসবে তো?'

একটু হেসে কোণি বলে, 'আসব।'

সে রাতে মাইকেলিসের কামের আগুন মুহূর্তেই নির্বাপিত হলো। অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করে নেতিয়ে পড়ল সে। নিষ্পন্দ, শিথিল মাইকেলিস শুয়ে আছে তপ্ত শয্যায়। কোণি কিন্তু অতৃপ্ত—চরম সুখটুকু সে পায়নি। মাইকেলিসের ওপরে উঠে সে তার অদম্য তৃষ্ণা মেটাতে প্রয়াসী হয়। অবশেষে পূর্ণতৃপ্তি পেল কোণি আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দিল মাইকেলিসকে।

মাইকেলিস রেগে উঠে বলে, 'তুমি নিজের টুকুই শুধু বোঝ।' তার এই মন্তব্য আঘাত পেল কোণি। সে বলল, 'তোমার পরম পুলকানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই সব মিটে গেল তাই না? আমার তৃপ্তির প্রশ্ন ওঠে না—কি বল?'

উত্তেজিত মাইকেলিস বলে, 'কিন্তু তোমাকে খুশী করতে গেলে তো ঘণ্টাখানেক লাগবে। এই সময়টা আমায় আটকে থাকতে হবে?'

কোণি কোন কথা বলে না। স্থির করে ফেলেছে সে মাইকেলিসের সঙ্গে আর নয়।

ক্লিফোর্ডের চৌকিদারকে খুব প্রয়োজন। কিন্তু চাকরটা অসুস্থ। খবর দেবে কে?

কোণি বলে, 'আমি তো ওদিকে বেড়াতে যাব আর অমনি চৌকিদারকেও খবরটা দিয়ে দেব।'

শান্ত নির্জন বনভূমি। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাতা থেকে তখনও ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। বনের উত্তরপ্রান্তে মেলর্সের বাড়ি। রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে কোণি। কোন সাড়াশব্দ নেই। সহসা কোণির চোখে পড়ে একটু দূরে অনাবৃত দেহে সাবান মেখে স্নান করছে মেলর্স। লুকিয়ে লুকিয়ে সে মেলর্সের দেহটা দেখতে লাগল।

একটু পরে কোণি আবার দরজায় টোকা দেয়। মেলর্স দরজা খুলে দেয়। কোণিকে দেখে বিস্মিত হলো সে। পরে মৃদু হেসে বলে, 'আসুন, লেডি চ্যাটার্লি।' ক্লিফোর্ড যা বলতে বলেছিল কোণি তা মেলর্সকে বলে। তারপর মেলর্সকে জিজ্ঞেস করে সে, 'তুমি কি এখানে একাই থাক?

—হ্যাঁ। সপ্তায় একদিন মা আসেন। ঘর-দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। আর আমার রান্না-বান্না টুকটাক কাজকর্ম আমি নিজেই করি'

নিছক ভদ্রতার খাতিরে কোণি বলে, 'এমন সময়ে এসে পড়লাম, নিশ্চয় তোমার কাজের ক্ষতি হলো?'

—'না না কোন ক্ষতিই করেননি। আমি তো একাই থাকি, কেউ আসে না আমার কাছে। তাই আপনি যখন দরজায় টোকা দিচ্ছিলেন, অবাক হয়েছিলাম খুব।'

দুজনে আজ দুজনকে চিনল। কোণিকে ভালো লাগল মেলর্সের,মেলর্সকে ভালো লাগল কোণির।

রাতে শোবার ঘরে ঢুকে কোণি তার পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহে বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। আলোটাকে একটু ঘুরিয়ে নিজের নগ্ন শরীরে ফেলল। একদিন কত সুন্দর ছিল তার দেহটি কিন্তু এখন তার সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়েছে। কোনদিনই খুব একটা লম্বা ছিল না সে। বরং

শুকচ যুবতীর মতো একটু খর্ব'ই ছিল। তার গায়ের রঙ কত উজ্জ্বল ছিল, এখন রঙটাতে ধূসর একটা ছোপ লেগেছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেলবতা হ্রাস পেয়েছে আর শরীরটাও কেমন যেন রুক্ষ-নীরস হয়ে উঠেছে। তার স্তনদুটি কোনদিনই খুব একটা স্থূল ছিল না—সে দুটি সদ্য ছেঁড়া তাজা নাশপাতির মতো ঝলমল করত। আজ স্তনের সে কাঠিন্য আর নেই, একটু যেন শিথিল হয়ে পড়েছে সে দুটি। নব যৌবন সঞ্চারে কোণি যখন প্রথম প্রেমে পড়েছিল তখন তার পেটের সে ঝকঝকে ভাবটাও আর নেই, কেমন যেন ক্ষীণ লাগছে তার রমিত উদর, ঝরে গেছে সে লোভন দ্যুতি। সাতাশ বছরেই তার যৌবন নদীতে যেন ভাঁটা পড়েছে।

কোণির মন হয়েছে অস্থির। মনের কথা খুলে বলার লোকও নেই। তার দিদি হিলডা থাকে স্কটল্যাণ্ডে। কোণি চিঠি লেখে তাকে। চিঠি পেয়ে ছুটে এল হিলডা। কোণিকে দেখে বলে, 'কি হয়েছে তোর? তোকে যে আর চেনাই যায় না।'

কোণি বলে, 'আমার মনে একটুও শান্তি নেই রে।'

হিলডা উত্তেজিত হয়ে ক্লিফোর্ডের ঘরে ঢোকে। বললে, 'কোণির শরীরটা যে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে যদি ভালো ডাক্তার না থাকে, তাহলে ওকে লণ্ডনে নিয়ে যাব। আমার কাছে কিংবা আমার বাবার কাছে যেখানে খুশী থাকতে পারে সে। আর তোমাকে দেখাশুনো করার জন্য ভালোদেখে একজন লোক পাঠাব।'

খুবই উত্তেজিত হয়েছিল ক্লিফোর্ড। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে 'কোণির মত কি? সে কি চায় যেতে?'

হিলডা বলে, 'সে যেতে চাক বা না চাক, যেতে তাকে হবেই। মার মনে শান্তি ছিল না, তাই তাঁর ক্যানসার হয়েছিল। মার অবস্থা কোণিরও হোক এ আমি চাই না।'

—শোন হিলডা, লোক আমি রাখতে চাই না। আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য মিসেস বোল্টনকেই না হয় ডেকে পাঠাব। সেবার আমার জ্বরে আন্তরিক-সেবা করেছিল সে।'

মিসেস বোল্টন নম্র-ভদ্র, বয়স সাতচল্লিশ। ক্লিফোর্ডকে সে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। পাশের ঘরে শোয়, দরকার পড়লে ক্লিফোর্ড তাকে ডাকে। মিসেস বোল্টন কোণির প্রতিও সহানুভূতিশীল। কোণির শরীর খারাপ, রোগা হয়ে

গেছে সে। সেজন্য মিসেস বোল্টনের মনটাও খারাপ। হাজার হোক সে যে একজন নার্স।

একদিনের রৌদ্রোজ্জ্বল এক সকালে মিসেস বোল্টন কোণিকে বলে, 'আমি তো রয়েছি। আপনি বরং একটু বেড়িয়ে আসুন মেলর্সের বাড়ির আশেপাশে কী সুন্দর ডেফোডিল ফুটছে!' ডেফোডিল! চমক লাগে কোণির। তাহলে তো আবার আসছে আর একটা বসন্ত! খুশীতে ভরে ওঠে কোণির মন। রঙীন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে সে। এখানে সেখানে ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল—ভায়োলেট, প্রিমরোজ, সেলেণ্ডাইন, ডেফোডিল। ছোট্ট একটা মেয়ের মতো উপচে পড়া আনন্দ নিয়ে ফুল তুলছে সে। মনে পড়ছে তার কত কবিতার কত লাইন।

কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়! কোণির মনে ঘনিয়ে ওঠে বিষাদ। আবার ফিরতে হবে একঘেয়ে নিরানন্দময় সেই রাগবী-হলে। একগোছা ডেফোডিল ফুল হাতে নিয়ে কোণি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লিফোর্ড জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরী হলো যে?' কোণি বলে, 'তোমার জন্যে ডেফোডিল ফুল এনেছি। সত্যি বনটা কী সুন্দর। বনে ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে। আর আশ্চর্য হই যখন ভাবি মাটির বুকেই জন্ম নিয়েছে সুন্দর এইফুলগুলি!'

পরের দিনও কোণি হাঁটতে হাঁটতেএলো সেই বনে। ফার বন। কিছুটা দূরে একটা ঝরণা। কলধ্বনি আসছিল তার কানে। পায়ে চলা সংকীর্ণ পথ দিয়ে একটু এগুতেই হাতুড়ির ঠকঠক শব্দ শোনা গেল। মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর। হাতুড়ি ঠুকে মেলর্স কি যেন করছে। কোণিকে দেখে সে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করল ঠিকই, কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় সে যে একটু বিরক্ত হয়েছে। একা থাকতেই ভালোবাসে সে, সযত্নে এড়িয়ে চলে নারীদের সঙ্গ। মনিবপত্নীকে দেখে মনে হয়েছিল তার, এতো আচ্ছা ফ্যাসাদ—ইনি কি আমায় একা থাকতে দেবেন না!

একটা টুলের ওপর বসল কোণি। আর যে মুহূর্তে মনিবপত্নীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো, শিউরে উঠল মেলর্স। কী সর্বনাশ! লেডি চ্যাটার্লির চোখে ফুটে উঠেছে আসঙ্গ লিপ্সা, শানিত যৌনতৃষ্ণা। মেলর্সের শরীরটাও তেতে উঠল।

অনেকক্ষণ বসেছিল কোণি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, সন্ধে হলো এবার

বাড়ি ফিরতে হবে। মেলর্সকে বলে সে, 'এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। আমি কিন্তু আবার আসব। আচ্ছা তুমি যখন কাজে ব্যস্ত থাক, এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি কর তখন কি দরজাটা বন্ধ থাকে?' 'হ্যাঁ'—মেলর্স উত্তর দেয়।

কোণি বলে, 'তোমার কাছে কি একটাই চাবি আছে?'

—'হ্যাঁ'। তবে স্যার ক্লিফোর্ডের কাছে এই ঘরের আর একটা চাবি থাক'লও থাকতে পারে।'

—'আমি বরং তোমার চাবিটি নিয়ে যাই—সময় সুযোগ মতো তুমি চাবি-ওয়ালাকে ডেকে আর একটা চাবি করিয়ে নিও।'

—'কিন্তু মাদাম, এদিকে তো কোন চাবিওয়ালা মিলবে না।'

অসন্তুষ্ট হলো কোণি।

বাড়ি ফেরার পথে কোণির সঙ্গে মিসেস বোল্টনের দেখা হলো। বোল্টন বলে, 'ফিরতে আপনার দেরী হচ্ছে। এদিকে স্যর ক্লিফোর্ডের চা পানের সময় যাচ্ছে পেরিয়ে, তাই আপনাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

—'তুমিই তো ক্লিফোর্ডকে চা করে দিতে পারতে।'

—'আপনিই তো বরাবর চা করে দেন। আমি চা করলে হয়তো তার পছন্দ হবে না!'

কোণি ক্লিফোর্ডকে চা দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'পাখী রয়েছে যেখানে তার পাশের ছোট ঘরটার চাবি আছে তোমার কাছে?'

—'বাবার পড়ার ঘরে থাকতেও পারে। কেন কি হবে?'

—'ঐ জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। মেলর্স তো ঘরটা বন্ধ করেই রাখে। চাবি থাকলে ইচ্ছে মতো আমি ওখানে যেতে পারি। মেলর্সের কাছে চাবি চেয়েছিলাম। সে বেশ বিরক্ত হলো।'

—'ওর স্পর্ধা তো কম নয়! বড় বাড় বেড়েছে। মেলর্স প্রথমে মিশরের সেনাদলে কামারের কাজ করত। পরে একজন ভারতীয় কর্ণেলের দাক্ষিণ্যে একেবারে লেফট্যানেণ্ট হয়ে গেল। সেই কর্ণেলের সঙ্গে ভারতবর্ষেও গিয়েছিল। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ল মেলর্স। তার পর পেন্সন নিয়ে এখানে চলে এল। ঘোড়ার ব্যাপারে সে বেশ অভিজ্ঞ। আর কাজ-কর্মও বেশ নিখুঁতভাবে করে।'

ক'দিন হলো বৃষ্টি হচ্ছে। রাগবী-হলের সেই একঘেয়ে জীবন কোণির অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই বৃষ্টির মাঝেই সে বেরিয়ে পড়ে। শান্ত-নির্জন বনভূমি।

মেলর্স বাড়ি নেই। কোণির প্রিয় ঘরটিতে তালা ঝুলছে। একটু পরেই মেলর্স এলো। পকেট হাতড়ে একটা চাবি বের করে কোণির হাতে দিয়ে সে বলে, 'পাখীগুলোকে অন্য কোথাও না হয় রাখব। চাবিটা আপনি রাখুন।'

কোণি বেশ একটু চটে গেল। বললে, 'পাখীও সরাতে হবে না, চাবিতেও আমার কাজ নেই।'

মেলর্স বলে, 'আপনি রাগ করছেন কেন? পাখীগুলো আর কয়েকদিন পরে ডিম পাড়বে। তারপর বাচ্চা হবে। স্যর ক্লিফোর্ডের নির্দেশে এসময় আমাকে পাখীর তদারকি করতে হয়। একটু শান্তি পাওয়ার জন্য আপনি এখানে বসবেন। আর আমি যদি একসময় পাখীর কাজে ক্রমাগত ঘোরা-ফেরা করি আপনি তাহলে অবশ্যই বিরক্ত হবেন।'

—'বিরক্ত হব কেন? তুমি তোমার কাজ করবে, আমি থাকব আমার মতো।'

—'এটি তো আপনারই বাড়ি। যখন খুশী আসবেন। আমাকে চলে যেতে বললেই চলে যাব।'

—'ফের সেই এক কথা! কেন তুমি চলে যাবে? তুমি কি সভ্য মানুষ নও? তুমি কি ভেবেছ তোমায় আমি ভয় করি?'

কেমন যেন একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে মেলর্সের মুখে। সে বলে, 'ঠিক আছে আপনার জন্যে একটা চাবি করিয়ে দেব। আমাদের দুজনের কাছে দু'টি চাবি থাকবে।' প্রচণ্ড রেগে কোণি বলে, 'তোমার সাহস দেখছি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

মেলর্স বললে, লেডি চ্যাটার্লি মিথ্যেই রাগ করছেন আপনি। আমি থাকলেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না জেনেই আমি দু'জনের কাছে দুটি চাবি রাখার কথা বলেছি।'

কোণি সমস্ত মন ক্লিফোর্ডের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। তার মনে হয় কোনদিনই সে ক্লিফোর্ডকে সইতে পারেনি, ভালোবাসতে পারেনি। এদিকে ক্লিফোর্ডের প্রতি মিসেস বোল্টনের বেশ একটা দুর্বলতা রয়েছে। ভদ্রমহিলা স্যর ক্লিফোর্ডকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। একসঙ্গে দাবা খেলে তারা, গল্প করে। মিসেস বোল্টনকে পেয়ে ক্লিফোর্ডও খুব খুশী হয়েছে। এতদিন ক্লিফোর্ড শুধু লিখত, এখন মাইনিং নিয়েও মাথা ঘামায়।

একদিন বিকেলে চা পানের পর কোণি বনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সারা আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। রমণীয় হয়ে উঠেছে বনভূমি।

মেলর্স কোণিকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে দিয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করেছে। একটু দূরে কাঠ-কুটো দিয়ে পাখীর ঘর করে দিয়েছে।

মুরগীগুলো ডিম পেড়েছে। দিন-রাত্তির তারা ডিমে তা দিচ্ছে। সন্তান-কামনায় কোণির হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে। তার মনে হয় মুরগীগুলোকেও ভগবান কত সুখ দিয়েছেন—তাদের বাচ্চা হবে। কোণি তাদের খাবার দিতে গেলে মুরগীগুলো ডানা দিয়ে ঝটপট করে। ছোট একটা পাত্রে কোণি তাদের জল দিল। একটা মুরগী জল খেল।

বসন্তে অজস্র ফুলের সমারোহে, প্রাণ-চাঞ্চল্য—প্রকৃতির এই বন্য পরিবেশে ডিম ফুটে মুরগীদের বাচ্চা হয়েছে, সর্বসাকুল্যে ছাব্বিশটি। অসীম বিস্ময়ে কোণি একটা বাচ্চাকে হাতে নিল। সহসা তার চোখ জলে ভরে ওঠে। কান্নাকে কিছুতেই আর দমন করতে পারে না কোণি।

কোণির গোলাপী হাঁটুতে, পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় মেলর্স, 'কাঁদবেন না লেডি চ্যাটার্লি। রুমাল দিয়ে কোণি তার চোখ মোছে। মেলর্স তাকে ঘরে নিয়ে এল। টেবিল-চেয়ার সরিয়ে, কম্বল পেতে তাকে শুতে বলল। দরজাটা বন্ধ করে ঘর ভর্তি অন্ধকারে সে কোণির নরম গায়ে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে তার গালে চুমু দিল। তারপর মিলনের রসঘন মুহূর্তে শিহরিত হলো দুজনের শরীর চরম পুলকানুভূতির পর শ্রান্ত দেহে মেলর্স অনেকক্ষণ কোণির ওপর শুয়ে রইল।

কোণির শরীরটা আজ বেশ ঝরঝরে লাগছিল। তার মনে হলো সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মানুষটি কত কাছের মানুষ হয়ে তার কাছে ধরা দিল। অবশেষে মেলর্স উঠল, দরজা খুলল। কোণি তার পোষাক ঠিক করল আর বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। মেলর্স গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাকে। বললে, 'আজকের এ ব্যাপারের জন্যে তোমার দুঃখ জাগেনি তো?'

কোণি বলে, 'না। জীবন মানেই জটিলতা আর আজ থেকে জটিলতার আবর্তে পড়ে আমার নতুন জীবন শুরু হলো।'

মেলর্স বলে, 'আর আজ থেকে নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীটা যে বড় বেশি লোকে ঠাসা। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম আমার বিরামময় জীবনে নারীর আনাগোনা বুঝি বা স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু না, আজ আবার শুরু হলো নতুন জীবনের।' কোণি বলে, 'হ্যাঁ বাঁচতে হবে আমাদের আর প্রেমই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। একটা কথা সত্যি করে বলবে?

আমায় তুমি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছ না তো ?

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মেলর্স কোণিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'না গো না ! জীবন আজ আমার ভরে উঠল ।'

কোণি বলে, 'অনেক পেলাম তোমার কাছ থেকে। জানিনা বিনিময়ে তোমায় আমি কতটুকু দিতে পেরেছি !'

পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোণি যখন মেলর্সের কাছ থেকে বিদায় নিল আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে, রমনীয় হয়ে উঠেছে ওকের বন ।

কত দ্রুত কেটে গেল একটা রাত। আবার সকাল হলো, দুপুর হলো, দুপুর গড়িয়ে এলো আর একটি বিকেল। নিজের অজানিতেই বুঝি কোণি আবার এল বনে। বসন্তের ছোঁয়ায় সবকিছুই আজ সজীব হয়ে উঠেছে। নিজের শুকিয়ে আসা শরীরটাও আবার রূপে-রসে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

আশেপাশে মেলর্স নেই। মুরগীর বাচ্চাগুলো প্রাণ চাঞ্চল্যে উচ্ছল। মুরগীরা ডাকছে মাঝে মাঝে। কোণির হাতে সময় খুব অল্প। ক্লিফোর্ডের চা পানের সময় হলো। এখুনি তাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

হনহন করে বাড়ির দিকে এগুচ্ছে কোণি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কোণির টুপি ভিজে গেছে। কোণি বাড়ি ফিরলে ক্লিফোর্ড জিজ্ঞেস করে, বৃষ্টি হচ্ছে ?'

কোণি বলে, 'হ্যাঁ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।'

বেশ একটু তাড়াতাড়ি চা পর্ব চুকিয়ে কোণি আবার ছুটল স্বপ্নময় সেই বনে ! তার কাছে চাবি ছিল। ঘরটিতে ঢুকল সে। দরজার কাছে টুলে বসে মেলর্সের জন্যে অপেক্ষা করে সে। মেলর্স এল অবশেষে। বলে, 'তুমি তাহলে এলে।'

টুল থেকে উঠে কোণি বলে, 'এত দেরি করলে কেন ? চল ভেতরে যাই।'

মেলর্স বলল, 'এভাবে আমার কাছে আস তুমি, একদিন না একদিন লোকে জানতে পারবে। কোন ঝামেলাই হবে না যদি তুমি না আস।'

—'যত ঝামেলাই হোক না কেন আমি আসবই। কে কি ভাবল তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমায় তুমি চাওনা।'

—'আসল কথা কি জান, আমি যে তোমাদের চাকর। আর তুমি হলে লেডি চ্যাটার্লি। লোকে কি বলবে বলতো !'

—'লেডি চ্যাটার্লির এই খোলসটাকে আমি ঘৃণা করি। আর জানাজানি

হলেও আমি ভয় করি না। আমার নিজস্ব টাকা আছে। মা আমায় কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন। আমরা অন্য কোথাও চলে গিয়ে মনের সুখে ঘর বাঁধব।'

মেলর্স কোণিকে বুকে চেপে ধরে। তারপর তারা ঘরে গেল। দরজা বন্ধ করে মেলর্স আলো জ্বালে। কম্বল পাতল সে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কোণি শুয়ে পড়ে। কামনা-জর্জরিত নিরাবরণ মেলর্স কোণির তাজা নাশপাতির মতো স্তনে, গোলাপী পেটে চুমু দিল। অস্বাভাবিক কঠিন আর দীর্ঘ হয়ে উঠল মেলর্সের·······। আর ঠিক তারপরেই সঙ্গমের মুহূর্তে কোণি তার উদর-অভ্যন্তরে অত্যন্ত চাপ অনুভব করে। একসময়ে আনন্দে কেঁপে ওঠে মেলর্স। নেতিয়ে পড়ে তার দেহ। কোণির পাশে শুয়ে পড়ে সে।

কোণি মেলর্সের শিথিল·······হাতে নেয়। এটি যখন অনমনীয়, কঠিন হয়ে ওঠে তখন কোণির খুব ভালো লাগে। কোণির স্পর্শে আর আদরে পুণরায় উত্তেজিত হয় মেলর্স। কোণি উঠে বসে, তাকে দাঁড়াতে বলে। কোণি তার রমণীয় স্তনে মেলর্সের·······আলতো করে বুলায়' তারপর সেটি চুম্বন করে। এবারের মিলনে পরিতৃপ্ত হলো কোণি। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ।

তিন দিন আর কোণি ওমুখো হলো না। মোটরে করে একদিন ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আথওয়েটে অভিজাত লেসলি উইণ্টারের বাড়িতে গিয়েছিল সে। সেখানে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, মেলর্সের সঙ্গে তার মিলনের ইতিবৃত্ত যদি উইণ্টার জানতে পারেন! ক্লিফোর্ড, উইণ্টার—এরা সব খনির মালিক, কুলি-মজুরদের ঘৃণা করেন।

ইচ্ছে করেই কোণি মেলর্সের সঙ্গে দেখা করেনি। তার মনে হয়েছিল, ভালোবাসা-দেহকামনা এসব একতরফা হয় না। কিন্তু চতুর্থ দিনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে কোণি—হু হু করে ওঠে তার মন। বনের যে দিকটাতে সে যায় সেদিকে না গিয়ে উল্টো দিকে গেল সে। আর সেখানে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তার সঙ্গে মিসেস ফ্লিণ্টের দেখা হলো। সে কোণির সমবয়সী—একদা স্কুলের মিসট্রেস ছিল। কোণির কোন দিনই তাকে ভালো লাগেনি।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলে, 'অনেকদিন পরে দেখা হলো, মিসেস চ্যাটার্লি! কেমন আছেন?'

—'ভালোই আছি।'

'কাছেই আমার বাড়ি। চলুন না।'

'চলুন যাচ্ছি। বেশিক্ষণ বসতে পারব না কিন্তু। ক্লিফোর্ড জানবে না আমি কোথায় আছি। অযথা চিন্তা করবে সে।

মিসেস ফ্লিন্ট তার বাড়িতে কোণিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। লেডি চ্যাটার্লি এসেছে, কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে বুঝে উঠতে পারছিল না সে। স্যর ক্লিফোর্ড যে তাদের জমিদার।

ফ্লিন্টের ফুট ফুটে এক রত্তি ছোট মেয়ে জোসেফাইন খেলা করছিল। তাকে কোলে নেওয়া মাত্র অদ্ভুত একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে কোণিকে। মনে হয় যার সন্তান নেই সে সমস্ত জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত।

মাখন রুটি সহযোগে চা পান করে কোণি। তারপর বলে, 'আজ চলি কেমন?' মিসেস ফ্লিন্ট পুনরায় তাকে আসতে অনুরোধ করেন। অতঃপর কোণি বাড়ির পথে পা বাড়ায়। ধূসর সন্ধ্যা ঘিরে ফেলেছে বনভূমিকে। আপন মনে পথ চলছিল সে। সহসা তার গতিরোধ করে মেলর্স। প্রথমটা চমকে উঠেছিল কোণি। মেলর্স শুধায়, 'এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

—'মেয়ারহে খামারে দিকে।

—এখন তবে আমার সঙ্গে চল।'

'আজ থাক। খুব দেরি হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। এখুনি আমাকে খুঁজতে লোক পাঠাবে।'

—'বাঃ, আমাকে বেশ এড়িয়ে যাচ্ছ তো! কোন কথা শুনব না আমি। তোমাকে না পেলে আমার চলবে না। আর এখন তো সবে মাত্র ছটা।

কোণিকে জড়িয়ে ধরল মেলর্স। সে চুপ করে থাকে, বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করে না। কামোত্তেজিত মেলর্স বলে, 'এদিকে এস, এইখানে।

ফারগাছের চারায় ঘেরা স্থানটিতে কাঠের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কোণি শোয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ মিলনের আনন্দ উপভোগ করে দুজনে। কোণির মনে হয় বুঝিবা গর্ভবতী হয়েছে সে।

মিলন শ্রান্ত কোণি পথ চলে আর ভাবে। ভালোবাসায় তার বড় ভয়। উজাড় করে সে যদি মেলর্সকে ভালোবাসে তাহলে নিজেকে হারিয়ে সে যে অচিরেই ক্রীতদাসী হয়ে পড়বে! বাড়ি ফিরে ক্লিফোর্ডকে বলে সে, ফিরতে দেরি হলো। নিশ্চয়ই তুমি চিন্তা করছিলে, তাই না? আর বল কেন, মিসেস ফ্লিন্ট কিছুতেই শুনল না, আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, চা খাইয়ে তবে ছাড়ল।'

ক্লিফোর্ড বলে, 'আমি ঐরকম কিছু একটা অনুমান করেছিলাম।'

কিন্তু নারীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। কোণি যে প্রেমে পড়েছে এ বিষয়ে মিসেস বোল্টনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটি কে? রাতে অনেক ভাবল মিসেস বোল্টন। মনে পড়ে তার টেডের কথা। টেড তার স্বামী। কত দিন হয়ে গেল সে মারা গেছে। কোণির জন্যে বোল্টনের দুঃখ জাগে।

সে রাতে রাজ্যের চিন্তা বাসা বাঁধল মেলর্সের মাথায়। তার মনে হয় একা একা বেশ ছিলাম। কেন যে লেডি চ্যাটার্লি এলো আমার জীবনে, আর শেষ পর্যন্ত তারা যদি ঘর বাঁধে চলবে কি ভাবে! পেন্সনের সামান্য ক'টি টাকায় কি সংসার চালানো যায়! আর লেডি চ্যাটার্লির টাকায় বসে বসে খাওয়ার মনোভাবটিকেও সে ঘৃণা করে।

ঘরে বসে অতিক্রান্ত জীবনের কত কথা মনে পড়ছিল মেলর্সের। কাজের মাঝে থাকলে চিন্তামুক্ত থাকা যায়। মেলর্স তাই বন্দুক ঝুলিয়ে, কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নৈশ নির্জনতায় দাঁড়িয়ে আছে ওক গাছের সারি। মাথার ওপর ঝকঝক করছে তারায়-ভরা স্বচ্ছ আকাশ।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। মেলর্সের হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। সেই সঙ্গে পুরোনো কাশিটাও চাগিয়েছে। মেলর্সের মনে হয় এই মুহূর্তে যদি কোণিকে পেত! কম্বলের তলায় উষ্ণতার রাজত্বে কোণির নগ্ন তপ্ত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত সে। কি হবে পাহারা দিয়ে! ঘরে ফিরল সে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। এগিয়ে চলল রাগবী হলের দিকে। কিন্তু ক্লিফোর্ডের এই রাজ প্রাসাদ থেকে কেমন করে সে খুঁজে বের করবে কোণিকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

ভোর হয়ে এলো। ক্লিফোর্ডের ঘরে সারা রাত যে আলো জ্বলছিল এই-মাত্র সেটি নিভিয়ে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায় মিসেস বোল্টন। এসময় স্যার ক্লিফোর্ড একটু ঘুমায়। মেলর্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিসেস বোল্টনের আর বুঝতে বাকী রইলো না লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিকটি কে!

মেলর্সের চেয়ে মিসেস বোল্টন দশ বছরের বড়। এই মেলর্সের বয়স যখন ছিল ষোল সে সময় তার প্রতি মিসেস বোল্টনের বেশ কিছুটা দুর্বলতা ছিল। ছাত্র হিসেবে মেলর্স বেশ ভালোই ছিল কিন্তু তার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্যেই জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলল সে।

বিগত দিনের কত স্মৃতি বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে রাগবীহল। একদিন পুরোনো জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করছিল কোণি। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটা দোলনা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিসেস বোল্টন বলে, 'আহা দোলনাটা কোন প্রয়োজনেই আর লাগবে না।'

কোণি বলে, 'ওকথা বলছ কেন ? আমারও তো ছেলে হতে পারে !'

—'স্যর ক্লিফোর্ড যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে আর ছেলে না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে !'

—'ক্লিফোর্ডের তো তেমন কিছু হয়নি। আংশিক পক্ষাঘাত বৈ তো নয়। ছেলে না হওয়ার কি আছে !'

মিসেস বোল্টন মনে মনে বলে, 'ভগবান জানেন মেলর্সের ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না ! তাহলে কি ঘেন্নার কথা ! ধুলায় লুটাবে রাগবীহলের ঐতিহ্য। রাগবীর দোলনায় দুলবে কিনা হতচ্ছাড়া এক চৌকিদারের বাচ্চা !'

ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রে ঠাসা অনায়াসে বহনযোগ্য ভিক্টোরিয় যুগের অপূর্ব শৈল্পিক নিদর্শন একটি বাক্স আবিষ্কার করে কোণি। বাক্সটা খুবই পছন্দ হয়েছিল মিসেস বোল্টনের। কোণি তাকে বাক্সটি দিয়ে দিল। বোল্টন এতই খুশী হলো যে সেটি তার বাড়িতে রেখে আসার জন্যে সাময়িক ছুটি নিয়ে টেভারসলে ছুটল। টেভারসলে বোল্টনের প্রতিবেশীর জিনিসটি দেখে অবাক হলো। প্রসঙ্গতঃ লেডি চ্যাটার্লি যে সন্তানসম্ভবা সেকথা জানাতেও ভুলল না। আর সঙ্গে সঙ্গেই লোকমুখে চারদিক ছড়িয়ে পড়ল এই রসাল গুজবটি।

লেসলি উইণ্টার একদিন নিজের কাজে এসেছিলেন স্যর ক্লিফোর্ডের কাছে কাজ সারা হলে তিনি বলেন, 'শুনেছি, তুমি নাকি বাবা হতে চলেছ ?'

ক্লিফোর্ড বলে, 'কেন, এরকম গুজব রটেছে নাকি ? আপাততঃ তেমন কোন সম্ভাবনা না থাকলেও পরবর্তীকালে আমার যে সন্তান হবে না এমন কথাও অবশ্য বলা যায়না।'

লেসলি উইণ্টার বলেন, 'তা বেশ। উত্তরাধিকারী না থাকলে উপার্জনটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

সেদিন সকালে কোণি ঘর সাজাচ্ছে এমন সময় ক্লিফোর্ড কথাটি পাড়ে। বলে শুনেছ কোণি, সকলে বলে বেড়াচ্ছে তোমার গর্ভে সন্তান এসেছে।'

ভয়ে ফেকাসে হয়ে ওঠে কোণির মুখ। নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে সে, 'এরকম গুজব রটানোর কারণ? নিশ্চয়ই কোন বদ উদ্দেশ্য রয়েছে।'

ক্লিফোর্ড বললে, নিছক বদ উদ্দেশ্য নাও হতে পারে। কে জানে হয়তো এই গুজবই একদিন সত্য হবে।'

কোণি বলে, 'বাবার চিঠিতে জানতে পারলাম বায়ুপরিবর্তনের জন্য আলেকজাণ্ডার কুপার আমায় ভেনিসে তার বাড়িতে মাস দুয়েক থাকার কথা বলেছেন আর বাবাও তাকে জানিয়েছেন যে কোণি আসবে।'

—'তুমি কি স্থির করেছ? যাবে?'

—হ্যাঁ, যাব। তুমিও তো যেতে পার আমার সঙ্গে।'

—'না এ অবস্থায় আমার আর যাওয়া চলে না।'

—কেন, মুমূর্ষু কত মানুষও তো ইনভ্যালিড চেয়ারে জাহাজে ওঠে।'

—'নাঃ এবার থাক। পরে যাওয়া যাবেখন। এখন বলত তুমি কদিন থাকবে?'

—'তিন সপ্তার মত।'

—'তারপর ফিরে আসবে তো?'

—'কেন ফিরব না!'

কোণি ভাবে এখন আর তার ভেনিসে না গেলেও চলে। মেলর্স তো রয়েছে। কিন্তু না তাকে যেতে হবেই। সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে ক্লিফোর্ড ভাববে ভেনিসে কোন প্রেমিকের সঙ্গে অবৈধ মিলনেই তার সন্তান এসেছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কোণি বেরিয়ে পড়ে। প্রাক গ্রীষ্মের ঝকঝকে একটা দিন। প্রকৃতি আবার নতুন সাজে সাজতে শুরু করেছে। নিভৃত সেই মিলনকুঞ্জে মেলর্স নেই। দু একটা মুরগীর বাচ্চা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে আর চঞ্চলভাবে চলাফেরা করছে। মেলর্স খাচ্ছিল। প্লেটে মাংসের চপ আর পাঁউরুটি, গ্লাসে বিয়ার। সে কোণিকে বলে, 'জল ফুটছে। তোমায় একটু চা করে দিই?'

কোণি বলে, 'একেই তো দেরী করে খাচ্ছ। তারপর আবার খাওয়া ফেলে উঠছ। কেন আমি কি চা করে দিতে পারি না?'

কোণি দুকাপ চা করল' মেলর্স বলে, 'দরজাটা বন্ধ করে রাখলেই ভালো হতো। বলা তো যায় না কেউ যদি এসে পড়ে!'

—'কেউ যদি আসে আসুক না। তোমার ঘরে আমি চা খাচ্ছি—তাতে কি হয়েছে?'

কোণি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকটা বড় সুন্দর। সব কিছুই সবুজ, সজীব। নির্জন, নিঝুম পরিবেশ। আশে-পাশে অজস্র ডেইজি ফুটে আছে। চারদিকে মিঠে রোদ্দুর। চা খেতে খেতে কোণি বলে, বেশ কিছুদিনের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি।'

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'ভেনিসে।'

—'একা? না স্যর ক্লিফোর্ডের সঙ্গে?'

—'একা। আচ্ছা চোখের আড়ালে গেলে আমায় মনে রাখবে তো?'

—'তোমায় কি ভুলতে পারি!'

কোণি বলে, 'জান, ক্লিফোর্ডকে বলেছি আমার ছেলে হতে পারে।'

—'তাই নাকি? কি বললেন তিনি? আমার কথা বলনি তো?'

—'না, তোমার নাম করিনি। ভেনিসে যাচ্ছি, নতুন করে কি প্রেমে পড়তে পারি না?'

—'আর সেইজন্যেই বুঝি ভেনিস যাচ্ছ?'

—'না গো না। তুমি নিশ্চিত থেক, প্রেম করতে যাচ্ছি না সেখানে।'

—'যাওয়াটা তাহলে নিতান্তই একটা মামুলি ব্যাপার—কি বল? একটা ছেলের জন্যেই তুমি তাহলে আমায় চেয়েছিলে—তাই না? আর ফাঁক তালে আমাকেও বেশ কাজে লাগিয়ে নিলে!'

—'তা কেন?'

—'তাহলে কিসের জন্যে শুনি?'

—'জানিনা।'

মেলর্স কোণিকে বলে, 'চল, এবার একটু সুখ করি!'

কোণি বলে, 'না এখানে নয়। আমাদের সেই ঘরটাই ভালো।'

—'আচ্ছা, আমি যখন তোমায় স্পর্শ করি তোমার ভালো লাগে?'

—হ্যাঁ খুব ভালো লাগে।'

—'তোমার?'

—'জিজ্ঞেস করছ কেন, তুমি তো জান।'

বাড়ি ফিরে কোণি চায়ের আসরে যোগ দিল। তার কিছুই ভালো লাগছিল না। তার মনে হলো এখুনি একবার সেই ছোট্ট ঘরটাতে গেলে ভালো হতো। মুরগীগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল মেলর্স। কোণি বলে, 'দেখ, আমি এসেছি।'

—'তাহলে চল আমরা ঘরে যাই।'

—'তুমি কি সত্যি সত্যিই আমায় চাও?'

—'চল।'

নিরন্ধ্র আঁধারে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল মেলর্স। সে বলে, 'তুমি তাহলে এসেছ। যাক কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি তো তোমাকে?

—'না। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

—'কি বল?'

—'সকালে ক্লিফোর্ডের মোটর চেয়ার ঠেলতে গিয়ে তোমার লাগেনি তো?'

—'না।'

—'ক্লিফোর্ডের ওপর তোমার রাগ হয়নি?'

—'তার ওপর আমার রাগ বা ঘৃণা কোন কিছুই নেই। ওরা যে মালিক।'

দু'জনে ঘরে ঢুকল। মেলর্স দরজা বন্ধ করে দেয়। আগুন জ্বলছে। ঘর বেশ গরম। খিদে ছিল না তাদের। মেলর্স তার কুকুরটাকে খাওয়াল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়েছিল কোণি। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে মেলর্স আর তার স্ত্রীর মিলিত ফটোগ্রাফ। কোণি বলে, 'ছবিটা বোধ হয় তোমার খুব ভাল লাগে, তাই না?'

মেলর্স বলে, 'মোটেই না। বিয়ের পর আমার বৌ ছবিটা টাঙিয়ে ছিল। আর এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় তার সবকিছু মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়। ছবিটা শুধু নিল না। সেই থেকেই ওটি ওখানে রয়েছে। আমারও ছবিটা সরিয়ে নেওয়ার কথা মনে হয়নি।

কোণি বলে, 'বৌকে ভালোবাসতে?'

পাল্টা প্রশ্ন করে মেলর্স, 'তুমি ক্লিফোর্ডকে ভালোবাস?'

কোণি বলে, 'আমার কথা ছাড়। সত্যি করে বলনা, স্ত্রীর প্রতি তোমার কি কোন আকর্ষণই নেই?'

—'আকর্ষণ! ওর কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না করে।'

—'তাহলে ডিভোর্স করে ফেললেই তো পার।'

—'আমি জানি সে আর কোনদিনই আসবে না।'

—'ডিভোর্স যখন হয়নি তখন যে কোনদিন আসতে পারে সে। আর এলেই তাকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধতে হবে।'

অবশেষে মেলর্স তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে রাজী হলো। কোণি সন্তুষ্ট

হলো। অতঃপর মেলর্স চা তৈরী করে। চা পান করতে করতে কোণি বলে, 'কি দরকার ছিল ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করার! মিসেস্ বোল্টনের কাছে মেয়েটির বিষয় অনেক কিছু শুনেছি।' মেলর্স বলে, 'ষোল বছর বয়সে প্রথম প্রেমে পড়ি। মেয়েটি ছিল রূপসী, রোমাণ্টিক। স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতাম আমরা। কত কাব্য করতাম দু'জনে। কিন্তু আমি যখন কামোত্তেজনায় ছটফট করতাম সে তখন কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে যেত। সে চাইত আমি তাকে দু-চারটে চুমু দেব এই পর্যন্তই। তারপর আমার জীবনে এল আমার চেয়ে বয়সে বড় এক স্কুল মিসট্রেস। তার শরীরটা ছিল বেশ নরম। তার চরিত্র নাকি খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু আমার প্রথম নায়িকার মতো এ মহিলাটিও বড় বেশী ঠাণ্ডা। কেবল চুমু আর জড়াজড়ি আমি চাই নি, আমি চেয়েছি চরম সুখ। তাই তাকেও মনঃপূত হলো না। এরপর এলো বার্থা। ঠিক আমি যেমন চাই সেই ধরণের মেয়ে। অতএব চুটিয়ে প্রেম, চুটিয়ে ভোগ। আর তাকে পেয়ে আমি যে ধন্য হয়েছি এই ভাবটা ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগল আমার ব্যবহারে। আমি কৃতার্থ, গলে গেছি তাকে পেয়ে। শেষ কালে তার চাকর বনে গেলাম। সে ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে তার সকালের খাবার গুছিয়ে দিতাম। সেও পেয়ে বসল। কোন কাজ কর্ম করত না। আর আমি হাড় ভাঙা খাটুনি সেরে খিদে-তেষ্টায় অস্থির হয়ে বাড়ি ফিরে খেতে পেতাম না। বার্থা সারাটা দিন শুয়ে বসেই কাটাত, কোন কাজ করত না। তাই রাগারাগি, মারপিট নিত্য নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার্থা ছিল প্রচণ্ড জেদী, বদমেজাজী। শেষে এমন হয়েছিল যে এক সঙ্গে শোয়া তো দূরের কথা তাকে দেখলেই হাড় পিত্তি জ্বলে যেত। এমনি এক অশান্ত আর বিরোধের পরিবেশে বার্থার সন্তানটি জন্ম নিয়েছিল। কিছু দিন পরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেদিন আমার বৌ আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমিও যুদ্ধে গেলাম। ফিরে এসে এখানে কাজে লেগে গেলাম। আর সে ছুঁড়ি স্ট্যাক্স গেটে একটা লোকের সঙ্গে থাকে।'

কোণি বলে, 'কিন্তু ও যদি আবার হাজির হয়?'

—'তাহলে যেদিকে দু'চোখ যায় সে দিকেই কেটে পড়ব।'

—'সে কি!'

—'এ পর্যন্ত মেয়ে তো কম দেখলাম না। সব মেয়েই এক ধরণের। সব ওপর ওপর—একটু চুমু, একটু জড়িয়ে ধরা, ব্যস্—এই টুকুই। বেশির ভাগ

মেয়ের খিদে মরে গেছে।'

—'আচ্ছা আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

—'তোমাকে পেয়ে সুখ পেলাম কিন্তু সেইসঙ্গে চিন্তা-ভাবনাও জাগল। শেষ পর্যন্ত বহুৎ ঝামেলা হবে। আমার জীবনে তুমি না এলে বিচ্ছিরি একটা এক ঘেয়েমির মাঝে হাবুডুবু খেতে হতো। তুমি আসার আগে আমার কি মনে হতো জান? মনে হতো যৌন ক্ষুধা মেটাতে একমাত্র কামুক নিগ্রো যুবতীদের স্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

'আমাকে পেয়ে তাহলে আর নিগ্রো যুবতীদের কাছে যেতে হবে না, কি বল?

—'সত্যি তোমাকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি।'

রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমানের পালা চলল সারা রাত। শেষে মিলন-মধুর উপভোগ্য উত্তাপের মাঝে তারা দু'জনে তলিয়ে গেল।

ভোর হলো। পাখীদের কল-কাকলি আসছে কানে। মেলর্স কোণির সর্বাঙ্গে আলতো করে হাত বুলিয়ে তাকে জাগিয়ে দেয়। কোণি চোখ মেললে তার মুখে চুমু দিল মেলর্স। মেলর্সের ঘরে কত তাড়াতাড়ি কেটে গেল বিরাট একটা রাত—বিস্ময় জাগে কোণির।

মেলর্স বলে, 'সাতটা বাজে। বাড়ি ফিরবে না?'

—'আমার এক বারে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

কোণির মনে হয় আসবাব-পত্র ভরা আভিজাত্যমণ্ডিত রাগবী-হলের চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই ঘরটি অনেক অনেক সুখের। সেলফে কয়েকটি বইও রয়েছে। মেলর্স তাহলে লেখাপড়াও জানে।

নির্মেঘ রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটাকে বড় সুন্দর লাগছিল কোণির। সারা রাতের শিশিরে ভিজে ফুলগুলি ফুটে উঠেছে। বার বার তার মনে হচ্ছিল মেলর্সকে নিয়ে সে তো গড়তে পারে একটা সোনার সংসার।

না, এবার যেতে হবে। মেলর্সের কাছ থেকে চিরুনি চেয়ে কোণি পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। তারপর অনেক পাওয়ার সুখটুকু নিয়ে ফিরে যায় রাগবী-হলে। সবার অলক্ষ্যে কোণি তার ঘরে গেল।

হিলডা কোণিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে সতেরোই জুন সে আসছে। রাগবীর নরককুণ্ডে একটা মুহূর্তও সে কাটাতে চায় না। কাজেই ঐ দিনই সে কোণিকে নিয়ে চলে যেতে চায়।

কোণি ক্লিফোর্ডকে বলে, 'আজ হিলডার চিঠি পেলাম। সতেরো তারিখে

আমি যাচ্ছি।'

'ফিরবে কবে ?'—ক্লিফোর্ড জিজ্ঞেস করে।

—'মাসখানেক পরে।'

—'ফিরবে তো ?'

—'ফিরব না তো যাব কোথায় !'

ক্লিফোর্ড কোণির বিদেশ যাত্রায় মোটেই খুশী হয়নি। কিন্তু কোণির এই অ্যাডভেঞ্চারে বাধা দিতে চায় না সে। সন্তান-সম্ভবা হয়ে ফিরবে সে তাই সম্মত হয়েছিল ক্লিফোর্ড। মেলর্সকেও কোণি সবকিছু জানায়। বলে, 'আর নয়। ফিরে এসে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করব। আর তুমি আর আমি অন্য কোন দেশে গিয়ে ঘর বাঁধব।'

মেলর্স বলল, 'আমি তো ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা আর মিশরে ছিলাম।'

—'বেশ তো আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই যাব।'

—'হ্যাঁ সেখানে যেতে পারি।'

আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূরের গাছপালা ঝাপসা হয়ে গেছে। কোণি সম্পূর্ণরূপে নগ্ন হয়ে নিভৃতে সেই মিলনকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়ল আর বনের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল। তার নিকষ কালো অবিন্যস্ত কেশরাশি উতল ধারা বাদলের ছোঁয়ায় পিঠের সঙ্গে একেবারে লেপটে গিয়েছিল। তার নিরাবরণ শরীর অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভিজে গিয়েছিল। নগ্ন মেলর্সও তার পেছনে ছুটেছিল। কোণির নাগাল পেয়ে মেলর্স তাকে জড়িয়ে ধরল। বৃষ্টিভেজা বনপথে কোণিকে শুইয়ে দিল সে। তারপর তারা উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুনো পশুর মতো সঙ্গমরত হলো।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হিলডা এল। ক্লিফোর্ডের কাছে বিদায় নিয়ে তারা মোটরে উঠল। কোণি মিসেস বোল্টনকে বলল, 'তোমার কাছে রইল স্যার ক্লিফোর্ড। তাকে ভালো করে দেখাশুনা করবে।

হিলডা তো চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিল যে সে কোনমতেই রাগবীতে থাকবে না। কোণি বললে, 'তুই বরং একটা হোটেলে থাক।'

—'আর তুই ?'

—'রাতটা আমি এই বনেই কাটাব।'

—তার মানে ?'

—'কেন এই বনে।'

কোণি মেলর্সের সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়ের ইতিবৃত্ত জানায় হিলডাকে। কোণি আর বাগানের মালির এই প্রেমটাকে বরদাস্ত করতে পারে না হিলডা। কোণির এহেন বিকৃত রুচিতে হিলডার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে, বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার মুখে। লোকটির বয়স কত, বিবাহিত কিনা এসব প্রশ্ন করে সে কোণিকে।

কোণি বলে, 'লোকটার হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে। সে খুব ভালো আর আমায় সে সত্যিই ভালোবাসে।'

একটু দূরে মোটরটাকে দাঁড় করিয়ে তারা মেলর্সের ঘরে এল। হ্যাম, চিজ আর বিয়ার খেতে খেতে তারা আলাপ আলোচনা করছিল। এক একবার গেঁয়ো ভাষায় কথা বলছিল মেলর্স। হিলডা বলে,, 'গেঁয়ো ভাষায় কথা বলছ কেন?'

—'কেন, কি হয়েছে?'

—'ডার্বির বুলি আর যা হোক শহুরে লোকেদের শুনতে মোটেই ভালো লাগে না।'

হিলডা পুনরায় বলে, 'তোমাদের এই সম্পর্কটা ক্রমেই জটিল হবে—একবার ভেবে দেখেছ কি? ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন চিন্তা জাগে না তোমার?'

বেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে মেলর্স বলে, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন চিন্তা করেছেন কি? আপনি তো আপনার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন—কেন শুনি? ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি! আপনার বোন কিন্তু বেশ ভালো। আমি ডাকিনি তাকে, নিজেই এসেছে সে আমার কাছে। আপনার মতো কাটখোট্টা নয় সে—তার রূপ আছে, রস আছে, অদম্য তৃষ্ণা আছে।'

প্রচণ্ড চটেছে হিলডা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। মেলর্স বলে, 'রাগ করে চলে যাচ্ছেন, পথ চিনতে পারবেন না। চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি।'

হিলডাকে এগিয়ে দিয়ে মেলর্স আর কোণি হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরছিল। কোণি বলে, 'আমায় একটা চুমু দেবে না?'

—'দাঁড়াও। একটু সামলে নিই। রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বালা করছে।

—'ছিঃ মেলর্স, তুমি কিন্তু দিদির সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করনি।'

—'আর তোমার দিদি? সে বুঝি খুব ভালো ব্যবহার করেছে?'

নির্জন রাত। বাইরের সাজ-পোষাক ছেড়ে মেলর্স আর কোণি শুয়ে পড়ে।

সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুম ভাঙে কোণির। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। আটটায় যেতে হবে তাকে। এখান থেকে তার যেতে ইচ্ছে করছে না। মেলর্স চটজলদি পোষাক পাল্টে নেয়। একটু পরেই সে ট্রেতে খাবার সাজিয়ে ঘরে ঢোকে। দু'জনে মিলে প্রাতরাশ পর্ব শেষ করে।

কোণি আর মেলর্স বনের পথ দিয়ে চলে আর কথা বলে। এক সময় মেলর্সকে জড়িয়ে ধরে কোণি বলল, 'আমায় তুমি ভুলে যাবে না তো, মেলর্স ?'

মেলর্স কোণিকে চুমু দিল, আদর করল। কোণিকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিল সে কোণির কাছে।

কোণির প্রতীক্ষায় মোটরে বসেছিল হিলডা। সে বলে, 'তাড়াতাড়ি আয়। মেলর্স কোথায় ?'

ভিজে গলায় কোণি বলে, 'ও এল না।' কোণি কাঁদছে।

লণ্ডন, প্যারী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি কত দেশ ঘুরল কোণি। গণ্ডোলায় ভেসে এলো ভেনিসে। উজ্জ্বল গ্রীষ্মের উপভোগ্য দিনগুলি কাটে হু হু করে। এমারাল্ডা-ভিলা দূর থেকে দেখায় ছবির মতো। কোণি নিয়মিত ক্লিফোর্ডের সাহিত্য মূল্য আছে এমন সব সুন্দর চিঠি পায়। একদিনের এক চিঠিতে চমক লাগে কোণির। ক্লিফোর্ড লিখেছে—

'মালির স্বৈরিণী স্ত্রী বার্থা বলা-কওয়া নেই হঠাৎ একদিন হাজির হয়েছিল মেলর্সের ঘরে। মেলর্স তাকে ভাগিয়ে দিয়ে দোরে তালা ঝুলিয়ে কাজে চলে যায়। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে মেলর্স দেখে বার্থা তার বিছানায় শুয়ে রয়েছে। ধিঙ্গি বৌ জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। অগত্যা বেচারা মেলর্স টেভারসলে তার মার কাছে ফিরে যায়। বার্থা মেলর্সের নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে। মেলর্সের ঘরে সে নাকি সেন্টের শিশি, মেয়েদের সিগারেটের টুকরো দেখেছে—যা থেকে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে নির্জন ঐ কুটীরে রীতিমতো নারীর আনাগোনা ছিল।'

খবর শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠে কোণি। সে বেশ বুঝতে পারে ব্যাভিচারিণী বার্থার হাত থেকে সহজে মুক্তি মিলবে না। অবশেষে চিঠি লেখে সে মিসেস বোল্টনকে—সঙ্গে আর একটি চিঠি পাঠায় মেলর্সকে। বোল্টনকে মেলর্সের চিঠিটা পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে। চিঠিতে লিখেছে সে—'সহসা বার্থা এসে যে কাণ্ডকারখানা করে গেছে তার জন্যে একটুও দুশ্চিন্তা করো না। সব মিটে যাবে। আমি সপ্তাখানেকের মধ্যেই ফিরছি।'

মিসেস বোল্টন লিখেছে—'আপনার ফেরার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। স্যার ক্লিফোর্ড খুব ভালো আছেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখচোখ।'

ক্লিফোর্ড লিখেছে—'তোমার অনুপস্থিতিতে রাগবী মরুভূমির মতো মনে হচ্ছে একথা ঠিক। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তোমার ফেরার দরকার নেই। আরো কিছুদিন না হয় রৌদ্রভাস্বর ভেনিসে থাক। তোমার শরীরটা ভালো হবে।

মেলর্সকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তাকে বলি—তোমার বৌ যেভাবে তোমার পেছনে লেগেছে, এতে তুমি কি ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারবে?

সে কি বললে জান? বললে—আমার কাজকর্ম, আমি তো মন দিয়েই করছি।

আমি বললাম—তোমার ঘরে মেয়েরা আসে, একথা কি সত্যি?

অমার্জিত, গেঁয়ো লোকটি উত্তর দেয়—ক্ষমা করবেন স্যার, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই আপনার। গেঁয়ো মাগীগুলোর স্বভাবই হলো কলংক রটানো। একদিন হয়তো ওরা একথাও বলে বেড়াবে আমার কুকুরটার সঙ্গেও আমার যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

মেলর্সকে জিজ্ঞেস করি, নতুন কোন কাজ সে খুঁজে নিতে পারবে কিনা?

সে বলে, 'আমায় তাড়িয়ে দিতে চান। বেশ তো, চলে যাব।'

'তাকে আমি এক মাসের বাড়তি মাইনেও দিতে চেয়েছিলাম—সে প্রত্যাখ্যান করেছে। যাক আগামী শনিবার সে চলে যাবে।'

অতঃপর মেলর্সের চিঠি আসে। সব কথা খুলে লিখেছে সে। বার্থা যে কোণির নামও করেছে একথাও সে জানাতে ভোলেনি। চিঠির শেষে সে তার ঠিকানাও জানিয়েছে—'আমি লণ্ডনে গিয়ে সতেরো নম্বর কোবার্গ-স্কোয়ারে আমার পুরানো বাড়িওয়ালী মিসেস ইনগারের বাসায় থাকব।'

উত্তেজনায় কাঁপছিল কোণি। কি যে করবে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। অবশেষে স্থির করে সেও শনিবার ভেনিস ছেড়ে যাবে, যাতে সোমবার লণ্ডনে পেঁছাতে পারে। মেলর্স শনিবার রাগবী ছাড়ছে, সোমবার সে তাহলে লণ্ডনে পেঁছাবে। কোণি কোবার্গ-স্কোয়ারের ঠিকানায় মেলর্সকে চিঠি লিখে জানায়, সে যেন হার্টল্যাণ্ডস হোটেলে চিঠি দেয় আর তার সঙ্গে মিলিত হয়।

স্যার ম্যালকম তাঁর প্রিয় ছোট মেয়ে কোণিকে হার্টল্যাণ্ডস হোটেলে পেঁছে দেবেন। ওরিয়েণ্ট একসপ্রেসে বাবা আর মেয়ে চলছে লণ্ডনে। কোণি বলে—রাগবীতে আর ফিরব না।

ম্যালকম শুধান, 'রাগবীতে ফিরবে না কেন ?'

'আমি অন্তসত্ত্বা'—সুস্মিতা কোণি উত্তর দেয়।

—'ছেলেটি কার ? ক্লিফোর্ডের নয় নিশ্চয় ?'

—'না।'

—'তবে ?'

—'অন্য একজনের। তাকে তুমি চেননা ?'

—'এখন কি করবে, স্থির করেছ ?'

—'অন্য কারো ঔরসে ছেলে হলেও ক্লিফোর্ডের কোন আপত্তি নেই।'

—'তাহলে আর চিন্তা কিসের !'

কোণিকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যালকম বলেন, 'বুঝেছি লোকটাকে তুমি ভালোবেসে ফেলেছ। দেখ, আবার ঠকে যেওনা যেন।'

—'না বাবা। সে সেরকম লোকই নয়। খুবই ভালো মানুষ—কোনদিনই সে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।'

—'শুনে সুখী হলাম। এতদিনে তুমি একটি সত্যিকারের পুরুষ মানুষ খুঁজে পেলে।'

এদিকে মেলর্স চিঠি লিখেছে—হার্টল্যান্ডস হোটেলে যাবে না সে। গোল্ডনকক্ হোটেলের সামনে কোণির প্রতীক্ষায় থাকবে, সন্ধ্যে সাতটায়।

প্রতীক্ষারত মেলর্সকে দেখে খুশী হয় কোণি। মেলর্স বলে' 'খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে। তোমার স্বাস্থ্য ফিরেছে।'

কোণি বলল, 'কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছ তুমি। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা মেলর্স, আমায় না পেয়ে তোমার কষ্ট হতো ?'

—'তুমি ছিলে না ভালোই হয়েছে। যা সমস্ত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল।'

—'তোমাকে ঘিরে যে সমস্ত কেচ্ছা রটেছে লোকে তা বিশ্বাস করেছে ?'

—'মনে তো হয় বিশ্বাস করেনি।'

সহসা মিষ্টি হেসে কোণি বলে, 'জান মেলর্স, আমার গর্ভে তোমার সন্তান এসেছে। খুশী হয়েছ ?' মুহূর্তের জন্যে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল মেলর্সের মুখ, কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হলো সে। কোণি প্রশ্ন করে, 'আমি কি ক্লিফোর্ডের কাছেই ফিরে যাব ? আমার সন্তানকে নিজের সন্তান বলে মেনে নিতে তার কোন আপত্তি থাকবে না।'

—'তিনি যদি জানতে পারেন আমার ঔরসে তোমার সন্তান হয়েছে তাহলেও

মেনে নেবেন ?'

—'তাহলে তুমি কী চাও ? ক্লিফোর্ডের কাছেই ফিরে যাবে ?'

—'তোমার কি ইচ্ছে ?

—'আমার ? আমি তোমার কাছেই থাকব, ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে যাব না।'

—'কিন্তু আমার কাছে কি-ই বা পাবে তুমি।'

—'তোমার কাছে অনেক পেয়েছি মেলর্স। আমার পেটে তোমার সন্তান রয়েছে, তা জেনেও তুমি আমায় একটুও আদর করবে না। একটুও খুশী হওনি তুমি ?'

—'কোবার্গ-স্কোয়ারে আমার বাসায় চল না।'

কোণি এল মেলর্সের বাসায়। ঝকঝক করছে তার ছোট্ট ঘরটি। কোণি বলে, 'মেলর্স', কোথাও যাব না আমি। আমি তোমার কাছেই থাকব।'

মেলর্স তাকে বুকে চেপে ধরে বলে, 'বেশ তাই হবে।'

—'আমি মা হতে চলেছি, তোমার আনন্দ হয়নি ?'

—'আসল কথা কি জান সংসারের এই জটিল আবর্তে নতুন একটা শিশু আসছে, একথা মনে হলে আমি ভয় পাই।'

—'কিন্তু আমাদের ভালোবাসাতেই তো মধুর হবে শিশুটির ভবিষ্যৎ।'

মেলর্সের হৃদয়ে করুণা আর প্রেমের সঞ্চার হলো। কোণিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিল সে। বিত্ত-ঐশ্বর্যের অভাব নেই কোণির। কিন্তু সে যে প্রেমের কাঙালিনী। তৃপ্ত হলো কোণি। কিন্তু বার্থার কথা মনে পড়ায় বিষাদে আচ্ছন্ন হলো তার মন। সে বলে, 'একদিন তো তুমি তোমার বৌকে ভালোবাসতে। তার সঙ্গে তোমার মধুর একটা সম্পর্কও ছিল। আর আজ তাকে তুমি ঘৃণা কর, ভাবতে গেলে কেমন অবাক লাগে।'

—'থাক না ওসব কথা। বিশ্বাস কর, দজ্জাল বার্থাটাকে আমি কোনদিনই ভালোবাসতে পারিনি—কেননা তাকে ভালোবাসা যায় না। আমাদের এখন থেকে খুব সাবধানে চলতে হবে যতদিন না তার সঙ্গে আমার পাকাপাকি বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে।'

—'সে কি ? আমরা তাহলে মিলতেও পারব না।'

—'ছ'টা মাস তো বটেই।'

স্যার ম্যালকম মেলর্সের সঙ্গে আলাপ করতে চায় না, মেলর্সও ম্যালকমের

সঙ্গে পরিচিত হতে চায় না। কোণী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার অনুরোধে উভয়ে মিলিত হলো। দ্বিপ্রহরিক ভোজন শেষে এদের প্রতিক্রিয়ায় দুজনের বেশ খোশ মেজাজ।

ম্যালকম বলেন, 'শুনছ তো, কোণি মা হতে চলেছে?'

—হ্যাঁ।'

—'তা বেশ। ছেলেটি কার?'

—'আজ্ঞে আমার।'

—'আমার শাঁসাল মেয়েটিকে কিভাবে জোটালে বাবা। তুমি তো দেখছি জাত শিকারী। তোমার বয়স কত?,

—'উনচল্লিশ।'

—'তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার বয়স উনচল্লিশ। তা এখনও বছর কুড়ি বহাল তবিয়তে লড়তে পারবে। খাসা লোক তুমি।'

পরদিন দুপুরে হিলডার সঙ্গে গল্প করছিল মেলর্স। হিলডা বলল, একটু সবুর করতে পারলে না। ছেলেপিলের ব্যাপারটা বিয়ের পরে হলেই কি ভালো হতো না।'

—'কি করব বলুন। আগুন নিয়ে খেলব অথচ আগুন লাগবে না, একি হতে পারে।'

—'যদি কষ্ট পোয়াতে না চাও তাহলে তোমাদের বিয়ে করতে হবে। কোণির যা টাকা আছে তাতে তোমাদের চলে যাব। কিন্তু বিয়ে করবে কি করে? তোমাদের দুজনের একই সমস্যা। তাই বলছিলাম ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় ভালো।'

—'বেশ, তাই হবে।'

অবশেষে ক্লিফোর্ডকে চিঠি লেখে কোণি—মুক্তি চায় সে। কোণির চিঠি পেয়ে শোকে-দুঃখে অসহায় একটা শিশুর মতো কেঁদে ওঠে ক্লিফোর্ড।

'একি, আপনি কাঁদছেন কেন স্যার ক্লিফোর্ড?'—মিসেস বোল্টন জিজ্ঞেস করে। কোণির চিঠিখানি সে বোল্টনকে দেয় পড়ার জন্যে।

মিসেস বোল্টন সান্ত্বনা দেয় স্যার ক্লিফোর্ডকে। ক্লিফোর্ডের মুখটা সে তার বুকে চেপে ধরে। ক্লিফোর্ড যেন স্তনন্ধয় এক শিশু। তারপর তাকে চুমু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় মিসেস বোল্টন।

কয়েকদিন পরে কোণিকে চিঠি দেয় ক্লিফোর্ড। লিখেছে সে 'একবার এখানে

এস। সামনাসামনি বসে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা করতে নির্ধারণ করতে চাই।'

চিঠি পেয়ে অনেক ভেবে-চিন্তে হিলডার সঙ্গে পরামর্শ করে অবশেষে কোণি এল রাগবী হলে। সে জানায়, মেলর্সকে ভালোবাসে সে গর্ভে ক্লিফোর্ডের সন্তানকে বহন করছে। রাগে ফেটে পড়ে ক্লিফোর্ড। বলে, ডিভোর্স আমি করব না।'

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তপ্ত আলোচনার শেষে কোণি তার ওপরের ঘরটিতে গেল। তার জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে হিলডাকে স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার কি কথা-বার্তা হয়েছে সবকিছু জানায়। হিলডা বলে, 'কাল-ই আমরা চলে যাব।'

সকাল হতেই তারা রাগবী হল ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। জিনিস-পত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। মিসেস বোল্টনকে ডেকে কোণি বলে, 'চললাম। মেলর্সকে আমি ভালোবেসেছি। স্থির করেছি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধব। আমার এ সিদ্ধান্তের কথা স্যার ক্লিফোর্ডকে জানিয়েছি। ক্লিফোর্ড বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হলে আমাকে জানাতে ভুলো না? আর দেখ আমাদের এ ব্যাপারটা কিছু-দিন যেন চাপা থাকে।'

রাগবী হল ছেড়ে চলে যায় কোণি। হিলডার সঙ্গে সে গেল স্কটল্যান্ড। যতদিন পর্যন্ত না বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে মেলর্স আর কোণিকে আলাদা থাকতে হবে। কোণির সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। আর একটা গ্রীষ্ম আসবে—সার্থক হবে তাদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

গ্রেঞ্জ ফার্ম থেকে মেলর্স কোণিকে চিঠি লিখল। 'কাজ পেয়েছি। জায়গাটা মোটামুটি ভালো আর চাষের কাজ আমার ভালোই লাগে। থাকার জন্যে এক ইঞ্জিন ড্রাইভারের পুরানো বাড়িতে একটা ঘরও মিলেছে। একা একাই থাকি, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার ইচ্ছে আমার নেই। তোমার কথা ভাবলেও বড় বেশি দুশ্চিন্তা জাগে। আমি জানি শীঘ্রই আমরা মিলিত হব। শুধু ধৈর্য্য ধরতে হবে, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় জয়ী হতে হবে আমাদের। সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রেম। সূর্য আর মাটির প্রেম থেকেই তো ফুলের জন্ম হয়। এখন আমি মুক্ত প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করছি, আমার অন্তরে এখন উদ্ভাসিত হচ্ছে শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের অমর জ্যোতি। জানি আমি, এগিয়ে আসছে আমাদের মিলনের শুভক্ষণ।'

LADY CHATTERLEY'S LOVER : D. H. Lawrence

॥ পরিচিতি ॥

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে নটিংহ্যামশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি খুব রোগ ভোগ করতেন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে বা মিশতে তিনি খুব লজ্জা পেতেন, আর 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে' ভুগতেন। জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অনিঃশেষ। কবিতা, ছোট গল্প রচনায় আর ছবি আঁকাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

লরেন্স রচিত উপন্যাসগুলি হলো 'দি হোয়াইট পিকক্' (১৯১১), 'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স' (১৯১৩), 'দি রেণবো' (১৯১৫), 'উইমেন ইন লভ' (১৯২১), 'ক্যাঙ্গারু' (১৯২৩), 'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার, (১৯২৮)।

'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স' আর 'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার' বিতর্কিত এই উপন্যাস দু'টি সাহিত্য জগতে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

লরেন্স মনে করতেন, জীবন তখনই সহনীয় হয়ে ওঠে যখন দেহ আর মন সমতানে ঝঙ্কৃত হয়। আর 'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—যাবতীয় বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও 'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার'কে আমি সাম্প্রতিককালের পক্ষে অপরিহার্য এবং স্বাস্থ্যপ্রদ একটি গ্রন্থ বলে মনে করি।

'ইন্‌টেলেক্ট' অপেক্ষা 'প্রাইমাল ইন্‌স্টিঙ্কট্'-কেই উচ্চাসনে বসিয়েছেন তিনি। দুর্নিবার, প্রবল শক্তিশালী যৌন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার ভেতর দিয়েই মানুষ একদিন লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক মেলর্সের মতো মুক্তপ্রেমের মহিমা উপলব্ধি করে, তার অন্তরে উদ্‌ভাসিত হয় শুচি স্নিগ্ধ প্রেমের অমর জ্যোতি।

লরেন্সের স্বকীয় জীবন-দর্শনের সার্থক পরিচয়বাহী তাঁর 'ফ্যান্টাসিয়া অফ দি আনকনসাস্' গ্রন্থটিতে তন্ত্রশাস্ত্রানুমতের প্রতিফলন নিতান্ত অসতর্ক পাঠক পাঠিকারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। 'লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার' প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে ডি এইচ লরেন্সের মৃত্যু হয়।

প্রণয়াসক্ত রমণী জীবন

ইহারা সেইকাকু

[সেইকাকুর উপন্যাস দ্য লাইফ অফ অ্যান অ্যামোরাস ওম্যান প্রকাশিত হয় ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। নায়িকা একজন প্রাক্তন-বারবণিতা। প্রথম জীবনের

কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা ক'রে সে খদ্দেরদের আপ্যায়িত করতো। আলোচ্য অংশটি ঐ উপন্যাস থেকে নেওয়া একটি লম্পটের পোষাকের মধ্যে প্রাপ্ত 'ছবি' শীর্ষক কাহিনী।]

মেয়েদের পোষাক সেলাই করার প্রচলন হয় আমাদের ছেচল্লিশতম শাসনকর্তা

রাণী কোকেনের রাজত্বকালে। তাঁর আমলেই ইয়ামাটো নামক জায়গাটিতে সবচেয়ে সুচারুভাবে সেলাইয়ের কাজ সম্পন্ন হতো। অভিজাতদের জন্য সিল্কের পোষাক সেলাইয়ের আগে গুণে নেওয়া হতো কতগুলো সূঁচ ব্যবহার করা হবে। আর কাজ শেষ হলে আবার সূঁচগুলো গোণা হতো। প্রতিক্ষেত্রেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। প্রত্যেকের দেহশুদ্ধির দরকার হতো এবং মহিলাদের মধ্যে যাদের মাসিক শারীরিক অস্বস্তি থাকতো, তাদের সেলাই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হতো না।

আমার জীবনে এক সময় আমি সেলাই কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলাম এবং আমি মেয়েদরজীর কাজ নিয়েছিলাম। আমি তখন শান্ত এবং ধর্মজীবন যাপন করতাম। আমার মন যৌনচিন্তা থেকে মুক্ত ছিলো। তার বদলে আমি দক্ষিণের জানালার বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মন ভরিয়ে আনন্দ পেতাম। আমার সঙ্গিনী মেয়েদরজী সবাই মিলে আমাদের রোজগারের টাকা এক করে মাঝে মধ্যে ভালমন্দ খেতুম। আমাদের সঙ্গী বলতে আমরা সব মেয়েরা। সুতরাং আমরা নিষ্পাপ ছিলাম। মেঘহীন আকাশের চাঁদ আমাদের জীবনকে বিড়ম্বিত না করে পাহাড়ের পেছনে অস্ত যেতো। সত্য সত্যই এই অবস্থাটা বৌদ্ধবাদের মতো, নিত্যতা, স্বর্গসুখ, বাস্তবসত্তা ও পবিত্রতার মিশ্রণ।

আমি এই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কাটাতে ছিলাম। একদিন এক যুবক ভূস্বামীর একটি চিত্রের সাদা সিল্কের মোড়ক সেলাইয়ের দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। শিল্পীকে জানিনে কিন্তু তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটি পুরুষ ও একটি রমণীর মিথুনরত অবস্থায় ছবি এঁকেছেন। আমি তাদের নগ্ন দেহ এবং বিশেষ করে শায়িতা রমণীটির উম্মুক্ত গঠন সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হলাম। রমণীটির পায়ের গোড়ালি ঊর্ধ্বে লম্বিত আর তার পায়ের আঙুল পেছনে হেলোনো। আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এই অঙ্কন কার্যটি নিছক কালী দিয়ে আঁকা। আমি যেন এই প্রণয়ীযুগলের প্রেমগুঞ্জন তাদের নিথর ওষ্ঠে শুনতে পেলাম। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে গেলো। আমি আমার কাজের বাক্সের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আর তখনই একটা পুরুষ মানুষের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগলো আমার মধ্যে—আর তা এই তীব্রভাবে যে বাস্তবিকই সব সেলাইয়ের চিন্তা মন থেকে উবে গেলো। আমি আর আঙুলের টোপর বা সুতোর লাটাইতে হাত দিতে পারলাম না।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিবাস্বপ্নে ডুবে গেলাম। আমার মনে হলো,

একা একা বিছানায় শোয়া সত্যই খুব কষ্টকর। আঃ, আমার সেই দিনগুলো যদি ফিরে পেতাম! যখন আমার অতীত সুখের কাহিনীগুলোর কথা মনে পড়ে, তখন আমার মন অবসাদে ভরে ওঠে।

এমনও হয়ে থাকতে পারে আমি সেই সুখের দিনগুলোতে যখন কাঁদতাম তা ছিলো সত্য, আর যখন হাসতাম, সে হাসি ছিলো কৃত্রিম। সত্য হোক আর মিথ্যে হোক, আমি যাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম,তাদের জন্যই এসব করতাম। আমি আবেগ প্রবণ হওয়ায় আমার বন্ধুদের আনন্দ ভালোবাসা ও খাবার দিয়ে ভরপুর করে রাখতাম। আমি তাদের কোমল প্রবৃত্তিগুলো জাগিয়ে রাখতাম। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে শীঘ্র চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করতাম। এখন আমার মনে হয়, এটা খুব নিষ্ঠুর কাজ।

আমি যাদের সঙ্গ লাভ করেছি, তাদের সংখ্যা অগুন্তি। আমি জানি, এমন মেয়েও এই পৃথিবীতে আছে, সারাজীবনে যে একটির বেশী পুরুষের সঙ্গ লাভ করেনি। এমন কি সে স্বামী পরিত্যক্তা হলেও নতুন সঙ্গী খোঁজে না, অথবা তাদের স্বামী মারা গেলে, পবিত্র ব্রত অবলম্বন করে তাদের সতীত্ব রক্ষা করে। তাদের স্বামী মারা যাবার পর কৃচ্ছ্রসাধন করে। আমি আমার কথা ভেবে তীব্র অনুশোচনা অনুভব করি। আমি স্থির করলাম, একদিন যেমন অসংখ্য পুরুষ সঙ্গ আমি উপভোগ করেছি, এবার থেকে আমি আমার এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বশে আনবো।

ইতিমধ্যে রাত পুহিয়ে এলো। আমার সঙ্গিনী মেয়েদেরজীরা যারা আমার পাশে ঘুমুচ্ছিলো, উঠে পড়লো। বিছানাপত্তর গুটিয়ে তাকের উপর রাখলো। আমি ব্রেকফাস্টের জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তা শেষ হলে আমি একটু জ্বলন্ত অঙ্গারের জন্য, অঙ্গার পাত্রের খোঁজ করলাম। তা দিয়ে আমার পাইপ ধরিয়ে, টান দিলাম। কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না ভেবে, আমি আমার আলুলায়িত চুল দ্রুত বাঁধলাম। আমার খোঁপা বাঁধায় ভুল হলো, কিন্তু খেয়াল করলাম না। কাগজের ফিতে দিয়ে তা বেঁধে নিলাম। চুলের জল ঝাড়ার ভঙ্গী করে, এবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দেখি একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। চাউনি দেখে মনে হলো, লোকটা এই লম্বা বাড়ীটায় বাস করা সেনা বিভাগের কোন ব্যক্তির ফাইফরমাস খাটা চাকর। দেখে মনে হয় সে সকালের বাজার সারতে গিয়েছিলো। সঙ্গের বাস্কেটে কয়েকটা শিবা মাছ। ঐ হাতেই এক বোতল ভিনিগার ও কয়েকটা পলতে, অন্য হাতে

তার আটপৌরে ঘন নীল রঙের কাপড় তুলে তার যৌনাঙ্গ উন্মুক্ত করে (নিশ্চয়ই ভাবছে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না) প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদন করছে। সেই জল-স্রোতটি অটোয়ার জলপ্রপাতের মতো তীব্র। সেই স্রোতে নুড়ি পাথরগুলো গড়িয়ে গর্তে পড়ছিলো। মনে হচ্ছিলো লোকটা কঠিন মৃত্তিকায় একটা অতল গহবর সৃষ্টি করতে পারে। হায় হতভাগ্য, তার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, তোমার ঐ বর্শাটা সিমাবারার কীয়েটোর যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগবে না।

এই ধারণাটা আমার গ্রাম্য বলেই মনে হলো। এর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। আমি দীর্ঘক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না।

আমার বর্তমান চাকুরী আমার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হলো। আমার চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার আগেই আমি অসুস্থতার ভাণ করে, আমার মনিবের কাছ থেকে ছুটি নিলাম।

আমি হোঙ্গোর সিক্সথ্ ডিস্ট্রিক্টের দূরের গলি পথের এক বাড়ীতে উঠলাম। গলির প্রবেশ পথের থামে আমি একটা প্ল্যাকার্ড সেঁটে দিলাম। তাতে লেখা, এই গলির মেয়েদরজী যে কোন ধরণের সেলাই করতে পারে।'

আমার এখন শুধু এক চিন্তা, আমার ঘরে কোন পুরুষকে আপ্যায়ন করা। কিন্তু তার বদলে, আমার ভাগ্যে কিছু নিষ্কর্মা বুড়ি জুটতে লাগলো। তারা আজকালকার সেলাই ফোঁড়াই সম্পর্কে আমাকে বক বক করিয়ে মারলো। যখন তারা আমাকে তাদের পোষাক সেলাই করার অর্ডার দিলো, আমি যা তা ভাবে তা করে দিলাম। আঃ, সেটাকে এখনও আমার খুবই খারাপ আচরণ বলে মনে হয়।

দিনরাত আমি কুচিন্তায় মগ্ন থাকতাম। কিন্তু প্রকাশ্যে এ সব বলা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিলো। একদিন আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেলো। আমি আমার ব্যাগ বইবার জন্য একটি ঝিকে সঙ্গে নিয়ে মটোম্যাচি রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে আমি ইচিগো-ইয়া নামে এক বস্ত্রব্যবসায়ীর দোকানে গেলাম। তাঁর কর্মচারীরা আমি আগে যেখানে কাজ করতাম, সেখানে যেতো।

আমি জানালাম, আমি আমার চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি নিজেই নিজের পেট চালাই। অবশ্য তা দিয়ে একটা বেড়ালেরও চলেনা। আমার একদিকের প্রতিবেশীরা সব সময়ই বাইরে থাকে। অন্য দিকে থাকে এক সত্তর বছরের বুড়ো মেয়েছেলে। সে কোন ঝগড়া ঝঞ্ঝাটে যায় না। বাড়ীর সামনে কোন জনপ্রাণী নেই। থাকার মধ্যে একটা ঝোপ। মহাশয়গণ যদি আপনাদের

কারও শহরের ঐ প্রান্তে কোন কাজ থাকে, তাহলে আমার ওখানে একটু বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।

একথা বলে, আমি সিল্কের তৈরী লাল রঙের একটা সুন্দর কিমানোও রেশমের কোমর বন্ধনী নিয়ে বাইরে এলুম। ইচিগো-ইয়াতে কড়া নিয়ম ছিলো, ধারে খুচরো জিনিস বিক্রী হতো না। কিন্তু দোকানের ছোকরা কর্মচারীরা আমাকে দেখে এমন অভিভূত হয়ে গেলো, যে আমাকে ফেরাতে পারলো না। দাম না দিয়েই আমি চলে এলাম।

নবম চান্দ্র মাসের অষ্টম দিনে. দোকানের মালিক তাঁর কর্মচারীদের বকেয়া আদায় করতে আদেশ করলেন। দোকানে পনেরো জন কর্মচারীর প্রায় সবাই এ দায় এড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কর্মচারী, যে নাকি ভালবাসা, কোমলতার ধার ধারেনা, সব সময় লাভ ক্ষতির চিন্তা করেন, মালিক যাকে সাদা ইঁদুর বলে ঠাট্টা করেন, অন্য কর্মচারীদের আপত্তির কথা অধৈর্যের সঙ্গে শুনে বললো, ঐ মেয়েছেলের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। যদি সে দেনা না মেটায়, আমি তার মাথাটি কেটে নিয়ে আসবো দেখবেন।

তাকে ঠেকাবার উপায় ছিলো না। সে তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ীর দিকে রওনা দিলো। বাড়ীতে পৌঁছে সে আমাকে কর্কশ ভাষায় গাল দিতে থাকলো, কিন্তু আমি চুপ করে তা শুনলাম। বললাম, মশাই, এই সামান্য ব্যাপারে কষ্ট করে এখানে আসতে হওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার হালকা পাটলবর্ণের কিমানোটা গা থেকে খুলে ফেলে বললাম, দেখুন মশায়, এটা হাল ফ্যাসনে রঙ করা। আর মাত্র কাল ও আজ এই দুদিন মাত্র আমার গায়ে উঠেছে এটা। আর এই নিন আমার রেশমী কোমর বন্ধনী আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। বলতে বলতে পোষাকটি তাকে দিয়ে বললাম, এই মুহূর্তে আমার কাছে পয়সা নেই, আপনি এটাই নিন।

আমি যখন তার সামনে দাঁড়িয়ে, আমার চোখ তখন জলে চকচক করছিলো। আর আমার পরণে লাল রঙের সায়াটি ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নগ্ন। সে যখন আমার মনোরম, দুগ্ধধবল, মেদহীন দেহ বল্লরীটি দেখলো, যাতে একটি তিলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, তখন সেই শক্ত লোকটা আসপ পাতার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

সে বললো, 'তুমি কি ভাবছো, তোমার পোষাকগুলো থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবো? তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

ও আমাকে কিমানোটা পরে ফেলতে বললো। তখন সে সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

তার গায়ে ঠেস দিয়ে আমি বললাম, 'তুমি একজন স্নেহশীল মানুষ।'

সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে সে তার ছোকরা অনুচর কিউরোকু-কে ডেকে, বাক্সটা খুলতে হুকুম করলো। তারপর তা থেকে একটা রূপোর টাকা নিয়ে বললো। 'আমি এটা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি 'সিতয়াদোরী' যাও। ইউ সিয়ারার দিকে নজর রাখো। তোমার তাড়াতাড়ি ফেরার দরকার নেই।'

উত্তেজনায় ছোকরার বুক ওঠানামা করতে লাগলো। তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে কিছুতেই একটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ফলে বেশ কিছুক্ষণ সে উত্তর দিতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে বুঝলো। সে ভাবলো ও বুঝেছি, আমি যখন পথে থাকবো, উনি তখন এই ছুড়িটার সঙ্গে মজা লুটবেন। ঐসঙ্গে ছোকরার মাথায় একটা মতলব এলো, যাক হাড়কেপ্পণ এ মনিবের কাছ থেকে বেশ কিছু বাগাবার একটা দুষ্প্রাপ্য মওকা পাওয়া গেছে।

সে বললো, 'কিন্তু কর্তা, আমি এই সুতির পোষাক পরে ঐ বাসায় নজর রাখতে যেতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি।'

কর্তা বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

তারপর তাকে একটা চওড়া হিনু সিল্কের কাপড় দিলেন। আর ছোকরা তা সেলাই করে নেবার অপেক্ষা না করে, গায়ে পেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লো।

ছোকরাটা চলে গেল, আমি দরজায় হুড়কা লাগিয়ে দিলাম। খড়ের টুপি দিয়ে জানালার ফোকর বন্ধ করে দিলাম। তারপর কোন দালালের সাহায্য ছাড়াই, আমরা দুজনের মিলনের চুক্তি সম্পাদন করলাম।

একবার আত্মসমর্পণের পরই আমার করণিক মহাশয়, তার মন থেকে লাভের লোভ ঝেড়ে ফেললেন। তারপর নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেন। একজন উৎসাহী যুবকের এই বোকামী ক্ষমা করা যায় না। তার কর্মস্থলে গোলমাল শুরু হলো। শীগগিরই তাকে বরখাস্ত করে, কিয়োটো যাবার নির্দেশ দেওয়া হলো।

এই সময় থেকে আমি নামেই মেয়ে দরজী রইলাম। আসলে আমি এখানে

সেখানে মজা লুটতে লাগলাম। দর্শনী প্রতিদিন এক সুবর্ণ মুদ্রা। যদিও আমার কাজের যন্ত্রপাতির বাক্সটি নিয়ে আমার ঝি আমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু আমি আসলে অন্য ধরণের কাজ করতাম। যা আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য করতে বাধ্য হতাম। কারণ যে ব্যক্তি বলতে পারেন, যে সুতো দিয়ে এখন আমি স্বাভাবিক ভাবে সেলাই কাজ চালাই, তা দিয়ে পাছাড় কাপড় সেলাই চলে না।

পরিচিতি

ইহারা সেই কাকু ঃ

জাপানী সাহিত্যে, ইহারা সেই কাকু এক উজ্জ্বল নাম। তিনি প্রেমও আদিরসের গল্পেকে মানব মনের গহণ প্রদেশের কোন এক হারিয়ে যাওয়া ঘটনার ঘনঘটায় প্রস্ফুটিত করে পাঠকের মনে সাড়া জাগিয়ে দেন।

অঙ্গুরীয়ক | কাওয়াবাতা ইয়াসুনারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক গরীব ছাত্র পাহাড়ের গায়ে একটা উষ্ণ প্রস্রবনে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিলো, যে অনুবাদের কাজটা সে কোরছিল সেটা শেষ করা।

বনের মধ্যে একটা গ্রাম্য আচ্ছাদনের নীচে তিনজন গেইসা মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। ওদের প্রত্যেকের মুখের ওপর রাখা ছিল এক্টা কোরে গোলাকৃতি পাখা।

বনের পাশ দিয়ে কয়েক পা নীচে নেমে গেল ছেলেটি। এক্টা পাহাড়ী ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল সেখানে আর এক ঝাঁক ড্র্যাগন মাছি উড়ছিলো ওপরে একটা বিশাল পাথর, জলের ধারাটাকে দুভাগ কোরে দিয়েছিলো।

পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা স্নান করার পুকুরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি মেয়ে।

ছাত্রটির মনে হোল মেয়েটির বয়স এগার বারর বেশী নয়। তাই সে গায়ের ইউকাতাটা (হালকা সুতীর পোষাক) খুলে একপাশে রেখে উষ্ণ জলে ডুবিয়ে দিল শরীরটা। পোষাকটা সে রেখেছিলো নদীর ওপর ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাথরগুলোর ওপর। মেয়েটি ছিলো তার খুব কাছেই।

মেয়েটির মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসি, যেন সে ওর বন্ধুত্বের ভাবটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। গরম জলে স্নান করার ফলে ওর সারা নগ্ন শরীরটা গোলাপী হয়ে উঠছিলো। ছাত্রটি বুঝতে পারলো মেয়েটি অবশ্যই গেইসা মেয়ে হ'বে। ওর শরীরে সৌন্দর্য্যের আভাষ রয়েছে তখনও, যদিও ইতিপূর্বে অনেক পুরুষেরই যৌন লালসা পরিতৃপ্ত কোরতে হয়েছে তাকে, তবুও মেয়েটি এখনও সুন্দরী। ওর চোখেও জ্বলে উঠল লালসার আগুন।

হঠাৎ মেয়েটি তার বাঁ হাতটা তুলে চেঁচিয়ে উঠলো। বোললো, "হায়, আংটি খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছি একেবারে ; হাতে নিয়েই জলে নেমেছি আমি।"

ছেলেটির দৃষ্টিটা স্বভাবতঃই গিয়ে পোড়লো ওর হাতের ওপর।

এই ভাবে চাতুর্য্যের সঙ্গে নিজেকে ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিরক্ত হয়ে ভাবলো ছেলেটি, 'তুমি একটা ক্ষুদে উপদ্রব।'

মেয়েটি শুধু দেখাতে চাইছিল তার আংটিটা। ছেলেটি জানতো না উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান কোরতে গেলে আংটি খুলে রাখতে হয় কি না। কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মেয়েটির চাতুর্য্যে ধরা পড়ে গিয়েছে সে।

ওর মনে হোল আরও বেশী অসন্তোষ প্রকাশ করা ওর উচিত ছিল ; কারণ মেয়েটি আংটিটা নাড়াচাড়া কোরতে কোরতে ক্রমাগতঃই লাল হয়ে উঠছিল। ও বুঝলো হাসিটা ওর মতো বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের পক্ষে অনুচিত ও অনুপযুক্ত, তাই সে মন্তব্য কোরল, "আংটিটা খুব সুন্দর তো ; দেখি একবার।"

"এটা ওপ্যাল পাথর" বোলতে বোলতে মেয়েটি, নেমে এল পুকুরে। হাতের আংটিটা দেখাবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে হোঁচট খেলো মেয়েটি। ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে কোন ক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে।

"ওপ্যাল?" ওর কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোলল সে। ওর মনে হোল মেয়েটির উচ্চারণের ভঙ্গীটা অকালপক্ক মেয়ের মতো।

"হ্যাঁ। আমার আঙ্গুলগুলো খুব সরু তাই অর্ডার দিয়ে করাতে হ'য়েছে আংটিটা। পাথরটা আবার একটু বড়ো।" মেয়েটি যখন কথা বোলছিল, ছেলেটি তখন খেলা কোরছিল ওর ছোট্ট হাতটা নিয়ে। পাথরটির দ্যুতি ওর সাদা হাতে যেন অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। মেয়েটি ধীরে ধীরে ওর বুকের কাছে এগিয়ে আসছিল। সে তাকিয়েছিলো ওর মুখের দিকে। মনে হচ্চিল খুব আনন্দ পেয়েছে সে।

ছাত্রটির মনে হোল, মেয়েটি আংটিটা আরও ভালো কোরে দেখাতে চাইলে ওকে তার নিজের হাঁটুর ওপর চেপে ধরতেও আটকাবে না তার।

পরিচিতি

KAWABATA YASUMARI : From the ring

কাওবাতে ইয়াসুনারী (জাপানে জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৭২ খৃঃ)

ভাগ্যবান কবি

হিউগ ম্যাকডায়ারমিড

স্কটল্যান্ডের দুটি বিভাগ! দুটি গল্প বোলে বিভাগ দুটির বিশেষত্ব বোঝানো যেতে পারে। আমি নিজে অবশ্য প্রথম বিভাগে পড়ি। প্রথম গল্পটি এই রকম।

একজন স্কটিশ চাষী তার খামার দেখতে বেরিয়ে দেখলো যে তার সদ্য যৌবন প্রাপ্ত পুত্রটি তারই একটি চাকরাণী মেয়ের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখলো সে, তারপর মাথা নেড়ে বিড়বিড় কোরে বোললো, "বাঃ জক্, বেশ পেকে গিয়েছিস তো। এরপর তো তামাক খাওয়া সুরু করবি দেখছি।"

অপর গল্পটি হচ্ছে—একজন ভ্রমণকারী স্কটল্যান্ড হাইল্যান্ড জেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি উঠেছিলেন একটা হোটেলে সময়টা রবিবারের সকাল, তাই তিনি ভাবলেন একটু শিকারের বেরোবেন। বন্দুক হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছেন তিনি, তখন হোটলের মালিক পথ আগলে দাঁড়ালেন তাঁর। না, রবিবার এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। অগত্যা ভদ্রলোক আবার উঠলেন নিজের ঘরে। এমন সুন্দর দিনটা কাটানো যায় কিভাবে! মাছ ধরতে গেলে কেমন হয়। ভাবামাত্রই কাজ। ছিপটা আর মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আবার নামলেন তিনি। কিন্তু এবারও হোটেল মালিক নিবৃত্ত কোরলেন তাঁকে। না, এই পবিত্র দিনটায় মাছ ধরাও চোলবে না। অবশেষে ভ্রমণকারীর বিমর্ষ মুখটা দেখে দয়া হোল তাঁর। "আচ্ছা, আপনি আপনার নিজের ঘরে যান, একটা সুন্দর মেয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, তাতে আপনার দিনটা ভালোই কাটবে। ভদ্রলোক ঘরে ফিরলেন। কিছুক্ষণ পরেই

তার দরজায় টোকা পোড়লো আর ঘরে এসে দাঁড়ালো একটি সুন্দরী যুবতী। কালক্ষেপ না কোরে মেয়েটি সুরু কোরলো তার পোষাক খুলতে। ভদ্রলোক একটু বিব্রত বোধ কোরছিলেন, তাই তিনি পেছন ফিরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শিষ দিতে লাগলেন। হঠাৎ দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন মেয়েটি বেরিয়ে গিয়েছে। দালানে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরলেন তিনি, জিজ্ঞেস কোরলেন চলে আসার কারণ। "প্রভুর এই পবিত্র দিনে যে শিষ দেয় সে লোকের সঙ্গে আমি এক বিছানায় শুতে পারবো না।" মেয়েটি উত্তর দিলো।

স্কটল্যান্ডের এই বিভাগটির বিশেষত্ব আরও বিশদভাবে বোঝাবার জন্যে আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একদিন একজন ভ্রমণকারী এই অঞ্চলের একটি দ্বীপে বেড়াতে এসে একটা কুটিরে আশ্রয় নিলেন। এইসব দ্বীপের কুটিরগুলো সাধারণতঃ খুব ছোট হয় আর খালি ঘর থাকে না। কিন্তু হাই-ল্যান্ডের আতিথেয়তা তো আর উপেক্ষার বস্তু নয়, তাছাড়া ভদ্রলোক এসেছেন সন্ধ্যায়, তাঁকে ফিরে যেতেও বলা যায় না। তাই এসব ক্ষেত্রে অতিথিকে থাকতে দেওয়া হয় সেই ঘরটায় যে ঘরটা গৃহস্বামীর মেয়ে আগে থাকতেই দখল কোরে আছে। এই অবস্থায় মেয়ের মা সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যে মেয়েকে মোজার মতো গায়ে চেপে বসা এমন একটা পোষাক পরিয়ে দেন যেটায় পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢাকা থাকে আর সহজে খোলা যায় না। সকালে উঠে মা দেখেন মেয়ের নিম্নাঙ্গে পোষাকটি ঠিক আছে কিনা। ঐ অতিথি যেদিন এসেছিলেন সেদিনও ঐরকম ব্যবস্থাই কোরেছিলেন গৃহস্বামিনী। কিন্তু ভ্রমণকারী ভদ্রলোকটির সম্পর্কে একটু সন্দেহ ছিল তার, তাই সকালে উঠেই মেয়েকে জিজ্ঞেস কোরলেন তিনি, "মেরি, সব ঠিক আছে তো? রাত্রে ভদ্রলোক কিছু কোরতে চেষ্টা কোরে-ছিলেন নাকি?' মেরি উত্তর দিলো, "তা কোরেছিলেন বৈকি মা। মোজাটা খুলতে অনেক চেষ্টাই কোরেছেন উনি।" মা বোললেন, "দেড়ে শয়তানটা তাহলে চেষ্টা কোরেছে? কিন্তু পারেনি নিশ্চয়ই?" "না", হাসতে হাসতে বোলল মেয়েটি 'উনি অনেক চেষ্টায় আমার একটা পা থেকে খুলেছিল ওটা।" মা আশ্বস্ত হলেন। "ঠিক আছে, ওতে কোন ক্ষতি নেই।"

পরিচিতি

HUGH MACDIARMID . From luky poets

হিউগ ম্যাকডয়ারমিড (গ্রেটব্রিটেনে জন্ম ১৮৯২—মৃত্যু ১৯৭৮ খৃঃ)

পরকীয়া সঙ্গমে

সিনক্লেয়ার লুই

চিপ পেওয়া এভিনিউয়ের চশমার দোকানের মালিক অরনো ভে। রঙ করা

বাঁকা ধরণের ফ্রেমের স্মার্ট চশমা তার বিশেষত্ব। সে জনগণের সুপরিচিত মানুষ, গোরস্থানের মতই সুপরিচিত। মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে সাজানো

থার কাজ, শিল্প সম্বন্ধে লেকচার দেয় যে অধ্যাপক এবং মিশনারী—এদের কাজের মতই চশমাওয়ালার ধৈর্য্য বা টেকনিকাল কৌশলের যথেষ্ট মূল্য দেয় না পাবলিক।

সে বড় হতে চায়। সে ভাল বক্তা। খুব হাসি খুশি। স্থানীয় যে সকল হকি টিম, স্থানীয় ক্লাব, চার্চ ও যুদ্ধসংক্রান্ত সব প্রচেষ্টার ব্যাপারে সে জনসমক্ষে অনেক কথা বলে।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তার মাথায় টাক পড়ছে। তার মুখ ও কপাল ডিমের মত চকচকে। সেই মসৃণতার মাঝখানে নিজের তৈরি হাই-বাইফোকাল চশমা—যুদ্ধে চাঁদা ওঠানোর যেকোন অনুষ্ঠানে এই মুখ দেখা যাবে।

কিন্তু তার স্ত্রী ভারগা এসবে নির্লিপ্ত। সে ছোটখাট, ভীতু রোমান্টিক মেয়েমানুষ। বয়সে সে স্বামীর চেয়ে দশ বছরের ছোট। তার ভাল লাগে রঙীন সিনেমা, ছবির প্রেম এবং পাহাড়ের ওপরে শরতের কুয়াশার পটভূমিতে লেখা প্রেমের কবিতা। যা আমেরিকার খবরের কাগজে ছাপা হয়।

ভারগার আছে এক গোপন প্রেমিক, উপপতি বা বয়ফ্রেন্ড, যাই বলুন। সে একজন ডেন্টিস্ট, নাম ডাঃ অ্যালান সিডার। ওদের দুজনার স্বভাবে ভারি মিল। বিয়ে হলে রাজযোটক মিল হত।

কিন্তু এখন ওরা খোলাখুলি মিশতে পারে না। স্বামীর চোখের আড়ালে আবডালে চলে ওদের মিলন খেলা। নিশীথ বেলা। গোপন বধূকে পেয়ে অ্যালানের নিশ্চয়ই ভরে যায় কোল। ওদের প্রেমের দোলনায় পরস্পর দেয় দোল। আর মানসরাজ্যে তো পরস্পরের নিতি অভিসার। নিতি ফুলশয্যা। চোখের আড়াল কি শুধু একজনকে করলেই চলে? আরও একজন যে রয়েছে। সাক্ষাৎ রায়বাঘিনী ননদিনী, জটিলা-কুটিলা তুল্যা। অ্যালানেরও যে বিয়ে করা বউ রয়েছে বাড়িতে। নাম বারথা। যার সঙ্গে আকৃতিতে প্রকৃতিতে কোনই মিল নেই অ্যালানের। দেখতে হোঁতকা, থলথলে মোটা। স্বভাবেও কুঁদলে, দজ্জাল, বিশ্ব ঝগড়াটে। এই পরকীয়া প্রেমিক যুগল ভারগা ও অ্যালানের বেজায় ভয় তাকেও।

কিন্তু কথাই আছে 'মিঞা বিবি রাজী তো কেয়া করে কাজি।' গরু বাছুরে ভাব থাকলে কি জায়গার অভাব হয় দুগ্ধপানের বা দানের? ভারগা ও অ্যালান যথাক্রমে দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্ত্রী ও স্বামী হওয়া সত্ত্বেও পরকীয়া পীরিতের অমোঘ আকর্ষণে শ্যামের ব্যাকুল বাঁশীর টানে

ঘরছাড়া উন্মনা শ্রীরাধার মত গোপনে মিলিত হতে—পরস্পরের আকর্ষণীয় সান্নিধ্য উপভোগ—দেহের সুধা পান করতে বেরোতো সময় সুযোগ মত। তারা সাধারণত সন্ধ্যারাতের আলো আঁধারিতে অ্যালেনের গাড়িতে চড়ে চলে যেত শহর থেকে দূরে। বহুদূরে। শ্যাওলা ঢাকা মাঠের নিরালা নির্জন নিভৃতে। সেখানে তারা শরীরে শরীর মেলাতো। পরস্পরের দেহের অ্যানাটমির ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিত গায়ে গায়ে। দেহের উত্তাপ বিনিময় করত। পরস্পরের কাছে নতুন করে স্বীকৃতি পেত সত্যিকারের নারীত্বের ও পুরুষত্বের। একে অন্যের সুধা আহার করত। যথাক্রমে পেলব ও পুরুষ ওষ্ঠের। স্পর্শকাতর স্তনবৃন্তের। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে চলত নানারকম প্রেমের খেলা। আদিম রিপুর সংহার। 'লাভারস ফিস্ট' মানে 'প্রেমিকের ভোজ' মেটাতো মনের সাধে। 'লাভারস-ফি'ও কিন্তু আদায় হত ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। অফুরন্ত আনন্দে আত্মহারা, হতবিহ্বল হয়ে পড়ত ওরা। ভুলে যেত বাড়িতে ওরা এক একজনকে বঞ্চিত করে তার হক্কের পাওনা ফাঁকি দিয়ে, তা উড়ে এসে জুড়ে বসা লোককে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে মেয়েরা তো নিজ পতির ওপরের একাধিপত্য বরং যমকে ছেড়ে দেবে তবু অন্য নারীকে কদাচ, নৈব নৈব চ। নারী হয়ে ভারগার এ হেন আরেক নারীর হক্কের ধন, মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়া-এটা কেমন!

অ্যালানের অন্য আরেক বিশিষ্ট পরিচয়—সে স্থানীয় অভিনেতৃ সংঘের সেরা অভিনেতা। তার পরকীয়া প্রেমিকা ভারগা যদিও নিজে অভিনয় করে না, সে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোষাক তৈরী করে। এই সুযোগে সে নাটকের মহড়ার সময় ঘোরাঘুরি করে গ্রীণরুমে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করে। অ্যালানের বউ বারথা সিডারের মনে স্বামীর চরিত্রে ও তার পরকীয়া আসক্তিতে সন্দেহ জাগবার কারণ ঘটে না।

মিসেস বারথা সিডারের মত শয়তান মেয়েমানুষ সত্যিই কম দেখা যায়। সে স্বামীকে সত্যি সত্যিই ঘেন্না করে। স্বামীর অভিনয়ের 'মেয়েলি' অভ্যেস, কবিতা লেখার 'বদভ্যাস', মস্ত বড় গোঁফ এবং সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানোর কায়দা সর্বকিছুই তার বেজায় অপছন্দ। সবকিছুকেই সে সদা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে।

সে টিট্‌কিরি দেয় আর তার সাত বোন এবং সাত ভগ্নীপতি বাঁধানো দাঁতে চুইং-গাম চিবোতে চিবোতে শোনে যে মিসেস স্নিডারের মতে, প্রেমের শয্যায় মিথুন লগ্নে সঙ্গমের আসনে তার স্বামী 'অ্যালি' রমণী রমণরণে বড্ড তাড়াতাড়ি হার মেনে রণে ভঙ্গ দেয়। যুদ্ধটা তার সঙ্গে কখনোই পুরোপুরি জমে উঠতে পারে না। তার অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক স্টেশনে পেঁছবার আগেই ট্রেন বা এয়ারপোর্টে পেঁছনোর আগে প্লেন ছেড়ে দেওয়ার মত। এমন অক্ষম পতিকে নিয়ে কোন "সক্ষম" "সোমত্ত" পত্নীর মন ওঠে ?

এইসব কথা বলে চেনাশোনা মেয়েমহলে বারথা প্রচুর সহানুভূতি কুড়োয়। স্বামী 'গলফ্', এবং 'ব্যাকগ্যামন্' খেলতে ভালবাসে। অতএব খেলা দুটোর কোনটাই শিখতে রাজি নয় সে।

এইভাবে অনবরত খুঁচিয়ে স্বামীকে স্নায়ুবিহ্বল করে তুলত বারথা। তারপর বলতো—'তুমি খুব ঘাবড়ে গেছো, মনে হচ্ছে ?'

ক্রশওয়ার্ডের ধাঁধা সমাধান খোঁজা অ্যালানের বাতিক। তাই নিয়েও ঠাট্টা-তামাশা করে বারথা। স্ট্যাম্প জমানো অ্যালানের আরেক সখ। তা নিয়েও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। হাসি মস্করা। এবং শেষে অ্যালান যখন চিৎকার করে ওঠে আমায় একা থাকতে দাও। বারথা নির্বিকার মুখে বলে, 'ব্যাপার কি বলতো ? সামান্য ঠাট্টায় ছোটখাট কথায় এত রেগে যাচ্ছো আজকাল ? তোমার মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। পাগলের ডাক্তার দেখাও।'

তারপর ঘটল সেই চরম অঘটন।

বারথা একদিন ভয়ঙ্কর চেহারা ও স্বভাবের এক পিসির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে পেল ক্যালিফোর্ণিয়ার সাধজোধে একটা বাড়ি আর নগদ সাত হাজার ডলার। স্বামীর সঙ্গে আগেভাগে কোন পরামর্শ না করেই স্রেফ জানালে, ওরা ঠাণ্ডা মিলনেসোটার বদলে ক্যালিফোর্ণিয়ার উষ্ণ আরামে থাকবে এবং সেখানেই নতুন করে প্রাকটিশ শুরু করতে হবে অ্যালানকে।

স্ত্রীকে খুন করার কথা অ্যালানের মাথায় এল। অথচ স্ত্রীর সঙ্গে ক্যালিফোর্ণিয়ায় যেতে অস্বীকার করার কথা একবারও মাথায় এলো না। অনেক আমেরিকান পুরুষই তাদের স্ত্রী ও পুলিসম্যানের পার্থক্য বোঝে না।

কিন্তু অ্যালান জানে তার পরকীয়া প্রেমিকা ভারগা'কে ছেড়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামিল। সে ভারগাকে সাংকেতিক কোড়ে টেলিফোনে

বললো সুপার মরেকেট থেকে বলছি। আপনাকে তিন গোদা অ্যামপারা গান পাঠানো হচ্ছে।

ফোনের জবাবে ভারগা বিকেল তিনটেয় তার অফিসে এসে হাজির হল। বলল, 'আমরা দুজনে কি একসঙ্গে, কোথায় পালিয়ে যেতে পারি না? পারি না স্বর্গখেলনা গড়তে ধরণীতে। আমরা যদি ছোট একটা ফার্মের মালিক হই'—

—এদিক ওদিক তাকিয়ে সবার অলক্ষ্যে তার স্তনে কনুইয়ের চাপ, নিতম্বে করপল্লবের মৃদু চাপ দিয়ে গাল টিপে আদর করে অ্যালান বলল,

—'আমার বউ আমাদের ধরে ফেলবে। ওর খুড়তুত ভাই ভানাথে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

—'হ্যাঁ, আমারও মনে হয়। ও আমাদের ধরে ফেলবে। আমরা কোনদিন সবসময় একে অন্যের কাছে থাকতে পারব না?' বলল ভারগা। তার প্রেমিকের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ নিবিড় ভাবে নরম স্তনে চাপ দিয়ে। সে চেষ্টা করে অনুভব করতে তার প্রেমিকের প্রধান স্পর্শকাতর স্থানের। মাঝে মাঝে তার আরও সাধ যায় বিশাল জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে তার প্রেমিককে বাইরে থেকেই উত্তেজিত করে, মনে মনে এও ভাবে এ্যালান কি পারবে না তার প্রত্যুত্তর দিতে।

......এ্যালানও চুপ করে থাকে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার সেও করে......।

—'একটা মাত্র প্রতিকার আছে। যদি তোমার ভয় না করে—'

উপায়টা বুঝিয়ে বলল অ্যালানে। তার প্রেমিকা পরস্ত্রী ভারগা জবাব দিল পরপুরুষ প্রণয়ী অ্যালানকে।

—'না আমার ভয় করবে না গো। আমি ভয় করি না, বন্ধু, যদি থাকো আমার পাশে। যদি তুমি সদাসর্বদা আমার পাশে পাশে থাকো তবে আমি নরকেও যেতে ভয় পাই না।'

তা অ্যালান পেশাদার সেতার যন্ত্রীবদ না হলেও তার কাজের হাত ভালো।

এক রবিবার বিকেলে তার বউ বারথা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে নিজের ছোট কালচে ধূসর মোটর গাড়ীর লাগেজ কম্পার্টমেন্টের

ইস্পাতের মেঝেতে একটা গর্ত করল ডাঃ অ্যালান।

লাগেজ কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে গাড়ির ভেতরের সরাসরি যোগাযোগ আছে। একই দিকে নিজের ভ্যাকুয়ামক্লিনারের হোসপাইপটা চুরি করে নিজের গ্যারাজে লুকিয়ে রাখে অ্যালান।

ফেব্রুয়ারীর এক মঙ্গলবার সে ইগনেশিয়ান স্ট্রীটের গোল্ডেনব্রুণ ব্রাদার্স এর দোকান থেকে নীল রঙের নতুন একটা রেডিমেড স্যুট কিনলো। ভালই ফিট্ করল। অদলবদলের দরকার হলো না। দোকানদার বিকেলে স্যুটটা ওর বাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলায় অ্যালান বলল—'না, কাল সকালে এখানে এসে পরবো। আমি সবাইকে অবাক করে দিতে চাই।'

মণ্টি গোল্ডেনব্রুণ বলল, 'তোমার বউয়ের এ স্যুটটা খুব পছন্দ হবে দেখো। যখন তীন স্যুটপরা অবস্থায় তোমাকে দেখবেন।'

সাদা লিনেনের তিনটে শার্ট আর লাল একটা 'বো'টাই কিনে নগদে দাম মেটাল ডেণ্টিস্ট ডাঃ অ্যালান। মণ্টি বলল—

—'ক্যাশ দেবার কি দরকার, তোমাকে ধার দিলে টাকা মারা যায় না, আমি জানি ডক্।'

—'সেই সুনামটা অক্ষুণ্ণ রাখা এই মুহূর্তে দরকার।' ওর কথার ধরণে অবাক হয় মণ্টি।

মণ্টির দোকান ছেড়ে অ্যালান যায় এম্পোরিয়ামে। গোল্ডেন রুল ড্রাগ স্টোরে। কোঅপারেটিভ ডেয়ারীতে। সব জায়গায় সে নগদে টাকা দেয়। রাস্তায় স্থানীয় এক বিশিষ্ট নাগরিক বিচারক টিমবারলেন ও তার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে অ্যালান। জীবনে তাঁদের সঙ্গে সবশুদ্ধ দশটা কথাও বলেছে কিনা অ্যালানের সন্দেহ। কিন্তু উনি সে ভাবে এই এক বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান দম্পতি। প্রেমের মূল্য কি এরা জানে।

সেদিন সন্ধ্যায়।

স্ত্রী বারথাকে বলল অ্যালান,

—'জানো, এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে আজ। ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ডেনটিসট্রি থেকে আমায় ফোন করেছে। ট্যুরে যেতে হবে।'

'লং ডিস্‌ট্যান্স ?'

"নিশ্চয়ই।"

'তাই নাকি !'

স্ত্রীর গলায় বিশ্বাস যতটা, বিরক্তি তার চেয়ে বেশী।

—'ওরা ডেন্টিস্টদের জন্য বিশেষ একটা রিফ্রেশার কোর্স চালু করেছে যাতে তাদের ব্যবহারিক বিদ্যাটাকে আর এক দফা ঝালিয়ে নেওয়া যায়। ওরা বলেছে, কাল আমাকে সকালে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে এবং তিন দিন ধরে দাঁত বাঁধানোর কাজ শেখাতে হবে নতুন দন্তচিকিৎসকদের। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু। আমাকে অবশ্য সকাল নটা থেকে রাত বারোটা অবধি কাজ করতে হবে। দুঃখিত, সঙ্গে নিয়ে গেলেও তোমায় সঙ্গ দিতে পারবো না তেমন। এইসব স্পেশাল কোর্সে বড্ড তাড়াহুড়ো করে ওরা। তুমি না হয় একা একা সিনেমা দেখবে, নয়তো হোটেলে বসে আরাম আনন্দ করবে।'

—'আমি যাবো তোমার সঙ্গে ? ঐ শর্তে ? মাথা খারাপ ! রক্ষে কর বাপু। না ধন্যবাদ। আমি এখানেই থাকবো। একা। কিন্তু তোমার রবিবার সকালের আগেই ফিরে আসা চাই-ই।

—'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তার আগেই বাড়ি ফিরবো।'

ডক্টর অ্যালান বউকে বলে গেল, সে মিনিয়াপোলিসের ফেয়ারা হোটেলে থাকবে।

কিন্তু বুধবার সকালে, যখন হালকা তুষার ঝরছে, নতুন স্যুট পরে গাড়ি চালিয়ে সেন্ট পলে যাওয়ার পথে অ্যালান ভাবছিল—আমার মধ্যে আসলে সত্যিকার কোন কবিত্ব শক্তি নেই। আমি বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। অতি সাধারণ ! সে একটা কবিতা ভাবতে চেষ্টা করে...কিন্তু তার মাথায় আসে শুধু আজেবাজে তিনটে মাত্র ছত্র।

—"ঝরছে তুষার, বইছে হাওয়া, সুখের খোঁজে আমার যাওয়া" সেন্ট পলে **হোটেল, অরকনেসে** একটা ডাবল বেডরুম ভাড়া করে সে হোটেলের ক্লার্ককে বোঝায় আমার বউ ট্রেনে আসছে। সতেরো মিনিটের মধ্যে তার আসার কথা।

নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে লিফটে চড়ে ঘরে যায় ডক্টর।

উনিশ মিনিট পরে এসে হাজির হয় ভারগা ভে। তাকে পেঁছে দিয়ে যায়

হোটেলের বেল বয়। ভারগার সদ্য কেনা নকল চামড়ার ব্যাগটা সে পেঁৗছে দিয়ে যায়।

—'তুমি পেঁৗছে গেছ হাজব্যান্ড। ঘরটা মন্দ নয়। 'উদাসীন স্বরে বলে ভারগা।

তার উদাসীন স্বর এবং পুরুষটিকে হাজব্যাণ্ড বলা শুনেই বেলবয় বোঝে মহিলা এই পুরুষের স্ত্রী নয়, কিন্তু এই পুরুষকে সত্যিই ভালবাসে।

তার মাথার ওপর ছ'তলার ঘরে ভারগা ও অ্যালান তখন দীর্ঘদিনের উপোসী ময়ালের মত, বহু দিন বাদে টাটকা রক্তমাংসের স্বাধ পাওয়া বুভুক্ষু বাঘের মত আর তর সইতে না পেরে কোনমতে রুমের দরজা বন্ধ করেই পাগলের মত পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিছানা তোলপাড় করে...। সহ্যের বাঁধ ভেঙেছে—হয়েছে প্রতীক্ষার অবসান। শুরু হয় কামনা মদির, অস্থির দুই হৃদয়ের পূর্ণ উপভোগ। সবুর সয়না, অন্ধের মতো একে অপরের শরীর খুঁজে বেড়ায়। এই মুহূর্তে ঘরের আসবাবপত্রগুলোও যেন লজ্জায় কুঁকড়ে যায় ওদের অবস্থা দেখে। কখনো বিছানায়, কখনো সুন্দর মসৃণ কার্পেট বিছোনা মেঝেতে, কখনোও বা সোফাসেটে বয়ে চলে বাঁধ ভাঙা যৌবন অভিসার। একে অপরকে আপ্রাণভাবে চেষ্টা করে কাছে পাওয়ার—তাড়াতাড়িতে ভুল করে। ক্ষতি নেই। এ ঘরে কেউ নেই, শুধু অ্যালান আর ভার্গা—ভার্গা আর অ্যালান। যেন পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত আকাশ তলে দুই আদিম মানব-মানবী—আদম-আর-ইভ্—নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর ...। কিংবা কোন যন্ত্রীর হাতে উচ্চগ্রাসে বাঁধা উত্তম তার-বাদ্যযন্ত্রের সুর লহরীর মনমাতানো ঐকতান বিস্তার। বাদকের হাত মুখ অন্য অঙ্গ কোন কিছুই নিশ্চেষ্ট নেই। সবকিছু সমান সক্রিয়। নরনারীর আদিম শয্যা-সংঘর্ষের দুই যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর এ যেন এক অনবদ্য দ্বৈরথ-দ্বন্দ্ব। চলল এইভাবে যেন কতযুগ কতবর্ষ, কে জানে...? কিন্তু সব কিছুরই শুরু আছে যেমন শেষও আছে তেমন। নিদেন সাময়িক বিরতি।

ভারগা-অ্যালানের বাধা বন্ধহারা উন্মত্ত উদ্দাম পরকীয়া প্রণয়লীলা তথা

সঙ্গমপর্বেরও শেষ পর্ব আসন্ন হল...শেষটা অবধারিতভাবেই দেহমিলনের সেই চরম পুলক লগ্নে রতিতৃপ্তির ইতিহর্ষের স্তরে উল্লাসের আত্মহারা যুগলের কণ্ঠ হতে এক তীব্র উত্তেজনাশিহর শিৎকার ধ্বনি নির্গত হয়...ওরা একে অন্যের নগ্ন দেহের পরেই ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে।

এরপরও যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যুগলের পরস্পরকে আদর সোহাগ মধুর মিলন। স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক। প্রকৃত-বিকৃত। যেমন এট্যাচ্ বাথে ভারগা তার স্নানের সময় এবং অন্য সময়েও নানাভাবে খুঁজে ফেরে এল্যান। বাথরুমেও তাদের যৌবন মদ মত্ত লীলা বাদ যায় না। সেখানেও নানা ভঙ্গিমায় একে অপরকে খোঁজে। এমন কি দু-জনের মধ্যে চলে রিপুর তাড়নায় নানা বিকৃত রুচির আলিঙ্গন। এ যেন উষ্ণ প্রস্রবণে নিজেদের একে অপরের কাছে বিলিয়ে দিয়ে কামনা মদির তপ্ত তনুকে সিঞ্চিত করেও আশ মেটে না। শুধু চাই—চাই—!

কখনও নির্জন ঘরের নিভৃতে ওরা 'উদাসী জীবন' অভ্যাস করে। শেখায় ভারগা, কি করে চরম উত্তেজনার মাহেন্দ্রক্ষণকে প্রলম্বিত করা যায় সঙ্গমে আপাত নিস্পৃহ নিরাসন থেকে। চেষ্টা করে অ্যালান। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় যখন তার সামনে পেছন ফিরে দাঁড়ানো নগ্নিকা ভারগা তার উন্মুক্ত সুগৌর উন্নত বর্তুলাকার নিতম্বটা মোহমুদ্গরের মত আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে থাকে। অ্যালান ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠে ফণাধরা ক্রুদ্ধ সাপের মত শিকারের ওপর ছোবল মেরে বিষ ঢালার জন্য ফোঁস ফোঁস গর্জাতে ও আন্দোলিত হতে থাকে। ভারগাও যেন অ্যালানের কাছে হার স্বীকার করতে রাজী নয়। সেও মেতে ওঠে রতি ক্রীড়ায়—উত্তেজনায় অধীর হয়ে পূর্ণ অনুভূতি লাভের হিসেব নিকেশ করে নিতে চায়। শুধু প্রতীক্ষা—চরম লগ্নের .....

ভারগার গলা শোনা গেল—'ওমা, তুমি নতুন স্যুট পরেছো ডার্লিং। ঘুরে দাঁড়াও তো। বাঃ কি সুন্দর মানিয়েছে তোমায়। ঠিক ঠিক ফিট করেছে! লাল টাইটা কি সুন্দর। বো-টাইয়ে তোমার বয়স আরো কম মনে হয়। এসব কিনেছো কেন? আমার জন্যে তাই না? ও ডিয়ার, ডিয়ার। তোমায় কত ভালবাসি। তুমি শুধু আমার, আমি তোমার। আমাদের দুজনার মাঝখানে আর কেউ নেই, এখন ভাবতে কত মজা কত আনন্দ তাই না?' বলে গলা জড়িয়ে আদরে চুমু খায় অ্যালানের মুখে।

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া...এখন ও ব্যাপারে কথা বলতে চাই না...তবে ওরা যখন আমাদের খুঁজে পাবে, আমাদের যেন খারাপ না দেখায়। কেউ যেন না ভাবে, আমরা দু'জন সুখে ছিলাম না। তুমি, তুমি মনস্থির করেছো তো ডার্লিং?'

—'তুমি পাশে থাকলে আমি সবকিছুর জন্যে তৈরী।'

পরের দিন বিকেলে ওরা পোষাক পরে। মালপত্র প্যাক করে। লাগেজ রেখে দেয় খাটের পায়ার কাছে। ব্যুরোর ওপরে রইল দশ ডলারের দুটো নোট। ঘরের কিছু নেয় না ভারগা। শুধু নেয় এক বোতল হুইস্কি আর নতুন কবিতার সংকলন একটা পকেট বই।

গ্যারেজের পরিচারককে এক ডলার টিপস দিয়ে অবাক করে দেয় ভারগা ও অ্যালান।

তারপর ওর ধুসর কালো গাড়িটা ছুটে চলে চঞ্চল মিসিসিপি নদীর ধারে ইন্ডিয়ান মাউন্ডস্ পার্কের দিকে।

হোটেল ছেড়ে আসার পর একটু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বাকি সময়টা ওরা সব কিছুতে হেসেছে। ভাগরা হাঁচলেও অ্যালান হেসে বলে—এখন আর নিউ-মোনিয়ার ভয় নেই।

তারপর কাছের ছোট্ট একটা রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করায় অ্যালান। আধো অন্ধকার। ইঞ্জিন চালু আছে। এক্সহস্ট্ পাইপের সঙ্গে লাগানো হোস পাইপ, যার অন্য মুখটা এখন লাগেজ কমপার্টমেন্টের তলার ফুটোয় লাগানো।

ভেতরে ঢুকে যায় অ্যালান। গাড়ীর ভেতরে ভারগাও বসে আছে। গাড়ি ভরে উঠেছে কার্বনমনক্সাইডের মিষ্টি অথচ মিহি গন্ধে।

হুইস্কির বোতল বার করে পুরুষ বলে—'একটু খাও, তাহলে সাহস হারাবে না।'

ভারগা এগিয়ে অ্যালানকে আদর করতে করতে বলে,

—'প্রিয়তম, সাহস বজায় রাখার জন্য কোন কিছুর দরকার নেই তুমি ছাড়া। তোমার শরীরের সুন্দর এই জিনিষগুলি ছাড়া।'

—'আমার আছে। আমি তোমার মত সাহসী নই ভারগা। তবুও তোমার নরম উঁচু বুক, নিতম্ব পুরু উরু, পেলব পায়ের পাতা, তোমার রসে ভেজা নরম ঠোঁট এসবও আমাকে উৎসাহিত করে। উদ্দীপিত করে বৈকি। দুজনেই হাসে। মদ খায়। উভয়ের বাহু হাত অঙ্গুলি কাঁধ ও উপাঙ্গকে উত্তেজনার খোরাক যোগায়—চেতনেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে।...'

—পুরুষ ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালে। বইটা যেন এখন সীসের মত গুরুভার। সে কনর‍্যাড্ আইকেনের কবিতা পড়ে শোনায় প্রিয়াকে।—

—স্বপ্নের নন্দন কানন থেকে তাদের ফিরিয়ে আনে এক তীব্র ও তীক্ষ্ন শব্দ গাড়ীর জানালা ভাঙা শব্দে। ভারগার গালে চড় মারছে বারথা। অ্যালানের কাঁধে ব্যাক জ্যাকের ঘা মেরে তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করে বারথার দূর সম্পর্কে ভাই, যে কিনা পেশায় ডিটেকটিভ। তার মারের চোটে অ্যালানের চোয়ালের হাড় ভাঙে।

বারথা ওকে গাড়িতে তুলে 'গ্র্যান্ড রিপাবলিকে' নিয়ে যায়। সেবাশুশ্রূষা করে ওকে সারিয়ে তোলে। ওর রোগশয্যার পাশে বসে প্রতিবেশিনী কুটনী ও ডাইনী মেয়েদের ডেকে এনে গল্প করে।

—"তোমরা তো জানো অ্যালান একটা মেয়ের সংগে ভেগেছিল—কিন্তু সেই 'মাগিটার' সঙ্গে পরকীয়া সংগমে অপারগ হয়ে—মানে এই কোন মেয়ের সঙ্গে কোন ব্যাটাছেলে রাত্রে একত্র বিছানায় শুলে যেসব কুম্তি টুম্তি করে—সেই 'কুম্তিতে' হেরে গিয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে গেছল।"

এর পরের ঘটনা।

বারথা ভারগার প্রত্যেকটি চিঠি গাপ করে। ভারগার স্বামী অরলো ধর্মের দোহাই দিয়ে ভারগাকে ডিভোর্স করেছে। ভারগা এখন ড্রেস মেকারের ছোট্ট দোকানে কাজ করে। তার কোন চিঠি অ্যালানের কাছে পৌঁছয় না।

বারথা তার উৎসুক শ্রোত্রী বান্ধবীদের শোনায়—'অ্যালি এখন বুঝছে ওসব প্রেম প্রেম নামক কুজ্ঞান মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়।'

॥ পরিচিতি ॥

VERGAVE SINCLAIRE LEWIS

সিনক্লেয়ার লুই নোবেলপুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান কথা-সাহিত্যিক।

লেখক তাঁর লেখায় রহস্যময় এক আদিরসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেছেন। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত "পরকীয়া সংগম" গল্পটি তাঁর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। সিনক্লেয়ার লুই মার্কিন সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল ধারার এক প্রধান ধারক ও বাহক।

সোনালী গাধা থেকে

লুসিয়াস আপুলেইয়াস

বাড়িতে বসে লক্ষ্য করলাম আমার প্রিয় কোতিস মাংস কুচোচ্ছে তার মনিব ও মনিব পত্নীর খাবারের ঝোল বানাবার জন্য। খাবারের আলমারিতে সাজানো রয়েছে নানা রকমের মদ। আমার নাকে যেন গন্ধ পেলুম মাংসের তৈরি উপাদেয় খাবারের।

কোতিসের শরীরের মাঝবরাবর ছিল একটাসাদা পরিস্কার অ্যাপ্রণ বা পরিধেয় আবরণী। তার স্তনদেশের নিচ থেকে গোটা শরীরটাকে বেষ্টন করে ছিল একখণ্ড লাল রেশমের পট্টি। সে তার শুভ্র সুন্দর দুহাতে রান্নার পাত্র ও তার ভেতরকার মাংস এভাবে নাড়াচাড়া করছিল যে আমার দেখতে ভারি ভাল লাগছিল।

এসব জিনিস যখন আমার চোখে পড়ল আমি কেমন যেন বিস্ময়াভিভূত হলুম। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই ভাবতে লাগলুম। ক্রমে ক্রমে মনে আমার সাহস ফিরে এল। যা আগে ছিল না। আমি কোতিসের সঙ্গে সাধারণ ভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলুম। বললাম, ওগো কোতিস। কি সুন্দর গোছানো ভাবেই না তুমি রান্নার পাত্রটা নাড়াচাড়া করছো। আর তোমার ঝোল তৈরির কায়দাটাই বা কত সুন্দর। ওঃ ধন্য সেই ব্যক্তি। যে শুধু সুখী নয় ডবল সুখী, যাকে তুমি কেবলমাত্র ছুঁয়ে দেখবার অনুমতি দাও। প্রশ্রয় দাও।

কোতিসও কম যায় না। সেও সমান সেয়ানা। কাজেই জবাব দিল—যা ভাগ আমার সামনে থেকে হতভাগা, আমার আগুনের আঁচ থেকে বাঁচতে চাস তো। কারণ যত কম তেজই তার থাকনা কেন তোর মতন লোককে পুড়িয়ে ছাই করবার ক্ষমতা তার আছে। আর সে আগুন আমি ছাড়া আর কেউ নেবাতেও

পারে না।

এইসব কথাগুলো বলবার সময় সে তার দুচোখের দৃষ্টি আমার ওপর মেলে ধরেছিল আর হাসছিল। কিন্তু আমি সেখান থেকে নড়লুম না যতক্ষণ না তার পূর্ণাবয়ব আমার সম্পূর্ণ নয়নগোচর হয়েছে। কিন্তু অন্যে পরে কা কথা, অপরের কথা কি বলব, বিদেশে থাকাকালীন আমি রপ্ত হয়েছি প্রতিটি তরুণী-কন্যার মুখ ও কেশরাজি লক্ষ্য করে দেখতে ও পরে নিজগৃহের নিভৃতে মনে মনে তা নিয়ে নিজে মনোরঞ্জন করতে। সেই ভাবে তাদের আকার প্রকারে স্মৃতির অবশিষ্টাংশটুকু নিজের মনে মনে যাচাই করে করে দেখতাম। কারণ মুখই হচ্ছে মানুষের শরীরের সেই প্রধানতম অংশ যা আমদের চোখের সামনে সর্বপ্রথম প্রকটিত। জমকালো চটকদারী পোষাকের যা ভূমিকা নারীর শরীরের সৌন্দর্য বিধানের, মুখেরও অবিকল তাই। যা নারীকে স্বাভাবিক এক কমনীয় মধুর সৌন্দর্য দান করে। এমন কেউ কেউ আছে যারা তাদের অবয়বের লালিত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দেহের নানা অলংকারপত্র—কণ্ঠাভরণ, বহুমূল্য বেশবাস শিরোভূষণাদি অনায়াসে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত তাদের নিজ নিজ নিরাবরণ দেহের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। বস্তুত তারা নগ্ন গাত্র চর্মের শুভ্রতা জাহির করতে যত আনন্দ পায় সোনা ও জোড়োয়া অলঙ্কারে সজ্জিত হতে ততটা না। কিন্তু যেহেতু আমার বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করতে কোন বাস্তব উদাহরণ না দেওয়া আমার পক্ষে পাপতুল্য, তাই বলছি, যদি আপনি মেয়েছেলের মাথার চুল কেটে বা নষ্ট করে ফেলেন বা তার মুখের চামড়ার স্বাভাবিক রঙ নষ্ট করে দেন তবে সেই নারী কখনো অত্যধিক সুন্দরী বলে বিবেচিতা হয়ে থাকুক আর না থাকুক, সে সাক্ষাৎ স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরাই হোক, সমুদ্রকন্যাই হোক বা স্বয়ং প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী ভেনাস বা রতিদেবীই হোক, যাবতীয় ললিতা সখীবৃন্দদ্বারা পরিবেষ্টিতাই হোক আর মদনদেবের সভাসদ বন্দিতাই হোক, তার মনোরম প্রেম-উত্তরীয় দ্বারা আবেষ্টিতাই হোক অথবা সুগন্ধি ও মৃগনাভি চর্চিতাই হোক তথাপি যদি সে কেশহীন মুণ্ডিত মস্তকে আবির্ভূতা হয় তবে অন্যে পরে কা কথা তার নিজের একান্ত নাগরকেও সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

ওই চকচকে চুলের সঙ্গে ফর্সা রঙ ও উজ্জ্বল মুখ কি চমৎকারই না মানায়। লক্ষ্য করে দেখুন, এ চুল সূর্য কিরণের মোকাবেলা করে চোখকে দারুণ তৃপ্ত করে। কখনো কখনো চুলের সৌন্দর্য সোনা ও মধুর রঙের সঙ্গে বেমালুম মিল খেয়ে যায়। কখনো বা তার ঘুঘুপাখীর গলার নীল ঝুঁটি ও চওড়া পালকের

রঙের সাদৃশ্য পায়। বিশেষ করে যখন তাকে হয় আরবা আরকে চাচত করা হয় নয়তো সূক্ষ্ম চিরুণীর দাঁতের সাহায্যে ছিমছাম ছাঁদে চুড়োকরে বাঁধা হয়। সেই অবস্থায় যখন ঘাড়ের পেছনে বাঁধা হয় তখন প্রেমিকের চোখে, যে প্রেমিক দুচোখ ভরে দেখবে তার প্রিয়ার এ হেন কেশ সৌন্দর্য—মনে হবে কোন কাঁচের মত যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অনাবিল মনোরম লালিত্য সুষমা যা, মেয়েটির দুকাঁধের ওপর চুল ছড়িয়ে থাকলে কিম্বা যা পিঠ বেয়ে চুল নামলে দেখা যেত কিনা সন্দেহ। সর্বোপরি, চুলের এমন একটি গরিমা আছে যে কেশধারিণীর পরিচয় যাই হোক, কেশধারিণী যত স্বর্ণালঙ্কার, রেশম, মণিমুক্তো ও অন্য মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ ভূষণ অলঙ্কারেই ভূষিতা হোক না কেন, তার কেশ সজ্জা যদি না হয় মনোহারী তবে তাকে আদপেই সুন্দর দেখাবে না।

কিন্তু আমার কোতিসের ব্যাপারই আলাদা। বসন উন্মোচিত ও বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ওর সৌন্দর্য বাড়ল বই কমল না। ওর মাথার চুল কাঁধ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে ওর কণ্ঠাভরণ অঙ্গাবরণের ওপর তার মনোরম গ্রীবার প্রতিটি অংশে—যদিও চুলের বেশির ভাগ অংশই তার ঘাড়ের পেছনে ফিতের সাহায্যে ঝুঁটি করে বাঁধা আছে। অতঃপর আমি যে ঝলসানো গরমের মধ্যে ছিলাম, তা আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর এবং যেখানটাতে সে তার চুলের ঝুঁটি পূর্বোক্ত ভাবে ন্যস্ত করেছিল, সেখানটাতে চুমু খেলাম। এতে সে মুখ ফেরাল, তার ঘুরন্ত চোখদুটো আমার ওপর ন্যস্ত করে বলল, 'ওহে পণ্ডিতবর, আপনি এখন তো মধু ও গরল উভয়েরই আস্বাদ নিলেন; খেয়াল রাখবেন আপনার আনন্দ যেন অনুশোচনায় পরিণত না হয়।

ধ্যাস, (আমি বললাম) প্রিয়ামোর, আমি আরো তৃপ্ত হই যদি এরকম আরেকটা চুম্বন এই আগুনে ঝলসে নিতে পাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে আরো বেশিকরে বার বার চুম্বন দিতে লাগলাম, আর সেও আমাকে অনুরূপভাবে আলিঙ্গন ও চুম্বন দান করতে লাগল। তার নিঃশ্বাসের গন্ধ দারুচিনির মত লাগল। আর তার জিহ্বার তরঙ্গে যেন সুমিষ্ট অমৃতের স্বাদ। এতে আমার মন যারপর নাই অহ্লাদিত। আমি বললাম, দেখ কোতিস আমি তোমারই। যদি আমায় কৃপা না কর এক্ষুণি মারা যাব। এই কথা বলার সাথে সাথে সে আমায় চুমু খেল! আমার মনে সাহস আনতে বলল। আর বলল, আমি তোমার সব বাসনাই মেটাব।......

খালি ধৈর্য্য ধরে রাত্তির অবধি অপেক্ষা কর। কাজেই এখন যাও তৈরি হয়ে থেকো।'

এইভাবে আমরা পরস্পর প্রেমালাপ ও শলাপরামর্শ সেরে তখনকার মত বিদায় নিলুম।

এর পর আমি উঠে গিয়ে আমার কামরার গেলুম। দেখি সব কিছু সুন্দর ভাবে তৈরি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলময় ছড়িয়ে আছে নৈশভোজের অবশিষ্ট মাংসাদি। বাটিগুলিতে আধা-আধি করে জল রাখা হয়েছে দরকার মত মদে মিশিয়ে তার দক্ কমাবার জন্য। মদ্যপাত্রও প্রস্তুত। মদের জগটাও রাখা আছে। আমি যখন শয্যায় প্রবেশ করতে যাব, ওমা, দেখি আমার কোতিস এসে হাজির। সে আমার হাতে গোলাপ ও অন্যান্য ফুল তুলে দিল তার আংরাখা থেকে নিয়ে। কতক সে বিছানায় ছড়িয়ে দিল। আমায় মিষ্টি করে চুমু খেল একটা। আমার মাথায় একটা মালা জড়িয়ে বেঁধে দিল। বাকি ফুল সে সারা ঘরময় ছড়িয়ে দিল। এরপর সে এক পেয়ালা মদ নিয়ে গরম জল মিশিয়ে তার দক্ ঠিক করল, ও আমার হাতে তা তুলে দিল পান করবার জন্য। আমি সেটা নিঃশেষ করবার আগেই সে আমার মুখ থেকে পেয়ালাটি নামিয়ে নিয়ে আবার সেটা পরিপূর্ণ করে আমার হাতে তুলে দিল। এই ভাবে আমরা দুজনে মিলে গোটা মদপাত্রটা মোট বার দুই কি তিনকে খালি করে ফেললাম।... এই ভাবে মদে মদে যখন চুর চুর হয়ে পড়েছি, তখন সে এল আমার শয্যায় ......মধুর ভাবে আমায় আলিঙ্গন করল। কাজেই সারা রাতটা আমাদের কাটল আনন্দে, বিনোদনে। আর শুধু সেই রাতটাই কেন, তারপরে পর পর আরো কত যে রাত আমারা আনন্দফূর্তিতে কাটিয়ে দিলাম তার কি কোন ইয়ত্তা আছে।

From THE GOLDEN ASS : Lucius Apuleius

(A. D. 2nd Century) খৃঃ দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করেন।

"লুসিয়াস আপুলেইয়াস" যে সব সাহিত্যসেবি সংকলনে রয়েছেন লুসিয়াস আপুলেইয়াস তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ও প্রাচীনতম পুরুষ। তিনি পাঠকের মনে গভীর রসের অনুভূতি জাগিয়েছেন তাঁর শ্লেষাত্মক আত্মজীবনী লিখে। তিনি দৈবযোগে গর্দভের রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

ইউলিসিস থেকে

জেম্‌স্‌ জয়েস

ইউলীসিসের 'নাসিবা' অনুচ্ছেদের অন্তর্গত এই খণ্ড কাহিনীতে নিও পোল্‌ড্‌ ব্লুম ও গার্টি ম্যাক্‌ডাওয়েলের বিবরণ রয়েছে।

মিমি কাফেট্র বলল—বাজি পোড়ানো হচ্ছে।

সবাই তীরের রাস্তা ধরে ছুটল পড়িমরি করে। বাড়িগুলি ও গীর্জার মাথার ওপর লক্ষ্য রেখে। এডি ছুটল ঠেলাগাড়িতে বাচ্চা বোর্ডম্যানকে নিয়ে আর মিমি ছুটল টমি জ্যাকির হাত ধরে রেখে, যাতে ওরা ছুটতে গিয়ে না হোঁচট খেয়ে পড়ে।

—চলে এস গার্টি, মিমি ডাকল। বাজারে বাজি পোড়ানো হচ্ছে।

কিন্তু গার্টি অনড়। তার আদৌ ইচ্ছে নেই এদের নির্দেশ পালন করবার। এরা সবাই যদি হুজুগের মাথায় পাগলের মত ছুটতে পারে. সে তবে বসে থাকতে পারে।...তাই সে জানাল, সে এখান থেকেই যা দেখবার দেখতে পারবে। যে চোখজোড়া এসে স্থির হল ওর ওপর তাতে তার নাড়ির গতি দ্রুততর হল। সে তার সামনের পুরুষটির পানে তাকাল, ফলে তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার, আর একটা আলোক রশ্মি যেন এসে পড়ল ওর ওপর পুরুষটির মুখে ছিল তপ্ত তীব্র বাসনা বহ্নি...যা কবরের মত নিশ্চুপ। সেই কামনার প্রকাশ এই নারীকে পুরুষটির একান্ত আপনার করে নিল। অবশেষে এই নারী ও পুরুষ পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে এল...অন্যদের উঁকি ঝুঁকি,

মন্তব্যের গণ্ডির বাইরে—আর এই নারীও জানত যে এ পুরুষটিকে আমরণ বিশ্বাস করা চলে। পুরুষটি এক অবিচল সাচ্চা মরদ যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি আগাগোড়াই আত্মসম্মান বোধে ভরপুর। পুরুষটির হাত ও মুখ সক্রিয় হল, আর মেয়েটির সারা শরীরে বয়ে গেল এক ধরণের শিহরণ। মেয়েটি অনেকটা পেছনে হেলে পড়ে উঁচুতে তাকাল ঊর্ধ্ব আকাশে বাজি পোড়ানো দেখতে। সে তার নিজের জানু দুটোকে দুহাতে ধরে রেখেছিল, যাতে সে পেছনে হেলতে গিয়ে না পড়ে যায়...সেখানে তখন দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না যে এই দুই নারী পুরুষের একত্রে অবস্থান লক্ষ্য করে। বিশেষত, নারীটি যখন অমনি করে তার লালিত্যময় সুন্দর সুগঠিত পা দুখানা...নমনীয় নরম নরম মসৃণ গোলাকার দুটো পা প্রকটিত করল আর নারী যেন স্পষ্ট শুনতে পেল পুরুষের বুকের মাঝের দুরু দুরু কাঁপুনি, তার উত্তেজিত ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ। কারণ উষ্ণরক্ত পুরুষের এরূপ উদগ্র কামনার বিষয়ে তার কিছুটা জানা ছিল ..কেননা বার্থা সাপন তাকে একদা চুপে চুপে বলেছিল একটা কথা...তাকে দিয়ে সে শপথ করিয়েও নিয়েছিল যে সে কস্মিন কালে ঘুণাক্ষরেও কারুর কাছে একথা প্রকাশ করবে না যে ঘিঞ্জি অঞ্চলের বাইরে তাদের সঙ্গে এসে একত্র বসবাস করতে এমন এক ভদ্রলোকের অভ্যেস হচ্ছে। তিনি কাগজ থেকে কেটে কেটে রাখেন নানা নাচিয়ে মেয়েদের ছবি যারা স্কার্ট ড্যান্সার অর্থাৎ ঘাঘরা তুলে পা উঁচুতে তুলে তুলে নাচ দেখায়—বার্থা তাকে আরও জানিয়েছিল যে সেই ব্যক্তি এমন কিছু আচরণে অভ্যস্ত যা আমরা বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝে কল্পনা করতে পারি এবং যা খুব একটা শালীন আচরণও নয়।

কিন্তু এ ব্যাপারটা ওটা থেকে একেবারেই আলাদা। তার কারণ, তফাৎটা সবদিক থেকেই...তার কারণ নারী প্রায় অনুভব করতে পারছিল তার মুখটা পুরুষের নিজের মুখের কাছে টেনে নেওয়া...আর পুরুষটির সুন্দর দুই ঠোঁটের প্রথম দ্রুত উষ্ণ স্পর্শ নিজের দু ঠোঁটে।

জ্যাকি কাফে চিৎকার করে উঠল...আর একটা...ফলে গার্টি নামে সেই নারী আরো পেছনে চিৎ হয়ে হেলে পড়ল—তার পায়ের মোজার বন্ধনীর রঙ সবুজ নীল—ওপরের নীলাকাশের রঙের সঙ্গে যার মিল আছে...সবাই চিৎকার করে তাকাল...ঐ তো...গার্টি আরও পেছনে হেলে পড়ে উঁচুতে তাকাতে চেষ্টা করল বাজি দেখতে...আকাশে অদ্ভুত কোন কিছু একটা ইতস্তত উড়ে যাচ্ছিল—

একটা কালো নরম কোন বস্তু—এদিক থেকে ওদিক। গার্টি দেখতে পেল একটা লম্বা 'রোমান মোমবাতি' উঁচু গাছের মাথার ওপর দিয়ে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে... ক্রমে আরো উঁচুতে...আর সেই উত্তেজনাময় নিস্তব্ধতায় সবাই রুদ্ধশ্বাস...বাজিটা যতই উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠছিল গার্টিকে ততই দুহাতে ভর দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে পেছনে হেলে পড়তে হচ্ছিল সেটা দেখবার জন্য।—উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে, ক্রমে নজরের বাইরে চলে গেল ওটা—আর এদিকে গার্টির মুখে এক স্বর্গীয় মোহময় লালিমা ফুটে উঠেছিল...ক্রমাগত ঘাড়ে পিঠে টান পড়ে সারা মুখে রক্ত আভা ছড়িয়ে যাওয়া—পুরুষটি গার্টির শরীরের অন্য সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল—ঠাস বুনোট মসলিনে তৈরী নিম্ন অন্তর্বাস। আর সেই মোলায়েম বস্ত্র যা গাত্রচর্মে সুখানুভূতি আনে। যা অন্যসব অন্তর্বাসের চাইতে আরও ভাল যেহেতু সেটার রঙ সাদা—গার্টি পুরুষটিকে যেন ইচ্ছে করেই দেখতে দিল নিজেকে এই অবস্থায়। নারী দেখল, পুরুষ দেখছে... সেই রোমান মোমবাতি বাজিটা এরপর এত উঁচুতে উঠে গেল যে মুহূর্তের মধ্যে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল—নারীর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখন কাঁপছিল এতক্ষণ ধরে কষ্ট করে পিঠ বাঁকিয়ে চিৎ হয়ে দাঁড়ানোর দরুণ এই সময় পুরুষটি হঠাৎ তার সামনে দাঁড়ানো নারীর শরীরের জানু থেকে দেহের অনেকটা ঊর্ধাংশের পূর্ণ দৃশ্য দেখে ফেলল যা কদাচিৎ সহজে দেখতে পাওয়া যায়। কোন নারীর দোলনায় চড়ে দোল খাবার বা স্কার্ট তুলে হাঁটু জল ভেঙ্গে এগিয়ে যাবার সময়ও নয়...অথচ গার্টি যেন লজ্জা বোধ করল না এতে—পুরুষও লজ্জা পেল এমন অশালীনভাবে কোন মেয়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখতে। তার কারণ, পুরুষটিও হয়তো লোভ সম্বরণ করতে পারেনি যুবতী নারী দেহের আশ্চর্য আকর্ষণীয় অস্পষ্ট একান্ত অঙ্গের দৃশ্য দেখবার। ঘাঘরা তোলা নাচের নর্তকীরা যখন অশালীনভাবে দর্শক ভদ্রলোকদের সামনে নিজেদেরকে প্রকট করে, তখন যেমন দেখা যায়—এ দৃশ্য যেন কতকটা সেই রকম। অথচ পুরুষটি তা দেখেই চলল। গার্টি হয়তো নিজের অজানতে স্বেচ্ছায়ই পুরুষটির উদ্দেশ্যে রুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুট আওয়াজ করে থাকবে...তার, তুষারশুভ্র দুই মৃণালবাহু পুরুষটির দিকে প্রসারিত করে তাকে কাছে ডাকল। যার পরিণতিতে, পুরুষটির দুঠোঁটের স্পর্শ সে পেল তার শুভ্র ললাটে। যে আর্তনাদ এরপর নির্গত হল নারীর কণ্ঠ থেকে তা যে কোন কিশোরী কন্যার প্রেমের স্বতস্ফূর্ত শ্বাশত আর্তি—একটি ছোট্ট রুদ্ধকণ্ঠ চিৎকার যেন তার বুক চিরে

বেরিয়ে এল। যে আর্তি যুগ যুগ ধরে নারীর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে এসেছে, পরক্ষণেই একটি হাউইবাজি হুশ করে ওপরে উঠে সশব্দে একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।...আর ও...এরপর সেই রোমান মোমবাতি বাজিটা ফুটে গেল। যার আওয়াজ কতকটা...ও...ও...ওই এই দীর্ঘ নিশ্বাসের মত...সব্বাই হর্ষধ্বনি করে উঠল ও...ও...ও আর সেই রোমান মোমবাতিটা থেকে একঢাল চুলের মত সোনালী ধারা বর্ষণের স্রোত উৎক্ষিত হয়ে বেগে নিচে নামতে লাগল আর তা মাটিতে পরার আগেই...আহ্...মুহূর্তের মধ্যে সে সব পরিণত হল সবুজ শিশিরের তারকা বিন্দুতে। সোনালী রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তা মাটিতে পড়তে লাগল...ওহো কি জ্যান্ত সে সমস্ত, ও এত মোলায়েম মিষ্টি মধুর।

এরপর সব কিছু শিশিরবিন্দুর মতই গলে গিয়ে মিশে গেল ধূসর বাতাসে। এরপর সব চুপ। গার্টি নামে মেয়েটি পুরুষটির দিকে এক ঝলক তাকাল।—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার সময়। যেন এক করুণ ছোট্ট চাউনি...মিনতিভরা ক্ষীণ প্রতিবাদ এক সলাজ মৃদু ভর্ৎসনা নারীর সে চাউনিতে...যার সামনে পুরুষটি সংকুচিত বিব্রত বোধ করল। পুরুষ একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিওপোল্ড ব্লুম(পুরুষটির ঐ নাম)এখন নীরবে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে এক কিশোরীর দুটি নিষ্পাপ চোখের চাউনির সামনে। ভাবছিল সে মনে মনে...কি পশুর মত আচরণই না সে করেছে এইমাত্র। আবার কি তার পুনরাবৃত্তি হবে। একটি সুন্দরীর নিষ্পাপ চিত্ত তার উদ্দেশ্যে সম্ভাষণ জানিয়েছে অথচ এমন হতভাগ্য সে, কি ভাবে সে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে? একটা আস্ত লম্পটের মত। এত লোকের মাঝে তারই কিনা এমন নীচ ব্যবহার?

কিন্তু...এখন সেই দুচোখে যেন এক আশ্চর্য অপার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, তার মত লোকের জন্য সেখানে রয়েছে মার্জনার বাণী। তার অমনধারা পাপ প্রমাদ ও ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও।

কোন মেয়ে কি মুখ ফুটে বলে কখনও? না হাজারবার না। এটা তাদের গোপন ব্যাপার—একান্তভাবে তাদেরই। ঘনায়মান গোধূলি লগ্নের একাকীত্বে একথা জানবার বা বলবার। কেউ নেই, কেবল সেই ছোট নিশাচর বাদুড়টি ছাড়া, যে সন্ধ্যার অন্ধকারে অতি মৃদুগতিতে ইতস্তত উড়ে বেড়ায়. কিন্তু ছোট্ট বাদুড়েরা তো আর কথা বলে না!

মিমি কাফে নামে নারীটি শিস দিয়ে উঠল ঠিক ফুটবল মাঠের ছেলেদের

অনুকরণে—যেন দেখাতে চায় কত বড় এক তালের ব্যাক্তি সে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'গার্টি', গার্টি' আমরা চললুম। তুমি এস। আমরা এগোচ্ছি।

গার্টি'র মাথায় একটা ফন্দি এল, প্রেমের দুনিয়ার অজস্র ছোট খাট ছলাকলার যেটা অন্যতম। গার্টি তার রুমাল রাখবার পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে রুমালটা টেনে বার করে নিয়ে সেটা নাড়ল। পুরুষটিকে দৃষ্টির আড়াল না করে তারপর সেটাকে ফের পকেটে রেখে দিল। পুরুষটি তাহলে অনেক দূরের যাত্রী? মেয়েটি উঠল। এটা কি বিদায় জানানো? না। মেয়েটিকে এখন চলে যেতে হচ্ছে...কিন্তু তারা দুজনে আবার মিলিত হবে সেখানেই আর তা না হওয়া অবধি অর্থাৎ আগামী কাল পর্যন্ত মেয়েটি এই ব্যাপারটার স্বপ্ন দেখতে থাকবে ভবিষ্যতেও সে স্বপ্ন দেখবে আজকের এই স্মরণীয় ফেলে আশা দিনটির এই মধুসন্ধ্যার।

গার্টি সোজা হয়ে দাঁড়াল শরীর টান করে। এবার এই নারী ও পুরুষ উভয়ের চিত্ত মিলিত হ'ল বিদায় বেলার সর্বশেষ দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ে...আর যে অদ্ভূত দীপ্তিময় দুচোখের দৃষ্টি মেয়েটির অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে পেঁছিল, তা ওর ফুলের মত সুন্দর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল বহুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত।

...মেয়েটি এরপর পুরুষটির দিকে তাকিয়ে এক ধরণের অর্ধস্ফুট বিবর্ণ হাসি হাসল...যে হাসিতে আছে এক মধুর ক্ষমাশীলতা, যে হাসি শেষটা গিয়ে পেঁছিল প্রায় কান্নার সীমানায়...এরপর তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

পরিচিতি

From : ULYSSES : James Jayce

জেমস্ জয়েস—জন্ম : ইংলন্ড : ১৮৮২। মৃত্যু : ১৯৪৪।

বিশ্ব সাহিত্যের বিরাট অঙ্গনে যে কয়জন সাহিত্য সাধক অক্ষয় কীর্ত্তি ও অবিনশ্বর যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন "ইউলিসিস" উপন্যাসের স্রষ্টা জেমস জয়েস তাঁদের অন্যতম। উনবিংশ শতকের শেষের দশকের অব্যবহিত পূর্বদশকে জন্মগ্রহণ করে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এক নতুন ধরণের উপন্যাস লিখে সাহিত্য জগতকে চমৎকৃত করেন। Stream of Consciousness নভেলের যে ধারা ভার্জিনিয়া উলফের হাতে (The Light House) প্রতিষ্ঠিত হয় তার উত্তরসূরী হিসাবে জেমস জয়েস নিশ্চয় আমাদের নিকট স্মরণীয় পুরুষ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপুষ্ট মনন ও মনের খেলা দিয়ে গড়া বিংশ শতাব্দীর গল্প ও উপন্যাসের যে ধারা আজও প্রবহমান তাতে জয়েসের ভূমিকা পিতৃপিতামহের।

মার্কিন ও ইউরোপিয় সাহিত্য ছাড়াও এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যেও সমকালে ও পরবর্তী যুগেও জেমস জয়েসের প্রভাব নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য।

আদিম খেলা

আলবার্তো মোরাভিয়া

গরম পড়েছে নিউইয়র্ক শহরে।

বসন্তের গান ফুরিয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু মাঝ রাতে এক আধটা ঢাকে কাঠি পড়ে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি ওঠে, হাওয়ায় ভাসে। জুন মাস চলছে এখানে। গ্রীষ্মকালের আগমন ঘটেছে, বসন্ত নিয়েছে বিদায়। হাওয়ায় জলের ছোঁয়া, মানুষগুলোর মনে ফুর্তির আমেজ।

ঘুম আর জাগরণের মাঝে লড়াই করছে আইরিশ হার্টফোর্ড।

ধূসর নীলচে চাদরখানা নিরাভরণ দেহে জড়িয়ে পাশ ফিরল। ধীরে ধীরে ও জাগছে...আরও একটা সকাল হচ্ছে ওর জীবনে। ঘুম-জড়ানো মস্তিষ্কে জাগরণের ছোঁয়া লাগছে...আর ঘুম নয়। শহরের রোদ ডাক দিয়েছে...এবার উঠতে হবে।

যে রাতে আইরিশ মদ পান বেশি করে সে রাতে পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য তার দেহ অধীর হয়ে ওঠে। চিমেরা ক্লাবে নাচের বাজনা বাজে। সেই বাজনার উত্তাল সুর ধ্বনিত ওর শিরা উপশিরায়, এডি? ফ্রাঙ্ক? ফ্রেডি?...না না চাক? এমনি কত পুরুষ ত রয়েছে জেসাস। কি মদ পান কর খুকু? কেন পারনদ। অভ্যস্ত না হওয়া তক গলা জ্বালা করে। তারপর ভোর রাতে ওদের যখন ঘুম ভাঙে...সে রাত বারোটা হতে পারে, বাজতে পারে একটা কিংবা

দুটো। ওরা জেগে ওঠে...ভালবাসতে চায়।

ভালবাসার খেলার সঙ্গী যখন মেতে ওঠে তখনও আইরিশের দু'চোখে ঘুমের জড়িমা। তারপর ধীরে ধীরে সে জেগে ওঠে, সাড়া দেয় তার দেহ। মাথায় যন্ত্রণা, দেহে ক্লান্তি সম্পূর্ণ একটা বেহুঁশ ভাব। বিছানায় শুয়ে সঙ্গীদের কারুকর্ম দেখে, তার দেহের নড়ন চড়ন অনুভব করে। সুন্দর সঙ্গী। তারপর মাথার যন্ত্রণা তীব্র হয়...যন্ত্রণা বিধুর দৈহিক ক্লান্তি। তার পরেই সঙ্গীটি ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে...এবং আইরিশ নিজেও। একই ভাবে সুরু করে এবং একই ভাবে শেষ হয়। এর আর অন্যথা হয় না।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় জুলে ক্রাঞ্জের কথা।

অনিচ্ছার সঙ্গে চাদরের ভিতর দিয়ে ওর হাত দুখানা বুকের উপর উঠে স্পর্শ করে স্তন বৃন্ত। হাসল আইরিশ। ধীরে ধীরে হাত নামাল উদর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সংকীর্ণ পায়ের মাংস বেশী কঠিন হল...পা দুখানা উঁচু করল। কি কঠিন উরুর মাংসপেশী সমূহ। যেন পাথরের তৈরী। এমনি ভাব থাকবে আরও দশটা বছর। প্রথম ধ্বসে যাবে স্তন যুগল...অবশ্য শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল। কিন্তু এখুনি ওসব ভাববার প্রয়োজন নেই। আর দেহের তেমন অবস্থা হওয়ার আগেই আইরিশ দেহ ব্যবসা ছেড়ে দেবে। হয়ত জুলে ক্রাঞ্জ বা আর কাউকে বিয়ে করে ঘর সংসার করবে।

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল আইরিশ। আয়নায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাতের তালুর চাপ দিল পাঁজরার নীচে আর স্তন-যুগলে মোচড় দিল।

মনে মনে বলে উঠল—আঃ এমন বিশাল স্তন-যুগল ত নজরে পড়ে না।

যেন পোষা কুকুরের ছোট ছোট্ট নাসিকা...চুমকুড়ি দিল স্তন বৃন্তে।

তারপরই সহসা হিম হয়ে গেল ওর দেহ। কি হয়েছে ওর? একটা কিছু বিপত্তি ঘটেছে। সারা দেহ কেন ঘামে ভেজা। কি হল। ঘরে ঢুকে কেউ আড়াল থেকে ওকে দেখছে না কি। ভয় হল মনে। ভয়...

না, তারপরই নজরে পড়ল, শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেছে।

স্নান করার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে আইরিশের।

স্নানের ঘরে ঢুকল। হাতে পিয়ারস্ সোপ। ইংলিশ সোপ। স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজরা জানে ইংরেজ মেয়েদের ত্বকের জন্যে কেমন সাবান দরকার হয়। আইরিশের দেহে ইংরেজ রক্ত রয়েছে। তাই ওর ইংরেজ ত্বক। এর জন্যে সে গর্ব অনুভব করে। অপূর্ব মসৃণ আর মাজা ঝকঝকে ত্বকের জৌলুষ। অন্য যুবতীদের মতন নীল নীল শিরা ওঠা নয়। স্তন যুগল মসৃণ, নীল শিরার আভাষ নেই কোথাও। পা আর হাঁটুর নীচে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আইরিশ... না কোথাও কিছু নেই। মনে প্রাণে দেহে ইংরেজ হতেই সে চায়। না, সস্তার ইংরেজ যুবতীর মতন নয়...রীতিমত খানদানি ইংরেজ যুবতী হতে চায়। কেননা আইরিশ পড়েছে সস্তার ইংরেজ যুবতীর দাঁতগুলো কুৎসিৎ।

মাঝে মাঝে বাবার দাঁত কেমন ছিল মায়ের কাছে জানতে ইচ্ছে হয়। বাবার অনেকগুলো ছবি সে দেখেছে, কিন্তু কোনও ছবিতে তার হাসি মুখ দেখে নি।

আইরিশ যখন বছর দশেকের তখন তার বাবা তার মা-কে ত্যাগ করে চলে গেছে।

তবু সে খুশি, কেননা তার মা-বাবা দুজনেই ইংরেজ। আইরিশ তখন স্কুলের ছাত্রী, বছর দশেক বয়স। সেই প্রথম সে একজন ছোকরার সঙ্গে শুয়েছিল। ছোকরাটা লুথেরাণ কলেজের ছাত্র। তার ঘরের দু'খানা বাড়ী পরে থাকত। সেদিন তার দেহের উপর আক্রমণের কথা আজও ভুলতে পারেনি আইরিশ। বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল সেদিন তার মনে। একটা অপূর্ব অনুপ্রবেশের অভিজ্ঞতা মনে আছে, ছেলেটা কেঁদে ফেলেছিল। হাড্ডিসার, ফরসা মুখখানা চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। যেন যীশুখৃষ্টের মুখ...পুয়েতো রিকান গাইয়ে ছোকরাগুলো ওদের মানি ব্যাগে এমনি ধরণের যীশুর ছবি গুঁজে রাখে।

বছর আঠারো বয়সেই বিয়ে করে ফেলল আইরিশ।

আবার বিয়ে ভেঙ্গেও গেল। ছাড়াছাড়ি হল। তারপর থেকে একে একে কত পুরুষ তার জীবনে এসেছে, কত পুরুষের সে শয্যা সঙ্গিনী হয়েছে...তাদের কারো নাম আজ সে মনে করতে পারে না। একবার ত সে নামের একটা তালিকা বানাবে ভেবেছিল, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। শেষে একদিন বুঝতে পারল, কেন তার জীবনের প্রথম ছোকরা সহবাসের পর অমনভাবে কেঁদে ফেলেছিল।

এক রাতে টেক্সাসের এক সৈনিক ছোকরাকে আইরিশ ঘরে এনেছিল।

ছোকরা দো-আঁসলা...রেড ইণ্ডিয়ানের রক্ত ছিল তার দেহে।

দারুণ উত্তেজনায় অধীর হয়ে ছোকরা চেঁচিয়ে উঠেছিল—কি করতে হবে

আমাকে ? কি করতে হবে, তোমার মাথাটা গ‍ু‍ঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে হবে ? তা'তে তোমার কিছু হবে না, কারো কিছু এসে যাবে না একেবারে ভাবছ ?

—ওহে বীরপুরুষ, আস্তে কথা বলো। চাই না, তোমার জন্যে পাড়াপড়শীরা অনুযোগ করুক। কেবল নিজের কথা ভাবছ কেন। নিজেই সব না কি, আর কেউ নেই ?

—ওটা ঠিক নয়। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে যদি তুমি যেতে দাও...।

—কেন দেব ? যা তুমি চাও তাই ত করছি, করছি না ? যার জন্যে এসেছ তা' পাও নি, বল সত্যি করে পাও নি ? তাহলে আমাকে আর কি করতে বলছ তবে কি তুমি পুরুষ বলে আমি খৃষ্টমাসট্রির মতন জ্বলে উঠব ? নিজেকে এমন আলাদা মানুষ ভাবছ কেন ? তোমরা সবাই এক। একই রকম। আর তখনই তার জীবনের প্রথম ছোকরার কথা মনে পড়েছিল আইরিশের। বুঝতে পেরেছিল। এবং সে রাতে আধা মাতাল আইরিশ সশব্দে হেসে উঠেছিল।

সৈনিক ছোকরা এর জন্যে মুঠোয় চেপে ধরেছিল আইরিশের গলা।

দু'দিন পরে ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে থিয়েটার থেকে সে ঘরে ফিরেছিল।

তারপর থেকে সহবাসের সময় সাবধান হয়েছিল আইরিশ। তবু একবার এক ছোকরা তার গলা টিপে ধরেছিল। কিন্তু শ্বাসরোধ করার সাহস তার ছিল না। এবং সে কথাটা জানত আইরিশ। তাই বলেছিল—টেপো, আরও টিপে ধরো। আমার চেয়ে তুমি বয়সে বড়, দেহে শক্তিও বেশি। আমাকে আঘাত করতে পার করো।

এই এক অস্ত্র লাভ করেছে আইরিশ...ঘৃণা।

জীবনের প্রায় প্রারম্ভকাল থেকেই নিজের পেশায় বিজয়িনী হয়েছে আইরিশ অনেক ঘাটের জল অবশ্য তাকে খেতে হয়েছে...ধাপে ধাপে উঠেছে। এখন পেশায় সে অভিনেত্রী, প্রথমে ছিল দলছুট অভিনেত্রী।...তারপর পেশাদার রঙ্গমঞ্চ...এখন খানদানি নাটক ক্লাবের অভিনেত্রী। কখনও লা ভেগাস কখনও চিকাগো আবার কখনও মিয়ামি। শান্ত একটি নারীর দেহ ঘিরে উদ্দাম লালসার শিখা অবিরাম জ্বলতে থাকে। হাসিতে অভিনয়ে, নাচে সারা ক্লাব ঘরে লালসার আগুন রিংরসার দাবানল সুরু হয়ে যায়।

বছরে এখন আইরিশের রোজগার কম করেও চল্লিশ হাজার ডলার।

আজকাল আর তার এ্যাপার্টমেণ্টে কাউকে আনে না আইরিশ। পুরুষ-বন্ধু

তার এখনও আসে .তবে আইরিশ চায় না তারা এসে তারা বিছানায় ভালবাসার খেলা খেলবে। বেশ ত। খেলতে হয় ত কোন হোটেলে চল আর না হয় পার্ক আছে, আছে কোনও বাড়ীর নিরালা ছায়া। তার দেহ মন্দিরের দ্বার সবায়ের জন্য উন্মুক্ত। এই দরজায় নয়। এ ঘর সে কিছুতেই অপবিত্র করতে দেবে না।

বাথ টবে বসে হাতের রঙ মাখা নখগুলো আইরিশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

সহসা টেলিফোনের কাছে এসে ডায়াল করল।

—মিস্টার ফ্রাঙ্ককে দয়া করে দিন।

—খুকু, আমি এখানে কাজের মধ্যে ডুবে আছি এখন ফোন করলে। মাতাল ছোকরাগুলো আড়ি পেতে রয়েছে। বল কি খবর তোমার, পুতুল।

উচ্ছল মেয়েলি কণ্ঠে বলে উঠল আইরিশ—ক্লাউন তুমি একটা, হাঁদারাম। স্নান করছি।

—কিন্তু কি ব্যাপার? বেলা এগারটায় স্নান করছ।

—এখানে এখুখুনি আসতে ইচ্ছে করছে না?

—দেখ খুকু...।

—আমার সারা দেহ এখন উষ্ণ মসৃণ গন্ধবহ মম্ মম্। জুজু আমার সাথে স্নান করতে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে না?

—শোন, কি বলতে চাইছ বল তো। এটা একটা বাণিজ্যিক সংস্থার অফিস। আমার সেক্রেটারি পাশে বসে আছে। জান ত সবই। বলতে বলতে হেসে উঠল ফ্রাঙ্ক। তারপর জানতে চাইল—আজ বিকেলে কি হবে? আসতে পারবে ত?

—না, জানাবার জন্যেই ত ফোন করছি। আজ আমাকে ছাড়াই খাও, জুজু। আজ বাড়ীতে থাকব।

—কি মজা পাবে তাতে? ঠিক আছে আমিও থাকব তোমার সাথে।

—পাগল। আজ আমার কাছে এসো না। গলফ্ খেলো গে'। কাউকে ডেট্ দিয়েছ নাকি?

—হ্যাঁ। ফিরে আমাকে একটা ফোন করো, জুজু।

ফোনটা ঝুলিয়ে রাখল আইরিশ। জী...ই...ঈ...জাজ। হাসল।

ঘরের একমাত্র জানালাটার ধারে বসেছিল পেলিগ্রিনো।

বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ভিটো...ষোল বছরের কিশোর।

পেলিগ্রিনোর ছেলে ভিটো...তার সম্পদ। তার বংশধারা প্রবাহিত ওর দেহে ওর রক্তে। ছেড়ে আসা জন্মভূমি ফ্লোরেন্সের স্মৃতি মনে পড়ে যায় ভিটোকে দেখলে। সুঠাম সুন্দর কিশোর। যেন শিল্পীর হাতে পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তি।

ভিটো যেন পারসিউস্ আর তার হাতে মেডুসার মাথা নয় যন্ত্রপাতি।

আইরিশের ঘরের এয়ার কণ্ডিশনার সারাতে চলেছে। ও বুঝি আইরিশ নয় ...সুন্দরী ম্যাডোনা। বাপ হলেও এই মুহূর্তে ছেলের উপর হিংসা হয় পেলিগ্রিনোর। ভিটোকেই যেন একমাত্র উপযুক্ত মনে হয়...হ্যাঁ, ও পারস্যুয়াস, ওরই অধিকার আছে ম্যাডোনার ঘরে ঢোকার।

—ভিটো আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

—কি ?

—ভাগ্য সুপ্রসন্ন তোর।

—কি বলছ তুমি ? কিসের জন্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একটা পুরানো এয়ার কণ্ডিশনার সারাতে পাচ্ছি বলে ?

মুখ ভেঙচে বলল পেলিগ্রিনো—আঃ মেসিন...না, ওই মেয়েমানুষটা। কে জানে ? এঃ ?

—থাম। থামবে তুমি ? আমি ওর সাথে কথাও বলিনি কখন।

– জানি তা। কিন্তু ওকে ত তুমি দেখছ। আজ তিন সপ্তাহ ধরে ও এখানে রয়েছে। আর তোমার মতন বয়সের ছেলের ত কেবল দেখাই অভ্যেস। তারপর মন ছোটে চোখের সাথে পাল্লা দিয়ে।

স্ক্রু-ড্রাইভারটা পিছনের পকেটে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল ভিটো—বাজে বকো না, থাম তুমি।

দরজা বন্ধ করে ভিটো চলে গেল।

ওর বাবা শুধু ওকে একবার মুখ ভেঙচাল।

দুই

এলিভেটর নীচে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল ভিটো।

সারা দেহ মনে তার শক্তির স্ফুরণ। দিন দিন তার দেহ সবল হয়ে উঠছে।

নিজের মধ্যে একটা অজানা অস্থির ভাব অনুভব করে ভিটো। বয়ঃ সন্ধিক্ষণের চাঞ্চল্যও। ধীরে ধীরে শ্বাসনিচ্ছে...ছাড়ছে। শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। টি-শার্টে ঢাকা বুকের উপর হাত রাখল। বুকের মধ্যে সরল গতি। যেন বুকের মধ্যে সুসম ঢাকের আওয়াজ। সবল ওর দেহ। প্রতি সকালে ভিটো নিয়মিত ব্যায়াম করে। পঞ্চাশবার ডন বৈঠক দেয়। বারে ওঠে নামে। হাত বুলিয়ে ফোর আর্মস অনুভব করে। আর ছ'মাসের মধ্যে ফোর আর্মস্ আরও শক্ত হয়ে উঠবে। তার যদি একটা টেনিস বল থাকত তাহলে সময় পেলেই সে টেনিস বলটা সজোরে টিপত...বার বার টিপত। আর ফাটাবার চেষ্টা করত বলটাকে। এবং দিনে দিনে তার ফোর আর্মস পাথরের মতন কঠিন হয়ে উঠত।

উপর তলার কাজ সেরে আজ খানিকক্ষণের জন্যে বল খেলতে যাবে। তার সারা দেহ উষ্ণ হয়ে উঠেছে...একটা কিছু করার জন্যে আজ সে প্রস্তুত। হাতে যেন কল্পিত একখানা র‍্যাকেট, সে সবেগে ঘোরাল।

এবং সেই মুহূর্তে এলিভেটর এসে থামল, তার দরজা খুলে গেল।

একটি মহিলা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থামল এবং তার হাবভাব দেখে বিস্মিত হল।

পাঁচতলার বাসিন্দা মিসিজ রসেন সোন।

এইত ক'মাস আগে ভিটো একটা প্যাকেট দিতে মিসিজ রসেন সোনের ঘরে গিয়েছিল। শুধু একটা কোট পরা অবস্থায় মিসিজ দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে মনে হয় কোটের নীচে আর কিছু পরা ছিল না। বোতাম ছেঁড়া কোটের ফাঁক দিয়ে মিসিজের উদরের একটা অংশ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। কিছুতেই ওখান থেকে নজর সরিয়ে নিতে পারছিল না ভিটো। মহিলা হেসে টাকা আনতে গেল তাকে কিছু বখশিস দেওয়ার জন্যে। ফিরে এল শোবার ঘরের দরজা খুলে রেখে। ঘরে রেডিও-তে বাজনা বাজছিল।

একটা ডলার তার হাতে গুঁজে দিয়ে একটু খুনসুটি করতে চাইল তার সঙ্গে।

বলল—কি গো ভিটো, আমার সাথে এক চক্কর নাচবে? নাচবার ইচ্ছে হচ্ছে? মাথাটা একপাশে হেলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়েছিল মহিলা। আর তখন ভিটো ভুলে গিয়েছিল মহিলার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে এবং মাথার চুল কুঁচকেছে দু'চার গোছা ঝুলে পড়তে চাইছে। তার মনে দারুণ ভয় বাসাও বেঁধেছিল এবং পালাবার উদগ্র একটা কামনা দেখা দিয়েছিল।

তারপর সে রাতে বিছানায় শুয়ে ভিটো কেবলই বোঝবার চেষ্টা করেছে কি বলতে চাইছিল তাকে মহিলা। সে কি তার সাথে প্রেম করতে চাইছিল? অসম্ভব তবু যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মহিলা পরণে কোটের নীচে ছিল না কোনও অন্তর্বাস...হয়ত জাঙ্গিয়াও ছিল না।...একবার পড়শীদের জাঙ্গিয়া না পরা একটা মেয়েকে সে দেখার সুযোগ পেয়েছিল...অবশ্য এমন কিছু নজরে পড়েনি। আর কোনও পার্থক্য ছিল না...কিন্তু একজন বয়স্ক মহিলা। তার নিশ্চয় পার্থক্যও থাকবে। তাই সে মনে মনে শপথ করেছিল, এরপর কোনদিন মিসিজ রসেন সোনকে যদি সে একলা পায় অবশ্য তেমন অবস্থায় তাকে পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, তাহলে সে সুযোগ নেবে।

সজোরে এলিভেটরের বোতাম টিপে ধরল ভিটো এবং ধীরে ধীরে সেটা উপরের দিকে ধাওয়া করল।

পাঁচতলা। আইরিশ হার্টফোর্ডের দরজা।

বোতাম টিপল ভিটো। দরজার ওপারে মিষ্টি বাজনার ঝঙ্কার শোনা গেল।

আবার বোতাম টিপতে যাচ্ছে অমনি দরজা খুলে গেল।

—সুপ্রভাত। কে তুমি? সামনে দাঁড়িয়ে আইরিশ জানতে চাইল। অঙ্গে শাদা চিকণ ড্রেসিং গাউন।

—আমি। আমি ভিটো পেলিগ্রিনো, নীচের তলায় থাকি। বাবা বলল, এয়ার কণ্ডিশনারটা বিকল হয়েছে...।

—আঃ তুমি পেলিগ্রিনোর ছেলে। আশ্চর্য্ত।

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা যে তোমাকে পাঠিয়েছে খুব ভাল লাগছে। খুব গরম আজ না হলেও বিশ্রী লাগছে। এস ভিতরে এস।

আইরিশ এক পাশে সরে দাঁড়াল।

ভিতরে ঢুকল ভিটো। ভারি সুমিষ্ট একটা সুবাস। সজোরে শ্বাস নিল। এমন সৌখিন মেয়েমানুষের সান্নিধ্যে সে এর আগে কখনও আসে নি। ঘরখানা মনে হচ্ছে যেন একখানা মস্ত বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আইরিশের পিছনে পিছনে সে শোবার ঘরে এল। এমন ঘরে এই তার জীবনে প্রথম আসা। কথা বলতে ওর ভয় হচ্ছিল। ঘামের ফোঁটা ওর পিঠ বেয়ে ঝরে পড়ছিল।

সুইচটা বারকয়েক টিপে উঠিয়ে আইরিশ বলল—এই দেখ এটা এখন একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার, দেখছ ত? সকালে খেয়ে বেরিয়েছ ত?

ভিটো তাড়াতাড়ি বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসবার আগে নীচ থেকে খেয়ে এসেছি।

ঠিক বলছত? এক কাপ কফি?

—ঠিক বলছি।

মৃদু হাসল আইরিশ। বলল—দেখ, আমি ভিতরে যাচ্ছি পোষাক পরতে। তোমার কিছু দরকার হলে আমাকে ডেক। তোমার কয়েক শীট পুরোন খবরের কাগজ চাই জিনিসগুলো রাখতে, তাই না?

ভিটো হাসল বোকার মতন—হ্যাঁ হলে ভাল হয়। আমার এমন ভুলো মন।

শাদা, চিকণ পোশাক দুলিয়ে আইরিশ ভিতরে রান্নাঘরে গেল এবং কয়েকখানা কাগজ আনল।

এবার দেহ সুবাসের সাথে ওর দেহের উত্তাপও ঘরের মধ্যে ছড়াল। ফিরে গেল আবার।

শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে আইরিশ ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল। আয়নায় চোখ রেখে বসল। অবাক হল। ওর মনে আনন্দ যেন আর বাধ মানছে না। কি সুন্দর ঐশ্বরিক দেহ সুষমা কিশোরটির। ঘুরে হাতের চিরুনি রাখল। উঠে এসে শোয়ার ঘরের দরজা খুলে বলল—কি যেন তোমার নাম বললে?

এয়ার কণ্ডিশনার পরিষ্কার করতে করতে বলল—আমার নাম ভিটো।

তাকিয়ে রইল আইরিশের দিকে।

—ঠিক আছে। কিছু দরকার হলে আমাকে ডেক, ভিটো। আমি আইরিশ।

হেসে ঘাড় নাড়ল ভিটো।

শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ফিরে গেল।

মনে মনে বলল, ভারি চালাক ছোকরা। মনপসন্দ। কি সুষম গঠন। বড় বড় চোখের পাতা। একটা খেটে খাওয়া পরিশ্রমী ছোকরা। ওদের সম্পর্কে সহজে সব কিছু জানা যায় না। তবে একেবারে বাচ্চা। আচ্ছা ভাবত... তুমিও ত একদিন বাচ্চা ছিলে। আর সেই যে ছাত্রটা সেদিন কেঁদে ফেলেছিল সেও ত বাচ্চাই ছিল। বয়সে হয়ত এরই মতন। ওঃ ভিটো যেন একটা তাজা মন্দা ঘোড়ার বাচ্চা...না, বাচ্চা শিকারী কুকুরের চেয়েও তেজীয়ান। ওকে পেলে কি সুন্দরই না লাগবে...

আয়নায় নজর রেখে সজোরে বলে উঠল আইরিশ—ওহো...ওউ। এবার থাম। উচ্ছেন্নে যাক্ ছোকরা। কি হয়েছে তোমার খুকি?

আইরিশ মোজা পরছিল, কিন্তু সহসা মন বদলাল। পোশাকের আলমারি থেকে খসখসে সিল্কের একটা আঁটসাটো ট্রাউজার বার করে পরল। খুলে ফেলল ড্রেসিং গাউনটা। এটা ওর একটা ভঙ্গী বিশেষ। আর এই ভঙ্গী ওর মন পসন্দ। কোমরের উপর থেকে ঊর্ধাঙ্গ উলঙ্গ। ছায়া ঢাকা দেহ থেকে চকখড়ির মতন শাদা স্তন যুগল যেন ঝুলছে। ট্রাউজারে মোড়া নিতম্ব...আর গোটা নিম্নাঙ্গ। যেন আধ নারীশ্বর...উপরটা স্ত্রী দেহ, নীচেরটা পুরুষ দেহ।

আচ্ছা তার কি একটা বক্ষ আবরণী পরা উচিৎ। মনে মনে হেসে ঠিক করল না, পরবে না। একটা সন্তার চমক সৃষ্টি করবে আইরিশ। চিকণ সিল্কের ব্লাউজ পরে বোতাম আঁটার সময় তার মনে পড়ল এখনও মুখের প্রসাধন হয় নি। ভুরু আঁকার পেন্সিলটা দালানে ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে। ভাবল, ছোকরাকে ওটা নিয়ে আসতে বলবে। এবং নিজে সে এ ঘরে দাঁড়িয়ে থাকবে...ব্লাউজ খোলা, উলঙ্গ স্তন যুগল। এমনি অবস্থায় ওটা তার হাত থেকে নেবে। তাহলে ঠিক ওর মনে চমক সৃষ্টি হবে। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

ড্রেসিং গাউনটা আবার গলিয়ে নিল আইরিশ...তবে বোতাম আঁটল না। বুকের কাছে কেবল ওটা মুঠো করে থাকল। ফলে শাদা চিকণ সিল্ক ঢাকা পা-জোড়া এখন চোখের সামনে নগ্ন। শোবার ঘর থেকে এ ঘরে এল আইরিশ।

এয়ার কন্ডিশনারের ঢাকনাটা খুলে ফেলেছে ভিটো। কালি ঝুলি মাখা যন্ত্রপাতি রেখেছে খবরের কাগজের উপর। আইরিশকে সে দেখতে পায়নি তবে তার পায়ের আওয়াজ শুনেছিল, আর গন্ধ পেয়েছিল দামী সেন্টের।

ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আইরিশ—কেমন কাজ হচ্ছে?

—ভালই হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করা দরকার। তবে এখুনি বলতে পারছি না, আর কিছু খারাপ আছে কি-না।

—দাঁড়াও, একটা সিগারেট ধরাই। বুকের কাছে পোশাকটা মুঠো করে ধরা অবস্থায় ব্যাগ থেকে লাইটার বার করার চেষ্টা করছিল আইরিশ। শেষে লাইটার বার করলেও জ্বালাতে পারছিল না।

সোনা, ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—দেবে না কি জ্বালিয়ে...।

—নিশ্চয়। ভিটো লাফিয়ে উঠে পড়ল। কালি মাখা হাত প্যান্টে মুছে লাইটার জ্বাললো।

হাত ধরে আগুন শিখা নিজের কাছে আনল আইরিশ।

—সা...ম...ম। সিগারেট চলবে?

—না। বলে আবার কাজে মন দিল ভিটো।

—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হয়েছে? আমাকে কি এটা কারখানায় পাঠাতে হবে?

—এখনও বুঝতে পারছি না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে...।

—না না, স্যুইটি। তোমার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। শুধু ভাবছি, তুমি কি সারাক্ষণ সময় দিতে পারবে? তুমি হয়ত কাউকে ডেট দিয়ে থাকবে, অথবা কোথাও বেড়াতে যাবে ...।

ওকে 'স্যুইটি' বলতে ভিটো অবাক হয়ে গিয়েছিল। এটা ত আমাদের ডাক। যে মেয়েগুলোর সাথে সে আড্ডা দেয় তারাও কখনও এই নামে তাকে ডাকে নি। লজ্জায় তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল।

অবশেষে জবাব দিল—না, কোথাও যাচ্ছি না। এখানেই কাজ করব।

—আহা, আমার মন পসন্দ। কাজ কর। আমি তোমায় পরে একটা স্যাণ্ড-উইচ বানিয়ে দেব। কিছু দরকার হলে আমায় ডেকো, কেমন! চলি! অঙ্গবাসটা আরও মুঠো করে ধরল। এমনভাবে যেন তার স্তন-যুগলের কাল বৃন্তস্থান ভিটোর নজরে পড়ে। মৃদু-কণ্ঠে গান গাইছিল আইরিশ। ওগো, তোমায় আমি পেয়ার করি, এমন পেয়ার তোমায় আর কেউ করেনি। জীবনে ঝড় আসুক, দুঃখ আসুখ আমি তোমারই থাকব...।

ভিটো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গান শুনছিল।

কাজ করতে করতে তার মাও এমনিভাবে গান গাইত। এখন আর খুব বেশী মনে পড়ে না। তার মায়ের দেহের এক ধরণের সুবাস ছিল। নতুন কাচা পোশাকটা পরলে এমনি সুবাসের আঘ্রাণ আজও পায়। এমনি নরম সুবাস। মনে পড়ে, মায়ের বুকে মুখ রেখে সে এই সুবাসের আঘ্রাণ নিত। সাবান আর সেণ্টের সুবাসে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতো।

পড়শীদের মেয়ে এ্যালিস মারতুলোকে তার পছন্দ। বুক জোড়া তার স্তন-যুগল। ছাদের ওপর ওকে জড়িয়ে ধরলে কিছু বলে না। বরং ওরা স্তন-যুগলের স্পর্শে ওকে উজ্জীবিত করে। মাঝে মাঝে মেয়েটার স্তন-যুগলের উপত্যকায় মুখ রেখে চোখ বুজতে ওর ভাল লাগে, ইচ্ছা হয়। ওর পোশাক

অশোকের অত আড়ম্বর নেই। একটা সুতীর শার্ট আর স্কার্ট। এই ত সেদিন রাতে ফ্যালিসকে সে আদর করছিল। হয়ত ওর জামাটা ভিটো খুলেও ফেলত কিন্তু হাতখানায় সহসা যেন খিল ধরে গেল। আর ঠিক তখনই পাশের বাড়িতে একটা আলো জ্বলে উঠল। উঠা পড়া ছাড়া ওদের আর উপায় রইলো না।

আইরিশ এসে আবার ওর পিছনে দাঁড়াল। তার অঙ্গের মিষ্টি সুবাস ওর নাকে লাগল। একটা যন্ত্র খুলেছিল মন দিয়ে। যখন তাকালো যেন খুব অনিচ্ছার সঙ্গে তাকাচ্ছে।

সেই সিল্কের ট্রাউজার তার পরণে, আর একটা নরম চিকণ ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে। বোতাম খোলা। শুধু পেটের কাছে গিঁট দিয়ে রেখেছে।

বলল আইরিশ—তোমার কাজ শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার এই শিশিটা খুলে দাওত। নেল পালিশের একটা শিশি সে বাড়িয়ে ধরলো।

—নিশ্চয়। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালো ভিটো।

খাড়া ঋজু দেহ। তার দৃষ্টি সোজাসুজি মিলছে আইরিশের সাথে। আর এজন্যেই তার দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল না। ট্রাউজার হাত মুখে শিপটা নিল। সজোরে ছিপি ঘোরাল। আরও চাপ দিল। ছিপিটা খুলে গেল।

শিশিটা হাত বাড়িয়ে নিল আইরিশ।

—ধন্যবাদ! বয়সের তুলনায় তুমি বেশ বলবান? কত বয়স তোমার?

—ষোল বছর। ফেব্রুয়ারী মাসে সতেরোয় পা দেব!

—আমার কথা শোন। তাড়াতাড়ি করো না।

—তাড়াতাড়ি মানে?

—এই ফেব্রুয়ারী মাসটা! হাসতে হাসতে শোবার ঘরে ঢুকল আইরিশ।

এবার ঘরের দরজাটা খুলে রাখল, যাতে ছেলেটা তাকে দেখতে পায়। তার দিকে মুখ করে বসে নখে রঙ মাখাতে বসল। কিন্তু ওর দিকে তাকালো না।

ওর পিছনে পর্দা ঢাকা একটা বড় জানালা।

এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে তার সোনালি চুলে আর চিকণ সিল্কের পোশাকে।

ভিটোর নজর আটকে গেল ওদিকে। কোনও নারীকে তার প্রসাধনের রহস্য ঝাঁপি খুলে বসতে এর আগে সে কখনও দেখে নি। কিন্তু মেয়েটি

একবারও তার দিকে তাকাচ্ছে না। ভিটোর ইচ্ছে হচ্ছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে খুব কাছ থেকে দেখে।

আইরিশ জানে, ভিটো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তবু সে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

নিজের বোকামি বুঝতে পারল ভিটো, কাজে মন দিল। একটা ব্যাপারে তো স্থির নিশ্চিত—ওই নারী বিবাহিতার মতন ব্যবহার করছে না। এ ঘরের মালিক সে, আসবাবপত্র সব কিছু তার। কিন্তু তার উপর কারো দাবি নেই। এটা সে অনুভব করছে যে কাউকে ও কৈফিয়ৎ দেয় না। যেখানে খুশি, যখন খুশি যাতায়াত করতে পারে। হয়ত ওর স্বামী নেই, বোধ হয় কলগার্ল। এ পাড়ায় বেশ কয়েকজন কলগার্ল আছে। আজকাল যে-সব মেয়ে নিজের রোজগারে বাঁচতে চায় তারাই কলগার্ল হয়। জেসাস্! এ-ও যদি তাই হয়। নিজের তলপেটে উত্তেজনায় মোচড় অনুভব করল এবং আর একবার তার দিকে চুরি করে তাকাল ভিটো।

এ সব চিন্তা যে তার মনে জাগছে তা' কি মেয়েটি বুঝতে পারছে? যদি সে সত্যি সত্যি কলগার্ল হয় তাহলে ভিটো কি এগিয়ে তাকে চুম্বন করবে? একটা নিখুঁত চুম্বন? আর তখনি কি ও তার শার্ট খুলে ফেলে তার স্তন যুগল দেখাবে? লজ্জায় লাল হল ভিটো। ঘামে ভেজা হাত থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা পড়ে গেল। আচ্ছা, মেয়েটি কি তাকে তার প্যান্ট খুলতে বলবে? হয়ত মেয়েটির তাকে মনে ধরেছে। এমন ত হয়, কোন কোন মহিলার কিশোরদের মনে ধরে। মিসিজ রসেনসোনের কি হয়েছে? সে কেন তাকে ওভাবে অবহেলা করে চলেছে? সে কি তার জন্যে পাগল হয়েছে? সে শিস্ দিতে লাগল। সহসা সে থামল, কেননা মেয়েটি শোবার ঘর থেকে এদিকেই আসছে।

—দেখত, এই শার্ট কি তোমার পছন্দ সই? আইরিশ জানতে চাইল।

—কি?

—যে শার্টটা পরে আছি এটা? এই শার্টের সঙ্গে এই স্ল্যাকসটা কেমন লাগছে?

ভিটো মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু মেয়েটি তাকিয়ে নেই। সে নিজের রঞ্জিত নখগুলো নিরীক্ষণ করছে।

ভিটো বলে উঠল—নিশ্চয়। সুন্দর মানিয়েছে।

তারপর আবার বলল—আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন...আপনি কি মডেল ?

এবার তার মুখের দিকে তাকালে আইরিশ। অনড়, নিরানন্দ দৃষ্টি। বলল—না। মডেল আমি একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

অস্বোয়াস্তিতে ভরে গেল ভিটোর মন। বিপদের আঁচ পেল। বলল—না, আমি তা মনে করি নি। বলতে চাইছি, আপনার দৃষ্টি, হাবভাব...মানে গত বছর এ বাড়ীতে একজন মডেল ছিলেন কি না আপনাকে দেখে তাঁর কথা মনে পড়ল।

—ও।

—মানে আপনাকে ত এ পাড়ার মেয়েদের মতন দেখতে নয়।

—বলে যাও।

হাসল ভিটো। কাঁধ নাচাল। বুঝতে পারল না, সে কি তার মনে আঘাত করেছে এবং করে থাকলেও কারণ কি। বলল—এটাই বলছি। আমি কেবল এটা ভাবলাম।

—তোমার কতক্ষণ লাগবে বল ত ?

লজ্জায় লাল হল ভিটো। তিরস্কার করছে বুঝল।

—কুড়ি মিনিট কি আধঘন্টা লাগবে। আপনি যদি বলেন ত কয়েকটা যন্ত্রাংশ নীচে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আনতে পারি। আমি কি যাব ?

জবাব দিল না আইরিশ। আঙুলের রঞ্জিত নখগুলো সে ছড়িয়ে রেখেছে। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে দৃষ্টি ছড়াল। এ বাড়ীর একটি পরিবার বাইরে চলে যাচ্ছে। হয়ত ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। সহসা একজন সঙ্গী পাওয়ার জন্যে তার মনে উদগ্র কামনা জাগল। আচ্ছা, জুলে ফ্রাঞ্জ কে ডাকলে হয় না ? কিন্তু এখন সবে ত বেলা বারটা। সে অফিসে। না, কিছুতেই সে এখন একা থাকতে পারবে না। মন ভরে গেল বিরক্তিতে।

—ভিটো, আইসক্রিম পেলে কেমন লাগবে তোমার ?

এয়ার কন্ডিশনারের ভিতর থেকে ময়লা টেনে বার করছিল ভিটো। বলল—কি ?

—একটু আইসক্রিম খাবে ?

হাসল ভিটো। বলল—নিশ্চয়।

আবার সে খুশি, আনন্দময়ী। বলল—ভাল। আমার রেফ্রিজারেটরে অনেকটা রয়েছে। এস খাই আমরা।

—নিশ্চয়। যদি না আপনি চান...।

—চলে এস। ওর দিকে হাতবাড়িয়ে দিল আইরিশ, ধরবার জন্যে। কিন্তু সে ত তখন ঘরের ওধারে। ভিটো ওর সাথে রান্নাঘরে ঢুকল।

জলাধরের কাছে একটা উঁচু টুলে বসে ভিটোর আইসক্রীম খাওয়া দেখছিল আইরিশ।

ভিটোর ঘাড়ের দিকে কালো কোঁকড়া চুলগুলো বেশ বড় হয়েছে। এবার ছাঁটা দরকার। টুলের গায়ে সে পা ঠুকছিল মৃদু মৃদু। উত্তেজিত হয়ে উঠছে আইরিশ। আঁটোসাটো ট্রাউজারের ধারগুলো দেহের কোমল অংশে ঘসছিল আর সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। ভিটো কি তার উত্তেজনা বুঝতে পারছে। অবাক হল আইরিশ। বুঝতে পারছে, তার সারা দেহে উত্তেজনা ছড়িয়ে, কামনা জাগছে।

—কেমন লাগল আইসক্রীম? আর একটু নাও।

—না, না। অনেক খেয়েছি।

—আর একটু নাও। বলেই উঠে পড়ল। দেহের মাংসের ভাঁজে ভাঁজে ট্রাউজারের কাপড় আটকে গেছে। পা ছুঁড়ে পোশাক ঠিক করে নিল আইরিশ।

ভিটো চোখ বড় বড় করে ওকে দেখছিল। নিতম্বের পুরুষ্টু অংশ যেন ওর চোখের সামনে আসছে। গলার কাছে কি যেন আটকে গেছে। মেয়েটা নিশ্চয় ট্রাউজারের নীচে আর কিছু পরে নি।

আর এক প্লেট আইসক্রীম তাকে দিল আইরিশ। এবার আর নিজের টুলে না বসে ভিটোর টুলের পিছনে দাঁড়াল। তর্জনী দিয়ে ভিটোর ঘাড়ের কোঁকড়ানো চুলগুলো স্পর্শ করল। মেয়েটি তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে...এত কাছে যে ভিটো তার দেহের উত্তাপ অনুভব করল।

আইরিশ বলল—তোমার এবার চুল ছাঁটার সময় হয়েছে, খোকা। তোমার মা তোমায় বলে নি?

—আমার মা নেই, অনেক দিন আগে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মা মারা গেছেন।

—হতভাগ্য সন্তান। দুঃখিত। আওড়াল আইরিশ। ভিটোর মাথায়

মৃদু চাপড় মারতে লাগল। তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। ভিটো যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। অস্বোয়াস্তির যন্ত্রণা। তার গালে আগুনের আঁচ, চোখের পাতাগুলো থেকে উত্তাপ ঝলসাচ্ছে। আইরিশকে জড়িয়ে ধরার জন্যে তার মনে উদগ্র কামনা, ওর স্তন-যুগলের উপত্যকার মুখ রাখতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে। ওর অঙ্গের সুবাস তাকে বিহ্বল করে তুলছে, করছে উত্তেজিত। মাথা ঘোরাতে গেল ভিটো আর অমনি ব্লাউজের খোলা অংশ দিয়ে ওর স্তন-যুগলের শাঁখ-শাদা মাংসের স্তূপ তার নজরে আটকে গেল। সুন্দর স্তনের স্ফীতি। তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরিয়ে নিল ভিটো।

—দুঃখিত। ধীরে ধীরে সে আওড়াল।

—দুঃখিত? কিসের জন্য।

—জানি না। তবে আমার হাতের কাজটা এখুনি শেষ করে ফেলা উচিৎ। বড় গরম লাগছে।

মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে আইরিশ তার ঘাড়ে হাত রাখল। ওর দেহের উত্তাপ অনুভব করল, খুব শক্ত হাতে ওর ঘাড় চেপে ধরতে ইচ্ছে হল। ত্বকের নীচে রয়েছে শক্তিমান মাংসপেশী। মসৃন ত্বক। কিন্তু হাত সরিয়ে নিল আইরিশ।

—বেশত, আর যদি আইসক্রীম না খাও তবে কাজটা শেষ করে ফেল। এসব জঞ্জাল আবার পরিষ্কার করতে হবে ত। আইরিশ সরে দাঁড়াল।

ভিটো উঠে পড়ল। বোকার মতন বলল—আইসক্রীমের জন্যে ধন্যবাদ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুর্ভাগা ছেলে, নির্জনতা ওর জীবনের অভিশাপ। ওর জন্যে একটা কিছু করার ইচ্ছে হচ্ছে আইরিশের। ইচ্ছে হচ্ছে ওকে জড়িয়ে ধরতে, ধরে রাখতে, শিশুর মতন কোলে বসিয়ে তাকে দোল খাওয়াতে, আদর করতে। ভাবছে আর হাসছে। কল্পনা করছে, ভিটো তার পাতলা ঘোরালো মুখ রেখেছে তার স্তনে, অনুভব করছে তার গালের উত্তাপ, ভিজে ভিজে ঠোঁটের স্পর্শ লাগছে তার ত্বকে। তার সারা মন এই উদগ্র কামনায় ভরপুর। সে পরিপূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। মনে মনে আওড়াতে লাগল আইরিশ আয়, আয়, বাছা আমার। এখন আর সন্দেহ নেই, আইরিশ তাকে কামনা করছে। এখুনি তাকে কাছে পেতে চাইছে।

একসময় ওর মন থেকে কামনার প্রভাব স্তিমিত হল। দুর্বলতা আর

ক্লান্তি।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল আইরিশ। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। চোখ বোজালেই বিচিত্র যৌন কামনায় মন ছটফট করছে। এখুনি, এই মুহূর্তে আসঙ্গ লিপ্সায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছে।

বিরক্তিতে অধীর হয়ে উঠে পড়ল আইরিশ। বসল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। বার বার নিজের মুখখানা এপাশে ওপাশে ঘোরাতে লাগল...প্রতিবিম্ব দেখল আয়নায়। মাথা থেকে চুলের কাঁটাগুলো খুলল আবার পরাল একটি একটি করে। উর্ধ্বে কুঞ্চিত ভ্রু-যুগল।

ভিটোর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—মিস্...আইরিশ। কাজ শেষ হয়েছে।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল আইরিশ। একহাতে মাথার চুল ঝুঁটি করে ধরেছে আর এক হাতে চুলের কাঁটার বাক্স। ঘরে যন্ত্র-চলার আওয়াজ। যেন তৃতীয় এক ব্যক্তির অস্তিত্ব। তাই শেষ হয়েছে ওদের সঙ্গ-সুখের পালা।

মুখের ভাব উজ্জ্বল হল আইরিশের। বলল—বা, চমৎকার। তুমি সারালে এটা।

মনে মনে গর্বিত হল ভিটো।

—খুব ভাল ছেলে। কত দিতে হবে বলত ?

—আপনি ত আমাকে আইস-ক্রীম খাইয়েছেন। আবার কি !

হাতের পিনের বাক্স রেখে মানি ব্যাগ খুলল আইরিশ। ধমকের সুরে বলল—ছেলেমানুষি করো না। তোমাকে দেবই। এই নাও। একখানা পাঁচ ডলারের নোট বাড়িয়ে ধরল।

দু'হাত পকেটে ভরে দাঁড়িয়েছিল ভিটো। এবার চলতে সুরু করে বলল—এখন রাখুন। অন্য কোনদিন নেব। দরজার দিকে পিছিয়ে গেল কিন্তু নজর আটকে রইল আইরিশের উপর। এঘর ছেড়ে যাওয়ার তার একটুও মন নেই।

ভিটোর চরম অস্বীকৃতি তাকে রাগালো। চুলের কাঁটার বাক্সটা ফেলে দিল মেঝেয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভিটো বাক্সটা নীচু হয়ে তুলতে গেল।

আইরিশ ওকে দেখছিল। সুতীর টি-শার্টের হাতার নীচে লম্বা পেশীবহুল হাত। কাঁধের হাড় শার্টের আবরণ ঠেলে উঠেছে। কি সুন্দর। এগিয়ে এসে পা দিয়ে ওর হাতখানা চেপে ধরল আইরিশ। বলল, কেমন, এবার ত ফাঁদে ফেলেছি। নেবেত টাকা ?

ভিটো মুখ তুলে তাকাল। লজ্জায় লাল হল। হাত ছাড়াতে গেল, পারল না।

—কি এবার নেবে ত?

—নিশ্চয়। হাসল ভিটো।

—এই ত ভাল ছেলের মত কথা। পা সরিয়ে নিল আইরিশ। তার চটি পরা নগ্ন পদ ওর প্রায় গালের কাছে। শাঁখ-সাদা শীতল সুবাসিত পা ওর ভেজা ভেজা ঠোটের একদম কাছে। আরও সরিয়ে নিল পা। উঠে দাঁড়ালো ভিটো।

নোটখানা ভাঁজ করে ওর হাতে গুঁজে দিল আইরিশ। রঞ্জিত নখের খোঁচা লাগল ওর কব্জিতে।

বলল ভিটো—ধন্যবাদ। ওটা যদি আবার গোলমাল করে ত বলবেন।

—তোমায় ডাকব।

—হ্যাঁ। তবে...।

—জানি, তোমায় শুধু ডাকব।

—আচ্ছা...।

—দেখ, মদ খেও না যেন এখন।

—কি?

—সব খরচ করে মদ খেও না।

হাসলো ভিটো—না, মদ আমি খাই না।

দরজা খুলে ধরল আইরিশ। চলে গেল ভিটো।

হাসল আইরিশ...কিন্তু হাসিমুখে রাগের ছোঁয়া। বন্ধ দরজার শীতল পাল্লায় মুখ রাখল। দু'হাতে স্তন-যুগল চেপে ধরল। কেমন এক ধরণের যন্ত্রণা হচ্ছে। সারা ঘরখানা মনে হচ্ছে আলোহীন। অথচ এখন সবেমাত্র দুপুর পেরিয়েছে। স্তন-যুগলে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছিল ...ঈশ্বর। এবার কি কাঁদব। সত্যিই চোখের জল মানল না। ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ঢুকল। চোখের জলে পাছে মুখের রঙ মুছে যায় তাই মাথা খাড়া করে হাঁটছিল।

এবার এয়ার কণ্ডিশনারটা দিল বন্ধ করে।

তিন

একটা টেলিফোন বুথ থেকে বাবাকে ফোন করল ভিটো।

...বাবা। শহরের এ পাড়ায় এসেছি কয়েকটা ছোকরার সাথে...বেড়াতে বল খেলতে...হ্যাঁ খেয়েছি। আজ একটু সিনেমায় যাচ্ছি। পাঁচ তলার মেয়েটি টাকা দিয়েছিল। দশটার মধ্যে ফিরতে বলছ?...আজ ত শনিবারে রাত। ...রাত বারটার মধ্যেই ফিরব।...জানি, তুমি বলবে এর আগেত কখন এত রাত করি নি।...তবে সিনেমা যদি ভাল না লাগে ত আরও আগে ফিরে আসব...।

একটা ঘড়িতে দেখল সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

ভিটো ভাবতে লাগল, এবার সে কি করবে? অন্যারা এ সময় কি করে?

তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে নিজেদের পাড়ায় ফিরে যেতে। পাঁচ তলার ওই ঘরখানায়। সে কল্পনা করতে লাগল, সাবওয়ে পার হয়ে সে হেঁটে চলেছে পাড়ার দিকে। সামনেই এলিভেটর। চাপল, করিডর পার হল। নজর পড়ল, ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। ব্যস। মন থেকে তার সব কল্পনা উবে গেল।

কি করবে ও এখন? কি বলবে সে?

সহসা ভিটোর মনে পড়ল সকালে ওই ঘরে স্ক্রু-ড্রাইভারটা সে ফেলে এসেছে। একটা অছিলা পাওয়া গেছে। পাঁচতলার ও ঘরে সে যেতে পারে। তারপর কি হবে? আমার স্ক্রু-ড্রাইভার ফেলে গেছি...তাতে কি হয়েছে?

তাকে দেখেই যুবতী রেগে গেল। ধমক দিল—যাও ছোকরা, বিরক্ত করো না। যাও, নইলে তোমার বাবাকে ডাকব।

কিংবা ধর, ওর ঘরে আর কেউ রয়েছে। কিংবা ও তখন ফোন করছে, ফোন রেখে ও দরজা খুলতে এসেছে। অথবা সে ঘুমোচ্ছে বা স্নান করছে। ও ত রাগ করবেই।

—এসময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত...মিস...আইরিশ। বিশ্রী লাগছে, কিন্তু আমি আবার স্ক্রু-ড্রাইভারটা ফেলে গেছি, ম্যাডাম। ওটা নিয়ে এখুনি চলে যাব...।

নিজের পরিবেশ ভুলে কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে পথ চলছিল।

ওর কল্পনার রথ দ্রুত ছুটছিল। ধর, ঘণ্টার ধ্বনিতে সাড়া দিয়ে আইরিশ দরজা খুলল, পরণে তার তেমনি সাদা চিকণট্রাউজার। হয়তো বলল—আর একটু আইসক্রীম খাও। দিল তাকে এক প্লেট আইসক্রীম। ওর বসার টুলের

পিছনে এসে দাঁড়াল। এত কাছে যে, ওর নরম স্তন-যুগলের স্পর্শ লাগছে ভিটোর দেহে। ওই স্পর্শ সুখ এত সুন্দর এত তীব্র যে ওর বুকের ধুকপুকুনি যেন থেমে গেছে। আচ্ছা ও যখন তাকে স্পর্শ করেছিল তখন কি ওর মনে কোনও আবেগ দেখা দিয়েছিল? ও যখন তার মাথায় কিংবা ঘাড়ে হাত রেখেছিল তখন কি অনুভবের দরুণ বিচিত্র আবেগের আঁচ সে ধরতে পেরেছিল? কেঁপে উঠল ভিটোর সারা দেহ চিন্তার সাথে সাথে। নিজেই নিজের ঘাড়ে হাত রাখল...কিন্তু কই সে অনুভবের আবেগ।

আচ্ছা, ধর সে সব কিছুতেই সাড়া দিল...তারপর কি হবে?

বেশ ত ছোকরা, তাকে নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়, ব্যস তাহলেই হল। যেন তার কোনও কল্পিত বন্ধুর সে কণ্ঠস্বর শুনছে। হাসছে ভিটো। শহরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ছাদে ওঠা। কিংবা কোনও পার্কে বা সিনেমা হলে যাও। জড়াজড়ি করো। ঠেলা দাও কিংবা ঠেলা খাও...আরও আরও জোরে ঠেলো। অসম্ভব। ওর সঙ্গে সে ঠেলাঠেলি করতে পারবে না।

বেশ, ঠিক আছে, আমি না হয় কচি খোকা...মনে মনে ও আওড়াতে লাগল। এবং হয়ত তুমি কচি খোকা হয়ে থাকবে না? নিজের কল্পিত পুরুষকে সে ধমক দিল—কি? খুব বড় হয়েছে তাই না?

রাত তখন নটা বেজে গেছে।

নিজেদের পাড়ায় ঢুকল ভিটো। একমনে পথ চলছিল।

পিছন থেকে একটা মেয়ে ওর নাম ধরে ডাকল।

থামল ভিটো। মেয়েটাকে চিনতে পারল। এ্যালিস মারটুলো আর একটা মেয়ের সাথে গল্প করছে।

এ্যালিস জিজ্ঞাসা করল—এ কি গো, সিনেমা দেখতে যাও নি?

ছোট-খাট শরীর এ্যালিসের। একমাথা কাল চুল। গোলাপি রঙের ব্লাউজ পরণে। মাথায় নীল একখানা রুমাল জড়িয়েছে—যেন কান ঢাকা মাফলারের মতন রুমালখানা জড়ানো।

ভিটো বলল—মনের কথা কবে থেকে জানতে শিখলে?

ওদের পার হয়ে এক ধাপ উঁচুতে বসল ভিটো এবং একটা সিগারেট ধরাল।

এ্যালিস হিসিয়ে উঠল—দেখ, ভিটো, তুমি যদি ভেবে থাক যে আমি তোমার

জন্যে হেঁদিয়ে মরছি তবে ভুল করেছ। আমার বাবা আজ তোমার বাবাকে মদ খাওয়ার জন্যে ডেকেছিল। তার কাছ থেকে শুনলাম, তুমি সিনেমায় গেছ।

—আচ্ছা ঠাণ্ডা হও। বন্ধুটি কে?

—মেরি কালাহান। আর এই ভিটো পেলিগ্রিনো, এক নম্বর ঠকবাজ।

সে সশব্দে হেসে উঠল।

এ্যালিস জানতে চাইল—সিগারেটে একটা টান দিতে দেবে না-কি?

—কি বলছ? তোমার বুড়ো বাপ তোমার সিগারেট খাওয়া শেখাচ্ছি বলে আমাকে খুন করে ফেলবে, জান তা?

—এ্যাই, বড় কথা বলছ ত! আমি সিগারেট খাই কি-না তা আমার বাবা গ্রাহ্যও করে না। বুড়ো জানে, আমি ধূমপান করি। সে চায় আমি যেন তার সামনে ধূমপান না করি।

—তার সামনে না করার ওটাই একমাত্র কাজ নয় নিশ্চয়।

—দেখ ভিটো, তোমার ওই নোঙরা মুখখানায় আমার ঘুষি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—মার যদি পার। আজ বড় গরম খানিকটা ঝগড়ার বাষ্প অন্ততঃ বেরিয়ে যাবে।

—ঝগড়া! কে সুরু করেছে? যাক্ এখানে আমি আর অপমানিত হওয়ার জন্যে বসে থাকব না। মেরি আয়, আমরা টি-ভি দেখব।

ভিটো বলল—মেরির হয়ত আমার সঙ্গে বাইরে বসে থাকতে ভাল লাগবে।

—সে থাকতে চায় না। সে ..

—মেরিকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?

—শোন ভিটো...মেরি আমি টিভি দেখতে যাচ্ছি। যাবি ত চল। নইলে এই ঠগটার সঙ্গে থাকতে চাস ত থাকতে পারিস, সেটা তোর ব্যাপার।

মেরি আবার হেসে উঠল। সে হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে। তার ওপর ভুরু কামিয়েছে। সারা মুখে অবাক হওয়ার ভাব। অনিচ্ছার সাথে সে উঠতে গেল। ধীরে সুস্থে উঠা-বসা করা তার স্বভাব। ভিটো তার হাত ধরে বলল—থাম মেরি। ও ভিতরে যায় ত যাক। এটা স্বাধীন দেশ, তাই না?

—নিশ্চয়। কিন্তু এ্যালিস আমার বন্ধু।

—তাতে কি? আমি তোমার বন্ধু না? ভিটো হাসল। সে যে ভিটোর

হাতে ধরা দেবে তার চিহ্ন ওর মধ্যে ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। মনে হয় তাই...।

ঠিক আছে। তাহলে এখানে বসে আরাম কর। ও গিয়ে টি-ভি দেখুক।

এ্যালিস সবেগে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

—বড্ড বেশি কফি পান করে। তাই কফির মতন ওর মেজাজ। ভিটো মুখ ভেঙচে বলল।

মেরি হেসে উঠল।

—চল, কিছু খেয়ে আসি।

—খাওয়া উচিত হবে না। তোমার সাথে ঘরে গেলে এ্যালিস কারো মুখে শুনবে। কিন্তু এখানে বসাটা অন্য রকম জান ত?

ভিটো তাড়াতাড়ি বলল—ঠিক আছে। তাহলে চল ছাদে যাই।

লজ্জায় লাল হল মেরি—এখানে বসে থাকলে ক্ষতি কি?

ভিটো বলল—চল যাই। কেউ আমার কাঁধে চড়ে বসুক চাই না। মুখ তুলল ভিটো। অমনি নজরে পড়ল একটা আঁধারে ঢাকা জানালার পর্দা নড়ল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে ত আমি ভালভাবে চিনিও না।

—চিনবার কি আছে? আমি ত তোমাকে আলাস্কা যেতে বলছি না। ছাদে চল।

—বেশ, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

—ও। এস। ভিটো বলল। মনের অধীরতা সে ধরে রাখতে পারছিল না।

ছাদের উপর একটা ছায়া ঢাকা জায়গায় মেরিকে নিয়ে এল ভিটো। একখানা খবরের কাগজ তার আনা উচিৎ ছিল। ভাবল, মেরি হয় ত অনভ্যস্ত। কেন না, ওকে হাত ধরে পাশে টেনে বসাতেই ও দেখল না, বসে পড়ল।

ওরা তখন দু'জনেই ছাদের উপর শুয়ে পড়েছে।

—কত বয়স তোমার?

—পনের।

—কই, স্কুলে তোমায় দেখেছি বলে মনে হয় না?

আমি এখানে পড়তাম না।

ভিটো ওকে জড়িয়ে ধরল।

—একটা সিগারেট ?

—না, আমার সিগারেট খাওয়া নিষেধ।

ভিটো এক সময় জানতে চাইল—তোমার ভাল লাগছে ?

মেরি নীরব।

—কি বললে না ? ভাল লেগেছে ?

—ঠিক আছে।

—এর আগে কখন...

শান্তকণ্ঠে বলল মেরি—থাম, তোমার এসব প্রশ্ন শুনতে চাই না।

ভিটোর কেমন যেন বিশ্রী লাগছে একধরণের অনীহা তার মন জুড়ে বসল।

কিন্তু আশ্চর্য। মেরি নিজেই সক্রিয় হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ ওরা ক্লান্ত দেহে শুয়ে রইল।

এক সময় মেরি বলল—এবার আমার চলে যাওয়া দরকার।

—দাঁড়াও। শোন, তুমি কি আমায় দারুণ ভালবেসেছ ?

—না। কেন তা বাসব ? তবে তুমি খুব ভাল ছেলে।

—তুমি তাই বলছ ?

—হ্যাঁ। তবে এ্যালিসের সাথে তুমি ভাল ব্যবহার করছ না।

—এ্যালিস ?

—হ্যাঁ, এ্যালিস মারটুলো। শোন এবার আমার যাওয়া ভাল। আমি আগে একা নীচে নেমে যাই কেমন ?

—নিশ্চয়। পরে তোমার সাথে দেখা করব।

হাত নেড়ে মেরি অদৃশ্য হল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আলসেতে ভর দিয়ে ঝুঁকল ভিটো।

পাশের বাড়ীগুলো ওর নজরে পড়ছে। পাঁচতলার আইরিশের ঘরের জানালাটাও দেখতে পাচ্ছে।

ঘরে আলো জ্বলছে, ছায়া চলাফেরা করছে। চুপচাপ বসে বসে ভিটো দেখতে লাগল। তার মনের অশান্ত ভাব মিলিয়ে গেল। এক সময় ওঘরের ;আলো নিভল।

ভিটো নীচে নেমে গেল।

বারটা বাজল।

টেলিফোন নামিয়ে রাখল আইরিশ

নিজের কাছেই সে ধরা পড়ে গেছে। বুঝতে পারছে, তার মাথার ঠিক নেই। সে একা, জীবনে একেবারেই একা। তাই বোধ হয় তো নিজের সম্বন্ধে এত সরব হয়ে উঠেছে। একটা ষোল বছরের বাচ্চা ছেলের কাছে কেন সে ধরা দিল...

আইরিশ ভাবল, কেন আমি ওর সাথে কথা বললাম? বললেই হত আমি অসুস্থ কিংবা মায়ের সাথে দেখা করতে যাব কিংবা এমন ধরণের আর কিছু?

এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হ্যারির কথা মনে পড়ল। সুন্দর আর মিষ্টি কথা বলল হ্যারি। কিন্তু ওকে এতটুকু ভাল লাগল না আইরিশের।

ঘরের মধ্যে সহসা সে পদচারণা করতে লাগল। ভাবল, আমি এত বিহ্বল হয়ে পড়ছি কেন? মনে মনে বলল—শান্ত হও খুকু। একদম শান্ত হয়ে কাজ কর। বিকাল বেলায় হাঁটু মুড়ে নীচু হয়ে চুলের কাঁটার বাক্সটা তুলে দিয়েছিল। তাকে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল তখন। পা দিয়ে ওর হাত চেপে ধরার কথা মনে পড়ল। এটাই ওর কাছে একটা ইঙ্গিতের মত ছিল। কিন্তু কত তীব্র ছিল সেই ঈঙ্গিত তা একটুও বুঝতে পারে নি ভিটো।

পদচারণা থামিয়ে আয়নার কাছে দাঁড়াল আইরিশ।

একেবারে তরতাজা তরুণ।

আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না আইরিশ। নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে। বার বার চেষ্টা করছে কিন্তু এই চিন্তাটা মন থেকে দূর করতে পারছে না। হা ঈশ্বর! আমার মনে বল দাও। একদমতরতাজা কিশোর! ভিতরটা আমার জ্বলছে। এখুনি ওকে আমার চাই। এই ঠিক এখানে, এই কম্বলে এই মেঝের উপর। কেন নয়? জবাব যেন তার জিভের ডগায়। কেন চাইবে না? হয়ত সে আজও কুমার। নির্ঘাত। তার মন বলছে, সে কুমার। সে তার মাথাটা তার কোলে তুলে নেবে। মনে মনে সে নিজের দেহে ভিটোর দেহের তাপ অনুভব করতে পারে। তার মাথাটা সে তার স্তনযুগলের উপত্যকায় চেপে ধরেছে। সে তার গালে হাত বুলোচ্ছে।

সে আর ভাবতে পারছে না।

আলো নিভিয়ে আইরিশ বাথ-রুম থেকে ঘরে এল।

এবং একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মি. ভিটো ও মিস্ আইরিশের মিলন।

চার

সকাল দশটা।

টেলিফোনটা বেজে চলেছে। ভিটোর বাবা এলিসান্ডেন্না পেলিগ্রিনোর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—আবার? আবার ওটা ভেঙ্গে গেল?

—না, না। ঠিক ভাঙ্গে নি।

—ও ভাঙ্গে নি, তাহলে?

—যন্ত্রটা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোচ্ছে।

—একটা অদ্ভুত আওয়াজ?

—ঠিক তাই। খুব সাংঘাতিক একটা কিছু বলে মনে হচ্ছে না। তবে খুব সকালেই ভিটোকে খবর দিচ্ছি কারণ ও আবার বেরিয়ে যেতে পারে। একবারটি ও উপরে এসে দেখে যেতে পারে...

আইরিশের বকবকানি শোনার দিকে মন ছিল না এ্যালিসানড্রোর। সে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়েছিল। ও ঘরে ঘুমুচ্ছে ভিটো। যেন একটা ভাঙা ভাস্কর মূর্তির মতন সে বিছানায় পড়ে আছে। অবাক হল সে মহিলার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনে। বাজে ওজর। যেন বলতে চাইছে, বলছি দয়া করে শোন, বেশী খুঁটিয়ে জানতে চেও না, অত তলিয়ে বুঝতে যেও না।

—ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না। তবে আপনি বললে আমি নিজে উপরে গিয়ে দেখে আসতে পারি...।

—না, না। তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়। আপনাদের দু'জনকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। ছোট ব্যাপার, ভিটো এলেই হবে।

—ঠিক আছে। ভিটো যাবে খন।

ভিটোর ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

—কিরে, জেগে আছিস?

এক ঘণ্টা জেগে শুয়ে আছি।

—কি ছবি দেখলি?

—ছবি দেখতে যাই নি। শহরে ঘুরছিলাম।

—তা' বুঝতে পেরেছি। দেখ আমাকে অনুগ্রহ করিস, ভিটো। কোনও বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করবি না কখনো। কি বলছি বুঝতে পারছিস?

—নিশ্চয়, বাবা।

—ইচ্ছে হলে যে কোন মেয়ের সাথে তুই মিসতে পারিস, টাকা দরকার হলে আমার কাছ থেকে নিবি। কোনও কিছু দরকার হলে বলবি। তবে অন্যায় কাজ করবি না।

ভিটো হেসে বলল—থাম। কে ফোন করছিল ?

—ফোনের কথা কি বলছিস ?

—ফোন বাজছিল, শুনলাম।

—তোর ম্যাডোন ফোন করছিল।

—কে ?

—পাঁচতলার স্বর্ণকেশিনী। বলছিল, তার যন্ত্রটা আবার গড়গড় করছে। তোকে তাই উপরে ডাকছে।

—এখন আমি কোথাও যেতে পারব না। পার্কে খেলতে যাব।

—আমিও তাই বলেছি।

—তবে...।

—তবে কফি খেয়ে পোশাক পরে একবার উপরে ঘুরে আয়।

—ঠিক আছে। বলতে বলতে বাবার মুখের দিকে তাকাল ভিটো। মনে হল, বাবার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। তার বাবা ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, সারা মুখে যন্ত্রণা আর বিষন্নতার চাপ।

—বাবা কি হয়েছে ? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি ?

তার বাবা মাথা নাড়ল।

—তোমার পা কেমন আছে ? যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি ? বাবার হাঁটুর উপর হাত রাখল ভিটো।

—না, কিছু হয় নি। উঠে পড়। আমি কফি গরম করছি।

ভিটো বিছানা ছেড়ে উঠল।

ভিটোর পথ চেয়ে ঘরে ছিল আইরিশ।

তার সারা দেহ মনে অজানা অস্থির ভাব। ভিটোকে ডেকেছে। এখুনি আসবে সে। কোন কিছু কাজ সে ঠিক মতন করতে পারছে না। ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে পাল্লাটা নাড়ছে। একটা বিশ্রী

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। এই একটা জামা কিংবা স্কার্ট বার করল…পছন্দ হল না। ফেলে দিল।

সহসা ওর মনে পড়ল স্নানের কথা। এখনও স্নান করে নি।

বাথ-টবে নগ্ন দেহে। টবে চুপচাপ বসে রইল আইরিশ। পরিচ্ছন্ন একরাশ জল। ছাদের দিকে ওর মুখ। স্বচ্ছ জলের ঝিকমিকি প্রতিবিম্ব পড়েছে ছাদের গায়ে। সাবান নিয়ে দেহে বুলোতে লাগল। না, স্নানে বেশি দেরী করবে না আইরিশ। কেননা যে কোন সময়ে ভিটে এসে পড়তে পারে।

তার হাত থেকে সহসা তোয়ালে পড়ে গেল।

কি ব্যাপার…। এখানেই ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে না-কি? এই আমার বিছানায়, সে ভাবল। কিংবা কাউরের উপর অথবা ঘরের অন্য কোথাও। ভাবনার সাথে সাথে ওর দেহ কেঁপে উঠল। তার মনেই তার জবাব ফুটে উঠল, সে সব আমি জানি না বাপু। আর সেটা ভাল নয়।

নগ্ন দেহে আইরিশ শোবার ঘরে ঢুকল। বিছানার একধারে বসল।

জানি না, এটা ভাল লাগবে কি-না! এটা আমার নিজের ঘর, এখানে আমি থাকি। অন্য কোনও পুরুষের ঘর হলে আমি সোজা তাকে ফেলে চলে আসতে পারি। কিন্তু…। কিন্তু এখানটা একদম আলাদা। এ ত একজন বয়স্ক পুরুষ নয়। বুকে যার অজস্র লোমের সমাবেশ, সারা দেহে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। পোষাক খোলবার সময় কড়া ইস্ত্রি করা পোশাক থেকে খসখস করে আওয়াজ হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে জুতো খোলে! কিন্তু এ ত একটা বাচ্চা ছেলে। সুঠাম এবং মনোহর! শান্ত আর সুন্দর একটা বান মাছের মতন সরল তেজালো। ওর ত্বকে এখনও সজীবতার সুবাস। ওকে নিজের বিছানায় তুলে কোলে করে রাখতে পারে আইরিশ। একটা শিশুর মতন সে তাকে নিজের কোলে চেপে ধরতে পারে, তাকে খাওয়াতে পারে, একখানা তোয়ালে দিয়ে তাকে চাপা দিতে পারে, ও নাড়াচাড়া করতে পারবে না, তখন তাকে খাওয়াতে পারবে, মুখে চুমু দিয়ে মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াতে পারবে।

দরজার ঘণ্টা বাজল।

হা ঈশ্বর! ওই এসে গেছে! শোবার ঘরের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে আইরিশ বলে উঠল এক মিনিট দাঁড়াও।

ভিটোর জবাবও শুনল—আচ্ছা।

একটা ঢিলে ঢালা শেমিজে তাড়াতাড়ি দেহ ঢেকে মুখে কয়েক পোঁচ পাউডার

বুলিয়ে নিল। ভুরু জোড়াও টেনে নিল দ্রুত-হাতে। তারপর দরজা খুলে দিয়ে বলল—যাও, বস গিয়ে। আমার দিকে তাকিও না আমার সাজ হয়নি এখনও।

—আচ্ছা! দালানে দাঁড়িয়ে রইল ভিটো।

আইরিশ তার পিঠে ঠ্যালা দিয়ে বলল—যাও ভিতরে গিয়ে বস। এখখুনি আসছি।

একখানা গদি মোড়া চেয়ারে ভিটো বসল। বলল—এখন যাই। পরে না হয় আসব…।

—না। ওখানে বস। তোমার ব্যস্ততা আছে না-কি?

—না। তবে বলছি না হয়…

—ঠিক আছে। তাহলে চুপ করে বসে থাক। আসছি।

ভিটো অস্বোয়াস্তিতে বিহ্বল হল। তাকে বসতে বলছে বটে, তবে ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে ও অনভিপ্রেত। নজরে পড়ল, গতকাল সে স্ক্রু-ড্রাইভারটা রেখে গিয়েছিল সেটা ঠিক সেখানেই রয়েছে। এয়ার কন্ডিশনারটার কাছে ও এগিয়ে গেল।

—ওটায় গিয়ে এখন হাত দিও না। কেমন? কি হয়েছে আমি গিয়ে দেখাচ্ছি।

—কাল আমার স্ক্রু-ড্রাইভারটা এখানে ফেলে গিয়েছিলাম সেটা দেখছি।

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আইরিশ হাঁকল—ভাবনি নিশ্চয় আমি চুরি করেছি।

—চুরি! তাও একটা স্ক্রু-ড্রাইভার? কিসের জন্য?

তা বলতে পারব না।

আইরিশের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গেল ভিটো। কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তা আর গভীর আবেগ। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল আইরিশ। হাসি-হাসি, সজীব আর সুন্দর মুখমণ্ডল।

ভিটো বলল—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।

দ্রুত তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল আইরিশ, বুঝতে পারল তার বিহ্বলতা। তারপর হেসে বলল—ধন্যবাদ তুমি এত সুন্দর।

ভিটো লজ্জিত হল। আর তার দিকে তাকাতে পারছিল না।

কাছে এসে আইরিশ তার হাত ধরে বলল—একি ? লজ্জা পাচ্ছ কেন বোকা ছেলে ?

হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ভিটো, কিন্তু আইরিশ তার হাত ছাড়ল না।

—ভিটো বুঝতে পারছিল যে তার সারা দেহ ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

—কিছু খাবে ভিটো ?

—ধন্যবাদ ! উপরে আসার আগে বাবার সাথে খেয়ে এসেছি।

—মদ ?

—হ্যাঁ, এই ধর হুইস্কি, স্কচ, বুরবঁ, ব্র্যান্ডি, ভদকা। কি তোমার পছন্দ।

—দেখুন, বলতে পারছি না। আমি বেশী মদ পান করিনি…।

—আচ্ছা একটু খাও ! তুমি ত একা আমাকে মদ পান করতে দিতে পার না।

—যা' আপনি পান করবেন তাতেই হবে।

ওর হাতে মদের গ্লাস তুলে দিল।

এক চুমুক মদ গিলল ভিটো। ভিতরে জ্বলতে লাগল।

—বেশী খাও, ভাল লাগবে ? আইরিশ ভিটোর হাত ধরে একখানা কোচের কাছে আনল।

বড় এক ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল ভিটোর। তার মুখ বিকৃত হল।

—দাঁড়াও, বসবার আগে ওখান থেকে সিগারেটটা আনত, সোনা।

ভিটো আইরিশের সিগারেট ধরিয়ে দিল।

—এস, এখানে বস ! লজ্জা কিসের !

—নার্ভাস হয়ে পড়ছি !

—কেন ? হেসে ওর হাত ধরে বলল আইরিশ। কোচের উপর এমনভাবে পা মুড়ে বসেছিল সে যে ওর হাঁটু দু'টো ট্রাউজার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ! তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসছিল।

—মদ আমি খুব একটা পান করি না। এভাবে পান করা… ।

—ভিটো, কোচে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়। মাথা একদম হেলিয়ে দাও।

ওর কথা মতন মাথা হেলিয়ে দিল ভিটো।

কাছে সরে এল আইরিশ। মদের গ্লাসটা তার মুখে ধরল। হাসিমুখে

বলল—এখন খাও, ভাল লাগবে। মুখের ভাব এমন করল যেন, ওর খুব মজা লাগছে। দুঠোঁট এক করে ছুঁচলো করলো যেন ওর মুখে এখুনি চুম্বন এঁকে দেবে।

ভিটো লজ্জায় দু'চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো। দৃষ্টি এক সময় সরিয়ে নিল।

খুব নরম গলায় আইরিশ জানতে চাইল—কখনও চুমু খেয়েছ কোন মেয়েকে।

তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল—জানি, খাও নি। তুমি একদম বাচ্চা।

ভিটোর দেহ মনে নিদারুণ জড়তা দেখা দিল। সে পা রাখল মেঝের কম্বলে, ঝুঁকে পড়ল।

—কি, শরীর ভাল ত?

সজোরে নিজেকে নাড়া দিয়ে ভিটো খাড়া হয়ে বসল। বলল—হ্যাঁ। জানি আমি···।

আইরিশ আরও কাছে সরে এল। ভিটোর মাথার নীচে হাত দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিল। ভিটো তার সুমিষ্ট সুবাসিত শেমিজের নীচে তার শীতল স্তন যুগলের অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করল। তার বুকে মুখ রাখবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো সহসা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে উঠল।

ওর হাত থেকে মদের গ্লাসটা সরিয়ে রাখল আইরিশ। তারপর নিজের গাল রাখল ওর কপালে।

—আঃ! নরম গলা ধ্বনিত হল ভিটোর।

—চোখ বুজো সোনা!

ভিটো দু'চোখ বুজল। আইরিশ ধীরে ধীরে তার গালে চাপড় মারতে লাগল। আঙুল বুলিয়ে আদর করল। মাথা সরিয়ে এনে তার কপালে, দু'চোখে চুমু দিল। ওর নরম গালে নিজের ভিজে ভিজে ঠোঁটের স্পর্শ দিল। আবার দু'চোখে চুমু দিল। অনুভব করল, ভিটো তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে।

—হ্যাঁ, অমনিভাবে আমায় জড়িয়ে ধরো সোনা! তারপর আদর করে তার মুখে চুমু দিল।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ভিটো।

ভিটো কাঁদছিল। উলঙ্গ দেহ। দু'হাঁটু জড়ো করে তার মধ্যে মুখ গুঁজে বসে কাঁদছে।

আইরিশ তাকে অনেকক্ষণ ধরে জড়িয়ে রইল। তারও দেহ নগ্ন…শেমিজটা খুলে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে শান্ত হল ভিটো।

—এখন ভাল লাগছে ?

—হ্যাঁ।

—যাও, বাথরুমে ঢুকে খানিকটা ঠান্ডা জল মাথায় দিয়ে এস, কেমন ?

—আচ্ছা!

—আমার শোবার ঘরের বিছানায় গিয়ে বস।

—আচ্ছা, কিন্তু আমার দিকে তাকিও না।

হাসি চাপল আইরিশ। বলল—বেশ, তাই হবে। তাকাবো না।

ভিটো ছুটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

ট্রেতে এক বোতল কোকা ভিটোর জন্যে আর নিজের জন্যে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে আইরিশ এ ঘরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, বিছানায় শুয়ে পড়েছে ভিটো। বিছানার চাদরে সারা দেহ ঢেকে রেখেছে। কেবল নজরে পড়ছে, ওর শরমে লাল, হাসি-হাসি মুখখানা। ভিটোর বিনয় নম্র আর তরুণ ভদ্র মনের কথা ভেবেই নিজের নিরাভরণ দেহ আবার শেমিজে আবারিত করেছে আইরিশ। অর্থাৎ এটা তার স্বভাব নয়। নিজেকে, নিজের সুঠাম নগ্ন দেহ সে তার প্রেমিককে দেখাতেই অভ্যস্ত। তাই ত মাঝে মাঝে পুরোপুরি বা আধা-আধি নগ্ন দেহে প্রেমিকের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কথা বলে, গল্প ক'রে যৌন বিকৃত মন এক ধরণের আনন্দ উপভোগ করে। শেমিজ পরেই আইরিশ বিছানায় চাদরের নীচে ঢুকে পড়ল।

—বেশ মজা, তাই না ? বলল আইরিশ।

ওর দিকে লাজুক মুখে তাকিয়ে ভিটো বলল—মদ পান করে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম।

—না, না। ওটা উত্তেজনার ফল। স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা খেয়ে নাও। আইরিশ এক গ্লাস কোক ওর মুখে তুলে ধরল।

—ঠিক আছে। আমায় দাও। আমি বাচ্চা নই।

বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল আইরিশ—তা' জানি। তুমি আমার

কাছে বাচ্চা, আমার সোনা। তোমার কথাই আলাদা। আচ্ছা, তোমার এটা প্রথম, তাই না! মানে, এই প্রথম প্রবেশ।

—হ্যাঁ।

—বেশ আনন্দ পেয়েছ ত?

—দেখ, তোমাকে কিছু বলতে চাই। জানি না বলাটা···।

—বেশ ত! বল!

—ভাবছ, আমি একেবারে বোকা। কেননা আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে জানি না, তাছাড়া আমার বয়স কম, একেবারে কিশোর। আর তুমি বয়সে অনেক বড়। বলতে বলতে ভিটো পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল এবং দু'হাতে মুখ ঢাকল।

অস্ফুটে বলল—তোমায় আমি ভালবেসেছি আইরিশ।

আইরিশের দু'চোখ ভরে জল এল। বিছানা ছেড়ে দ্রুত উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল, চোখের কোল থেকে টিপে টিপে জল মুছল।

ভয় পেয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল ভিটো। বলল—আমি কি কিছু বলেছি? তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কিছু বলি নি।

আইরিশ বিছানায় ফিরে এল। আবার সেই হাসি মুখ। একটানে শেমিজটা খুলে ভিটোকে জড়িয়ে ধরল। বলল—ভিটো, তুমি আমার সোনা। এমন ভাবে আর আমাকে বলো না।

ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল ভিটো। বলল—কিন্তু···।

—তুমি এখনও ভালবাসা কি জান না। আমাকে ভালবাসার ধারণাও তোমার নেই। ভালবাসতে তুমি এখনও শেখ নি।

ভিটো এখন আলিঙ্গন মুক্ত। তাকে এখন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। তার কিশোর মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। তারপর সে দৃষ্টি নত করে বলল—যা' মনে প্রাণে অনুভব করছি, তাই বলছি। তোমায় ভালবাসি। ভালবাসা কি ভুল হয়েছে? বেশ! আমাকে তোমার ভালবাসতে হবে না, কিন্তু আমি তোমাকে ঠিক ভালবাসব।

—দেখ, ভালবাসা সম্পর্কে তোমার ধারণা না থাকলেও তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই চোখে জল এসেছিল, ভিটো।

—কিন্তু আমি···।

ভিটোকে বুকে জড়িয়ে ধরল আইরিশ। স্তন যুগলের উপর ভিটোর মাথা।

তাকে আদর করতে করতে বলছিল আইরিশ—কি সুন্দর, তুমি সোনা। আমাকে তোমার ভাল লাগছে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়! ভিটো চুমু দিল।

আইরিশ তাকে জড়িয়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল—তোমায় ভালবাসি। তোমায় আমি চাই, একান্তভাবে চাই। তুমি কত সুন্দর, কত বলবান! তোমাকে আমি—।

ভিটোর দেহ মনে যন্ত্রণা মধুর আনন্দ।

এক সময় আইরিশ তার দুই উরুর মাঝে ভিটোকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

মেরিট পার্ক।

জুলে ফ্রাঞ্জ তার গাড়ী দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছে। যেন এক একটা স্যালমন মাছ…উজান স্রোতে লাফিয়ে পালাবার জন্যে তাল খুঁজছে। সপ্তাহ কাটাতে চলেছে ফ্রাঞ্জ। ব্যাগে সব জিনিসপত্র গোছান জুতো রয়েছে একজোড়া বাড়তি, আর রয়েছে গলফ খেলার সব সরঞ্জাম। গাড়ির মধ্যে এখনও একজনকে নেওয়ার মতন যথেষ্ট জায়গা আছে।

সহসা তার একটা পোষা কুকুরের কথা মনে পড়ল।

যার বাড়ীতে সে সপ্তাহ কাটাতে যাচ্ছে সেই ভদ্রমহিলার একটা পোষা কুকুর আছে। একটা ঝাকড়া লোম টেরিয়ার। নামটাও ভারি মিষ্টি-বোরি। এত লোমে ঢাকা যে ওই কুকুরটার মুখখানা একদম নজরে পড়ে না।

ভারি সুন্দর কুকুরটা। এর মধ্যেই তাকে চিনে ফেলেছে।

এ ধরণের একটা কুকুর আইরিশকে কিনে দেওয়া যায়। সে তার দেখা শোনা করবে, খাবার দেবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে। ওদের দু'জনের মধ্যে থাকবে একটা প্রাণীর সেতু! ওরা 'দু'জনে বসে অবসর সময়ে কুকুরটার খেলা দেখতে পারবে এ যেন অপরের বাচ্চা মানুষ করা।

অমনি নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়তেই ফ্রাঞ্জ দুঃখিত হল। ওর গৃহস্থী ভদ্রমহিলার কোনও ছেলে মেয়ে নেই। তাই ভাল। নইলে অপরের ছেলে মেয়ে দেখলে ওর মন বিষন্ন হয়ে পড়ে। তার ত ছেলে মেয়ে আছে।

কিন্তু সে তাদের জন্যে এখন লজ্জিত। সে তাদের ভালবাসে, তাদের সাথে সে দেখা করতে যায়, এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যায়, তাদের জন্যে খরচ করতে চায়। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে না। ভুলে যেতে চায়। তাদের কথা আর ভাবতে চায় না।

আজ তিন বছর এমনটা হয়েছে। তার স্ত্রী মিনার স্মৃতি এখন তার মনে মনে পীড়া দেয়। এখন একমাত্র সে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ চায়। কেন্ চাইবে না? বছর চৌদ্দ ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর তাদের জীবন এমন ছিল না। সুখেই ছিল। কিন্তু গত তিন বছর ধরে তার স্ত্রী কি যেন হয়েছে। মিনা হচ্ছে ইনজিওরড পার্টি। ক্ষুব্ধ তাই তার মাথা ধরে, অসহনীয় জীবন, স্বামী সাহচর্য অসহ্য—তাই সেই বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছে।

এখন মিনা আলাদা হয়ে ভালই আছে।

সুন্দর এবং সাজানো-গোছানো এ্যাপার্টমেণ্টে থাকে, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়ে আর বয় ফ্রেণ্ড নিয়ে সে আনন্দেই আছে। এখন ও হাসিখুশি, আনন্দে মশগুল হয়ে থাকছে। স্বামীকে তার কোন প্রয়োজন নেই। মনে মনে হাসল জুলে।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা? মাথা নাড়ল জুলে। ওদের কাছে গিয়ে জুলে অনুভব করেছে যে, ওরাও আর তাকে চায় না। আর সেটাই তাকে সবচেয়ে আঘাত করেছে। কি করবে তুমি? কি করবার আছে তোমাদের? ওটাই ছেলেদের স্বভাব। ওর মন যেন কল্পিত বিচারক। আর তার কাছেই জুলে যুক্তি তুলে ধরে। আচ্ছা, অমন বয়সে নিজের বাবার সাথে আমি কি ব্যবহার করেছি। বাবা মানুষ করেছিল। বড় হয়ে দেখলাম রুজি রোজগার করা কি কঠিন ব্যাপার! তারপর? কি কি করেছি?

আর করবার কি আছে? এই যে আমার এই বয়সে কে আবার স্পোর্টস করা ব্যবহার করে? চিন্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছে! একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল নেই। তাই হাসল জুলে। মন বুঝি এলোমেলো হওয়ার সওয়ার হয়েছে। সহসা আইরিশের কথা মনে পড়ল। এখন ও আইরিশের সাথেই যেন কথা বলছে। দেখ না, মেরিট পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজের মনকে প্রশ্ন করে বসেছি···আমার মতন বয়সে কে আবার স্পোর্টস কার চড়ে? কেন এমন ইচ্ছে হয়েছে? হয় ত বুড়ো হাওয়ার দরুণ অক্ষম হয়েছি, তাই···কে জানে? মনের

আইরিশ হেসে জবাব দিল…এবং এমনিভাবে জবাব দেওয়াই তার স্বভাব…তুমি ? তুমি একটি বুড়ো ভাম, ভাই।

ভাবল…ও ত একটা বেশ্যা ! মাঝে মাঝে আইরিশ তাকে এমন রাগিয়ে দেয় যে, ইচ্ছে হয় ওর মুখে একটা সজোরে ঘুষি কষিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না… মেয়েটা সত্যিকারের সুন্দরী। উলঙ্গিনী উর্বশী ! এবং নর্তকীদের মধ্যে আইরিশ সবসেরা। সফল হয়েছে জীবনে। অবশ্য সফলতার জন্যে তাকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। জুলের জানা শোনা মেয়েদের মধ্যে সত্যিই সেই মনোহারিণী।

তাহলে এবার ওকে নিয়ে বিচার করা যাক। ওকে ভালবাসে সে। তাকে তার ভাল লাগে।

বেশ, তবে তাকে বিয়ে কর ? তাহলে কালই ওকে বিয়ে করব। নিশ্চয় এই ভাবনা যখন একবার মাথায় ঢুকেছে তখন আমি পাগল। কে না অল্প বিস্তর পাগল ? এবং পাগলামি করার মতন ক্ষমতা যখন আমার আছে।

জাত ব্যবসায়ী সে। এবং ব্যবসায়ে অবিশ্বাস্য রকম রোজগার হয় তার। তাই পাগল হলেও সে সফল। এই ভাবনা তার মনকে খুশি করে। এবং এটাই হচ্ছে আইরিশের ব্যঙ্গের এক মাত্র জবাব। যদি আইরিশ এইভাবে তাকে খোঁচা না মারত, এবং তার সাথে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা' যদি না জানতে পারত…তবে সে দেহের মনের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেত। আইরিশ তাকে খাড়া করে রেখেছে। এই যেমন ঘণ্টা কয়েক আগে তাকে ফোন করেছিল আইরিশ।

ফোনের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল—জুজু…সোনা !

আর তার কণ্ঠস্বর শুনে, তার ডাক শুনে দারুণ খশি হয়ে উঠেছিল জুলে। এমনভাবে তার কণ্ঠস্বর শুনবে ভাবেও নি, কেননা ও ত আইরিশকে ফোন নম্বর দেয় নি। সে শুধু তা ওয়েস্টপোর্টের ঠিকানা জানে।

জুলে বলেছিল—তোমার সাথে দেখা হবে ? তোমাকে গাড়ীতে তুলে আনব ?

আইরিশ বলেছিল—না গো, খোকা ! বড় দেরী করে ফেলেছে। ক্লান্ত আমি। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে ? এত ক্লান্তই বা হয়েছ কেন ? আমি ত জানতাম, ছুটি কাটানোর জন্যে তুমি চিঁড়িয়াখানা যাবে আর না হয় অন্য কিছু করবে। বিকেলে কি করলে ?

সারাদিন ধরে কেবল ঘুরেছি, জান ! এমন গলায় কথা বলেছিল যেন একটা কিছু লুকোতে চাইছে। বিব্রত হয়ে পড়েছে। কিন্তু না, মুহূর্ত মধ্যে আবার নিজেকে ঠিক করে নিয়েছে। ধাতস্থ হয়েছে। আবার সে একাকিনী। অপরিচিতা। জঙ্গী মনোভাবা।

যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে জুলি। তাই বলেছিল—দেখ, আমি ত ন'টা দশটার মধ্যেই ফিরছি। তখন তোমাকে একটু শহরে ঘুরিয়ে আনব। তারপর তুমি যদি চাওত…।

কণ্ঠে অনীহার স্পর্শ। বলেছিল আইরিশ—না, না। ওসব নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।

—সোনা পুতুল ! আমি না হয় একটু সকাল-সকালই ফিরছি। এসময় পথে গাড়ী বেশী থাকবে না…।

আইরিশ নীরব ছিল।

আর তখন জিজ্ঞাসা করেছিল জুলে—কি শুনছ ত ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—বলছিলাম, যদি তোমার ভাল লাগে ত…।

—না, না। ওসব কথা ছাড়। তুমি কেমন আছ তাই জানতে চাইছিলাম। কাল তোমার সাথে দেখা হবে।

জুলে তখন বলেছিল—সেটা তোমার মিষ্টি মনের পরিচয়। কিন্তু তুমি কি ঠিক…।

—না জুলে। বড় দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে। কাল তোমার সাথে ঠিক দেখা করব।

আচ্ছা, তাহলে যখন আসবেই তখন ও ফোন করল কেন তাকে ? হয়ত শুধু তার সাথে কথা বলার জন্যে যেমন সে কথা বলতে চায়, তেমনি আর কি ? কিংবা এমনও হতে পারে ও শহরে পৌঁছবার পরেও ডাকতে পারে তাকে। তার মন বলছে, সে নিশ্চয় ফোন করবে। আইরিশ হার্ট ফোর্ড একটা বেশ্যা। আমি কেন তার পিছনে ঘুরছি !

ছয়

ফোন বাজাতেই আইরিশের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এ নিশ্চয় জুলে। বাজুক। এত তাড়া কিসের! এক সময় বিছানা থেকে উঠে পড়ল আইরিশ।

—হ্যালো, খোকা। বলল সে।

—পুতুল! তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম না কি? ভারি দুঃখিত…।

—ঠিক আছে। এখুনি উঠব ভাবছিলাম।

—ভাল ঘুম হয়েছে ত?

—দেখ, তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাইব, জবাব দেবে ত?

—নিশ্চয় খুকু। বলে ফেল। কি চাই?

—আমি যদি এতই অসুস্থা হই, তবে তুমি আমার পেছনে ঘুরছ কেন?

—দেখ, আমারও ত তাই জিজ্ঞাসা। আমিও তাই জানতে চাই।

এবং যখন জানতে পারবে তখন ভিরমি খাবে। পালাবে।

—দেখ আইরিশ, পাগলের মত কথা বলো না।

—কিন্তু ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছি। আমি পাগল, আমি নষ্টা। তবে আমাকে তুমি ত্যাগ করছ না কেন? অন্য কোন সুন্দরী, মনোলোভা আর উদার মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছ না কেন? সে তোমায় ভালবাসবে আর তুমি আমাকে ভুলে যাবে।

জুলে বারেক থামল, তারপর বলল—কিন্তু তোমাকেই ত আমি চাই গো। আমার সাথে বেড়াতে যাবে না?

—নিশ্চয় যাব জুজু। কিন্তু তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

—দেখ, ও ব্যাপার আমাকে ভাবতে দাও। আরও বেশি কিছু যদি চাও, আর কোন লোককে যদি ভালবাসতে চাও। ত সে তোমার বিজনেস। তোমার উপর আমার কোনও দাবি নেই। আমি যখন তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব সেটা আমার বিজনেস, তাই না? তুমি অবশ্য না বলে আমাকে আঘাত দিতে পার।

আইরিশ নীরব।

জুলে আবার বলতে লাগল—দেখ, আমি দু'খানা টিকিট কিনেছি। নতুন ছবি এসেছে। ভাবছি তুমি আর আমি কোথাও খেয়ে নিয়ে ছবি দেখতে যাব।

—জুজু, তুমি কি সত্যিই আমায় নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ, চাই।

—কিন্তু তারপর ত আমাকে নিয়ে তোমার ঘরে যাবে, রাত কাটাবে আমার সাথে। আর যদি তোমার সাথে না শুই রাগ করবে। অবশ্য তোমাকে

দোষ দিতে পারি না, সত্যি বলছি। আচ্ছা, আর কোনও মেয়েমানুষকে সঙ্গে নাও না কেন?

—কারণ ত আগেই বললেছি। আর কোনও মেয়েমানুষ আমি চাই না, তোমাকেই চাই।

—জুলে, তুমি পাগল।

—জানি তা'। সাতটার সময় তুমি তৈরী থাকবে ত?

—সব পোশাক পরতে হবে না কি?

—শোন, যদি কেবল কোট পরে আস, তাতেও আমার আপত্তি নেই…।

—ওটাই ত আমার জীবন কাহিনী। শুধু কোট পরে কোথাও বেরোলাম না…।

—জুলে হাসল—তুমি আমায় খুন করবে। তাহলে ঠিক সাতটায় যাব।

—না, সাড়ে সাতটায়।

—বেশ তাই হবে।

—শোন, যদি তোমার সাথে রাতে না শুই রাগ করবে না কি?

—না রাগ করব না।

—ভাল। তবে কে জানে, হয়ত তোমার সাথেই রাতে শোব। তোমার অত সুন্দর ভুঁড়ি। জান জুজু, ভুঁড়িওয়ালা পুরুষকে আমি ভালবাসি।

হেসে বলল জুলে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। আমি ঠিক যাব।

টেলিফোন রাখল আইরিশ।

মনে মনে আওড়াল আইরিশ, জুলে ফ্রাঞ্জের সঙ্গ অসহ্য।

ভিটো দরজার বোতাম টিপল।

আইরিশ বাথটবে বসেছিল। ডাকল—এখানে আছি। চলে এস।

বাথটব ছেড়ে উঠল না আইরিশ। দু'হাতে এক গাদা সাবানের ফেনা নিজের নিরভরণ দেহে ছাড়িয়ে দিল। স্তন-যুগলের উপর ফেনাগুলো জমল। যেন পাতলা একখানা ওড়নার আবরণ।

ভিটো চমকে গেল। বিছানায় ছাড়া আইরিশকে এভাবে কখনও সে দেখে নি। সমগ্র নগ্ন দেহ নজরে পড়তেই তার মনে কামনার ঝড় বইতে সুরু করল। এমন ভাবে দেখতে সে এতটুকু অভ্যস্ত নয়। অধীর কামনায় ভরপুর মন…মুখ ঘুরিয়ে নিল ভিটো। কি দেখল ভিটো। আইরিশে শাঁখ-শাদা গলার কোল পর্যন্ত টলটল করছে, ঝক্ঝক্ করছে জল পাতলা

সাবানের ফেনার নীচে গোলাপী একজোড়া স্তন বৃন্ত অল্প ঠোঁটের ঝিলিক, আর রক্তিম ভ্রূ-যুগল।

দু'হাত বাড়াল আইরিশ। হাঁটু মুড়ে ওর দুহাত ধরল ভিটো। ওই বাথটাবে ওর সঙ্গে স্নান করতে অধীর হয়ে উঠল সে।

—মম্‌স্‌, ভারি আনন্দ হচ্ছে তোমায় দেখে।

—আহা খোকা। তুমি কি আমায় হারিয়েছ?

—মনে হচ্ছে, কেবল কথা বলে সময় নষ্ট করছি।

হাততালি দিয়ে বলে উঠল আইরিশ—বেশত খোকা, পোশাক ছেড়ে চটপট আমার কাছে চলে এস।

ভিটো পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হ'ল।

…ঘুরে দাঁড়াও। হাসতে হাসতে বলল আইরিশ।

—বেশ ত। তোমার কাছে যেতে চাই না।

—আগে ঘুরে দাঁড়াও!

ঘুরে দাঁড়াল ভিটো। ঈষদুষ্ণ জলের স্পর্শ লাগছে তার পায়ে।

সাহসা সে সাহসী হয়ে উঠল। আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

বলল—দেখ, তোমায় দেখে আর আমার লজ্জা করে না।

—তোমার লজ্জা করা উচিৎ নয় ভিটো। আমার দেখা সুন্দর পুরুষদের মধ্যে তুমি সেরা। এস।

বাথটবে বসে পড়ল ভিটো।

—এমনিভাবে আমায় দেখতে তোমার ভাললাগে? আমাকে সুন্দরী মনে হয়?

আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হল ভিটোর।

বাথটবে ঈষৎ উঠে বসল আইরিশ। স্তন-যুগলের উপর থেকে সাবানের ফেনা মুছে ফেলল। শাঁক-শাদা গোলাকার মাংসপিণ্ড। গোলাপী চক্রের মাঝে বৃন্ত-দুটি। আইরিশের মুক্ত যৌবন এখন আরও ভালভাবে নজরে পড়ছে।

—খোকা আমার যৌবন চলে গেছে, তাই না? বয়স ত তিরিশ হল।

—তাতে কি হয়েছে?

—আমি ত আর উনিশ বছরের ছুক্‌রি নই।

—ছুক্‌রিদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। ওরা একদম বোকা, কিছু বোঝে না। হ্যাংলা!

—হ্যাংলা ? হাসল আইরিশ।

—হ্যাঁ, মানে সঙ্গমের কিছু জানে না, বোঝে না…।

—এবং আমি জানি, তাই না ?

—মানে, আমি বলতে চাইছি… ।

—আমি জানি তা' বুঝলে কি করে ?

—কি ?

—সঙ্গম, জানলে কি করে আমি জানি ? যাক গে, এস… । বাথটবে ঈষৎ সরে বসল আইরিশ। ভিটোকে শুয়ে পড়বার জায়গা দিল। বলল—এখন চোখ বুজিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক।

—আমি তোমায় ভালবাসি।

—আহা, খোকা…সোনা… ।

ভিটো দেহ মুচড়ে ওর দিকে সরে যেতে চেষ্টা করছিল, কামনা মাখা দৃষ্টি আর ঘন ঘন শ্বাস টানছিল। বলল—আমি…আমি তোমায় ভালবাসতে চাই, খুকু… ।

হাসির ঝিলিক ছড়াল আইরিশ। চাপা কপট রাগে বলল—আচ্ছা, কি করছ খোকা ?

ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে হাঁফাচ্ছিল ভিটো। বলল—কাছে এস। আমি তোমায় ভালবাসতে চাই… ।

—আহা ! লাগছে যে গো… ।

—দুঃখিত ! এখন ওসব লাগুক। আমি তোমায় ভালবাসতে… !

—আহা-হা ! ভিটো, আমার চুল ভিজিয়ে দিচ্ছ।

—ভিজবেই ! এখন দারুণ সাহসী হয়ে উঠেছে ভিটো। আইরিশের রাগের আর সে তোয়াক্কা করে না। আর সে ভয় করে না। এমনটাই সে চায়। তার মুখের ভাব বদলে গেছে, এখন হাসছে আইরিশ।

বলে উঠল আইরিশ—বড় ভাল লাগছে, ভিটো !

আরও কাছে টেনে নিল আইরিশকে, বলল ভিটো—জানি ভাল লাগবে। এইত, কেমন ?

—বেশ, বেশ ! কিন্তু একটু আস্তে, ঠিক ত ?

দুরন্ত মনের আবেগ আর সংযত দেহ-ভঙ্গিমায় উঠছে, নামছে ভিটোর সুউন্নত দেহ। দৃষ্টি তার আইরিশের মুখের উপর। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ঘোর ছড়াচ্ছে

তার মুখে। ওর মুখের মৃদু হাসিতে তারই আভাষ।

—ভিটো, বড় ভাল লাগছে, বড় সুন্দর।

ধীরে ধীরে দেহ উঠাচ্ছে, নামাচ্ছে ভিটো। সাড়া দিচ্ছে আইরিশের দেহ।

ভিটো তাকিয়ে আছে। আইরিশের বিস্ফারিত ওষ্ঠ যুগল, ছোট ছোট শাদা দাঁতগুলো নজরে পড়ছে। ওকে দেখছে, মুখে হাসি, দৃষ্টিতে আবেদনের স্পর্শ। ওর মুখের ভাব ভিটোর কাছে আজানা। সে শুধু নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, নামছে। তার মুখে এক ধরণের দৃঢ়তা। যেন নিজের মধ্যে লড়াই করতে হচ্ছে বলে তার মুখে এই নিশ্ঠুরতার ভাব। কারণটা তার কাছে একেবারেই অজানা…তবে এটুকু বুঝেছে। এই লড়াই আনবে এক বিবর্ণ জয়ের স্বাদ। জানে না, এই আস্বাদের পরিণাম কি এবং কেন-ই বা এই স্বাদ গ্রহণের জন্যে তার মন এত উম্মুখ। শুধু জানে, তার কর্ম চঞ্চলতা আইরিশের দু'চোখে অমন উদগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। মনে মনে তাই গর্ব অনুভব করল ভিটো। শব্দ করে হাসল।

আর এই এক টুকরো হাসির আওয়াজ আইরিশের মনে গভীর আনন্দবোধ জাগাল। আবেশে আর অকথিত আরামে সে এখন অফুরন্ত খুশি। তার মনের আগল টুটে গেছে। নগ্ন দেহ খুশির হিল্লোলে হিল্লোলিত।

ভিটোর দুর্বার উচ্ছ্বলতায় সাড়া দিল খুশিতে ডগমগ আইরিশ।

ওদের দেহ এখন স্থির।

সারা শরীর ভিজে, চুল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। নোনতা, গন্ধবহ জল মুখের মধ্যে।

ভিটো নরম গলায় ডাকল—আইরিশ!

নীরব ছিল আইরিশ। কি যেন ভাবছিল।

বলল—আমি ডুবে গেছি।

—বুঝতে পারছি। এ রকম কঠোর ব্যবহার তোমার সাথে করা উচিত হয় নি।

আইরিশ পাশ ফিরে তাকে জড়িয়ে ধরল। চুম্বন করল গালে, মুখে, ঘাড়ে। আরও জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে ওর মাথা, জল উঠে এসেছে মুখের কাছে। কিন্তু তবু আঁকড়ে ধরে আছে ভিটোকে। হাসছে, চুম্বন করছে। চাপ দিচ্ছে

দু'জনের দেহের নিম্নাংশে। একটা যন্ত্রটা মধুর মিলন ঘটুক আবার ওদের।

অবশেষে ওকে ছেড়ে দিল আইরিশ।

ভিটোর বাহুতে মাথা রেখে সে বলল—এই মাত্র কি করলে তা' জান?

অবাক হল ভিটো। বলল—না ত।

—জান না? একেবারেই ধারণা করতে পারছো না?

সরল কণ্ঠস্বর ভিটোর—না, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যদি এটা কিছু না হয়। যদি কোনও ক্ষতি না হয়…

—এ সব কথার অর্থ? কি বলছ?

—দেখ হাঁদারাম, আমাদের মিলন ঘটেছে, আমরাই ঘটিয়েছি।

—তাতে কি?

—তাতে এই হল যে, কত বছর পরে ঘটল তা' জানি না। এ সম্বন্ধে তোমার কি কোন ধারণা নেই।

—না। বড় দুঃখিত, আইরিশ।

—রাখ; তোমার দুঃখ! হায় ঈশ্বর, এখন আমি কি মরব? কি করবার আছে আমার?

তারপর মনের ভাব বদলে আইরিশ বলে উঠল—ঠিক আছে। যা হবার হয়েছে। আর পাঁচ বছরের মধ্যে এমনটা আর হবে না।

কি? কেন হবে না?

দু'হাতে ভিটোকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, আইরিশ—তোমায় ভালবাসি। কোন কিছুর জন্যেই তোমায় ছাড়তে পারব না। আমার কাছে তোমার অনেক দাম।

ভিটো ঘাবড়ে গিয়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

—নাও। এবার সরো। বাথটব থেকে উঠতে দাও। বলল আইরিশ।

উঠে দাঁড়াল ভিটো…ক্লান্ত মন।

পরিণতি

সাত

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল ভিটো। ডিমু ভাজা হচ্ছে।

পরণে শর্টস্ আর জামা, হাত দু'খানা বুকের কাছে আড়াআড়ি করে রাখা।

আইরিশের পরণে ফুল ছাপ জামা আর স্কার্ট। সহসা ওর মনে হল, ওর

দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যেই একটা কি যেন অভিযোগ দানা বেঁধে রয়েছে। ও ধরতে পারছে না। হয়ত ওর অনুপস্থিতিই এর কারণ। কিংবা এ-ভাব আগেই জন্মেছিল, কিন্তু সে আঁচ করতে পারে নি।

এক সময় ভিটো জানতে চাইল—তারপর আর কি হল ?

জবাব দিল আইরিশ—যা বলবার তা ত বলেছি, খোকা। একদম অসহ্য লাগছিল !

—মিস্টার ক্রাঞ্জের সাথে দেখা করলে ? জুলে ?

ভুরু কোঁচকাল আইরিশ—হাঁ। তাতে কি হয়েছে ?

ভিটো নীরব।

—নিশ্চয় তার সাথে দেখা হল। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তারও পরিচয় রয়েছে। আমরা ত একই পরিচিতজনদের সঙ্গে মেলামেশা করি। এতে কি এমন পার্থক্য ঘটল ?

এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, মনে মনে ভাবল ভিটো। তার দেহে রাগ শির শির করছে। ধীরে ধীরে ক্রোধ বাড়ছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। কথা বলতে বাধবাধ লাগছে। তারপর বলতে সুরু করল। এবং নিজের কথা নিজের কাছে বিচিত্র শোনাল।

—ভেবেছিলাম, তুমি ওর সঙ্গ ছাড়বে। তাই না বলেছিলে ? তাহলে কেন তার কাছে গিয়েছিলে ?

ওর ভাব ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আইরিশ। তরুণ মুখমন্ডলে ঘৃণার পাতলা আবরণ, ছাদের আলোর নীচে নিষ্ঠুরতাব স্পর্শ। ওর বাজপাখীর মতন দীর্ঘ নাসিকায়।

নরম গলায় বলল আইরিশ--দেখ, ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি, সোনা। হঠাৎ-ই দেখা হয়ে গেল। মিথ্যে তিলকে তাল করো না।

—কি করে বুঝব যে, তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাও নি ?

—ও ভিটো···।

ভিটো নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে। বলল—তাই তুমি দু'দিন চলে গিয়েছিলে। যাবার সময় বলে গেলে, কোনও মেয়ের সাথে মিশো না। আমি মিশি নি, কথাও বলি নি। আর তুমি ওর সাথে, ওর পয়সায় ফুর্তি করে এলে···।

আইরিশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভিটোর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—থাম,

ভিটো। থাম…।

—না, আমায় ছেড়ে দাও। চলে যাচ্ছি…।

—জানি, তুমি মিথ্যে তিলকে তাল করছো। বহুবার ত বলেছি, জুলে আমার কাছে কেউ নয়। এস আমরা দু'জনে একটু মদ পান করি, কেমন?

ভিটোর রাগ মাথায় চড়ল। তার কথায় ছুরির ধার। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। বলল—তুমি, একটা জঘন্য!

—তুমি পাগল হয়ে গেছ; ভিটো। আইরিশ ধীরে ধীরে বলল।

—আমি পাগল হতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই! ভিটো চিৎকার করে উঠল।

ওকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল আইরিশ। বিস্মিত, ভীত সে। বলল—আবার তোমায় বলছি শোন, তুমি ভুল করছো। জুলে আমার কেউ নয়।

—কি করে বুঝব, বল। তুমি ত কিছু বল নি। সেই ত তোমার সন্তানের পিতা।

—থাম, ভিটো। বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। যাও…চেঁচিয়ে উঠল আইরিশ।

—যাচ্ছি। কিন্তু আর আসব না।

—কোথায় যাবে? নিজের ঘরে?

—জানি না।

—ঠিক আছে। যাও। তুমি একটা শয়তান।

—আর তুমি? তুমি একটা বেশ্যা! ঝড়ের মতন বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভিটো।

দু'হাতে মুখ ঢেকে টুলের উপর বসে পড়ল আইরিশ।

বেশ্যা! বেশ্যা! বেশ্যা! সবাই তাকে তাই মনে করে। সে স্ট্রীট গার্ল! সে নর্ম সঙ্গিনী পুরুষের! এর হাত থেকে যেন তার মুক্তি নেই!

আলো নিভল প্রেক্ষাগৃহের।

অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল ভিটো। রাতের নাচঘর এটা। বুঝতে পারছে, ওর হাত ঘামছে। বমি আসছে! অনেক খোঁজ নিয়ে সে আজ এখানে এসেছে।

স্পট লাইটটা জ্বলে উঠল।

আইরিশ এসে দাঁড়াল পর্দার ধারে। আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তার পরণে শুধু ব্রেসিয়ার আর বিকিনি। দর্শকদের খুব কাছেই এখন আইরিশ। বাজনা সুরু হল। তালে তালে এবার নাচ শুরু করল আইরিশ। উদ্দাম হয়ে উঠছে তার দেহ ভঙ্গি। একই সাথে তার কাঁধ আর নিতম্ব দুলছে, কাঁপছে। শিহরণ জেগেছে স্তন যুগলে। দুরন্ত হয়ে উঠছে শিহরণ। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে স্তন-যুগল পিষ্ট করছে। যেন এখুনি ওদের বন্দী দশা ঘুচে যাবে।

আর প্রতিবারই দর্শকরা কাম-পীড়িত কণ্ঠে সোল্লাসে চিৎকার করছে।

সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল আইরিশ।

একটানে খসিয়ে দিল তার বুকের বাঁধন।

ভিটো বোবা হয়ে গেল। আইরিশ! তার আইরিশ। বুকে ওর মাংসের সুডৌল পাহাড়। ক্ষীণ একটা পাতলা জালের আবরণ রয়েছে শুধু! ওর আড়ালে সোনালি দুটো স্তন বৃন্ত। ওই মাংস-পিন্ডে হাত রাখবার, স্পর্শ করার অধিকার ত একমাত্র তারই ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ও সকলের। ও বারবধূ।

আবার বাজনা বেজে উঠল।

আরও সামনে এগিয়ে এল আইরিশ। মুখ তার দর্শকদের দিকে। পা দু'খানা ফাঁক করে দেহ বেঁকিয়ে বসার ভঙ্গি করেছে। দু'পায়ের উপর সমস্ত দেহের ভার। হাত দু'খানা দু' উরুর মাঝে তালে তালে আসা যাওয়া করছে। আর দারুণ উত্তেজনার মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে। যেন কোনও পুরুষের সাথে সে যৌন সঙ্গমে রত। নাচের ভঙ্গিতে, মাথা আর হাতের আস্ফালনে দারুণ যৌনতার স্ফুরণ।

চিৎকার করছে দর্শকরা।

ভিটো উঠে পড়ল। যা' দেখবার তা' দেখা হয়ে গেছে।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে টলতে টলতে সে বেরিয়ে এল।

বাইরে একটা মাত্র আলো জ্বলছে। গভীর রাত।

দু'হাতে মুখ ঢাকল ভিটো। দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

—এ্যাই, কে ওখানে? কে যেন চিৎকার করে উঠল।

পাশের রাস্তা ধরে একজন এগিয়ে আসছে।

ভিটোর দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা। ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

—এখানে আয় বলছি ! ভিটো এগিয়ে গেল।

—কি করছিস এখানে ?—কিছু না।

—কি নাম তোর ?

—ভিটো পেলিগ্রিনো।

—যা, বাড়ী যা। নইলে থানায় ধরে নিয়ে যাব।

ভিটো নাচঘর ছেড়ে এগিয়ে গেল !

নীচের তলায় ভিটোর মৃতদেহ দেখে এসেছে। যেন ছিন্ন দল একটা গোলাপ।

আত্মহত্যা করেছে ভিটো।

কেন ? আত্মহত্যা সে কেন করল ? নিজের মনের কাছেই প্রশ্ন করল আইরিশ।

জবাব তার জানা। তার ভিটো নেই। সে আর ভাবতে পারে না। ধীরে ধীরে সে চেয়ারের উপরে উঠে দাঁড়াল। আলো ঝোলাবার আঙটায় রেশমের দড়ি বেঁধে একটা ফাঁস তৈরী করে নিয়েছে। এবার ফাঁসটা গলায় লাগাল। দেহের কোথাও আবরণ রাখে নি। উলঙ্গ অতি প্রিয় স্তন দুটোর উপর হাত রাখল।

এক ঝটকায় চেয়ারখানা পায়ের নীচ থেকে ফেলে দিল।

ঝুলে পড়ল আইরিশ বিস্মরণের জগতে।

* * *

পরিচিতি

ALBERTO MORAVIA

আলবার্তো মোরাভিয়া রোমে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁকে ইটালিয় তথা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যে নিঃসন্দেহে আদিরস তথা প্রেমের গল্প ও উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ বলা যায়। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পটিতেই তার প্রমাণ মেলে। মোরাভিয়ার 'ওম্যান অব রোম' 'টাইম অব ইন্ডিফারেন্স', এম্পটি ক্যানভাস, 'টু অ্যাডোলেসেন্স' ইত্যাদি গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

স্বীকারোক্তি থেকে

জিন্ জ্যাকুইস্ রুশো

কুমারী ল্যাম্বার সিফার আমাদেরকে ঠিক মায়ের মতই স্নেহ যত্ন করতেন, আবার মায়ের মতই শাসন করতেন আমাদের। দুষ্টুমি করলে, সাজাও পেতে হত তার হাতে। অনেক সময় তিনি শুধু শাস্তির ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত হোতেন। আর, এই শাস্তি পাবার ভয় আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। তাতে ঘাবড়েও যেতুম বেজায়। কিন্তু আসল শাস্তি পাবার পর দেখা যেত, যা আশঙ্কা করেছিলুম, সে তুলনায় শাস্তিটা নগন্য। কিন্তু সবচাইতে তাজ্জববোধ হত, যখন এই শাসন তর্জনের দরুণ শাস্তিদাত্রী আমার কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয়া, আরো বেশি ভয়ভক্তির পাত্রী হয়ে উঠতেন।

এই শ্রদ্ধাভক্তি, এবং তার সঙ্গে আমার নিরীহ গোবেচারা স্বভাব—এই দুয়েরই পূর্ণ প্রভাবের বশে আমি সচরাচর এমন কিছু করে বসতে চাইতাম না যার দরুণ সঙ্গত কারণেই এই শাস্তিদান পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে আমার ওপর। অথচ, আমি যে যন্ত্রণা ও হেনস্থার মধ্যে আস্বাদ করতুম এক ধরণের ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির সংমিশ্রণ—যার পরিণতিতে আমার ভয় পাবার চেয়ে বরঞ্চ যেন অনন্দই হত ঐ নারীর হাত থেকে আবার একটি শাস্তি পেতে। সন্দেহ নেই, আমার এই ধরণের অনভূতির সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরণের অকালপক্ব যৌনচেতনা। কারণ ঐ একই শাস্তি বোনের বদলে ভাইয়ের হাত থেকে পাওয়া গেলে সেটা আমার কাছে আদৌ প্রীতিপ্রদ বোধ হতনা নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাই ছিল ভিন্ন ধাতের মানুষ। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থার আশঙ্কা ছিল অমূলক।

এত সত্ত্বেও আমার যাতে শাস্তি না পেতে হয় তার জন্যে সচেষ্ট থাকতুম সর্ব-তোভাবে। এবং তা করতুম শুধু মাত্র কুমারী ল্যাম্বার সিফারের—অসন্তোষ বা বিরাগভাজন হতে চাইতুম না বলে। এতেই বোঝা যাবে সহৃদয়তার প্রভাব আমার ওপর ছিল কত খানি। যদিও সে প্রভাবের হেতু ছিল আমার ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি, যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি আবার প্রকারান্তরে সদাসর্বদা আমার ইন্দ্রিয় চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। তবু দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটতই। একে আমি ভয় পেতুম না অথচ এড়িয়ে চলতে চাইতুম। আমার কোন দোষ বা ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও এটা ঘটত। আর আমি বিবেকের দংশন বোধ না করেও বলতে পারি যে আমি এর থেকে মোটের ওপর লাভবানই হয়েছি।

তবে এই দ্বিতীয় দফার পুনরাবৃত্তি তথা শাস্তিলাভের ঘটনাই হত সর্বশেষ। তার কারণ কুমারী ল্যামবার সিফার নিশ্চই এমন কিছু লক্ষ্য করে থাকবেন, যাতে তিনি প্রায় নিঃসন্দেহই হয়েছিলেন যে তার প্রদত্ত শাস্তি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নি। তাই তিনি শেষটা জানিয়েই দিলেন যে তিনি আর এভাবে শাস্তি দেবেন না.যেহেতু তিনি এতে অত্যধিক ক্লান্তি বোধ করেন।

…তখন অবধি আমরা দু'ভাই-বোন ওর ঘরেই শুতোম। এমনকি শীত কালে কখনো ওর নিজের বিছানাতেই ওর সাথে একসাথে শুয়ে ঘুমিয়েছি—এরপর কিছুদিন বাদে আমাদের দুজনের আলাদা ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হল—সেই সময় থেকেই আমার সাথে উনি, কোন বয়স্ক ছেলের সঙ্গে কোন মহিলা যেভাবে আলাপ আচরণ করেন সেই ভাবে কথাবার্তাও, আচরণ করতেন। কিন্তু এতে আমি খুশি হবার বদলে যেন হতাশাই বোধ করেছি বেশি!

কে বিশ্বাস করবে, এই শিশু সুলভ সাজা যা আমায় পেতে হত আমার মাত্র আট বছর বয়সে একজন ত্রিশ বছর বয়সের তরুণীর হাতে, তা আমার বাকী সারা জীবনের রুচি-প্রকৃতি, আশা-আকাঙ্খা, বাসনা, কামনা এবং সর্বোপরি আমার নিজ সত্ত্বার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ-নির্ধারণ করবে…আর তা এমন ভাবেই করবে যা স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার চেতনা যখন একবার উদ্বুদ্ধ হল তখন আমার বাসনা কামনাগুলি এত উন্মার্গগামী হয়ে পড়ল যে তাদের আর বশে রাখা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আমার প্রায় জন্ম থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা উদ্দীপ্ত আমার দেহের উষ্ণ রক্তের জোরালো দাবী সত্ত্বেও আমি অনেকটা বয়স অবধি নিজেকে যাবতীয় কলঙ্কের ছোঁয়া থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়ে-ছিলাম। সেই পরবর্তী বয়সে আমার মধ্যে এক শীতলতম ও অলস মন্থরতম

মেজাজ-মর্জি ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগল। দুর্ভোগ যন্ত্রণার মাঝে দীর্ঘ কাল ধরে কেন জানি না আমি আমার ক্ষুধার্ত দুই জ্বলন্ত চোখের নজর দিয়ে, যত সুশ্রী মেয়েদের সঙ্গে আমার মোলাকাত ঘটত তাদের যেন গোগ্রাসে গিলতুম। আমার কল্পনায় অনবরত আবার তাদের দেখা পেতুম। যে দেখা পাওয়ার এক মাত্র অর্থ হচ্ছে আমার নিজের রুচি ও রীতি অনুযায়ী তাদের স্মৃতি কাজে লাগানো—তাদের ভেতরে অগুণতি কুমারী ল্যামবার সিফারকে আবিষ্কার করা!

বয়ঃ প্রাপ্তির বহু বছর বাদেও এই অদ্ভুত রুচি সর্বদা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে নষ্টামি ও পাপাচারের পর্য্যায়ে পেঁাছেও আমার নীতিবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। হয়তো স্বাভাবিক নিয়মে আমার এই রুচির প্রভাবে আমার নীতিবোধ বিনষ্ট হবারই কথা। যদি কারো বয়ঃপ্রাপ্তির অর্থাৎ ছোটবয়স থেকে ক্রমে বড় হয়ে মানুষ হবার প্রক্রিয়াকে পূর্ণ দোষ মুক্ত ও শালীন বলা যায়, তবে আমার বেলা অন্তত নিঃসন্দেহে তাই। আমার তিন জন মাতৃ স্থানীয়া আত্মীয়া যাঁরা শুধু শালীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, তাই নয়, তাঁরা এতদূর সংযতচিত্ত ছিলেন যে, যা নারী সমাজে অদ্যাবধি দুর্লভ। আমার পিতা আমোদ-আহ্লাদ প্রিয় সেকালের বীরত্ব ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি ভুলেও কখনো, এমনকি তার প্রিয় নারীদের সাক্ষাতেও এমন বাক্য কদাচ উচ্চারণ করতেন না যাতে কোন নারী বিশেষ করে, কুমারী কোন কিশোরীর গন্ডে লজ্জার রক্তিমাভা দেখা দেয়! আর শিশুদের প্রাপ্য মর্য্যাদা ও মনোযোগের ওপর আমার পরিবারে, বিশেষ করে আমার উপস্থিতিতে যতটা জোর-দেওয়া হত, এত আর কোথাও নয়। এই ব্যাপারে আমি কুমারী ল্যামবার সিফারকেও সমান যত্নবতী হতে দেখেছি। একদা ওঁদের বাড়ির এক চমৎকার চাকরকে তো তাড়িয়েই দেওয়া হল, শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, সে বেচারি আমাদের উপস্থিতিতে একটা আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছিল। যৌবনে পদার্পন না করা অবধি আমার যে শুধু নরনারীর যৌন মিলন সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না তাই নয়, যে অস্পষ্ট গোলমেলে ধারণটা আমার ছিল সে সম্পর্কে, তা কখনই ঘৃণা ও বিরক্তিকর ছাপ না নিয়ে আমার মনে উদয় হত না। সাধারণ বারবনিতা সম্পর্কে আমার মনে যে ঘৃণার ভাব ছিল, তা কখনই দূর হয় নি। কোন লম্পট চরিত্রহীন ব্যক্তি নজরে এলে আমার সর্বান্তঃকরণ ঘৃণায় ও ভীতিতে পরিপূর্ণ—হয়ে উঠত। লাম্পট্য সম্পর্কে আমার মনের বিভীষিকা এইভাবে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেই দিনটি থেকে, যেদিন একটা ফাঁকা পথ ধরে ছোট সাক্কোনেক্সে হেঁটে যাবার সময় রাস্তার দ্ুপাশের জমিতে কতকগুলো গর্ত দেখতে পাই এবং আমায় তখন কেউ একজন বলেছিল এই সব জীবেরা অর্থাৎ লম্পট লোকেরা এখানে যৌনক্রীড়া করে। যৌনক্রিয়ার চিন্তামাত্রই আমার মনে ভেসে উঠত রাস্তার কুকুরদের মৈথুন দৃশ্য যার স্মৃতি মাত্রই আমার মনে বিতৃষ্ণা উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট।

আমার বড় হয়ে ওঠার এই প্রবণতা, যা নিজে নিজেই একটি দাহ্য অর্থাৎ উত্তেজনাশীল মেজাজের প্রথম উৎক্ষেপকে বিলম্বিত করে দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তা আরও আনুকুল্য লাভ করল—আমি আগেই বলেছি—আমার ইন্দ্রিয়পরয়াণতার প্রথম প্রকাশ লক্ষণের গতি নির্দেশ থেকে। আমি যা প্রকৃতভাবে অনুভব করেছি তাই দিয়েই, কেবলমাত্র আমার কল্পনাকে ব্যাপৃত রাখতে শিখেছি সেই সঙ্গে রক্তের সবচেয়ে অস্বস্তিকর উত্তেজনা সত্ত্বেও আমি জেনেছিলাম কি করে আমার বাসনা কামনাকে সেই ধরণের আমোদ প্রমোদ অভিমুখী করা যায় যে ধরনের আমোদ প্রমোদের সঙ্গে আমি পরিচিত। যা আমার কাছে ঘৃণ্য বিষয়ে পরিণত করে তোলা হয়েছে, সেটা কি ভাবে এড়ানো যায় তাও জেনেছিলাম।

অথচ ঐ দুটো ব্যাপারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে আমার মনে ঘুনাক্ষরেও কোনও সন্দেহের উদয় হয় নি। আমার নির্বোধ কল্পনায়, আমার প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার মুহূর্তে যে সব অপচয়াত্মক ক্রিয়া কর্মে নিয়োজিত হতে আমার বাসনা কামনা আমাকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করত, যাতে আমি আশ্রয় নিতুম ভিন্ন লিঙ্গের সহায়তার, আমি জানতুমও না যে আমি যে বাসনার জ্বালায় জ্বলে একে ব্যবহার করছি, তাছাড়াও এ ভিন্নতর কোন উদ্দেশ্যের সহায়ক হতে পারি।

এক উগ্র লালসাময় অকালপক্ক মন মেজাজ সত্ত্বেও, এই উপায়ে তখন আমি বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করলুম। কুমারী ল্যামবার সিফার একদা একান্ত অজানতে. নিষ্পাপচিত্তে আমার মনে যে ধরণের কামনার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তা ছাড়া অন্য কোন ধরণের ইন্দ্রিয়সুখানুভূতির আকাঙ্ক্ষা আমার জানা ছিল না বা আমি করতুমও না।

পরে কালক্রমে যখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষে পরিণত হলাম, তখন, যারা আমাকে বিনষ্ট করবার কথা; সেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। আমার পুরোনো

শিশুসুলভ রুচি লুপ্ত না হয়ে আমার বয়স্ক রুচির সঙ্গে এত বেমালুম মিশে গেল যে আমি কখনই আমার ইন্দ্রিয় প্রজ্জ্বলিত অন্য বাসনা থেকে তাকে পরিবর্জন করতে পারি নি। আর এই উন্মত্ততা আমার স্বভাব লাজুকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাকে সদাসর্বদা মেয়েদের সম্পর্কে অত্যন্ত নিরুদ্যম করে তুলত। প্রথমত কিছু বলার সাহসের অভাব, দ্বিতীয়ত কিছু করার ক্ষমতার অভাবই ছিল এর মূল কারণ। সেই ধরণের উপভোগ, যার অপরটি ছিল কেবল মাত্র আমার কাছে চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা সাধন, সেটা যে এর জন্য উৎসুক ছিল তার দ্বারা কাজে লাগানোও সম্ভব হল না বা যে নারী এটা দানে সক্ষম তার দ্বারা এটা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না।

অতএব এইভাবেই আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি এক অলস ইচ্ছা-পূরণের কল্পনাবিলাসে ; আমি যাদেরকে সবচাইতে ভালবাসতুম তাদের সমক্ষে একটি কথাও না বলে। আমার মনের রুচি ও বাসনা প্রকাশ করাটা আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জা সঙ্কোচের ব্যাপার হওয়ায় আমি অন্তত সেটা পরিতৃপ্ত করতুম এমন সব পরিস্থিতিতে যার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে এবং এই ধারণাটাকে জিইয়েই রেখেছিলাম। কোন দাম্ভিক নর্মসহচরীর পদসেবী হওয়া, সর্বদা তার হুকুম তামিল করা, তার ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এটাই ছিল আমার কাছে এক মধুর উপভোগ্য ব্যাপার এবং যতই আমার সজীব কল্পনা আমার দেহশোণিতকে উত্তপ্ত করে তুলত, ততই আমি প্রতিভাত হতুম এক সলাজ প্রেমিক রূপে। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রেম নিবেদনের এই পদ্ধতি আদৌ তেমন আশু কার্যকরী নয়। আর এর লক্ষ্য যারা, তাদের সতীত্ব রক্ষার পক্ষেও এটা তেমন বিপজ্জনক নয়। এই কারণেই আমি কখনও কাউকে তেমন করে না পেয়েও নিজস্ব নিয়মে নিজে নিজে কাম উপভোগ করিনি। তার মানে, কল্পনায়। অতএব এমনটা ঘটেছে যে আমার চেতনইন্দ্রিয়গুলি আমার ভীরু স্বভাব ও রোমান্টিক সত্বার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার মানসিক ভাবাবেগ ও অনুভূতির বিশুদ্ধতাকে বজায় রেখেছে আর আমার নীতিবোধকে রেখেছে নির্মল। এরই মূলে কিন্তু রয়েছে সেই একই রুচির প্রভাব যার সঙ্গে চিত্তের আর একটু বেশি ঔদ্ধত্য এসে মিশলে হয়তো আমাকে তলিয়ে দিতে পারত চরম পাশবিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাঝে।

পরিচিতি

From 'THE CONFESSIONS'

(JEAN JACQUES ROUSSEAU A. D. 1712-78)

রুশোর জন্ম ফ্রান্সে ১৭১২ খৃঃ মৃত্যু ১৭৭৮ খৃঃ !

[রুশোর পিতা জনৈক সেনাবাহিনীর অফিসারকে প্রহার করার পরে জেনেভা ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় বালক রুশোকে পাঠানো হয় 'বসি'তে (Bossey) ল্যাম্বার সিফার নামে জনৈক প্রটেস্ট্যাণ্ট পাদরি ও তার ভগিনীর সঙ্গে বসবাসের উদ্দেশ্যে। এই অংশে সেই মহিলা সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ করেছেন লেখক]

দার্শনিক মনীষী ও মহাবিপ্লবী রুশো আজকের পৃথিবীর এক স্মরণীয় পুরুষ। ফরাসী বিপ্লব ছাড়াও আধুনিক মনন ও শিক্ষা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনন্য সাধারণ। তাই তাঁর একটি লেখা এই এরূপ বিতর্কিত বিষয়ে সংযুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিকাশে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর 'স্বীকারোক্তি' এক অমূল্য সম্পদ। ফ্রয়েড প্রমুখের পূর্বসূরী হিসাবেও মনস্তাত্ত্বিক অন্তঃদর্শনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ্য।

বন্ধু-স্ত্রী | গিয়োভানি বোকাসিও

সিয়েনা শহরে স্পিনেলোসিও ট্যাভেনা ও জেম্পা ডি মিনো নামে দুই বন্ধু বাস করত। বয়সে দুজনেই তরুণ ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। শহরের এক বনেদী পাড়ায় পাশাপাশি দুটো বাড়ীতে ওরা থাকত।

নজীরবিহীন বন্ধুত্ব ছিল ওদের। ওরা যে শুধু সব কাজ এক সঙ্গে করত, সব জায়গায় একসঙ্গে যেতো তাই নয়, ওদের ভাবনা চিন্তা, কথাবার্তা আচার-আচরণে এমনই মিল ছিল যে বাইরের সবাই তো ওদের এক মায়ের পেটের ভাই ভাবত। হয়ত বা ঘুমিয়ে ওরা একই স্বপ্ন দেখত। ওদের এই অভিন্ন হৃদয় গভীর বন্ধুত্ব অন্যদের ঈর্ষার কারণ ছিল।

সুখেই কাটছিল ওদের দিনগুলি। অবশেষে একদিন দুই বন্ধুর গভীর প্রণয়ে ভাগ বসাতে এল আরো দুজন, ওরা বিয়ে করল সম্ভ্রান্ত বংশের দুই রূপসী কন্যাকে। দুই-এ দুই-এ চার হোল। দুই পরিবারে আনন্দের উজান স্রোত যেন বাঁধন হারা হয়ে উঠলো।

কিন্তু চিরকাল একরকম যায় না। অদৃশ্য কোন নিয়তির ঈঙ্গিতে ঘটনা ঘটে যায় আপন নিয়মে—মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

স্পিনেলোসিও সারাদিনের অনেকটা সময়ই বন্ধু জেম্পার বাড়ীতে আড্ডা মেরে কাটাতো! জেম্পাকে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই নিজের কাজে বাড়ীর বাইরে থাকতে হত। জেম্পার অনুপস্থিতিতে তার বউ স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে গল্প গুজব করত, আড্ডা মারত। দিনের পর দিন এই ভাবে হাসি ঠাট্টা, গল্পগুজব করে ওরা সময় কাটাত। ক্রমশঃ দুজনের মধ্যে গড়ে উঠলো বন্ধুত্ব—এবং

একদিন সেই বন্ধুত্ব পরিণত হোল গভীর প্রেমে।

জেপ্পা কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটি নারী ও একটি পুরুষের অবৈধ প্রেমের উদ্দাম লীলা চলতে লাগল দুর্বার গতিতে

কিন্তু একদিন

জেপ্পা তখনও বাড়ী ছিল। ওর বউ বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল জেপ্পা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। স্পিনেলোসিও জেপ্পাদের বাড়ী এসে দেখলো জেপ্পার বউ একা রয়েছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে দেরী করে না। বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীর নরম দেহটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল। একটা ঝোড়ো হাওয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে জেপ্পার বউ-এর দেহটাকে এলোমেলো করে দিল। কিন্তু সেও পিছিয়ে নেই—আদরের প্রত্যুত্তর দিল সে স্বামীর বন্ধুকে চুমু খেয়ে।

জেপ্পাকে ওরা দেখতে পায়নি; জেপ্পা কিন্তু আড়ালে থেকে সব দেখছিল। প্রিয়তমা স্ত্রী ও প্রাণের বন্ধু স্পিনেলোসিওর এই বিশ্বাসঘাতকতায় জেপ্পা বিস্ময়ে হতবাক। উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু উত্তেজনা দমন করে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলো ওদের এই প্রেমলীলা কোথায় শেষ হয় দেখার জন্য।

এদিকে স্পিনেলোসিও জেপ্পার বউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। জেপ্পা চ্যাঁচামেচি করল না বা ওদের বাধাও দিল না। ও জানে তাতে শুধু কলঙ্কই রটবে। স্ত্রী ও বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতায় উদ্‌ভ্রান্ত মনকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে শুধু প্রতিশোধ। ভেবে ভেবে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে ফেলল জেপ্পা।

জেপ্পা লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে স্পিনেলোসিও ওদের শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে জেপ্পা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

ঘরে তখন জেপ্পার বউ তার শিথিল বেশবাস গুছিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ স্বামীকে দেখে চমকে উঠলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে এমন মুখ-ভাব করল যেন কিছুই হয়নি। নিরুত্তাপ কণ্ঠে জেপ্পা জিজ্ঞেস করল।

'কি করছ?'

'দেখতে পাচ্ছনা কি করছি।' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল জেপ্পার বউ।

'হ্যাঁ দেখতে পারছি।' নিরুত্তাপ কিন্তু কঠিন স্বরে জেপ্পা বলল, 'এছাড়া আরও এমন কিছু দেখছি যা আমাকে দেখতে না হলেই ভাল হত।'

'মানে? আর কি দেখেছো?' তীক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করল ওর বউ।

'সেটাতো তুমি আমার চেয়েও ভাল জান ডার্লিং—আর জানে আমার প্রিয় বন্ধু স্পিনেলোসিও।' জেপ্পার কণ্ঠে শ্লেষ।

মুহূর্তে পাল্টে গেল জেপ্পার বউ-এর মুখের চেহারা। বুঝলো ধরা পড়ে গেছে। বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না, শুধু ফ্যাকাসে মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জেপ্পার মুখের দিকে। অজানা এক আশংকায় ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বুঝলো মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়ে আর রেহাই পাবে না। জেপ্পার হাঁটু দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল—কৃতকর্মের জন্য বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল স্বামীর কাছে।

জেপ্পার কোন ভাবান্তর হল না ঠাণ্ডা গলায় বলল,

'শোন, তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি—এক শর্তে—আমি যা বলব তোমাকে তাই করতে হবে, কি পারবে?'

'হ্যাঁ পারব, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।' জেপ্পার বউ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

'তাহলে চোখ মোছ, মন দিয়ে শোন।' জেপ্পা ওর পরিকল্পনার কথা বউকে বলল এবং ওকে কি কি করতে হবে তাও ভাল করে বুঝিয়ে দিল। বারবার সাবধান করে দিল স্পিনেলোসিও যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় ওর পরিকল্পনার কথা।

জেপ্পার বউ ভাল মেয়ের মত স্বামীর কথায় মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল স্পিনেলোসিও কিছুই জানবে না।

পরদিন ভোরবেলা। দুই বন্ধু কথা বলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে এসে স্পিনেলোসিত জেপ্পাকে বলল,

'বন্ধু, আমার অন্য এক বন্ধুর বাড়ীতে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন আছে, সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।'

'সেকি, এখনও তো ব্রেকফাস্টের সময় হয়নি স্পিনেলোসিও।' জেপ্পা বলল।

'আমাকে একটু আগেই যেতে হবে।' স্পিনেলোসিও জবাব দিল। 'বন্ধুটির

সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথাবার্তাও আছে—তাই একটু আগেই যেতে চাই।'

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্পিনেলোসিও চলে গেল। জেপ্পার বউকে কথা দিয়েছে সকাল বেলায় যাবে।

জেপ্পা ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে শুধু একটু মুচকি হাসল। ঘটনা পরিকল্পনা-মাফিক এগোচ্ছে। একটু অপেক্ষা করে সেও বাড়ীর দিকে পা চালালো।

জোরে জোরে পা চালিয়ে স্পিনেলোসিও জেপ্পাদের বাড়ী পৌঁছে গেল। জেপ্পার বউকে নিয়ে ওদের শোবার ঘরে পা বাড়াতেই জেপ্পাও বাড়ী ফিরে এল। জেপ্পা ফিরে আসতে স্পিনেলোসিও হকচকিয়ে গেল। স্বামীর পায়ের শব্দ পেয়ে জেপ্পার বউ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে স্পিনেলোসিওকে শোবার ঘরের বড় সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে স্ত্রস্ত পায়ে ঘর ছড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাস জেপ্পার বউ নিশ্চিন্ত। স্বামীর পরিকল্পনা মত সব কাজই ও করেছে, এরপর যা করবার জেপ্পাই করবে।

বাড়ী ফিরে জেপ্পা সোজা ওপরে উঠে এলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল ব্রেক-ফাস্ট তৈরী হয়েছে কিনা। ওর বউ জানাল হয়েছে। জেপ্পা বলল,

'স্পিনেলোসিও ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে আজ ব্রেকফাস্ট করবে। ওর বউ বাড়ীতে একা আছে। যাও ওকে ডেকে নিয়ে এসো ওকে বলো ও আমাদের সঙ্গে আজ ব্রেকফাস্ট করবে।

বাধ্য মেয়ের মতো জেপ্পার বউ সঙ্গে সঙ্গে স্পিনেলোসিওর বউকে ডেকে আনতে গেল। স্বামী ব্রেকফাস্ট করতে বাড়ী আসবে না জেনে স্পিনেলোসিওর বউ জেপ্পার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জেপ্পার বউ এর সঙ্গে ওদের বাড়ী চলে এলো।

ওরা বাড়ীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জেপ্পা হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বউকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ঘনিষ্ট ভাবে স্পিনেলোসিওর বউকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জেপ্পার এই হঠাৎ উদ্দাম আর অস্বাভাবিক আচরণে স্পিনেলোসিওর বউ অবাক হয়ে গেল। জেপ্পাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে দেখে বলল।

'এসবের মানে কি জেপ্পা ? এজন্যই কি তুমি আমাকে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছো ? আমি ভাবতাম স্পিনেলোসিও কে তুমি নিজের ভাই-এর

মত ভালবাস, আমি জানতাম তুমি ওর বিশ্বস্ত বন্ধু।' স্পিনেলোসিওর বউ-এর স্বর কঠিন।

জেম্পা কিন্তু নির্বিকার। আরও শক্ত করে বন্ধুর বউ-এর কোমরটা জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে এল ঘরের একপাশে বড় সিন্দুকটার কাছে, যার ভেতরে স্পিনেলোসিওঁ বন্দী হয়ে আছে। বলল,

'প্রিয়তম, আমাকে অভিযোগ করার আগে, আমারও কিছু বলার আছে, মন দিয়ে শোন। আমি স্পিনেলোসিওকে নিজের ভাই-এর মতই ভালবাসতাম এখনও বাসি। 'কিন্তু ওর প্রতি আমার বিশ্বাসের চরম প্রতিদান ও আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু স্পিনেলোসিও—তোমার স্বামী—আমারই প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে অবাধে প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছে—ঠিক যেমনটি ও তোমার-সঙ্গে করে। আমি ওকে ভালবাসি—তাই ওর অপরাধের একমাত্র উপযুক্ত প্রতিশোধ এটাই। ও আমার স্ত্রীকে অধিকার করে নিয়েছে—আমিও চাই তোমাকে। তুমি যদি রাজী না হও তাহলে জেনে রাখ তোমার স্বামীকে একদিন না একদিন হাতেনাতে আমি ধরব—সেদিন ওর অপরাধের জন্য এমন কঠিন শাস্তি ও পাবে যার পরিনামে তোমাদের দুজনের জীবনই হয়ে উঠবে দুর্বিসহ।'

জেম্পার কাহিনী শুনে স্পিনেলোসিওর বউ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। স্বামীর ব্যবহারে সে ক্ষুব্ধ, লজ্জিত। কিন্তু জেম্পার কথাও সে পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। ধীরে ধীরে বলল।

জেম্পা, আমার স্বামীর অপরাধের খেসারৎ যদি আমাকেই দিতে হয়—রাজী আছি। কিন্তু তুমি দেখো তোমার বউ যেন আমার প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ না করে। ও আমার যা ক্ষতি করেছে, তাতে আমি কিন্তু ওকে কিছুই বলিনি।

জেম্পা বলল, 'হ্যাঁ আমি তা নিশ্চয়ই দেখব। তাছাড়াও তোমাকে আমি একটা অত্যন্ত মূল্যবান ও সুন্দর রত্ন উপহার দেব।'

কথাগুলি বলে জেম্পা স্পিনেলোসিওর বউকে দুহাতে জড়িয়ে পাগলের মত চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিল। ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে বড় সিন্দুকটার ওপরে—যার ভেতরে বন্দী হয়ে আছে স্পিনেলোসিও—শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনেই মত্ত হয়ে উঠলো এক উন্দাস প্রেমের খেলায়। দুই দেহ এক হল।

সিন্দুকের ভেতরে বন্দী স্পিনেলোসিও ওদের দুজনের কথাবার্তা সবই শুনেছে। তারপরে ওর মাথার ওপরে ওদের দুজনের প্রেমলীলা ওকে যেন পাগল করে তুলল। ওর মনে হতে লাগলো যেন যে কোন মুহূর্তে সে মরে যেতে পারে। কিন্তু স্পিনেলোসিওর চুপচাপ মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাই সেত তালে তালে বন্ধু পত্নীকে আদর করতে থাকে।

ধীরে ধীরে সিন্দুকের ওপরে ওদের উন্দামতা শান্ত হয়ে এল। স্পিনেলোসিও

ততক্ষণে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। শেষে অনেক ভেবে নিজেই এই উপলব্ধিতে এল—যা স্বাভাবিক জেপ্পা তাই করেছে। ওর অপরাধের এটাই শাস্তি হওয়া উচিত। এরপর জেপ্পা যদি চায় তাহলে এবার থেকে ও জেপ্পার প্রকৃতই বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠবে। আর তার বউ ত জেপ্পাকে বন্ধু করে নিয়েছে।

জেপ্পা স্পিনেলোসিওর বউকে ছেড়ে দিয়ে কৌচে এসে বসল। স্পিনেলোসিওর বউ আগোছালো- পোষাক গুছোতে গুছোতে বলল,

—'কই আমাকে যে রত্ন দেবে বলেছিলে দাও।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' বলে জেপ্পা শোবার ঘরের দরজা খুলে ওর বউকে ডাকল। ওর বউ ঘরে এলে জেপ্পা ওকে সিন্দুকটা খুলতে বলল।

জেপ্পার বউ সিন্দুকটা খুলতেই জেপ্পা স্পিনেলোসিওর বউ-এর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দিল সিন্দুকটার দিকে—যেখানে বিষাদক্লান্ত স্পিনেলোসিও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্পিনেলোসিওর বউ সিন্দুকের মধ্যে ওর স্বামীকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। সে এক অবর্ণনীয় মুহূর্ত। বিস্ময়ে নির্বাক ও বুঝল স্বামী সবই বুঝেছে, সবই জেনেছে ও যা করেছে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল স্পিনেলোসিও। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে প্রিয়তম বন্ধু জেপ্পা। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। জেপ্পাই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গলো। স্পিনেলোসিওর বউকে বলল।

'এই নাও তোমার সেই রত্ন-যা তোমাকে দেব বলে কথা দিয়েছি।' বলে স্পিনেলোসিওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

স্পিনেলোসিও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো সিন্দুকটা থেকে। বলল,

'বন্ধু এটাই আমার নিয়তি ছিল, যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সুযোগ আছে—এসো আমরা আবার সেই আগের মত নতুন করে বন্ধুত্ব গড়ি।'

একটু থেমে স্পিনালোসিও আবার বলল, 'এতদিন তো আমারা কোন কিছুই একা ভোগ করিনি—যা পেয়েছি দুজনে সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছি। এবার থেকে এসো আমরা আমাদের স্ত্রীদেরও সমান ভাবে ভাগ করে নিই।' কথা শুনে মুখ লাল হয়ে যায় লজ্জায়। আর সলজ্জ মুচকি হাসি ফোটে স্ত্রীদের চোখে মুখে। লজ্জায় আরক্ত হয়েও যেন এ প্রস্তাবে স্ত্রীদের আনন্দ ধরে না।

জেপ্পা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সানন্দে মত দিল বন্ধুর প্রস্তাবে। ওরা চারজনে খুশী মনে বসল ব্রেকফাস্টের টেবিলে। সেদিন থেকে দুই বন্ধু পেল দুই জন করে স্ত্রী—ওদের স্ত্রীরাও পেল দুজন করে স্বামী।

* * *

TWO FRIENDS : Gyovani Boccacio